সুলেখা সান্যাল

র চ না স ম গ্র

প্রথম খণ্ড

সুলেখা সান্যাল রচনাসমগ্র

ভূমিকা : অশোক মিত্র

সম্পাদনা : গৌতম অধিকারী

কথারূপ

২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

Sulekha Sanyal Rachanasamagra
Part-I

গ্রন্থস্বত্ব
সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়)

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারি ১৯৬৫

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুব্রত মল্লিক

প্রকাশক
দেবযানী অধিকারী
কথারূপ
২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কলকাতা-৭৩

মুখ্য পরিবেশক
দে'জ পাবলিশিং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

হরফবিন্যাস
দিশা প্রিন্টেক্সট
দূরভাষ : ৯৪৩৩৪২২৪৪৯
মুদ্রক
শান্তি প্যাকার্স, কলকাতা

দাম
দুই শত তিরিশ টাকা

বাংলা সাহিত্যের মননশীল পাঠকদের



(১৯২৮-১৯৬২)

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা

অকালপ্রয়াত লেখিকা সুলেখা সান্যাল (১৯২৮-১৯৬২) বাংলা কথাসাহিত্যে প্রায়-অনালোচিত রয়ে গেছেন বিগত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর জুড়েই। কিন্তু এখনও তাঁকে বিস্মৃত লেখকদের দলভুক্ত করা চলে না এবং উচিতও নয়। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের (১৯৫৬) আশ্বিন মাসে অরুণা প্রকাশনী থেকে তাঁর অনুজা সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়)-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'সুলেখা সান্যালের গল্পসংগ্রহ'। গ্রন্থটিতে লেখিকার জীবদ্দশায় প্রকাশিত একমাত্র গল্প সংকলন 'সিঁদুরে মেঘ'ভুক্ত আটটি রচনা ছাড়াও আরও দশটি অগ্রন্থিত গল্প রয়েছে। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের শারদ সংখ্যা 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেওয়াল পদ্ম' উপন্যাসটির 'সারস্বত প্রকাশন' প্রকাশিত সংস্করণটি (১৯৫৬) এখনও বাজারে পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও বাংলা ভাষার প্রবহমান সমালোচনাধারায় তাঁর অনুপস্থিতি সত্যিই এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। ফলে এ-সময়ের এক তরুণ প্রাবন্ধিক যখন ক্ষোভ ও অভিমানে বলে ওঠেন, ''বাণিজ্যিক পত্রিকা ও তার অনুগত লিখিয়েদের কথা না হয় বাদই দিলাম। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' নামিত মহামূল্য বইটিতে সুলেখা সান্যালের নামটুকুও উচ্চারণযোগ্য মনে হল না কেন!', তখন সে-অভিমান ও ক্ষোভ অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। অবশ্য অন্য একটি ইতিবাচক ক্ষেত্রও আছে— মরূদ্যানের মতো। কবি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল, রুশতী সেন, সুতপা ভট্টাচার্য সহ বেশ কয়েকজন প্রাবন্ধিকের রচনায় সুলেখার সাহিত্যকর্ম প্রসঙ্গে নির্মিত হয়ে চলেছিল বা চলছে বহুমাত্রিক আলোচনার পরিসর। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমিতে এক আলোচনা সভায় তাঁর পঠিত দুটি সেরা বাংলা বইয়ের কথা জানাতে গিয়ে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সর্বজয়া'র পাশে উল্লেখ করলেন সুলেখার 'দেওয়াল পদ্ম' উপন্যাসের নাম। এ-সব ঘটনাক্রমের মধ্যে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 'কথারূপ' পত্রিকার সুলেখা সান্যাল বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্ভবত সুলেখার জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ে সেটিই ছিল সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার প্রয়াস। এই প্রয়াস পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছিল, যা পরবর্তীকালে সুলেখার সমস্ত সাহিত্যকর্ম একত্র প্রকাশের প্রেরণাভূমি, ফলস্বরূপ 'সুলেখা সান্যাল রচনা সমগ্র'-এর প্রথম প্রকাশ।

এই গ্রন্থটির প্রকাশে সুলেখা-অনুরাগী পাঠক, যারা তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা যেমন খুশি হবেন, তেমনই একটা তৃপ্তিবোধ আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত। কারণ নবপ্রজন্মের বাঙালি পাঠকের কাছে তাঁর রচনাকর্ম পৌঁছে দেওয়া গেল শুধু নয়, তাঁকে সর্বসমক্ষে আলোচনার বিষয় করে তোলার ধারাটি ক্রমাগত পুষ্ট হতে থাকবে। কিন্তু এ-কারণে কোনো অতিরিক্ত গৌরব বা কৃতিত্বের দাবিদার আমরা নই। কেননা, 'মহাযুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দেশভাগ-স্বাধীনতা' পর্বের লেখিকা হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে আমাদের মনোযোগ আদায় করতে পারেননি, সে-ব্যর্থতার দায় তাঁর নয়, আমাদের। পাশাপাশি কঠিনতম বাস্তবটি না মেনে উপায় নেই, এখন বাঙালি পাঠকের মধ্যে লেখকের পরিচিতি বড়ো বেশি খবরের কাগজ ও তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্য পত্রিকাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞাপিত পণ্যসামগ্রীই বিকোয় নগদ মূল্যে। মুনাফাকেন্দ্রিক বুর্জোয়া সংস্কৃতির যে-বাজার তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে এক ছোটো পত্রিকা ও ছোটো প্রকাশন সংস্থা কাউকে দায়ি না করে একটা কর্তব্য পালনের পরিসরটুকু খুঁজে নিচ্ছে মাত্র। প্রত্যাশা, কথাসাহিত্যের প্রবহমান ধারায় একটি নির্দিষ্ট সময় ও সমাজ পরিসরের মধ্যে থেকে এই লেখিকা কিভাবে তাঁর সাহিত্যবীক্ষাকে সৃজনক্ষেত্রে রূপ দিতে পেরেছিলেন, সে-সম্পর্কে সাহিত্যজিজ্ঞাসার দ্বার উন্মোচিত হবে।

সুলেখার সাহিত্যকর্ম ও তাঁর জীবনরেখার সঙ্গে পাঠক হিসাবে যতটুকু পরিচয়, তাতে এটুকু উপলব্ধি করা গেছে, সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে ও সমাজমুক্তির সংকল্পে আলোড়িত বাংলার সামাজিক-সংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটেই সুলেখার রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবন প্রবাহিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পৃথিবীর অনিকেত মানসযাত্রা, দেশভাগ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি একদিকে সামাজিক বিকৃতির সূত্রপাত করেছিল। বিপরীতে অন্য একটি ধারাতেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সমাজ পরিবর্তনের জন্য একদল মুক্তিকামী মানুষের দায়বদ্ধতা— তৈরি হচ্ছিল অনুপূরক সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। পড়াশোনার সুবাদে কলকাতায় এসে সুলেখাও নিজেকে যুক্ত করেছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে। যদিও এসব ক্ষেত্রে প্রতিকূলতাও কম ছিল না কোনোভাবেই। যেমন প্রতিকূলতা ছিল তাঁর লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও। বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের অবশেষ ছিল তাঁর পারিবারিক প্রেক্ষিত। অন্যদিকে তাঁর মা ছিলেন কৃষ্ণনগরের রামতনু লাহিড়ীর পরিবারের মেয়ে। অর্থাৎ হিন্দু পরিবারে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও একটা ব্রাহ্ম উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছিলেন। পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক— এটা তিনি চেয়েছিলেন, যা সুলেখাকেও উজ্জীবিত করে থাকবে। সুলেখার জীবনবোধ সমৃদ্ধ হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন তথা বিপ্লবী দলের সঙ্গে পরিচয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এবং বামপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি বিনষ্ট দাম্পত্য-জীবন, সে-সময়ের এক শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের সঙ্গে মানসিক ও বৌদ্ধিকভাবে

গড়ে ওঠা সম্পর্কের চিড় তাঁকে ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত করছিল। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে প্রতিবাদী মানসিকতার মানুষ হয়ে উঠবার জন্য তিনি নিজের জীবন ও সৃজনকর্মকে ফুরিয়ে যেতে দেননি। স্বল্পপরিসর জীবনে রচনা করেছিলেন দুটি উপন্যাস— 'নবাঙ্কুর' (১৯৫৬), 'দেওয়াল পদ্ম' (১৯৬৪) এবং শেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী একত্রিশটি ছোটোগল্প। এগুলি থেকে আটটি ছোটোগল্প নিয়ে তার জীবদ্দশাতে প্রকাশিত হয়েছিল একটি ছোটোগল্প সংকলন 'সিঁদুরে মেঘ' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)।

'রচনাসমগ্র'-এর প্রথম খণ্ডে থাকছে প্রথম উপন্যাস 'নবাঙ্কুর' এবং অগ্রন্থিত এগারোটি ছোটোগল্প। 'নবাঙ্কুর' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয় 'মধ্যবিত্ত' পত্রিকায় বাংলা ১৩৬২ সালে। ওই বৎসরই সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মোট তিনটি সংস্করণের মধ্যে আমরা ১৯৫৬ সালে মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণটির পাঠ গ্রহণ করেছি। উপন্যাসটি পাঠপ্রতিক্রিয়ায় আত্মজৈবনিক স্থাপত্যের কথা বারবার উঠে এসেছে অনিবার্যভাবে। আবার অনেকে ভেবেছেন সুলেখা সান্যাল আত্মজীবনকে বিনির্মাণ করে এই উপন্যাসের কথনবিশ্বে সামন্ততান্ত্রিক পুরুষশাসিত সমাজে নারীসত্তার বহুমাত্রিক নিপীড়ন ও প্রান্তিকায়নকে শনাক্ত করতে করতে যথাপ্রাপ্ত পরিস্থিতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথাও ভেবেছিলেন। আবার কেউ বা ভেবেছেন 'নবাঙ্কুরে' সমাজ কাঠামোয় নারীর অধিকারটুকুর লড়াই সামগ্রিক মুক্তির লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত। সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষের শ্রেয় অবস্থায় উত্তরণের প্রশ্নেই ও উপন্যাসের শিকড়-সন্ধান। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ছবির হয়ে ওঠার কথকতাকে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের সঙ্গেও তুলনীয় হতে দেখা যায় বারবার। অপুর আত্মজৈবনিক স্থাপত্য নির্মাণ করতে গিয়ে বিভূতিভূষণ যেমন তার উৎস, পরিবেশ, ভিত্তি ও প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেন নিশ্চিন্দিপুর, ইন্দির ঠাকরুণ, দুর্গার মধ্য দিয়ে, তেমনই সুলেখা ছবির উৎস ও প্রেক্ষাপট গড়ে দিয়েছিন কুসুমপুর, রায়বাড়ি, বিশেষ করে মা মমতার মধ্য দিয়ে। ফলে এ-প্রজন্মের কাছেও উপন্যাসটির বহুমাত্রিক পাঠের অবকাশ আছে।

সংকলিত এগারোটি গল্প সরাসরি পত্রিকার পাতা থেকে মুদ্রিত। এগুলির মধ্যে 'লঘুমেঘ' প্রকাশিত হয় ১৩৬২ বঙ্গাব্দে, 'নির্লজ্জ' ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে এবং 'প্রতীক', 'শেষ সন্ধ্যা' ও 'যে গল্পের শেষ নেই' প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে। 'ঘেন্না', 'লজ্জাহর', 'ফাটল', 'রূপ', 'পাষণ্ড' ও 'ভাঙাঘরের কাব্য' গল্পগুলির প্রকাশকাল নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। 'মামনি' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায়— এমন তথ্য জানা গেলেও গল্পটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। হয়তো এমন আরও গল্প পত্র-পত্রিকার পাতায় থাকতে পারে যা অজানা রয়ে গেছে। পাঠকের সন্ধানে এমন কোনো গল্প থাকলে সবিনয়ে সেই তথ্য জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কেননা অচিরেই 'সুলেখা সান্যাল রচনাসমগ্র' দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হতে চলেছে। এই খণ্ডটিতে 'দেওয়াল পদ্ম' উপন্যাস সহ লেখিকার অন্য সমস্ত গল্পের

সঙ্গে 'নবাঙ্কুর' দ্বিতীয় খণ্ডের অসমাপ্ত অংশ এবং 'মুকুরের মুখ' ও 'হৃদয়ের রঙ' নামে যে দুটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন সুলেখা সেই লেখাগুলিও থাকবে।

সম্পাদনাপর্বে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলিতে বর্তমান সময়ের গ্রহণযোগ্য বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো শব্দের পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। যেমন 'কর্ম্ম', 'ধর্ম্ম' 'কার্য্য' শব্দগুলি হয়েছে 'কর্ম', 'ধর্ম', 'কার্য'। 'বেশী, বাড়ী, পাখী, মামী, মাসী' ইত্যাদি বানানের শেষে 'ী' এবং 'ি' দুই রূপই সংকলিত রচনাগুলিতে দেখা গেছে। কিন্তু এই সংকলনে শুধুমাত্র 'ি' রাখা হয়েছে। উক্তি-প্রত্যুক্তির ক্ষেত্রে সুলেখা ',', ':', ':—' তিনটি রূপই ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ',' ব্যবহার করা হয়েছে। রচনাগুলির যতিচিহ্নের কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা হয়েছে অর্থ সম্পর্ক ঠিক রেখে। কেননা বর্তমান পাঠকদের জন্য আমাদের এ-সংকলন। যাঁরা গবেষক, তাঁরা নিশ্চয়ই চাইবেন অতীতের বানান সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রূপে পেতে। এজন্য অবশ্যই তাঁদের আদি সংস্করণ দেখতে হবে। এ-কারণে রচনাগুলির প্রয়োজনীয় তথ্যনির্দেশ করা হয়েছে।

'কথারূপ' পত্রিকার সুলেখা সান্যাল সংখ্যা প্রকাশিত হবার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে 'রচনাসমগ্র' প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হল। দীর্ঘ বিলম্বের নানাবিধ কারণ, যার দায়দায়িত্ব সম্পাদকের। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন স্বনামখ্যাত প্রাবন্ধিক শ্রী অশোক মিত্র। সুলেখা সান্যালের মৃত্যুর অববহিত পরে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় কবি ও প্রাবন্ধিক তরুণ সান্যাল 'সুলেখা সান্যাল : জীবন ও সাহিত্য' শিরোনামে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ-গ্রন্থে মানুষ ও সাহিত্যিক সুলেখাকে সঠিক অর্থে চিনিয়ে দেওয়ার জন্যই সেই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। এজন্য তাঁর কছেও আমরা কৃতজ্ঞ। সংকলন প্রকাশের ক্ষেত্রে সবসময়ই সব ধরনের উপদেশ ও উৎসাহ জুগিয়েছেন কথাসাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়। সুলেখা অনুজা সুজাতা সান্যাল (চট্টোপাধ্যায়) ও তাঁর স্বামী শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় তাঁদের সংগ্রহ থেকে লেখালেখির ঝুড়ি উদারভাবে আমার হাতে তুলে না দিলে এই সংকলন প্রকাশ হতে পারত না। তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানো নিতান্ত অনুষ্ঠানিকতা। তেমনি আনুষ্ঠানিকতা হবে আমার দুই ছাত্র পবিত্র বিশ্বাস ও জীতেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে কৃতজ্ঞতা জানানো। কেননা সম্পাদনার সামগ্রিক কাজে তাঁদের ভূমিকা অপরিসীম।

এই সংকলনটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এ-প্রজন্মের পাঠকের কাছে সুলেখা সান্যালের সাহিত্যকর্ম পৌঁছে দেওয়াই শুধু নয়, তা নিয়ে একটা আলোচনার পরিসর তৈরি হোক, বাংলা সাহিত্যের মননশীল ধারার সঙ্গে তরুণ চিত্তের যোগ স্থাপিত হোক—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

গৌতম অধিকারী

ভূমিকা

বিগত এক দশকে গোটা দেশের চরিত্র-লক্ষণের সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদল দ্রুত পালটে গেছে। বাংলা সাহিত্য সেই রাহুগ্রস্ততার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। বিবেক, সমাজচেতনা, মূল্যবোধ সমস্তই আমূল পালটে যাবার উপক্রম। দেশটা গরিব, কিন্তু ওপরতলার মানুষজন, যাঁরা দেশের শাসন করার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ধারারও নিয়ামক, তাঁরা দিব্যি প্রাচুর্যের দোলায় দোল খাচ্ছেন। দেশের অধিকাংশ মানুষ যে দরিদ্র বিত্তহীন তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তার পরবর্তী বামপন্থী আন্দোলনের সূত্র ধরে বাঙালি চেতনায় কতকগুলি বিবেকবোধ গাঢ় করে প্রথিত হয়েছিল। বড়োলোকেরা তাঁদের বিত্তের আস্ফালন দেখাতে ঠিক সাহস পেতেন না, বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের ধনৈশ্বর্য নিয়ে একটু লজ্জাই যেন পেতেন। সাহিত্যের যে লোকায়ত ধারা বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনাবলির থেকে কখনও আলতোভাবে, কখনও স্পষ্ট ঋজুতার সঙ্গে বহমান হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে তা হয়তো ইতিহাসের নিয়ম মেনেই আবেগের মহানদীতে পরিণত হল। এমনটা না হয়ে যেন উপায় ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাস্তিকতার সংস্থানভূমি থেকে যে-লগ্নে ওই ইতিহাসসিদ্ধ সামাজিক দায়বদ্ধতায় উত্তীর্ণ হলেন বাংলা সাহিত্যের গোটা চেহারাটা দ্রুত বদলাতে শুরু করল। এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে লোকায়ত তাগিদ প্রধানত বিদেশি অনুপ্রেরণার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন থেকে বাঙালি কথাসাহিত্যেকেরা নিজেদের পারিপার্শ্বকে আবিষ্কার করলেন। বাস্তবতার অনুভূতি তো আকাশ থেকে পড়ে না, তা অভিজ্ঞতার সহকার-শাখা-সঞ্জাত। আমাদের চারপাশে সমাজ তার কদর্যতা নিয়ে প্রতিদিন বিস্ফারিততর হচ্ছে, কিন্তু এই কদর্যতাই রূঢ় বাস্তব। সমাজ বেঁচে আছে তার কুশ্রীতা নিয়ে, কর্কশতা নিয়ে, নির্দয়তা নিয়ে, ক্রুরতা নিয়ে। এই সমাজের ঘেরাটোপে ভালোবাসা আছে। কিন্তু যেহেতু একটি ভঙ্গুর শ্রেণিসমস্যা-জর্জর অস্থির ভূমিতে আমরা দাঁড়ানো, প্রেম ছাপিয়ে কখনও কখনও কেন প্রায় সব অবস্থাতেই স্বার্থপরতার বীভৎস প্রতিভাস, বিশ্বাস ছাপিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার মিছিল, যে মিছিলে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত,

বিত্তহীনেরাও ভিড়ে যাওয়া এড়াতে পারে না। লেখকেরা এই পর্যায়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, সামাজিক উত্তরণের স্বপ্ন কখনও ছুঁড়ে ফেলে দিতে নেই, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রেম-প্রীতি এবং বিশ্বস্ততার আকাশগঙ্গা বইবে, কিন্তু আপাতত অশান্তি, আপাতত অনেক প্রত্যয়হীনতার প্রহর, সামাজিক দ্বন্দ্ব-বিন্যাসের প্রকোপ থেকে আমরা যেমন বেরিয়ে আসতে পারছি না, আমাদের ব্যক্তিক জীবন-নির্বাহে তেমন ধারা অশান্তি, অসামঞ্জস্য, বঞ্চনার ধারাবাহিক কুরূপকথা।

সুলেখা সান্যালের নাম বিশ্বায়নের ঘোরে প্রায় হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম, যেমন আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর বৎসর আগেকার বাংলা সাহিত্যের জটিলতার পুনরাবৃত্তিও এখন অনেকের কাছে অপাংক্তেয় ঠেকে বলে আশঙ্কা করতে হয়। অথচ বিশ্বায়নজনিত বিস্মরণ-প্রক্রিয়ার বিরোধিতাও একটু-আধটু সারা পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবাংলায় আমরা নব্য 'খেরেস্তান' বলে চেতনার পুনরুজ্জীবনের অধ্যায়টিতে পৌঁছুতে কিছুটা বাড়তি সময় হয়তো লাগবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হবেই এবং তার লক্ষণগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই আবছা রেখাচিত্রে ধরা পড়তে শুরু করেছে। বিশ্বায়নের পরিণামে গোটা পৃথিবীর শতকরা দশ ভাগ মানুষের পোয়াবারো, নব্বুই ভাগের ভরাডুবি—এই সত্যটি অন্যত্র ইতিমধ্যেই প্রকটিত। আমাদের দেশের তথ্যও একই কথা বলে। কিন্তু সমাজের মধ্যমণি হয়ে যাঁরা আপাতত কলকাঠি নাড়ছেন, তাঁরা সেই খোদ কাহিনি মাটিচাপা দিতে ব্যস্ত। তবে রবীন্দ্রনাথের গানের ধুয়ো ধার করে আমরা বলতে পারি, 'এদিন এদিন যাবে, এদিন যাবে।' এবং সমাজচেতনার পুনরাবিষ্কারের এই প্রয়াসে, আমার অন্তত ধারণা, বাঙালি সাহিত্যভোক্তাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-পরবর্তী অধ্যায়ে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সুলেখা সান্যালের রচনাবলি গভীরভাবে অনুধাবন করা ওই অধ্যাবসায়ের অপরিহার্য অঙ্গ—এটাই আমার প্রতীতি।

সুলেখা সান্যালের দুটি উপন্যাসের মধ্য প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নবাঙ্কুর' এবং অগ্রন্থিত এগারোটি গল্প 'সুলেখা সান্যাল রচনাসমগ্র'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। রচনাগুলির মনোযোগী বিশ্লেষণ আমাদের বিবেককে প্রহৃত হতে সাহায্য করবে। যদি ধারাবাহিকতা মেনে তাঁর লেখা পাঠ করা হয়, তাহলে একটি বিশেষ লক্ষণরেখার ইঙ্গিত ধরা না পড়ে উপায় নেই। তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলিতে জীবনদর্শনের রোমান্টিকতার ছোঁয়া লাগানো। অনেকটা যেন পঠিত অথবা বিশ্বাসের ধারাপাত নিয়ে সমাজজীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলির তন্নিষ্ঠ বিবরণ আন্তরিকতা-উদ্‌বেল সমাজচিন্তার পরিচয় ছোঁয়, যিনি লিখছেন তাঁর প্রত্যয়ে যেন দ্বিধা নেই। কিন্তু তাহলেও কোথায় যেন নিশ্চিন্ত নিয়মকলা ছোপ লেগে আছে। তবে সুলেখা সান্যাল তাঁর লেখকসত্তার পাশাপাশি একটি উত্তাল ব্যক্তিগত

ইতিহাসের কথাও বলেন, সেই ইতিহাসে লেগে থাকে সামাজিক, রাজনৈতিক, আলোড়ন-বিলোড়নের ঝাঁঝ। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি জ্বলেছেন, পুড়েছেন, একসময়ে নিঃশেষ হয়ে গেছেন। তাঁর শেষের দিকের রচনাতেও সমাজ-প্রত্যয় নিষ্প্রভ হয়ে আসেনি। কিন্তু বাস্তবতার আখরগুলি দগদগে ঘা-এর মতো যুক্ত হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে আমি বলব সময় সময়ানুবর্তিতা মেনে রচনাগুলি পাঠ করলে আমরা যেমন দগ্ধ হব, ঋদ্ধও হব সেই সঙ্গে। সমাজের নাড়িটুকু যে কোনও সৃজনশীল মানুষ প্রথম মুহূর্ত থেকেই ধরতে পারেন না। তাঁকে হাতড়ে বেড়াতে হয়, অনুশীলন ও পরিচিকীষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, অনেক সময় ব্যক্তিক জীবনানুবর্তনের উচ্চাবচতার মধ্য দিয়েও যেতে হয়। সুলেখা সান্যাল এই প্রতিটি অন্ধি-সন্ধি পার হয়ে গেছেন। বাংলা সাহিত্য ও তার পারিপার্শ্বিকতায় আপাতত উত্তমর্ণরা গদা ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরা শৌখিন মানুষজনদের শঠতা, চতুরালী, ছেনালী, শ্রীবৃদ্ধিজাত দম্ভের আস্ফালন ইত্যাদি নিয়ে আসর জমিয়েছেন, কিন্তু এই ক্ষণিক ঋতুর অবসান হতে বাধ্য। তখন আমরা যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রত্যাবর্তন করব, ফিরব সুলেখা সান্যালের মতো বাস্তবাবাদী জীবনচর্যা বিশারদ সাহিত্যিকদের সমারোহে।

অশোক মিত্র

সুলেখা সান্যাল : জীবন ও সাহিত্য

তরুণ সান্যাল

জীবনের ঘটনা কখনও কখনও কপোলকল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়, নইলে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জাত সুলেখা সান্যালের জীবন এত আশ্চর্যজনক হবে কেন। বহুবার আমার মনে হয়েছে, তাঁর সৃষ্ট নায়িকাদের সঙ্গে তাঁর চরিত্র ও জীবনের বহু মিল আছে, তাঁর সাহিত্য যেন আত্মজীবনীমূলক। তবুও শিল্পকে যদি জীবনের চেয়ে বড়ো বলেও মান, সুলেখা সান্যালের ব্যক্তিজীবনের পাদপীঠে তাদের ম্লান বলেই মনে হবে। বিশেষত তাঁর ১৯৫৮ সালের পরবর্তী রচনাসমূহে এত বেশি পরিচিত মানুষের মিছিল দেখা গেল যে আমি সুলেখা সান্যালের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম বলেই তাঁদের সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্মকে প্রায় আত্মজীবনী রচনা বলে মনে হয়েছে। এসব কথা আজ যদিও মনে পড়ছে, তথাপি যাঁকে 'সুলেখাদি' বলে ডাকতুম সেই অতি পরিচিত লেখিকাকে অনেক লেখক-লেখিকাদের থেকে তফাৎ করে দেখতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। তিনি জীবনের শেষদিকে কলকাতার পরিচিত সাংস্কৃতিক সমাজ থেকে এত দূরে এবং এত বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতেন যে নানা সংঘর্ষ ও নিন্দা-প্রশংসার বাইরে সাহিত্যকর্ম, কেবলমাত্র জীবন ও সাহিত্যের জন্য বেঁচে থাকতে, তিনি মৃত্যুর কৃষ্ণ যবনিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আশ্চর্য মানসিক শক্তি নিয়ে আত্মপরীক্ষা দিয়ে গেলেন। শ্রীযুক্তা সুলেখা সান্যাল দুরারোগ্য লুকোমিয়া বা রক্তের কর্কট রোগে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে বর্ধমানে তাঁর পিত্রালয়ে, গত ৪ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সাহিত্যকর্মীর সাহিত্যই তাঁর একমাত্র পরিচয়, এ-কথা মেনে নিয়েই আমরা বলব, সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে তাঁর আত্মজীবনের বহু ঘটনার বিম্বন দেখা যায়। সুলেখা সান্যালের অধিকাংশ রচনাই আত্মজীবনীমূলক একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যে ভাগ্যের সঙ্গে দ্বৈরথে শ্রীযুক্তা সান্যাল পরাজয় স্বীকার করেননি; সেই ভাগ্য যদি পুরুষশাসিত—কী প্রচলিত, কী প্রগতিশীল—সংস্কৃতিসেবীদের বিচারের

সুলেখা সান্যালের তিরোধান ঘটে ১৯৬২ সালের ৪ ডিসেম্বর।

শেষ পর্যন্ত মানদণ্ড হয়ে থাকে, তবে কলুষকল্মষসাপেক্ষ মধ্যযুগ এবং লোভ চরিতার্থ করার মূলধনাশ্রয়ী মনই জয়ী হবে। সুলেখা সান্যালের রচনাই তাঁর জীবনের বিপ্লববার্তা বলে গণ্য হোক, অন্তত আমি সে-কথা সর্বদাই মনে রাখব।

সুলেখা সান্যাল ১৯২৮ সালের ১৫ জুন (১ আষাঢ়, ১৩৩৫) অবিভক্ত বঙ্গের ফরিদপুর জেলার কোঁড়কদি গ্রামে ক্রমক্ষীয়মান জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দু-পুরুষ আগে এঁদের কয়েকটি নীলকুঠিও ছিল। কিন্তু তাঁর শৈশবে আর সেই পরিবারের পুরাতন মহিমা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না বললেই চলে। শিক্ষক জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা যেমন ব্যক্তিজীবনে তাঁর শিক্ষাজীবনের সরল নিষ্ঠা দান করেছিলেন, তেমনি মাতৃকুলের ধারায় রামতনু লাহিড়ীর ঐতিহ্যপূত অচলায়তন ভাঙার তরঙ্গভঙ্গও সে চরিত্রে দাগ রেখেছিল। তাছাড়া, কোঁড়কদি গ্রামটিরও ব্রিটিশরাজের পুলিশের খাতায় বিপ্লবী ও 'স্বদেশী'দের ঘাঁটি বলে নাম ছিল। উত্তীর্ণ কৈশোরে সুলেখার অগ্রজদ্বয় এবং তাঁদের অন্যান্য বন্ধুদের নিকটে নতুন সমাজগত দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

সুলেখা সান্যালের বাল্য ও প্রথম কৈশোর কাটে চট্টগ্রামে পুত্রকন্যাহীন মাসিমার নিকটেই। যুগান্তরের 'ছোটদের পাততাড়ি'তে তাঁর সাহিত্যজীবনের হাতেখড়ি। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও শচীন মিত্র (এঁদের দুজনকেই সুলেখা সান্যালের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সিঁদুরে মেঘ' উৎসর্গীকৃত) তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম উৎসাহদাতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪২ সালে চট্টগ্রামে বোমা পড়ার পর তিনি স্বগ্রামে ফিরে আসেন এবং প্রাইভেট ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, পরে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতায় প্রথমে ভিক্টোরিয়া পরে স্কটিশচার্চ কলেজে বি.এ. পড়েন। এম.এ-তেও ভর্তি হয়েছিলেন, তারপর কিন্তু পাঠ সম্পূর্ণ করেননি। ১৯৪৮ সালে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহিত জীবন তাঁর নানা কারণে সুখের হয়নি।

কৈশোরেই তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ১৩৫১ সালে 'অরণি'তে প্রকাশিত হয়। রচনাটির নাম 'পঙ্কতিলক'। ১৯৪৮-৪৯ সালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এবং নির্যাতন ভোগও করেছিলেন। সুলেখা সান্যালের ১৯৪৪ সালের পূর্বের রচনাগুলির মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জনজীবনের বিপ্লবাকাঙ্ক্ষা লক্ষ করা যায়। বঙ্গবিভাগের ফলস্বরূপ ছিন্নমূল পিতৃপরিবার ও বাঙালি জীবনের নিদারুণ দুর্ভোগ তাঁকে জীবনের কঠিন পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। কলকাতায় শিক্ষয়িত্রী হিসাবে নিদারুণ সংগ্রামে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে সংযুক্ত থেকে তিনি কখনই সাহিত্যশিল্পকে বর্জন করেননি বরং বাঙালি সংগ্রামশীল নারীর অনন্য অভিব্যক্তি তিনি নানা কাহিনির মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

সুলেখা সান্যালের সৃষ্ট চরিত্রগুলির অধিকাংশই নারীচরিত্র। যারা সামাজিক

বিচারে, অর্থনীতির হাটে উপযুক্ত মূল্য না পেলেও হেরে যায় না। সম্ভবত এই বিচারে সুলেখা সান্যালের 'সিঁদুরে মেঘ' গল্পপুস্তকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ('সিঁদুরে মেঘ' নামে গল্পটি জনৈক চিত্রপরিচালক ব্যবহার করবেন বলে ইতিপূর্বেই কনট্রাক্ট করেছেন)।

সুলেখা সান্যালের সাহিত্যকর্মকে মোট দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে তাঁর ১৯৫৪ সালের রচনাগুলি পড়ে। এই রচনাগুলির চরিত্র তাঁর একমাত্র প্রকাশিত উপন্যাস 'নবাঙ্কুরে' (প্রথম সংস্করণ ১৩৬২, ২য় সংস্করণ ১৩৬৭, নয়া প্রকাশ) এবং গল্পগ্রন্থ 'সিঁদুরে মেঘ'-এ স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে। নবাঙ্কুর-এ নায়িকা বালিকা ছবির ক্রমে ঘাত-প্রতিঘাতে যুবতী হয়ে ওঠার কাহিনি। ভেঙে পড়া একান্নবর্তী বনেদী পরিবারের মেয়ে ছবির গ্রামের স্বদেশি অধীর কাকার সাহচর্যে, মা মমতার বেদনায় অভিষিক্ত হয়ে, লেখাপড়া শেখার জন্য পিসিমার সঙ্গে শহরে যাওয়া, তারপর গ্রামে কৈশোর-উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে এসে সাধারণ মানুষের বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া প্রভৃতি দিকগুলি মোটা দাগে আঁকা হয়েছে। 'নবাঙ্কুর' সুলেখা সান্যালের একটি অত্যাশ্চর্য ও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। 'সিঁদুরে মেঘ'-এর গল্পগুলির মধ্যে অবিস্মরণীয় 'নাম' গল্পটি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শিকার মালতী ও অনন্ত ঘর বেঁধেছে। দুজনেরই অতীত জীবনে দুঃখ ছিল। মালতী যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বাবাকে ও সংসার বাঁচাতে কালো ধলা অফিসারের লোভের শিকার হয়েছিল। অনন্ত তাঁর আগের বউটিকে কনট্রাক্টের লোভে কর্তাব্যক্তিদের হাতে তুলে দিয়েছিল। দুজনের সম্পর্কের মলিনতা দুজনেই চোখের জলে ধুয়ে দেয়, নায়ক অনন্ত বলে, "তুমি তো দেখেছ রাতে ঘুমোইনে আমি। ঘুমোবো কি—? শান্তি পাইনে যে। এমন ভয় ধরে গেছে মনে। উঠে তোমাকেই পাহারা দিই... গাছটা উড়িয়ে নিয়ে গেছে বলেই তো চারাটাকে আরও সাবধানে রাখতে চাই।" 'জীবনায়ন' গল্পের নায়িকা সীমা বেকার স্বামী ও বৃদ্ধা শাশুড়ির সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম। দুঃখের সংসারে আগন্তুক শিশুটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। ঘর থেকে একদা বেরিয়ে যাওয়া মেয়ে লতা (অন্তরায়) এবং 'ছোটমাসী'র (ছোটোমাসি) নতুন মর্যাদা আমাদের সামাজিক সমস্যার অন্য একটি দিককে স্পষ্ট করে তুলেছে। ঘর থেকে উৎখাত উদ্বাস্তু মা তার শিশুটিকে ('আমার মানিক সোনারে পিষ্যা মারল কেন অরা? আমি পারি নাই রাখতে') জেলখানায় বন্দিনী মায়ের ভূমিষ্ঠ নবজাতকের মধ্যে ফিরে পায় (জন্মাষ্টমী)।

এককথায় বলতে গেলে সুলেখা সান্যালের 'সিঁদুরে মেঘ' বইখানি বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'নবাঙ্কুর', 'সিঁদুরে মেঘ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের প্রথম ধারায় উল্লেখযোগ্য রূপায়ণ।

ব্যক্তিগত জীবনের নানা ঘটনার কথা প্রসঙ্গত বাদ দেওয়াই ভালো।

বিশেষভাবে ১৯৫৬ সালের পরবর্তী বহু ঘটনাই নানা ব্যক্তির মনঃপূত না হবারই কথা। তবে এ-কথাটি বলা ভালো যে, কার্যত এ সময়েই তাঁর দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ ঘটে এবং তিনি বর্ধমান জেলায় বড়শুল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্টের বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারূপে যোগ দেন। সম্ভবত সুলেখা ব্যক্তিজীবনের এ সময়ে এমন ভুল করে বসেছিলেন যে ভুল শোধরাবার আর এ জীবনে অবসর হল না। কিন্তু ভুল করেছিলেন বলেই বোধ হয় ভালোবাসা, প্রীতি, ঘৃণা নামক মানসিক যে বোধগুলিকে তিনি পূর্বতন রচনায় বিচার করেননি, সেগুলিকে নতুন করে তাঁর বিচার করতে হল। এতে তাঁর ব্যক্তিজীবনে কী লাভ-লোকসান হল তা তিনিই শেষ পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি এই প্রচণ্ড ব্যর্থতা থেকেই পেলাম।

শ্রীযুক্তা সান্যালের ১৯৫৭ সালে লিউকোমিয়া রোগ ধরা পড়ে। ডাক্তারদের মতে অন্তত আরও দু-বছর আগেই এ-রোগের আক্রমণ হয়েছিল, ১৯৫৫ সাল থেকে। তখন পর্যন্ত তিনি খুব উল্লেখযোগ্য কোনো রচনা প্রকাশ করেননি, ব্যক্তিগত জীবনের টানাপোড়েনে তিনি তখন অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত ছিলেন। ১৯৫৮ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে লিউকোমিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করেন। ভারত সরকারের পাসপোর্ট দপ্তর অতিদ্রুত তাঁর ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করে দেয়। মিসেস কস্টের অধীনে তিনি মস্কোয় লেনিন হাসপাতালে চিকিৎসিত হন (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মহামতি লেনিনের শরীর থেকে বুলেট বের করার জন্য এই হাসপাতালেই অস্ত্রোপচার হয়)। সোভিয়েত স্বাস্থ্য মন্ত্রণা বিভাগ ও ভারতীয় ছাড়পত্র দপ্তর সুলেখা সান্যাল ও তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধবের নিকট এজন্য ধন্যবাদার্হ।

মস্কোয় তিনি নিরাময়ের দিকেই চলেছিলেন। সেখানে পেয়েছিলেন সোভিয়েত কর্মীদের আন্তরিক প্রীতি ও সহানুভূতি। শেষ দিন পর্যন্ত শ্রীযুক্তা সান্যাল তা স্মরণ করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন মানুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অসামান্য। নিরাময়ের পূর্বেই তিনি ভারতভূমিতে ফিরে আসেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ট্রপিক্যাল স্কুল অব্ মেডিসিনের হেমাটোলজির অধ্যাপক ডা. জে. বি. চ্যাটার্জীর চিকিৎসাধীনে ছিলেন। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি মস্কোতে ছিলেন।

মৃত্যুর কালো ছায়ার নীচে থেকেও সুলেখা সান্যাল জীবনের প্রতি মমতা হারাননি। যেন মৃত্যুকে পরাভূত করবার জন্যই তিনি ১৯৬১ সালে বি. টি. ডিপ্লোমার অধিকারিণী হলেন। ১৯৬২ সালে তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে অনার্স ডিগ্রি পান। তিনি এম.এ. পরীক্ষা দেবারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মাঝে মাঝে রক্ত পরিবর্তন করে যাঁকে বেঁচে থাকতে হয়েছে, মৃত্যুর

সঙ্গে পাল্লা লড়ে অদম্য মনের শক্তির জোরে ১৯৫৫ সাল থেকে মৃত্যুকে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

মস্কো থেকে ফেরার পর সুলেখা সান্যাল কলকাতার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগৎ থেকে প্রায় নিজেকে গুটিয়ে এনেছিলেন। তাঁর অতি শুভানুধ্যায়ী অনেকেই তাঁর সংবাদও ভুলে গেছেন। তাঁর অতি পরিচিত সাহিত্য-সহকর্মীর অনেকে তাঁর সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। আমার সৌভাগ্য যে আমি তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষদিকের বহু তথ্যই জানি বলে। জানি, কী নিদারুণ বেদনায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সাহিত্যকর্মে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। দ্রুত অপসৃয়মান জীবনের রৌদ্রটুকু ধরে রাখার জন্য তাঁর আকুতি মার্জিত একটি ছোট্ট পরিবেশে কেমন জড়িয়ে রেখেছিল।

মস্কো থেকে ফেরার পর তাঁর যে রচনাগুলি প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে 'দেওয়াল পদ্ম' (মানসী, শারদীয় ১৩৬৮) উপন্যাসটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এতদিনে তিনি তাঁর নিজস্ব রচনাশৈলী খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী এতে কোথাও ধরা পড়েছে কিনা জানি না, কিন্তু কেবল যে পুরুষই নয়, নারীও যে মানবিক বিশ্বাসভঙ্গের সঙ্গে যুক্ত তা তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন। পুরুষকার এবং নারীত্ব উভয়ই যেন যথাক্রমে নারী তনু সন্ধানে এবং পুরুষের রৌপ্য অনুসরণে ব্যয়িত হতে চলেছে। অনেক সময় মানুষ ঘটনাক্রমে শিকার হয়ে পড়ে। তবু সে ঘটনাগুলি যে অপরের জীবন পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে পারে সে-কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। জীবনের প্রবাহ নানা ধারা-উপধারায় কখনও সংঘর্ষে, কখনও মিলিত প্রধাবনে বয়ে চলেছে : মানুষ যেন তাঁর আপাত বহিরঙ্গ দেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে। সুলেখা সান্যাল যেন শেষ জীবনে পলকের জন্য জীবনের ধারাপ্রবাহের মেলবন্ধনটি আবিষ্কার করেছিলেন, যা ব্রহ্মবাদিনীদেরই একমাত্র আয়ত্তাধীন। 'উলুখড়', 'একটি মামুলি গল্প', 'খোলা চিঠি', 'যে গল্পের শেষ নেই' প্রভৃতি আত্মবিশ্লেষণমূলক গল্পগুলির পরিণতি 'দেওয়াল পদ্ম'। 'দেওয়াল পদ্ম'-এর নায়ক সঞ্জয় নায়িকা 'অসীমা'র ভগ্নিপতি। অসীমা ডাক্তার। অসীমা মধ্যপ্রদেশের এক হাসপাতালে কাজ করে তার ব্যর্থ দিনগুলি সেবা দিয়ে ভরিয়ে রাখে। অসীমার পিতৃ পরিবারের ধারণা সঞ্জয় তার স্ত্রীকে খুন করেছে, অথচ শিশুদুটিকে মানুষ হতে দিচ্ছে না। সঞ্জয় পাকিস্তানের সম্পত্তি বিক্রি করা টাকায় একটি বিশাল জোতের পত্তন করে। শুকনো মাটিতে ফসল ফলাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ফসল ফলে না— ঝড়, বন্যা, অনাবৃষ্টি লেগেই আছে। অসীমা এসেছিল সঞ্জয়ের কাছে তার বোনের শিশুদুটিকে নিয়ে যেতে। সঞ্জয় অসীমাকে বলল, তার বোন অর্থ ও শহরে চাকচিক্যের লোভে তাকে ছেড়ে, শিশুদুটিকে ফেলে একটি আধুনিক চৌকস যুবকের সঙ্গে পালিয়েছে। অসীমাও তার নিজের কথা বলে। বহু

কষ্টে কলকাতায় ডাক্তারি পড়া শেষ করে তার দয়িত অশোকের সঙ্গে মিলতে লন্ডনে যায়। কিন্তু অশোক সেখানে একটি সস্তা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে না-করা ঘর বেঁধেছে। সেই মেয়েটি লরা অশোককে ছাড়ে না, অশোক অসীমাকে কথা দিয়েছিল শুনে বলে, "কথা? কথার কি দাম? তাও ওই বিশ্রি চেহারার মেয়ে! তোমার বন্ধু চন্দ্র চক্রবর্তী কথা দেয়নি আমাকে? তার বাচ্চা ছিল না আমার পেটে? ...ওকে দাও না হোস্টেলে পাঠিয়ে।" অসীমা আবার কলকাতায় ফেরে। তারপর দূর দেশে ডাক্তারি।

অসীমা-সঞ্জয়ের ভুল বোঝাবুঝির শেষে, অসীমার ফেরার আগের বিকেলে সঞ্জয় অসীমাকে 'দেয়ালপদ্ম' দেখিয়েছিল। এক পোড়ো মন্দিরের শুকনো গা বেয়ে দেয়ালপদ্ম গাছের লতা উঠেছে। "মন্দিরের গায়েই ও শিকড়টা লাগানো। কে লাগিয়েছিল, কবে লাগিয়েছিল কেউ বলতে পারে না; ভীষণ উঁচুতে ফোটে... ও জিনিস নাকি ওই রকম নির্জন আর ঠান্ডা আর পোড়ো বাড়ির গা ছাড়া জন্মায় না।"

সুলেখা সান্যাল তাঁর সাহিত্যকে বুঝি ওই দেয়ালপদ্মই ভেবেছিলেন। নাকি কোনো বাংলাদেশের মেয়ে? তাঁর জীবনের লতাটি কোনো পোড়ো মন্দিরের দেয়াল বেয়ে সুন্দর হয়ে ফুটে উঠে ঝরে পড়ে গেল। হায়, লতাটি যে মন্দির বেষ্টন করে উঠেছিল, একদা সে মন্দিরের অন্তরেও বিগ্রহ ছিল। সুলেখা সান্যালের জীবন ও সাহিত্য অভিন্ন। আমি তাঁর সাহিত্য অন্বেষণ করে মন্দিরের দেবতাটিকে অন্বেষণ করি না, কেননা আমি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকেই শিখেছিলাম, যে দেবতা জীবনকে স্খলন-পতন-ত্রুটি সত্ত্বেও ফুটে উঠতে দেন, সেই দেবতা মানুষকে খাটো করেন না, তিনি অমর। তাই বুঝি সুলেখা সান্যাল তাঁর দেয়ালপদ্মের নায়িকাকে অসীমা নাম দিয়েছিলেন।

আত্মজীবনীমূলক রচনায় তখন তিনি নতুন বাঁকে এসেছিলেন, যেখান থেকে জীবনের নিগূঢ় অভাবনীয় সত্যেরই অনুভূতি জন্মায়—তখনই অকালে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল।

পরিচয়
পৌষ, ১৩৬৯



উপন্যাস

নবাঙ্কুর



এক

এখনও অন্ধকার কাটেনি—শুধু দুটো-একটা কাক ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে—এখান থেকে ওখান থেকে। আর সারা বাড়িটায়, আজই প্রথম—আগে, সব্বায়ের আগে ঘুম ভেঙেছে ছবির।

রায়দাদুদের গোয়াল থেকে গোরুগুলোর পা ঠুকবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে থেকে থেকে—ঠক্-ঠক্ ঠকাস্, ঠক্-ঠক্ ঠকাস্। কোনদিকের একটা খোলা জানালা যেন বাতাসে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে একবার বন্ধ হচ্ছে, একবার খুলছে। আবার খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। জানালার বাইরে বাতাসের শব্দ হচ্ছে—শাঁই, শাঁই-ই।

ঘামে গা ভিজে চপ্‌চপে হয়ে গেছে গরমে। আস্তে আস্তে চোখ খুলে ছবি এবার তার ঘামে-ভেজা হাতের তেলোটা চোখের সামনে তুলে ধরে।

দেখতে হয়! বাঁ হাত—না ডান হাত। হাতটাও ঘেমেছে কিন্তু কত পরিষ্কার! হাতের করগুলো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রোজ সকালে উঠে হাতটা ময়লা হবার আগেই দেখতে হয়। তাহলে দিন ভালো যায়—পরিষ্কার হাতের মতো মনটাও খুব পরিষ্কার থাকে। ঠাকুমা বলেছে।

ছাই থাকে! সে তো রোজ দেখে হাত, তবুও তো তার ঝগড়া হয় কারুর না কারুর সঙ্গে—সেফু, দুর্গা, উমা, আশিস, নয়তো মণিদা।

মণিদাটা কেমন করে ঘুমোচ্ছে দেখ। হি! হি! হাঁ হয়ে আছে মুখটা, এতটুকু একটা গোল হাঁ। এখন যদি মণিদার নিশ্বাস নেওয়া নাকটা দু-আঙুলে টিপে ধরা যায়, তাহলে! না বাবা থাক! মার ঘুম ভাঙবে, বাবার ঘুম ভাঙবে।

বাবা ওপাশে ঘুমোচ্ছেন পাশ ফিরে। ছোট্ট খাটখানা বাবার একার। খালি গা, পৈতেটা দেখা যাচ্ছে পেছন থেকে—ঘাড়ের পাশ দিয়ে পড়ে আছে।

ব্রাহ্মণদের পৈতে পরতে হয়—কখনও ছাড়তে নেই। দাদু চান করতে গিয়ে হাত-ভরা জল আর পৈতে উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন মন্ত্র পড়ে। বাবা কিন্তু মন্ত্র পড়ে না—বড়কাও না। শুধু পৈতেটা সঙ্গে রাখে।

কায়স্থদের পৈতে নেই। চাঁড়ালদেরও নেই। দুর্গারা তো কায়স্থ। আর পাঠশালার এককোণায় রোজ যারা বসে—হারান, জীবন আর যুগল—ওরা হল চাঁড়াল। দাদু বলে, চাঁড়ালরা ছোটোলোক। ওদের ভাত খেলে জাত যায়, জল খেলেও যায়। কায়স্থদের জল খাওয়া যায়, কিন্তু ভাত খেলে জাত যায়।

কিন্তু অধীরকা বলে ওসব নাকি বাজে কথা। মানুষ সবাই একরকম। অধীরকা মাঝে মাঝে ভারি সুন্দর সব কথা বলে... বলে, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র আমার রক্ত, আমার ভাই। চণ্ডাল ভারতবাসী... না, তারপরে আর মনে নেই। অধীরকা-র নিজের কথা না, মাথায় পাগড়ি বাঁধা যার ছবিটা টাঙানো আছে তাঁর কথা। তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি কোনও জাত মানতেন না। অধীরকাও জাত মানে না। তাই তাকে কেউ দেখতে পারে না। দাদু না, রায়দাদু না, এমনকী অধীরকা-র নিজের বাবা পর্যন্ত না। ওরা নাকি স্বদেশি।

স্বদেশিরা ছোটোলোকদের ভাত খায়—ওরা নাকি বন্দুকও চালাতে জানে। সবাই বলে, অধীরকা-ই নাকি পাণ্ডা—অরুণকা, ধীরেনকা, প্রসন্নকা-দেব পাণ্ডা। পাণ্ডা কাকে বলে কে জানে! মাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

মা-র গা থেকে কাপড় সরে গেছে। খালি গা দেখা যাচ্ছে। মা কি কালো! রায়দাদুর রং কিন্তু খুব ফরসা। মা-র রং সেরকম নয়। আর কালো হল অধীরকা, মা-র রং সেরকমও নয়। লাল ইটের মতো রং—পোড়া পোড়া। রান্নাঘরে থেকে থেকে নাকি ওরকম হয়, মা নিজেই বলেছে। হাতগুলোও শিরা-ওঠা মা-র, নীল নীল শিরা, সে-হাতে অনেকগুলো চুড়ি আছে, শাঁখা আছে, লোহা আছে। কাকিমার হাতে কাচের চুড়ি আছে, কিন্তু মা-র হাতে নেই। মা বলে, বুড়ো বয়সে আবার কাচের চুড়ি!

ওপাশে ফেরানো মুখ, দেখা যাচ্ছে একটা পাশ। মা-র কপালটা খুব চওড়া, বড়ো কপাল হওয়া নাকি ভালো। ছবির কপালও তো বড়ো—তারও কি ভালো হবে? কিন্তু মা বলে, মেয়েদের ছোটো কপালেই সুন্দর দেখায়। যেমন সেফুর! সবাই সেফুকে সুন্দর বলে। তা আর কী হবে বাবা। ছবির কী দোষ, মা-ই তো তাকে অত বড়ো কপাল দিয়েছে। মণিদারও তো অ্যাত্তো বড়ো কপাল!

মণিদার আগে নাকি আরও দুটো বোন ছিল তাদের। কিন্তু সেই দিদিরা মরে গেছে সে হবার আগেই—মণিদারও আগে। মা মাঝে মাঝে সে-কথা বলে আর আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। তারা শুনতে চাইলে তবেই বলে, নইলে নয়।

মা খুব কম কথা বলে, কিন্তু সারাদিন কাজ করে। আর একটু পরেই তো উঠবে, উঠে ঘাটে যাবে চান করতে, তারপর ঢুকবে হেঁসেলে। সেই যে ঢুকবে আর

রাতের আগে মাকে দেখতেই পাবে না তারা। কত রাত যে হয় মা-র আসতে!

হয়তো ঘুমটা ভেঙে গেছে তখন শুনতে পায়, এলোমেলো হয়ে থাকা হাত-পা সরিয়ে দিতে দিতে বকবক করছেন, ছেলের শোওয়ার ছিরি দেখেছ! এই মণি, ভালো হয়ে শো শিগ্‌গির। দেব আর ক'দিন পরে বৈঠকখানায় পাঠিয়ে।

মণিদাকে মা খুব ভালোবাসে। মা-ই তো নাম রেখেছে প্রদীপ। একটা কবিতা পড়েছিল মা—তা থেকেই মণিদার নাম। মা বলে, মণিদা নাকি অনেক বড়ো হবে—খুব নাম হবে মণিদার।

আহা! ইচ্ছে করলেই যেন হয়! কিন্তু হয় যেন বাবা! হলে তো ভালোই।

মা কবিতা বলে মাঝে মাঝে; তাও অনেক করে বললে। গান জানে কিন্তু কখনও গায় না। বউদের নাকি গান গাইতে নেই। ঠাকুমা তবু কিন্তু মাকে বলে, শহুরে বিবি, মেমসাহেব!

মার সামনে বলে না। দাদুর কাছে বলে, নয়তো ঘাটে গিয়ে অন্য বুড়িদের কাছে বলে ঠাকুমা।

ঠাকুমার আবও ছেলেমেয়ে ছিল। তারা মরে গেছে, মাঝে মাঝে ঠাকুমা তাই কাঁদে। ঠাকুমার সঙ্গে দাদুর নাকি বিয়ে হয়েছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে, আট বছর বয়সে।

আট বছর বয়স তো পার হয়েই গেছে কিন্তু তার বিয়ে হবে না। আজকাল হয় না। বিন্তিপিসির তো আঠারো, কুড়ি, একুশ বছব বয়স, বিন্তিপিসিরই বলে হল না!

পিসি কালো বিচ্ছিরি দেখতে, তাই নাকি বিয়ে হয় না। ক-তবার যে দেখে যায় লোকেরা কিন্তু কেউ পছন্দ করে না। কালো হলে কি হয়? 'কালো তো জগতের আলো'।

এইবার আলো ফুটে উঠেছে বাইরে। মাথার কাছের জানালাটার ওপর বসে একটা কাক কী যেন খাচ্ছে ঠুকরে ঠুকবে। একবার বিচ্ছিরি গলায় ডেকে উঠলেই হয়—সব্বাই উঠে পড়বে। তখন আর আগে ওঠার মজাটা থাকবে না।

উঠে বসা মুশকিল। শুয়ে শুয়ে ক্রমশ পায়ের দিকে সরে গিয়ে ঝুপ করে খাট থেকে নেমে চোরের মতো নিঃশব্দে দরজা খুলে ছবি চলে আসে একেবারে ছাদে। তারপর ছাদের এক কোণায় পুবদিকটায় ব্যগ্র দুই চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকে গোল থালার মতো আলোক-চক্রটার দিকে তাকিয়ে।

খুব ভোরে ভালো করে লক্ষ করলে, ওর মধ্যে সত্যি সত্যি সূয্যি-ঠাকুরকে দেখা যায়! রথে বসে আছেন, মাথায় সোনার মুকুট, হাতে চাবুক। সেই রথ সারাদিন ছুটবে—ছুটবে, ঘুরে বেড়াবে সারা আকাশময়। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে ছবি সেই মুকুট-পরা দেবতাকে দেখার চেষ্টা করে।

পুবদিকের ছাদের ঠিক নীচে রায়দাদুদের মস্ত বড়ো আম-কাঁঠালের বাগান,

তার ভেতর পাখিদের বাসায় ঘুম-ভাঙা পাখিরা, তাদের ছানা-পোনারা চেঁচাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তাদের তারস্বর চেঁচামেচি আর পাখা ঝাপটানির শব্দ।

সারা গ্রামটার ওপর ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে—মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন আর ভয় নেই। সূর্যের আলোয় ভয় থাকে না। এখন তাকানো যায় সোজা সামনে, যেদিকে কুসুমপুরের খাল, চিকচিকে জল। উত্তরদিকের কুঠিবাড়িটাকেও এখন আর ভয় করে না, ভয় করে না ছাদের পশ্চিমদিকটার ভাঙাচোরা ঘরগুলোর দিকে তাকাতে।

বরং কাছে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। ভাঙা জানলা দিয়ে ভাঙা ঘরগুলোয় উঁকি মারলে গায়ের মধ্যে কেমন শিরশির করে। একটা মস্ত বড়ো কাঠের সিন্দুক, দুটো মাটির সরার মধ্যে দড়ি ভরে কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া একটা আলনা, কটা উই-খাওয়া কাঠের পিঁড়ি, আর ঘরের মধ্যে রাশিকৃত ভেঙে-পড়া চুন-সুরকি। দরজার একটা মরচে-ধরা তালা।

ওরা নাকি চলে গেছে। শহরে চলে গেছে অনেকদিন আগে। কোন শহরে তাও ভালো করে কেউ বলতে পারে না। ছবিদের আর এক শরিক তারা। আর কি কোনওদিন আসবে না? সে-কথাও কেউ জানে না।

কিন্তু প্রতি বছর পুজোর সময় দাদুর নামে টাকা পাঠায় সেই শরিকরা— যারা চলে গেছে। সেই টাকা নাকি পুজোয় লাগে।

এই ভাঙা দোতালার ঘর দুখানা একেবারে ধসে যাচ্ছে, তাদের দোতালার ছাদের সঙ্গেই লাগানো। ঘর দুখানার জন্য ছাদটাও নাকি ধসে যাচ্ছে। কোনদিন যে একেবারে পড়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। ওপাশের ছাদের মাঝখানটায় মস্ত বড়ো একটা ফাটল, তার গা ফুঁড়ে উঠেছে বট, অশ্বত্থ, পাকুড় গাছ— তাদের ডাল-পাতা মেলে দিয়ে হাঁ-করা ফাটলটা বন্ধ করে দিয়েছে। সেইজন্যই নাকি আরও ভয়। যদি দেখতে না পেয়ে কেউ এগিয়ে যায়! পড়ে যায় ভেতরে!

ভীষণ ইচ্ছে করে একবার ওই ফাটলটার মধ্যে উঁকি মেরে দেখতে। কী আছে ওখানে সে ভেবে পায় না। মা বলে, ওর মধ্যে বিষাক্ত সাপ আছে, খাটাস আর বন-বেড়ালের বাসা আছে।

দূর থেকে ছাদ ঝাঁট দেওয়া ময়লা ধুলো-বালি ছুঁড়ে ফেলা হয়। ঠাকুরঘরের শুকনো ফুল-বেলপাতাও ঠাকুমা ফেলে।

শক্ত করে সিমেন্ট দিয়ে বেঁধে ভাঙা ছাদ থেকে আস্ত ছাদ আলাদা করে রাখা হয়েছে। যদি ভেঙে পড়েও, তবুও নাকি এদিকটা ঠিকই থাকবে। অদ্ভুত সব কথা!

তাই আবার হয় নাকি। আমরা দাঁড়িয়ে আছি এদিকটায়— বেশ আছি। কিছু হল না। কিন্তু ওদিকটা ধসে গেল। যাঃ! সব বাজে কথা।

ঠাকুমা তো বলে, একশো বছরের পুরোনো বাড়ি। অত পুরোনো বাড়ি আবার

টেকে নাকি। আসলে সবটাই ধসে যাবে একদিন। মাঝে মাঝে ঝুপঝাপ ইট খসে পড়া নয়— একেবারে সত্যি সত্যি হুড়মুড় করে। তারপর একদিন নীলকুঠিটার মতো ভাঙা কতকগুলো ইট পড়ে থাকবে এখানে-ওখানে। লোকে বলবে মেজো-রায়দের বাড়ি।

মেজো-রায় মানে দাদু। ছোটো হল হরিদাদু, অধীরকার বাবা। আর বড়ো রায় হল রায়দাদু। আর সবচেয়ে মজার কথাটা ছবি ভাবলেই আশ্চর্য হয়ে যায়— হরিদাদু, দাদু, বড়ো রায়দাদু আর ওই ভাঙা ঘরগুলোর চলে যাওয়া দুই দাদুদের ঠাকুরদা নাকি ছিল একজন! আগে এমন আলাদা ছিল না সবাই, এমন নাকি ভাগ ছিল না বাড়িগুলোর। উনিশটা নীলকুঠির মালিক ছিল রায় বংশ।

কিন্তু কেমন করে সব কী হয়ে গেল! দাদুব ঠাকুরদার এক ভাই শহরে গিয়ে, চুপি চুপি সব নীলকুঠি সাহেবদের কাছে বেচে দিয়ে আর কোনওদিন ফেরেনি বাড়িতে। ফিরলে নাকি অন্য ভাইরা খুন করে ফেলত।

লোকে ছড়া বেঁধেছিল সেই সময়। ঠাকুমা এখনও বলে, ভারি মজার ছড়াটা—

"স্বন্নবাবু হন্নে হল, কুঠি বেচে দীনহীন,
বাঙলায় বাঙালির কুঠি থাকবে ঘোড়ার ডিম।"

ঘোড়ার ডিম! হিঃ, হিঃ।

দাদু বলে, জমিদারি তো সত্যি সত্যি দাদুদেরই ছিল কিন্তু ভাগাভাগি, মামলা-মকর্দমায় কেমন করে সব চলে গেল।

এখন জমিদার কে? যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই বলবে, বড়ো রায়। তারপর কে হবে? তার ছেলে অনিল রায়।

সবাই বলে, অনিলকাকা নাকি বউকে ধরে মারে। দু-একদিন অনেক রাতে হঠাৎ কান্নাকাটি চেঁচামেচির শব্দে ছবিরও ঘুম ভেঙেছে—আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে উঠে হয়তো মা-কাকিমার কথার মধ্যে দিয়ে বুঝতে পেরেছে অনিলকাকা আবার তার বউকে ধরে মেরেছে। কিন্তু ঠাকুমা বলে, পুরুষমানুষ ওরকম একটু হয়েই থাকে। আমাদের সময়...।

কিন্তু ঠাকুমার ওই দোষ। সব কথা শেষ না করে হয়তো একটা কাজে চলে যায়।

কিন্তু সেই অনিলকাকাকেও আবার উলটে মার খেতে হয়েছে। কারা মেরেছে কেউ জানে না। সন্ধেবেলা ঘোড়ায় চড়ে আসছিল কাছারি থেকে, হঠাৎ দেখা গেল খালি ঘোড়া ছুটতে ছুটতে আসছে—মানুষ নেই। খালের ধারে কারা যেন মেরে অজ্ঞান করে ফেলে গিয়েছিল অনিলকাকাকে। এই তো ক'দিন আগে। বাব্বাঃ! সে-কথা ছবি কখনও ভুলবে না।

সে আর মণিদা চুপি চুপি দেখতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে সারা গায়ে রক্ত মেখে

অনিলকাকা চিৎকার করছে যন্ত্রণায়। সমস্ত গ্রামের লোক এসে জড় হয়েছে, নাটমণ্ডপের বারান্দায় যেখানে অনিলকাকাকে আনা হয়েছে।

কেউ বলেছিল বাঁচবে, কেউ বলেছিল বাঁচবে না।

রায়াদাদু তাঁর লাঠিয়ালদের ডেকে পাঠালেন সেই রাত্রে। তারপর মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ছবি শুধু শুনেছিল অনেক গলার আর্তনাদ, বাঁশ ফাটার শব্দ। সবাইয়ের সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, কুসুমপুরের দিকে লাল হয়ে গেছে আকাশ, মাঝে মাঝে তার ছাই উড়ে আসছে এতদূর পর্যন্ত।

আর ঘুম ভাঙা চোখে দেখেছিল আর একটা জিনিস, সেটাও ভোলা যাবে না। জোরে শব্দ করে সদর দরজাটা খুলে অধীরকা বেরিয়ে আসছে, পেছনে লণ্ঠন হাতে নতুন দিদিমা। কাকার দু-হাতে দুটো বড়ো বালতি। নতুন দিদিমা বারণ করলেন যেতে, অধীরকা সে-কথা শুনলও না।

তারপর সে-আগুন নিভেছে। অনিলকাকা চলে গেছে শহরের হাসপাতালে পালকি করে। কিন্তু কিসের একটা ফিশফিশানি আজ ক'দিনেও থামেনি।

রায়দাদু শহরে খবর দিয়েছে, পুলিশ আসবে, খুঁজে বের করবে সব লোককে। কেমন একটা থমকানো ভয় যেন ক'টা দিন গাঁ-খানাব ওপর দিয়ে ছিল। ক'দিন অধীরকাই বা কোথায় ছিল কে জানে। কাল বিকেলে ফিরেছে। ছাদে যখন ডাম্বেল, মুগুর ভাঁজছিল তখন এই ছাদ থেকে ছবি দেখেছে।

মণিদাটা বলে, পুলিশ এসে নাকি স্বদেশিদের আগে ধরবে। ওরাই নাকি পাণ্ডা সবকিছুর। কে জানে বাবা!

অধীরকার কত বড়ো লম্বা-চওড়া শরীর। কী মোটা-সোটা হাত-পা! ধরতে আসা এতই সোজা নাকি! মণিদা বলেছে ধরতে এলেই কাকা বন্দুক চালিয়ে দেবে। দাদু বলেছে, ভালো লোকদের কখনও পুলিশে ধরে না। চোর-ডাকাতদের ধরে।

ভালো লোকদের ধরে না? ছবি মনে মনে কথাটা আওড়ায়। অধীরকা তো ভালো।

যে ছোটো খালের মতো সরু পুকুরটা এ-পাড়া, ও-পাড়াকে মাঝখানে ভাগ করে দিয়েছে, তাতে কে যেন স্নান করতে নেমেছে। নিশ্চয় হারান ঠাকুর। নইলে স্তোত্র বলবে কে অমন করে এত সকালে—

'ওঁ জবাকুসুম সংকাশং,
কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্...।'

মা একদিন মানেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। সূর্যের স্তব করছে ঠাকুরমশাই।

ঠাকুরমশাই ভীষণ গরিব। দুর্গাদের চেয়েও, শ্যামলদের চেয়েও। আর ঠাকুরমশাইয়ের ভাগ্নিই তো মায়াদি। মায়াদিকে ছবি মনে মনে খুব ভালোবাসে।

মন নাকি বাতাসের আগে চলে, ঠাকুমা বলে। কত কথা যে মনে হয় একা

থাকলে— অদ্ভুত, মজার সব! হিঃ হিঃ! তার মনটাও তবে এখন বাতাসের আগে চলছে? সূর্যের রথেরও আগে?

খানিকক্ষণ থেকে একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল—মাঝে মাঝে। কিন্তু এখন সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হরিদাদুর বাড়ির দিক থেকে আসছে শব্দটা। কে যেন হরিদাদুর দরজায় ঘা দিচ্ছে ক্রমাগত, গম্ভীর মোটা গলায় ডাকছে—হরিবাবু! রায়মশাই!

কোনও উত্তর নেই। অধীর হয়ে-ওঠা গলাটা এবার বিকৃত আওয়াজে চেঁচাচ্ছে—হরিনন্দন রায়! দরজা খুলুন! দরজাটা খুলে দিন, নইলে ভেঙে ফেলব!

সে-শব্দে সারা বাড়িশুদ্ধু লোক জেগে উঠেছে। এখানে দাঁড়িয়েই অধীরকাদের মোটা কাঠের দরজাটা খোলার শব্দ পাচ্ছে ছবি। খট্-খট্ করে কারা যেন ঢুকছে সান-বাঁধানো উঠোনে।

ছবি ছুটে আসে ঘরের দিকে। বাবা ছাদের কার্নিশে ঝুঁকে পড়ে নীচে কাকে যেন কী জিজ্ঞেস করলেন, তারপর ফ্যাকাসে মুখে মার দিকে তাকিয়ে ফিশফিশ করে বললেন—পুলিশ।

নীচে রোয়াকে কাদের এলোমেলো গলাব শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু চেঁচাচ্ছে না কেউ। সারা বাড়িটা থমথম করছে।

কোমরে কাপড় গুঁজতে গুঁজতে বাবা নীচে নেমে গিয়েছিলেন, মাও গেল পেছন পেছন মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে। কী যে হয়েছে! একটা কথাও জিজ্ঞেস করা গেল না মাকে।

আজকের সকালটা অদ্ভুত। সবচেয়ে আগে উঠেছে বলে এত আনন্দ হচ্ছিল, এখন তার বিশ্রী লাগছে! কেউ কিছু বলবেও না! এমনি সব। নিজেরা কেবল ফিশফিশ করবে।

হতভম্বের মতো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে শেষে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত প্রদীপকেই ছবি ডেকে তোলে ঠেলে ঠেলে, অ্যাই দাদা, অ্যাই। ওঠ না শিগগির। বাবা বলল হরিদাদুর বাড়ি পুলিশ এসেছে।

ছবির ঠেলাঠেলিতে আচমকা ঘুম-ভাঙা প্রদীপ তার লাল লাল দুই চোখ মেলে এক মুহূর্ত বোকার মতো তাকিয়ে থেকে তারপরেই হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসে বলে, পুলিশ! তবে অধীরকাদের সত্যিই ধরতে এসেছে রে ছবু!

এতক্ষণে পুলিশ আসার কারণটা মাথায় ঢুকতেই মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে যায় ছবিরও। এইরকমই একটা কথা তো আজ সাতদিন ধরে গ্রামটার ওপর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে—লোকের মুখে মুখে চলে বেড়াচ্ছে। কেবল বিশ্বাস করেনি তারা দু ভাই-বোন।

সেই কথাটাই সত্যি হয়ে গেল এমন!

বিরক্তি আর উত্তেজনায় ছবি মাথা ঝাঁকায়, কেন ধরবে? তুই যে বলিস ধরতে পারবে না। দাদু বলে, ভালো মানুষদের পুলিশে ধরে না। প্রদীপ একটু ভাবে। একটু সময় নিয়েই ভাবে, তাবপর গম্ভীর গলায় বুড়ো মানুষের মতো বলে, বুঝলি ছবি, রায়দাদুই পুলিশদের ডেকে এনেছে। পুলিশরা তো জানেই যে কাকারা স্বদেশি। অরুণকা, প্রসন্নকা, ধীরেনকা সব্বাইকে ওরা চেনে—এতদিন ধরতে পারেনি, এবার রায়দাদুর জন্যেই ধরবে। অনিলকাকা নাকি শহরে গিয়ে পুলিশের কাছে বলেছে, যারা মাথা ফাটিয়েছে তার মধ্যে একজন নাকি ধীরেনকার মতো দেখতে ছিল। কী মিথ্যুক ভাই!

তারপরেই দৃঢ় প্রত্যয়ে মাথা নেড়ে সে বোনের মুখের দিকে তাকায়, কিন্তু কাকাদের হাতে পিস্তল থাকে! দেখিস আমি বলে দিলাম, কিছুতেই পুলিশ ধরতে পারবে না অধীরকাকে। অত সোজা নয়!

যাবি তাই দেখতে? ছবি মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে।

প্রদীপেরও কৌতূহল কম নয়, কিন্তু সে যেতে রাজি হয না। বলে, না ভাই, গেলে বাবা এইসা মারবে...!

জানতে পারবে নাকি? আমরা তো লুকিয়ে যাব।

দুজনে চোরের মতো পেছনের দরজা দিয়ে অধীরদের বাড়ির মধ্যে ঢোকে। উঠোনের সিঁড়িতে হরিনন্দন বসে আছেন চুপ করে। তাদের দিকে একবার কেবল তাকিয়ে আবার আগের মতোই মাথা নিচু করে বসে থাকেন।

লতু পিসি আর নতুন দিদিমা রান্নাঘরের দরজার কাছে কাঠের মতো বসে। সমস্ত উঠোনে বাক্স-পেঁটরা, বই-কাপড়, লেপ-তোশক বোঝাই হয়ে আছে, দুজন লাল পাগড়ি-পরা লোক সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছে তখনও। রান্নার হাঁড়ি, গামলা, দরজার কাছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে।

তারই মধ্যে হতভম্ব ভাই-বোন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকে খানিক। কিন্তু কেউ ওদের বকে না, একটা কথাও কেউ বলে না ওদের সঙ্গে। শেষে দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে।

বড়ো দালানটার মাথায় লাল পাগড়ি-বাঁধা কতগুলো লোক ঘিরে আছে কাকাকে। কেবল হাফপ্যান্ট-পরা মোটামতো ফরসা যে-লোকটা ঘরের কোণ থেকে জিনিসপত্র টেনে বার করছে—তার মাথায় শুধু লাল পাগড়ি নেই, আছে টুপি।

অধীর ওদের দেখে অবাক হয়ে অর্থহীন একটু হাসি হাসে। তার হাত দুখানা কোলের মধ্যে জড়ো করা, যেন লুকিয়ে রাখতে চাইছে।

ছবি সেই হাত দুখানা লক্ষ করে বারে-বারে। কই পিস্তল! হাতের মুঠোতেও তো নেই। লোহার শিকল দিয়ে জড়ানো খালি দুখানা মোটা-মোটা হাত।

ছবি এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রদীপের মুখের দিকে তাকায়। আর বাজি হেরে যাবার

মতো ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে প্রদীপও স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে সে-হাত দুখানার দিকে। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কিছুতেই, মস্ত বড়ো একটা আঘাত পেয়েছে কারুর কাছ থেকে এমনিভাবে সদ্য ঘুম-ভাঙা, এলোমেলো চুলে ঘেরা মুখখানা হঠাৎ তার যেন বেঁকেচুরে যায় দু-একবার। তারপরেই হঠাৎ সে কেঁদে ফেলে। টপটপ করে গাল বেয়ে পড়তে থাকে চোখের জল।

ছবি অত সহজে কাঁদে না। আট-ন বছরের মেয়ে কিন্তু দেখে মনে হয় প্রদীপের চেয়ে বড়ো। তার রং ফরসা, প্রদীপের মতো কালো নয়। কিন্তু তাতে আবার প্রদীপের মতো শ্রী-ও নেই। প্রদীপ রোগা কিন্তু ছবির শরীরে স্বাস্থ্যের দীপ্তি আছে। প্রদীপের স্বভাবটা মেয়েদের মতো কোমল, ছবির স্বভাব ছেলেদের মতো—খানিকটা উদ্ধত, খানিকটা বিরক্ত। মনে হয়, সব সময় ও যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটার ওপর রাগ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

সে সোজা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে, তোমার হাত বেঁধেছে কে অধীরকা? সে উত্তর শুনতে চায় না, প্রশ্নটা সবাইকে শোনাতে চায়।

উত্তর দেয় খাকি হাফপ্যান্ট-পরা লোকটা। কাজ করতে করতে এদিকে তাকিয়ে সে হাসে, তারপর বলে, না বেঁধে কী করি বল খুকি! কখন কী চালিয়ে-টালিয়ে বসেন কে জানে! প্রদীপের দিকে এগিয়ে এসে বলে, কী হল খোকা? অ্যাঁ! কাঁদছ কেন? কাকার জন্যে? ওঁকে তো ধরব না আমরা— দেখ ছেড়ে দেব। তোমার আপন কাকা উনি? না? আচ্ছা খোকা, তুমি ধীরেনবাবুকে চেন? প্রসন্নবাবুকে? ওঁরাও কি তোমার কাকা? ওঁরাও তো এখন এখানে নেই? কোথায় গেছে জানো? না, তুমি আর জানবে কী করে?

অধীর এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এবার হঠাৎ সে নিচু করে থাকা মাথাটা তুলে ডাকে, প্রদীপ!

সে-ডাকে কী ছিল কে জানে। প্রদীপ তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে, একটু ম্লান হাসি হাসে।

ছবি কী বোঝে কে জানে, হঠাৎ প্রদীপের হাতখানা চেপে ধরে বলে, চল ভাই, আমরা মুখ ধুতে যাই— বলে অধীরের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঝড়ের মতো সে প্রদীপকে নিয়ে ঘর ছাড়ে। তার এলোমেলো ফ্রকটা, রুক্ষ লালচে চুলগুলো বাতাসে নাড়া পেয়ে ফুলে ওঠে একবার, তারপর মিলিয়ে যায় দরজার বাইরে।

দরজার বাইরে পা দিয়েই হঠাৎ ফুঁসে উঠে ঘুরে দাঁড়ায় সে ভাইয়ের দিকে, মুখ ভেংচে বলে, বুড়ো ধাড়ি ছেলে। কাঁদলি কী বলে ওই লোকটার সামনে?

প্রদীপ অপ্রতিভ মুখে কী একটা বলতে গিয়েও আবার চুপ করে থাকে।

খিড়কির পুকুরের সেই পাতা কাঠখানার ওপর এসে রোজকার মতো দুজনে বসে। অন্যদিন রোজ ওদিকের ঘাটে মায়াদি আসে— বাসন মাজে, কাপড়-চোপড়

কাচে। আজ ঘাট খালি। আজ যে বেলা হয়ে গেছে। অনেক বেলা! আজকের সকাল সব সকালের চেয়ে অদ্ভুত। আজকের সকালে পুলিশ এসেছে, এখনও আছে তারা। অথচ তবু ভয় করছে না সেদিনকার রাতের মতো। কেবল একটা বুক-চাপা আতঙ্ক আর আশঙ্কায় ছেয়ে রয়েছে মনটা। ছবি বারে বারে মনকে প্রবোধ দেয়— না না, নিয়ে যাবে না কাকাকে।

কোনোমতে মুখ ধোওয়া শেষ করে ছবি দেখে প্রদীপ তখনও বসে আছে চুপ করে। দুঃখ হলে মণিদা ওমনিই চুপ করে থাকে, কেবল চোখ দুটো ছলছল করতে থাকে।

ছবির তা নয়। দুঃখ হলে সে সোজাসুজি প্রকাশ করে। পল্টু, মন্টু, মীনাদের সঙ্গে যখন মারামারি হয়, ঝগড়া হয়, সে দুমদাম চড় কিল বসিয়ে, নয়তো আঁচড়ে কামড়ে দিয়ে চলে আসে। মণিদাকে তাই সে বুঝে উঠতে পারে না। কী করবে ভেবে না পেয়ে সে ব্যথিত মুখে চুপ করে থাকে।

হঠাৎ ঝড়ের মতো ছুটতে ছুটতে পল্টু এসে ঢোকে, প্রদীপকে খুঁজছে সে। বলে, অধীরকাকে যে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। জানিস নে তোরা? তোরা কী বে? দ্যাখগে লতু পিসিমা আর নতুন দিদিমা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে উঠোনে কেমন করে। সব ওই রায়কত্তার জন্যে, জানিস না? তোরা আবার বলিস রায়দাদু! দাদু না হাতি!

কিন্তু পরমুহূর্তে পল্টুর মুখখানায় খুশি ছড়িয়ে পড়ে কী মনে করে, বলে, কিন্তু আর কাউকে ওরা ধরতে পারেনি তাই— ধীরেনকা, প্রসন্নকা, অরুণকা— কাউকে না। কাল সারারাত ধরে ওরা গ্রামখানাকে ঘিরেছে— তবু পায়নি, হিঃ হিঃ! বেশ মজা না রে? একেবারে জব্দ হয়ে গেছে পুলিশ, না রে? যাবি দেখতে অধীরকাকে? এখনও কুঠিবাড়ির মাঠ ছাড়ায়নি বোধ হয়— গেলে দেখতে পাবি। বলেই পল্টু ছুট দেয়— যেমন এসেছিল।

ছবি চমকে উঠে বলে, সত্যি সত্যি নিয়ে যাচ্ছে? তবে যে লোকটা বলল, ছেড়ে দেবে?

প্রদীপ স্থির দৃষ্টিতে তখনও তাকিয়ে আছে দূরের দিকে, একবারও সে ঘাড় ফেরায় না। ঘাটের পাশে কটা বেতের গাছ মিলে গিয়ে ঝোপের মতো ঠান্ডা ঠান্ডা একটা জায়গা করেছে, সেখানে একটা ডাহুকের বাসা আছে। সেই ডাহুকটার ডাক শুনছে প্রদীপ।

ছবির এবার খুব রাগ হয়, সে বলে, অ্যাই দাদা, বসেই থাকবি?

এতক্ষণে প্রদীপ মুখ ফেরায়, জল দিয়ে চোখ-মুখ ধুয়ে ফেললেও বোঝা যায় সে কেঁদেছে। ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, পিস্তল না ছাই— হাতি আছে! সব বানানো কথা। নইলে কখনও ধরতে পারে, হাতে শেকল পরাতে পারে! দোষ না থাকলে তো ওরা ধরে না।

সে-কথা শুনে ছবিও একটা মুহূর্ত কেমন ভাবনায় পড়ে, তারপর হঠাৎ সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে ভাইয়ের হাতখানা শক্ত করে ধরে বলে, চল, জিজ্ঞেস করে আসি। কী দোষ করেছে কাকা যে ওরা ধরে নিয়ে যাবে!

দুজনে ছুটতে থাকে ঘাটের পথ দিয়ে। বেতঝোপ আর কাঁটাগাছ মাড়িয়ে আগাছা-বিপথের মধ্য দিয়ে তাড়াতাড়ির পথটা বেছে নেয় ছবি, আর তার ধরে থাকা হাতের টানে টানে প্রদীপও ছোটে।

দোল-পুকুরটার পাড়ের ওপর উঠে একটুখানি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুজন। রুক্ষ চুলগুলো বাতাসে উড়ছে ছবির, তার হাঁটুর নীচেটা বেতের কাঁটায় রক্তারক্তি হয়ে গেছে।

কিন্তু কোথায় কাকা?

পুকুরের পাশের মটর খেতটায় লাল-নীল-সবুজ ফুলগুলো নেই। তাতে এখন মটর ধরেছে, সেগুলোও প্রায় পেকে এল। ফুলের আর ফলের মতো বোধ হয় ফসলেরও গন্ধ থাকে। কেমন একটা সোঁদা সোঁদা মৃদু গন্ধ আসছে। তা কি মাটির? কে জানে!

পলাশ গাছটায় মাঘ মাসে যেন আগুন লেগেছিল। সরস্বতী পুজোয় লাগে পলাশ ফুল। কিন্তু এখন দ্যাখ— ন্যাড়া পাতা-ঝরা একটা ঊর্ধ্ববাহু মুনির মতো ওটা দাঁড়িয়ে। তারই একটা উঁচু ডালে বসে একটা চিল চেঁচাচ্ছে তারস্বরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে।

সারা মাঠ জুড়ে মৌমাছি আর ভোমরার গুন গুন আওয়াজ খুব মৃদু গানের সুরের মতো শোনাচ্ছে।

সব ওরা দেখছে, শুনছে, কিন্তু বুকের ভেতরটা হয়ে গেছে খালি। কী একটা যন্ত্রণা যেন ঠেলে ঠেলে গলা পর্যন্ত উঠছে।

হঠাৎ আঙুল বাড়িয়ে ছবি প্রায় চিৎকার করে ওঠে, ওই— ওই রে দাদা! কুঠিবাড়ি থেকে বেরুচ্ছে, ওই তো কাকা!

কথা শেষ না করেই সে ছোটে প্রাণপণে, প্রদীপেরও আগে। দুবার আছাড় খায় ছবি। পড়ে ঠোঁট কেটে গেছে, তবু ছুটছে। খোলা মাঠের হু-হু কবা হাওয়া ওকে ঠেলে রাখতে চাইছে উলটোদিকে, চুলগুলো চোখে-মুখে এসে পড়েছে, বাতাস জোরে নাকে-মুখে ঢুকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে তার, তবু ছুটছে আর দু-চোখের জাগ্রত দৃষ্টি মেলে রেখেছে ওই ক'টা বিন্দুর দিকে।

ক্রমশ ওরা স্পষ্ট হচ্ছে। ওই তো কাকা আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে, দু-পাশে পুলিশ।

ছবি প্রাণপণে চেঁচায়, কাকা, অধীরকা দাঁড়াও, আমি আর দাদা আসছি। দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে তার ক্ষীণ গলার ডাক একটানা সুরের মতো ভেসে ভেসে মিলিয়ে যায়। অধীর সেই সুরটা বোধ হয় শুনতে পায়। সে চমকে পেছন ফিরে

তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে মাঝ রাস্তায়।

অনেকে— গ্রামের লোক, পথচলতি মানুষ সজল চোখে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে দিয়ে গেছে তাকে গাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত। অপ্রত্যাশিত শ্রদ্ধা দেখিয়ে তারা তার সাহস বাড়িয়েছিল।

কিন্তু ওই যে দুটো ছোটো মানুষ তিরের মতো ছুটে আসছে। অনেকের ভিড়ে ওদের সে দেখতে চেয়েও পায়নি এদিক-ওদিক তাকিয়ে! ওদের না দেখে সে আর এক পাও এগোবে না।

হাতকড়া-বাঁধা হাত নিয়েই সে মাটিতে বসে পড়ে— তার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ায় দেহরক্ষীরা।

ছবি হাঁফায়, তার ছোটো বুকটা ওঠা-নামা করে পরিশ্রমে। সে কাছে বসে অধীরের হাতকড়া-বাঁধা হাত দুখানায় তার হাত বুলিয়ে দিয়ে বিষণ্ণ মুখে বলে, এখনও তোমার হাত বাঁধা— নিয়ে যাচ্ছে? তবে যে বলল ছেড়ে দেবে?

কান্নাভরা গলায় কেবলই প্রশ্ন, সেদিন দিনু চৌকিদার এজমালিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে থানায় নিয়ে গেল, সে নাকি চোর। দাদু যে মণিদাকে বলে, চোর-ডাকাত ছাড়া ভালো মানুষদের পুলিশে ধরে না? তুমি কি চোর-ডাকাত?

প্রদীপ একটা কথাও বলছে না। সে জানে কথা বলতে গেলেই আগে তার চোখের জল ঝরে পড়বে। সে কেবল চুপ করে অধীরের গা ঘেঁসে বসে আছে।

দারোগা বকসীরও বোধ হয় ভালো লাগে না এ নিস্তব্ধতা। উত্তরটা সেই দেয়, কেউ শুনতে চায়নি তার কাছ থেকে তবু দেয়, তোমার কাকাও যে ডাকাত খুকু! স্বদেশি ডাকাত। তারা করে মানুষের ঘরে চুরি, এঁরা করেন সরকারের ঘরে। আপনার চুপ করে থাকা যে আমারও সহ্য হচ্ছে না। যা হোক, একটা কিছু বলুন না— শুনছেন ও মশাই? ও অধীরবাবু! কথা শেষ করে সে সিগারেট বার করে, নিজে নেয়, অধীরকেও একটা দিতে গিয়ে হঠাৎ তার হাতকড়া-বাঁধা হাতের দিকে তাকিয়ে নিজের সিগারেটটাও তুলে রাখে প্যাকেটে।

তবুও একটা কথা বলে না অধীর। নিজেই সে উঠে দাঁড়ায়, চলবার জন্য পা-ও বাড়ায়, কিন্তু ছবি পেছন থেকে তার কাপড় চেপে ধরে, কবে আসবে তুমি আবার, অধীরকা? ওরা তোমাকে আসতে দেবে তো?

ছবির দু-চোখের সেই করুণ জিজ্ঞাসা, তার ব্যাকুলতা, পাশে দাঁড়িয়ে অদম্য চেষ্টায় কান্না চেপে রাখা প্রদীপ, সব মিলিয়ে বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠে এতক্ষণ পরে অধীরের চোখেও হঠাৎ জল এসে পড়ে, সে হাতকড়া-বাঁধা হাত দুখানা চেষ্টা করে তুলে আঙুলের ডগায় চোখের কোণটা মুছে ফেলে।

পাড়ার ছেলেরা এসে ভিড় করেছে তার কাছে, তাদের সে দেশের কথা শুনিয়েছে, ভবিষ্যতের কথা শুনিয়েছে নানা গল্পের মধ্য দিয়ে। দেশপ্রেমের কবিতা

পড়ে শুনিয়েছে আর তখন কোথা থেকে যেন ও-বাড়ির কুলদা-দার এই মেয়েটা এসে চুপ করে বসে থাকত, কেউ তাকে না ডাকলেও।

গল্প শুনে, কবিতা শুনে কে কী বুঝেছে পরীক্ষা করত অধীর। সবাইয়ের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে শেষে হেসে জিজ্ঞেস করত, বল কী বুঝলে?

সেই না বোঝার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কখন এককোণ থেকে ছবি বলে উঠত রিনরিনে গলায়, আমি বলব কাকা?

তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সে বলত, তুই পারবি বলতে? আচ্ছা বল, তুই-ই বল।

ছেলেরা নড়েচড়ে বসত, তারা চটে যেত, সেটা অধীরের চোখ এড়াত না। তবু সে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকত, বাধা দিতে পারত না ছবিকে।

তারপর কখন হয়তো একসময় ও-বাড়ি থেকে শোনা যেত ছবির ঠাকুমার গলা, ছবি, ও ছবি! একটু বাড়ি কটা পাহারা দেবে যে এমন কেউ নেই। মেয়েমানুষ— কিন্তু বাড়িতে পা বসে না মেয়েব।

সঙ্গে সঙ্গে মমতাও খুঁজতে আসতেন।

কোনোদিন ছবিকে রাগ করে ধরে নিয়ে যেতেন, কোনওদিন নিজেই উঠে যেত মেয়েটা ছলছলে চোখে। চুপি চুপি বলে যেত, রাত্তিরে কি আবার পড়বে কাকা? আমি আসব কিন্তু।

খেলার মাঠে অধীর ছেলেদের নানারকম ব্যায়াম শেখাত, শরীর পালনের উপদেশ দিত—সেখানেও এসে হাজির হত মেয়েটা। তার দুই চোখে জ্বলে জ্বলে ওঠা আগ্রহ, আমাকে নেবে না কাকা? আমিও ওদের মতো ব্যায়াম করব, দৌড়ব।

পণ্টুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাফ দিতে গিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল একদিন। একদিন দৌড়োতে গিয়ে পা কেটে রক্তারক্তি করে বসল।

তবু আসত। ছেলেদের সঙ্গে সমান করে পারত না, মুখ লাল হয়ে যেত, হাঁফাত— তবু...।

আজও সেই মেয়েটাই। তেমনি করুণ আগ্রহ-ভরা দুই চোখ নিয়ে, জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কী বলবে অধীর? কী উত্তরে শান্ত করবে ওকে?

একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়েছে ওর চোখে-মুখে, ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে, অথচ কাঁদতে পারছে না। জোর করে ধরে আছে— যেন এমনি করে ধরে রাখবে।

চোর-ডাকাতকে তো ধরে? ভালোমানুষকে ধরবে কেন? কেন?

এতক্ষণে এই প্রথম কথা বলে অধীর। গলার স্বর তার এই প্রথম কাঁপে, ছাড় ছবু, অমন করতে নেই। আসব না কেন? কয়েকদিন পরেই তো ফিরব— ওরা কি আমাদের ধরে রাখতে পারে? যাও, লক্ষ্মী মেয়ে, প্রদীপের সঙ্গে বাড়ি যাও। মন দিয়ে

লেখাপড়া করবে দুজনে— কেমন? ছাড় ছবি, ধরে রাখতে নেই।

আরও অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে অধীরের, যা সে কাউকে বলেনি। ছবির প্রশ্নটার উত্তর সে দারোগা বকসীর মুখের ওপরেই শুনিয়ে দিতে পারত, বলে যেতে পারত রায়কত্তার কথা। বলতে পারত ভবিষ্যতের কথা, তার আদর্শ— কিন্তু এই মুহূর্তটাতে সেসব আর ইচ্ছে করছে না।

ছবি ছোটো বলে, অত কথা বুঝবে না বলে ইচ্ছে করছে না তা নয়। কথা বলে বলে ওই ছোটো হাতের মুঠো ছাড়িয়ে দেবে না সে। জোর করে ছাড়িয়ে নিতে হবে। মেয়েটা কাঁদুক, বুঝতে চেষ্টা করুক।

অধৈর্য হয়ে অধীর এবার নিজেই এগিয়ে যায়।

এমনিতে এমন শক্ত মন তার। বাবা-মা-বোনের কান্না দেখে এসেছে আসার সময়। নিজেই ওদের সান্ত্বনা দিয়েছে, মৃদু ধমক দিয়েছে, কিন্তু কষ্টের এতটুকু ছাপ তার মুখে পড়েনি। কিন্তু ছবিটা তাকে আবার পেছনে টানছে।

ও যেন মনে পড়িয়ে দিয়েছে তার মায়ের যন্ত্রণা-মাখা চোখের জলে ভাসা মুখখানা। এখন মনে পড়ছে মায়া জানতেও পারল না তার চলে আসা। শুনে নিঃশব্দে কাঁদবে মামিমার ভয়ে।

এখন মনে হচ্ছে ওদের দিয়ে মায়াকে একটা খবর পাঠালে হয়। এখনও গ্রামের সীমানা ছাড়ায়নি সে, কিন্তু গ্রাম তাকে আবার টানছে। টানছে স্নেহ, ভালোবাসা, মায়া, মমতা।

ঘাড় শক্ত করে সামনে চোখ রেখে সে সোজা হেঁটে চলে, একবারও পেছনে তাকায় না।

খানিকটা সামনে স্কুলবাড়ির টিনের চালটা রোদ পড়ে ঝকঝক করছে— সেটাও আস্তে আস্তে পেছনে পড়ে থাকে। বাঁয়ে পোস্টাপিসের খড়ের চালাও মিলিয়ে গেল।

কেবল খানিক দূর থেকে ভেসে এল ছবির গলা, কাঁপা কাঁপা, অস্থির রিনরিনে গলা, কাকা, শোনো, শুনছো! তুমিও বল 'বন্দেমাতরম্'।

প্রদীপ আর ছবির একসঙ্গে মেশানো গলা আরও দু-একবার শোনা গেল, 'বন্দেমাতরম্'।

তারপর আর নয়।

পথচলতি মানুষ, স্টেশনের পথে যাওয়া মানুষ, হাটুরে লোক অবাক চোখে তাকিয়ে অধীরকে দেখে— দেখে তার দেহরক্ষীদের। দারোগার মাথায় টুপিটার ওপর রাজার মুকুটের পেতলে সূর্যের আলো পড়ে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠাটাও দেখে। দেখে কিন্তু কথা বলে না। মাথা নিচু করে প্রণাম করে— অধীরকে, না দারোগাকে, না পুলিশদের বোঝা যায় না।

কেবল ডানদিকের ছোটো পটলের খেতটায় আগাছা ওপড়াতে ওপড়াতে হাতের কাস্তেটা রেখে উঠে দাঁড়ায় মামুদ। নিঃশব্দে একবার সেলাম জানায় অধীরকেই, তারপর আবার তেমনি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পেছনে তখনও ছবি আর প্রদীপ তেমনি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে চোখ পেতে। অধীরকে আর দেখা যাচ্ছে না, শেষ বিন্দু কটিও যে মিলিয়ে গেছে দিগন্তে সে খেয়াল ওদের নেই।

ছবির কাছে এ আর এক নতুন বিস্ময় আর ব্যথা। তার উত্তপ্ত মনটা কিছুতেই যেন শান্ত হতে চায় না।

এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল তার জীবনে।

সবাই বলে আর একবারও কাকাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে শহর থেকে। কাকা যখন সেখানে পড়ত। তখন ছবি দেখেনি। এখন দেখল।

কেন ধরল? ভালোমানুষদেরও ধরে নিয়ে যায়— কেন নিয়ে যায়? এ-প্রশ্নটাই তার মনে ফুটন্ত জলের মতো ফুটে উঠে উঠে তাকে অশান্ত করে তোলে।

প্রদীপ এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি কিন্তু কেঁদেছে। কেঁদেছে এটা সে প্রকাশ হতে দিতে রাজি নয়, চট করে পেছন ফিরে জামা দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলে ছবির হাত ধরে। তখনও চোখের জল তার দীর্ঘ চোখের পল্লবে অভ্রের কুচির মতো লেগে আছে। বলে, চল ছবি।

ছবি এতক্ষণ কাঁদেনি। সেও যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার থমকে দাঁড়ায় দিগন্ত-প্রসারিত মাঠের দিকে মুখ করে। চোখ ছাপিয়ে এবার জল আসে— ঝাপসা হয়ে যায় সবকিছু, বলে, কাকাকে ওরা যদি না ছাড়ে দাদা?

বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠছে এক অব্যক্ত ব্যথায়, ছবি তা বুঝতে পারছে না, বোঝাতেও পারছে না। তাদের মাঠে-ঘাটের ছুটোছুটিতে পাঠশালায় কিংবা খেলাঘরের কোণে— সব জায়গায় একটা নিয়ম আছে। সেখানে সব্বাই জানে যে অন্যায় করলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

কিন্তু এ তো পল্টু, সেফু, উমা নয় যে খিমচে, কামড়ে, চড় মেরে প্রতিশোধ নেওয়া যাবে। এ কেমনতর অন্যায়! যার কোনও শাস্তি নেই? সবাই কেবল দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখে অধীরকাকে শেকল বেঁধে ধরে নিয়ে যাওয়া?

থেকে থেকে তার বুকের ভেতরটায় ছুরির খোঁচা খাওয়ার মতো যন্ত্রণায় ব্যথিয়ে ওঠে।

ফ্রকের কোণায় চোখ মুছে ফেলে নিজেই প্রদীপের হাত ধরে সে এগিয়ে চলে ঝরা আমপাতা মাড়িয়ে। ছোটো দু-জোড়া খালি পায়ের চাপে শুকনো আমপাতার মৃদু শব্দ উঠতে থাকে একটানা।



দুই

কুঠিবাড়ি ছাড়িয়ে সামান্য পথ এগিয়ে গেলে বাঁদিকে পড়ে রায়েদের বৈঠকখানা— বড়ো তরফের ভাগ। উঠোনের ওপর অনেকগুলো ঘরওয়ালা দালান লম্বা হয়ে চলে গেছে। দালানের নীচে খানিকটা জায়গা জুড়ে একটুকরো বাগান। কিছু ফুল, কিছু ফলের গাছ, তরকারির চাষও আছে।

দালানের বারান্দায় রায়কর্তা সকাল থেকে প্রায় সারাটা দিন একটা লম্বা বেঞ্চিতে গা এলিয়ে দিয়ে বসে তামাক টানেন। ওখানেই তাঁর কোর্ট, কাছারি। ওখানে বসেই তাঁর পাওনা কিংবা বিচার শেষ করে তবে ওঠেন। তাঁর অম্বুরি তামাকের গন্ধ সারা বৈঠকখানা ছাড়িয়েও অনেকটা দূর পর্যন্ত মাতিয়ে রাখে।

খুব বড়ো বড়ো টানা চোখ রায়কর্তার আর তেমনি প্রকাণ্ড একজোড়া গোঁফ। গায়ের রং ধবধবে ফরসা, বিরাট লম্বা-চওড়া পুরুষ, আর গলার স্বরও তেমনি। জোরে কথা বললে বুকের মধ্যেটা যেন চমকে ওঠে।

দূর গ্রামের চাষি গেরস্থ কিংবা এ-পাড়া ও-পাড়াব নতুন আসা লোকজন যারা তাঁর বৈঠকখানার ওপর দিয়ে রাস্তা করে নেয় আর এক পাড়ায় যাবার জন্য কিংবা ইচ্ছে করেও যারা পথ কমিয়ে ও-পথ দিয়ে যেতে চায় তাদের সবাইকেই একবার থমকে দাঁড়াতে হয় সেই বজ্রগম্ভীর গলার শব্দে।

চেনা হলে, অচেনা হলেও, মুখ থেকে নল নামিয়ে বলেন, কে যায়?

তার তখন থমকে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না।

যদি কারও তাড়াতাড়ি থাকে, অতি দ্রুত পায়ে সরে যেতে চায় কথা বলে সময় নষ্ট না করে, তারও রেহাই নেই।

নিজে ওঠেন না, একটু দূরে বসে থাকা সবসময়েব চাকর রোগা পেটমোটা মানিক বাগদিকে হুকুম করেন, দেখে আয় তো!

মানিক ধরে আনে। যদি সে লোক গরিব কিষাণ-গেরস্ত হয় তবে মুখ থেকে নল নামিয়ে অপাঙ্গে তার দিকে একবার তাকান। বিদ্রূপের হাসিতে বাঁকানো ঠোঁটে বলেন, ডাকলে সাড়া দিসনে? ব্যাটা, তোরা কি নবাব হচ্ছিস দিন দিন?

আর যদি সে-লোক ফরসা জামা-কাপড়-পরা কোনও ভদ্রলোক হয় তবে তাকে বসতে দেন, কথা বলেন।

এরও ব্যতিক্রম আছে, মাঝে মাঝে হেরে যান এ-পাড়া ও-পাড়ার ফাজিল ছোটো ছোটো ছেলেগুলোর কাছে। ওরা ইচ্ছে করে পায়ের শব্দ করে উঠোন ডিঙিয়ে চলে। রায় বলেন, কে যায়?

ওরা চার-পাঁচজন সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে— কে আবার! রায়কত্তার গোঁফ যায়।

নল মুখ থেকে সরিয়ে রায়কর্তা চেঁচান, দ্যাখ তো, দ্যাখ তো রে মানিক!

মানিক ছুটেও যায় যথারীতি, কিন্তু ছেলেরা ততক্ষণে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেছে।

সে-দলে পল্টু আছে, প্রদীপও থাকে।

যত অদ্ভুত অদ্ভুত নাম সব পল্টুর দেওয়া। রায়কর্তাকে বলে গোঁফ। দাদুর নাম রেখেছে শালিক। বড়কারও কী একটা নাম আছে, ছবিদের বাবারও। সবাই জানে না। প্রদীপ জানে, ছবিকেও সে বলেছে চুপি চুপি।

কাউকে হঠাৎ কানমলা কিংবা বকুনি খাবার হাত থেকে বাঁচাতে হলে বাবা, দাদু কিংবা বড়কার নাম না করেও ওই নাম করে সাবধান করা যায়। সবাই তো আর বুঝবে না। যারা বুঝবার তারা বুঝে নেবে ঠিক।

রায়কর্তা আর মানিক বাগদিকে নিয়ে একটা ছড়াও আছে। মানিকের বাবা ছিল হরিশ বাগদি— রায়কত্তার লেঠেল। ঠাকুমারা দেখেছে তাকে, ইয়া লম্বা-চওড়া জোয়ান মানুষ, কালো আবলুষ কাঠের মতো রং, দৈত্যের মতো চেহারা, পাটার মতো ছিল তার বুক। রায়কর্তার জন্য জমির দখল নিতে গিয়ে সেই বুকে কোঁচের খোঁচা খেয়ে মরে গেল হরিশ। রায়দাদু বলেছিলেন, যা হরিশ, তোর ছেলের সারাজীবনের ভার আমি নিলাম।

রাযদাদু তারপর থেকে মানিককে তার সারাক্ষণের চাকর করে নিয়েছেন। ওর বাবা ছিল লাঠিয়াল আর ও হয়েছে চাকর।

তাও আবার চেহারা দেখ না!

ঠাকুমার কাছে শোনা হরিশের চেহারার সঙ্গে তার ছেলে মানিকের একটুকু মিল নেই। তার হাত-পা সরু সরু, পেটটা মোটা, বোকা বোকা চাউনি। সারাক্ষণ সে রায়কর্তার কাছে বসে থাকে, তামাক সেজে দেয়, গা টিপে টিপে দেয়। একটু কী রাগও হয় না ওর রায়কত্তার ওপর?

পল্টু তাই ছড়া বেঁধেছে, দূরে দাঁড়িয়ে বলে। রায়কত্তা থাকলে বলেই ছুটে পালায়। আর মানিককে একা পেলে পালায় না— চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওকে শোনায়—

ঢাল নেই, তলোয়ার নেই,
রায়কত্তা জমিদার,
পেট মোটা, পা সরু, মানিক বাগদি সর্দার।

আর আশ্চর্য লোকটা! কখনও দাঁত বার করে হাসে, কখনও বিষণ্ণ মুখ করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, কও বাবুরা, কও। কবাই তো।

সামনে বিরাট পুকুর, বাঁয়ে একটা আম আর নারকেল গাছের বাগান সামনে রেখে রায় বসে থাকেন। অম্বুরি তামাকের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, নলের শব্দ হয় ভুড়ুক ভুড়ুক করে আর তার ফাঁকে মাঝে মাঝে ঝুলে পড়া ভুরুর নীচে থেকে তাকান প্রদীপের বৈঠকখানাটার দিকে।

সেখানে বারান্দায় নয়, ঘরের মধ্যে বসে থাকেন প্রদীপের ঠাকুরদা, দক্ষিণা রায়।

তিনিও তামাক টানেন। দক্ষিণার সবসময়ের চাকর নেই, বাড়ির চাকর নিবাসই দিয়ে যায় তামাক। মাঝে মাঝে কোনও মুনিশকে কিংবা চেনা-শোনা কাউকে পেলেও সাজিয়ে নেন। আর কেউ যখন থাকে না, তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিজেই ওঠেন, সেজে নেন।

কিন্তু সে তামাকের অমন মিষ্টি গন্ধ নেই। প্রদীপ অনেকদিন বাতাসে নাক রেখে শুঁকে শুঁকে দেখেছে, এ গন্ধটা রায়দাদুর মতো নয়।

আজও অন্যমনস্ক হয়ে তামাক টানছিলেন দক্ষিণা, হঠাৎ বাইরে শশী মাঝিকে যেতে দেখে উঠে আসেন, এই ব্যাটা, শোন দেখি।

শশী এগিয়ে আসে বিস্মিত মুখে।

সে-মুখের দিকে তাকিয়ে রাগে দক্ষিণা রায়ের গা জ্বলে যায়, বলেন, তুই অধর জেলের ছেলে না?

শশী মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

বাঁওড়ে যে মাছ ধরলি— তার ভাগ কই? ঘাড় ধরে আদায় না করলে বুঝি টনক নড়ে না তোদের?

নিশ্চিত ভঙ্গিতে শশী বলে, দিছি তো।

দিছিস? কই? কবে দিলি?

ক্যান, বাবুগোরে ন্যায্য পাওনা মিটোয়ে দিয়ে গ্যালাম যে সেদিন। বাবুরা লোক পাঠায়ে দশ সের মাছ মাপায়ে আনিছেন! বাঁওড় আপনাগারে, না দিয়ে কি উপায় আছে? বলে শশী একটু হাসবার চেষ্টা করে দক্ষিণার আরও রেগে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে। পরে যখন বুঝতে পারে দক্ষিণা তার কথা বিশ্বাস করছেন না, তখন বলে, আমার কথা বিশ্বাস করতিছেন না? রায়কত্তারে জিজ্ঞেস করবেন? ওই তো তামাক খাচ্ছেন। চলেন মুকাবালা করি।

কথাটা শুনে একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকেন দক্ষিণারঞ্জন। সারা শরীর রাগে থরথর করে কেঁপে ওঠে। হঠাৎ ছুটে গিয়ে লোকটার চুলের মুঠি চেপে ধরেন, হারামজাদা। সেদিন পর্যন্তও তুমি আমার বাড়ি বয়ে মাছ দিয়ে গেছ, আজ দিচ্ছ ও-তরফে। আর আমি যাব মুকাবালা করতে।

প্রথম একটা মুহূর্ত শশী কেমন হতভম্ব হয়ে থাকে। তারপরেই জোরে ঝাঁকানি দিয়ে মাথা ছাড়িয়ে নিয়ে সে সরে দাঁড়ায়, বলে, যখন জায়গা আপনাগারে ছিল দিছি, বাড়ি বয়েই দিছি। নিজেগারে জায়গা নিজেরা রাখতি পারেন নাই, আমার উপর দাপট করেন ক্যান?

শুনে দক্ষিণা এবার পা থেকে খুলে নেন বিদ্যাসাগরী চটি। কয়েক ঘা বসিয়ে দেন কাঁপা কাঁপা হাতে।

লোকটা সরে যায় না। দাঁড়িয়ে মার খায় আর ভাঙা-ভাঙা গলায় চেঁচায়।

গোলমাল শুনে এদিক-ওদিক থেকে লোকজন ছুটে আসে। এসে দাঁড়ান দক্ষিণার মেজ ছেলে সুখদারঞ্জনও। নাটমণ্ডপের বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে গোটাকয়েক ছেলেকে নিয়ে পড়াতে বসেছিলেন, ছুটে এসে থমকে দাঁড়ান। দক্ষিণার হাত থেকে চটিটা কেড়ে নিতে নিতে কঠিন দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় কেবল বলেন, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন বাবা? ছিঃ ছিঃ।

হঠাৎ কী হল কে জানে। দক্ষিণার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। ক্লান্ত, রুগ্ন মানুষের মতো তিনি আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে বৈঠকখানার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন।

মার খেয়ে শশী এতক্ষণ আক্রোশে, রাগে ফুলছিল। এবার হঠাৎ সুখদার পা জড়িয়ে ধরে হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে, দ্যাখেন মাজেবাবু, দ্যাখেন, গরিবেব উপর অত্যাচাব কেমন! উনি যদি ভালোভাবে কতেন, আমি নিজের ভাগের মাছ দিয়ে যাতাম। কিন্তু কথার আগেই জুতোর বাড়ি।

ঝরঝর করে জল ঝরে পড়তে থাকে শশীর দু-চোখ বেয়ে, সে গামছায় চোখ মোছে।

সুখদা একবার চারপাশের দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনদের দিকে তাকান। অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে, কেউ হাসছে, কেউ বিরক্ত হয়েছে। কেউ কথা বলছে, কেউ চুপ করে আছে। লোক নেহাত কম জোটেনি। এতক্ষণ ভিড়ের মধ্যে সবায়ের মাথা ছাড়িয়ে ওঠা বিশাল দেহ আর একজোড়া খুশি খুশি চোখ নিয়ে ব্যবধান রেখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন রায়কর্তাও। তেমনি নিঃশব্দে চলে যাচ্ছেন।

পেছনে দাঁড়িয়ে সুখদার ছেলে আর ছাত্র দুজন।

আর। সমস্ত বড়োমানুষগুলোর আড়ালে, ভিড়ের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে কুলদার দুটি ছেলেমেয়ে, ছবি আর প্রদীপ।

সুখদা তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিয়ে শশীর নগ্ন কালো পিঠের ওপর আলগোছে হাত রেখে বলেন, যা রে শশী, বাড়ি যা। বুড়ো হয়ে গেছেন, কী বলতে কী বলে বসেন, মনে রাখতে নেই।

আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে আসে। সবাই চলে গেচে। পন্টু আর ছাত্র দুটিও পড়তে বসেছে। সমস্ত উঠোনটার মধ্যে এখন দাঁড়িয়ে কেবল সুখদারঞ্জন আর কাকার চোখের দিকে ভয়-মেশানো আতঙ্কিত দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছবি আর প্রদীপ।

একবার কেবল শান্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সুখদা বলেন, যাও, বাড়ি যাও।

বড়কা কিছু বলল না তো, বলল না, কিছু না— প্রদীপ ভারি খুশি হয়ে ওঠে ভেবে। খুশি মুখেই সে বোনের দিকে তাকিয়ে তারপর উঠোন ডিঙিয়ে দুজনেই বাড়িমুখো চলতে থাকে।

সুখদা আবার তাকান ওদের দিকে। কী যেন জিজ্ঞেস করবেন এমনিভাবে থমকে দাঁড়ান কিন্তু তারপর গিয়ে বসেন নিজের জায়গায়। ছাত্রদের বলেন, নিজের ছেলেকেও বলেন, পড় সব। হাঁ করে দেখছ কী?

জানলা দিয়ে দক্ষিণাও দেখতে পেয়েছেন ওদের। হাত ধরাধরি করে চলেছে দুজনে। হঠাৎ পেছন থেকে ডেকে ওঠেন তিনি, প্রদীপ, এদিকে আয় তো। শোন।

সে ডাক রায়কত্তার মতো গম্ভীর না হলেও ভয়ে প্রদীপেব বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। সে থমকে দাঁড়িয়ে যাবার জন্য পা বাড়ালে কী হবে ছবি জোর করে হাত চেপে রাখে।

পাংশুমুখে প্রদীপ বলে; ছাড় না ভাই, শুনে আসি।

না, যাবিনে তুই। যা নিষ্ঠুর দাদুটা। শশী মাঝিকে কেমন করে মারল শুধু শুধু। ডাকলেই যেতে হবে?

যদি বলে, ডাকলাম এলিনে যে বড়ো— কী বলব তখন?

চলতে চলতেই ছবি উত্তরটা শেখায়, বলবি, শুনতেই পাইনি।

আমাকে কিন্তু ভাই দাদু খুব ভালোবাসে, বলে আমি নাকি বংশের প্রদীপ। পল্টু, মন্টুকেও ভালোবাসে, কিন্তু... —বলে হঠাৎ দাঁড়ায় একটু; খানিকটা অবাক হওয়া গলায় বলে, আর তোকে কেন দেখতে পারে না ছবু? বলে, নাচুনে মেয়ে, ধিঙ্গি। ঠাকমা সেদিন কাকিমাকে বলছিল, ও মেয়ে এ বংশের হাড়ে কালি দেবে। কেন?

জানিনে— বলে তার রুক্ষ চুলগুলোকে একবার নাড়া দিয়ে ছবি বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে পেছনে চটির শব্দ করতে করতে এসে ঢোকেন দক্ষিণাও।

পেছন থেকে প্রথমে কান টেনে ধরেন ছবির, আর এক হাতে ধরেন প্রদীপের, তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে ওঠেন, ভদ্দরলোকের বাড়ির

ছেলেমেয়ে হয়ে দিনরাত চাষাভুষোর মতো মাঠে মাঠে ঘোরা। তোমাদের হাড়-মাংস আজ আমি আলাদা করব।

সেই চিৎকার শুনে ভাঁড়ার ঘর থেকে ঠাকুমা পূর্ণশশী ছুটে আসেন। বাবা নেমে আসেন সিঁড়ি দিয়ে। বিন্তি পিসিমা পান সাজা ফেলে ছুটে আসে কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে।

প্রদীপ কেঁদে ফেলেছে ভয়ে। দাদাটা যেন কী? ব্যথা কি তার লাগছে না! ছবির সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে লজ্জায়, কান ধরার অপমানে। সে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে সহ্য করে সেই চিমটি-কাটা যন্ত্রণাটা, উদ্ধত ভঙ্গিতে। কেবল যখন দেখতে পায় মাও রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে বেরিয়ে এসেছে, ঘোমটাটা একটু টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার আড়ালে, তখন আর চোখদুটো সামনে তুলে রাখা যায় না, নামিয়ে ফেলতে হয় মাটির দিকে।

ব্যাপারটা কয়েকটা মুহূর্তের কিন্তু ছবির মনে হতে থাকে সে যেন অনন্তকাল ধরে দাদুর হাতের মধ্যে ধরা তার লাল হয়ে যাওয়া কানটা নিয়ে শূন্যে ঝুলে আছে।

হঠাৎ ঠাকুমা প্রায় ছুটে আসেন। দুজনকেই দাদুর হাত থেকে মুক্ত করে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ঝংকার দিয়ে ওঠেন, ছাড় ছাড়। এমনি বকতে হয় বক, গায়ে-টায়ে হাত তোলা কেন? মেয়েছেলের গায়ে হাত দেয় কখনও? হলই বা ছোটো!

বাবা কোথা থেকে খুঁজে একগাছা কঞ্চি জোগাড় করে পূর্ণশশীর হাত থেকে প্রদীপকে কান ধরে সরিয়ে নিয়ে এসে বলেন, হতভাগা, পড়া নেই শোনা নেই, এত বেলা পর্যন্ত কোথায় পুলিশ, কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে! কাকা তোমাকে রাজা করে দিয়ে গেছে তো! পাজি নচ্ছার! চাপা স্বরে কথাটা বলে একবার তাকান হরিনন্দনের ঘরের দিকে। সেদিকে একটা মুখকেও উঁকি মারতে দেখা যায় না।

সরু কঞ্চিটা বাতাসে একবার নেচে ওঠে। বাবার রাগকে জানে প্রদীপ। অন্তত এক ঘা না মেরে তা শান্ত হবে না। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে যায়। সে জলে ডোবার আগে কিছু একটা আঁকড়ে ধরার মতো করে কাঁপা গলায় বলে ওঠে, আমি কি একা গিয়েছি? ছবিও তো ছিল।

পূর্ণশশী এতক্ষণ ভারি করুণ চোখে তাকিয়েছিলেন সেই উদ্যত বেতের দিকে। এবার সাহস করে এগিয়ে গিয়ে বেত চেপে ধরে প্রদীপকে একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, ওই দ্যাখ, আমি জানি যে ছেলের কোনও দোষ নেই। ওই মেয়েই তো ওকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, নইলে ওর সাধ্যি কী পুলিশের সামনে যায়। উনি কত ভয় দেখান, কত বোঝান— অধীরের কাছে বোমা-পিস্তল থাকে, ওরা মানুষ মারে, যেতে নেই। তা কি শোনার জো আছে? মেয়ে দিনরাত কানে মন্ত্র দিচ্ছে, দাদা চল, কাকা ডাকছে, কাকা গল্প বলবে।

ছবির দিকে একবার ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে বলেন, মেয়ে নয়তো যেন

সিংহবাহিনী, দিনরাত ছেলেদের সঙ্গে হুই-হুই করে বেড়াচ্ছে। এ বাড়ির আরও তো মেয়েরা ছিল, আছে। এমন কাউকে দেখিনি। বেত তুমি ছেলের গায়ে তুলতে পারলে কুলদা, কিন্তু ওঠাও তো দেখি মেয়ের দিকে। যত জুলুম তম্বি তোমার সোনার চাঁদ ছেলেদের ওপর। মনের সমস্ত জ্বালাটুকু উজাড় করে দিয়ে প্রদীপের হাত ধরে বেরিয়ে যেতে যেতে ঠাকুমা স্নেহমিশ্রিত স্বরে বলেন, চল দাদু, তোমাকে নাড়ু দিইগে। আর যেও না যেখানে-সেখানে। তুমি লেখাপড়া শিখে কত টাকা-পয়সা রোজগার করবে। তোমার কি মেয়েমানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে চলে।

ছবি চোখ তুলে একবার তাকায় ভাইয়ের মুখের দিকে। সে তাকানো দেখে প্রদীপ ঠাকুমার আঁচলে মুখ ঢেকে পালায়।

সবাই চলে গেলে এবার দরজার আড়াল ছেড়ে মা বেরিয়ে এসেছে, আর বাবা তখনও দাঁড়িয়ে আছে কঞ্চিখানা হাতে করে। রেগে আছে তা বোঝা যায়, কিন্তু মারছে না তাকে। কেন মারছে না? অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে মারা ভালো। এ নিস্তব্ধতা ছবির ভালো লাগে না।

হঠাৎ টের পায় পেছন থেকে কে যেন তার চুলের গোছা চেপে ধরেছে। ব্যথা পায় তবু বুঝতে পারে মায়ের হাত সেটা।

মমতা তাঁর হাতের খুন্তি দিয়েই পিঠের ওপর দু-ঘা বসিয়ে দিয়ে চাপা চাপা গলায় বলেন, হতভাগা মেয়ে, দিনরাত তোর জন্যে আমাকে ঘরে-বাইরে কথা শুনতে হবে কেন? আর আমার সহ্য হয় না।

কুলদার দিকে চোখ পড়তেই মমতা আরও জ্বলে ওঠেন, বলেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন হাত নামিয়ে। পিটুনি দিয়ে ওঁদের খুশি করতে পারলে না? তাহলে তো ওঁদের শান্তি হত— আমারও হত।

নিজেরই কেমন গলা ভারি হয়ে ওঠে কথা বলতে বলতে, সজল হয়ে ওঠে চোখ। হাত ধরে হিড়-হিড় করে ছবিকে উঠোন থেকে রোয়াকে এনে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, সাতটা না, পাঁচটা না, একটা মাত্র মেয়ে আমার। তাকে একটু ভালো খাওয়াতে পারিনে, ভালো একটা জামা দিতে পারিনে, অথচ আমি নাকি জমিদারের ছেলের বউ। দোষের মধ্যে মেয়েটাকে একটু বাইরে বেরোতে দিই, ঘরে আটকে রেখে পাকা করিনে, এই তো আমার অপরাধ? আজ থেকে আর তাও দেব না।

তাকে এমন করে টেনে সিঁড়ি দিয়ে তোলেন যেন সে একটা যন্ত্র। মার খুন্তির বাড়ি পিঠে বেশ ভালো করেই লেগেছে, কানটা জ্বলে যাচ্ছে এখনও। কিছুই যেন ভালো করে অনুভব করা যাচ্ছে না। ছবির চোখে যেন সকালের ঝলমলে আলোটা নিভে গেছে।

কাকাকে যে অমন করে বেঁধে নিয়ে গেল, কেউ কিছু বলল না। কাকার বাবা-মা ছাড়া আর কারুর কষ্ট পর্যন্ত হল না। সে-যন্ত্রণাটা জমা ছিল। শশীকে

বিনা কারণে মার খেতে দেখে আর এক ধরনের জ্বালা জমা হয়েছিল মনের মধ্যে। তারপর প্রদীপকে ঠাকুমার কথায় সায় দিয়ে ভালো ছেলের মতো চলে যেতে দেখে অভিমানে মনটা ভরে উঠেছিল, কিন্তু মার কাছে হঠাৎ মার খাওয়া তার সব কষ্টকে ছাপিয়ে উঠেছে। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা যেন তার বুকের পাঁজর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। সে হঠাৎ এতক্ষণে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

মমতা একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন। তারপর নিজেরও দু-চোখ ভরা জল নিয়ে দু-হাতে তাকে কাছে টেনে নেন, ইস্ বড্ড লেগেছে! দেখি। কেন তুই অমন করে আমার মাথা গরম করে দিস বল তো। অন্য মেয়েরা কেমন ঘরে থাকে, কাজ করে আর তুই দিনরাত হই-হই করে ঘুরবি— বলবে না লোকে! অধীরকে নিয়ে গেল, সবাই দূরে দাঁড়িয়ে দেখল। পল্টু, মন্টু সবাই। আর তোরা দুটোতে কোন সাহসে অতদূর গেলি?

ছবি দু-হাতে মাকে আঁকড়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে আর তার ভাঙা-ভাঙা গলা থেকে শোনা যায়, কাকাকে ওরা লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেল। কেউ কিছু বলল না— কেন?

পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে মমতা খানিকটা ভেবে নিয়ে বলেন, বলবে কী! অত সাহস কার আছে? ওদের যে কামান-বন্দুক আছে। সবই তো ওদের। দেশটাই যে আমাদের নয়।

এত কথা বলতে পাবেন মমতা বোধ হয় নিজেই জানতেন না। তাঁরও মনের কোণে সকাল থেকে একটা কান্নার সুর বাজছিল সেটা এতক্ষণ পরে ছবির পিঠে হাত বোলাতে গিয়ে, কথা বলতে গিয়ে জল হয়ে ঝরে পড়ে। কেন তা তিনি বুঝি নিজেও জানেন না।

এবার ছবি মুখ তোলে। হাতের তালু দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে বুঝি একটু হাসবাব চেষ্টা করেন ম্লানভাবে, অধীরকাকারাও তো তাই বলে, কেন? বলে, আমাদের দেশ আমাদের হবে, সেইজন্যেই তো ওদের ওপর এত রাগ ইংরেজদের। দেশের লোকও এত ভীতু, বন্দুক দেখে ভয় পায়। স্বদেশিদের দূর দূর করে। অথচ এমন সোনার টুকরোর মতো ছেলে অধীর, ধীরেন, প্রসন্ন...।

ছবি বলে, অনেক লেখাপড়া শিখলে কি তবে অধীরকা, ধীরেনকাদের মতো সাহসী হওয়া যায় মা? আমিও তবে অনেক লেখাপড়া শিখব।

মমতার মুখের ওপর দিয়ে নিমেষে আশা-নিরাশার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের যে লুকোচুরি খেলাটা হয়ে যায় তা বুঝবার ক্ষমতা ছবির নেই। মৃদুকণ্ঠে, আপনমনে বলা মায়ের কথাগুলোই কেবল ছবির কানে যায়. মেয়ে হয়ে জন্মেছ এই সংসারে. জানিনে কী হবে। হয়তো পারতাম, হয়তো! যদি...।

প্রদীপ এসে দাঁড়িয়েছিল পেছনে, এতক্ষণে তা টের পান মমতা। তখন

অনেক কথা মনে পড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, যাও, দুজনে চান করে এসোগে। তোমার ইস্কুলের বেলা হয়ে গেছে মণি, ছবিরও পাঠশালা আছে। পড়াশোনা তো কিছু করলে না— দেখো আজ কী কপালে আছে দুজনের। আমার রান্না পড়ে রয়েছে— দেখো কাণ্ড, বলতে বলতে ছুটলেন নীচে।

আবার সেই ব্যস্ত মা। ছবির ভালো লাগে না। কেবল কাজ আর কাজ— সারাদিন কাজ। রান্নাঘর। রান্না করা আর খেতে দেওয়া। অত কাজ না করলে কী হয় মানুষের?

মা চলে যেতেই ঘর খালি। প্রদীপ যেন আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর মতো, ছোটোবোনের সামনে দাঁড়ায়।

ছবি চটেছে। সে কথা বলে না। মুখ ফিরিয়ে একদৃষ্টিতে দেখতে থাকে দেওয়ালের কৃষ্ণের ছবি-আঁকা ক্যালেন্ডারখানা।

প্রদীপ পেছন থেকে তার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে অনুতপ্ত গলায় বলে, মা তোকে মেরেছে, না রে ছবু? আমি কী করব? আমার ভাই দোষ নেই।

দোষ নেই!— ছবি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়, তুই অত ভীতু কেন রে দাদা? দাদুর কান ধরাতেই ওমনি কান্না? কেন— আমরা তো আর ঝগড়াও করিনি, মারিওনি কাউকে। কেবল দেখতে গিয়েছিলাম। আর দাদুরা কী? কাকাকে বেঁধে নিয়ে গেল, নিজেরা ঘরে বসে রইলেন। শশী মাঝিকে শুধু শুধু জুতো দিয়ে মারলেন। ওঁদের কোনও দোষ নেই তাতে?



তিন

লম্বা টানা বারান্দায় সুখদার সঙ্গে খেতে বসেছে প্রদীপ, পল্টু, মন্টু। ওরা স্কুলে যাবে। দুপুরবেলায় রোদের মধ্যে দূরের স্কুল থেকে ওদের আসতে দেওয়া হয় না, অন্য ছেলেরাও কেউ আসে না।

আসে ছবি। পাঠশালা কাছে বলে ও খেয়ে যায় না। দুপুরবেলা একটা বিশেষ সময় ঠিক আছে তার, রোদ্দুর দেখে ঠিক করে নেয়। কালী পণ্ডিতের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বই-স্লেট বগলে সে ছুটতে ছুটতে আসে ও-পাড়া থেকে এ-পাড়ায়। রোজ একই সময়ে আসা চাই। কেন? সে-কথা ছবি কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারে না— বলেও না। কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখে বুঝেছে ওই সময়টায় মাকে একা পাওয়া যায়।

সারা বাড়িটা তখন নিঝ্‌ঝুম। উঠোন আর রোয়াক-ভরা রোদে পা রাখা যায় না, পুড়ে পুড়ে যায়। তারই মধ্যিখানে একটা নেড়ি কুকুর রোজ বসে বসে হাঁফায় জিভ বার করে, রোজ। তাকে দেখলেই কুকুরটার লেজ নড়ে, চোখ দুটো চকচক করে ওঠে, কারণ রোজ খেয়ে উঠে ছবি তাকে পাতেব ভাত দেয়।

রান্নাঘরের বড়ো বড়ো উনুনদুটো তখন নিভে যায়। বারান্দাটা ধোওয়া হয়ে কেমন ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে থাকে, তখন ঢুকলে ভালো লাগে। সেই বারান্দার এককোণে মা তার ভাত নিয়ে বসে থাকে, সে না-আসা পর্যন্ত নিজে খায় না। কাকিমাকে জোর করে খাইয়ে দেয়।

মেয়েটা যা পাজি! সবাইয়ের সঙ্গে খেতে বসালে মমতারই লজ্জা। মাছ ডিমের ছোটো-বড়ো নিয়ে চেঁচামেচি করে। কিছু বোঝে না— বোঝালেও বোঝে না। সেজন্য তিনিই ইচ্ছে করে এ-ব্যবস্থা করেছেন। কাউকে না জানিয়ে ওর পছন্দমতো তরকারি রেখে দেন বেশি করে, বড়ো মাছ রেখে দেন।

যেমন জেদি আর উদ্ধত সব ব্যাপারে, তেমনি খাওয়ার ব্যাপারেও। তা নিয়ে ওর কোনও লজ্জা পর্যন্ত নেই। এ যেন মেয়েই না।

ওর চেয়ে প্রদীপ অনেক ভালো। শান্ত, ভীতু ভীতু। এ মেয়েকে নিয়ে তার কী যে জ্বালা!

কিন্তু শুধু কি তাই? শুধুই পাঁচজনের সঙ্গে খেতে বসে ভাগের কমবেশি নিয়ে চেঁচিয়ে তাকে লজ্জা দেবে এটাই কী সব!

নিস্তব্ধ দুপুরটায় যখন কেউ ঘুমোয়, কেউ কাজ করে বসে, তখন এই লম্বা বারান্দাটার এককোণে মা-মেয়ে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে এক হয়ে যায় যে তার সুর সারাক্ষণ ধরে বাজতে থাকে মমতার মনে।

ঝাঁটার কাঠির মতো সোজা সোজা একরাশ চুল মেয়ের মাথায়, লাল লাল। হাজার তেল মাখাও, যে কে সেই! সেই রুক্ষ চুলের গোছা থেকে চুল উড়ে মেয়ের চোখে পড়ে, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে থাকে রোদে লাল হয়ে-যাওয়া মুখে। সযত্নে মুছিয়ে দেন মমতা।

প্রদীপ তাঁর ছেলে, তাকেও ভালোবাসেন প্রাণের মতো, কিন্তু ছবির জন্য কী যেন ব্যথা আছে— কিসের সে-ব্যথা তা বুঝি মমতা নিজেও বোঝেন না। প্রদীপ তো ছেলে, এ-বাড়ির সবায়ের সতর্ক দৃষ্টি তার ওপর। ছেলের দাবিতে সে সব পায়। চেয়েও পায়, না-চেয়েও পায়। মেয়েটাও তেমনি করে পেতে চায়। তারও সব চাই, সবায়ের মতো করে চাই। অতটুকু মেয়ে সেফু যা নিজে বোঝে, ওকে তা বুঝিয়ে দিতে হয়।

মমতা নিজে তাই ওকে আগলে বেড়ান। এই সময় ওকে কাছে নিয়ে খাওয়ান, ভালোটুকু, বড়োটুকু। ভালো হবার জন্য, শান্ত হবার জন্য অনুরোধ করেন। মেয়ে খিদের মুখে গোগ্রাসে খায় আর খুব শান্ত হয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। তারপরেই আবার ভুলে গিয়ে যে কে সেই।

আজও তেমনি বসে আছেন, ভাতের থালা সামনে নিয়ে। বসে থাকতে থাকতে চমকে উঠেছেন প্রতিটি পায়ের শব্দে। কিন্তু এল না।

নিজের পেটের ভেতরটাও জ্বলে যাচ্ছে খিদেয়। রোজকার মতো আজও নেড়ি কুকুরটা বসে বসে হাঁফাচ্ছে জিভ বার করে।

লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! বিকেলে এসেই খাই-খাই করে পাগল করে দেবে..., বিড়বিড় করতে করতে নিজে খেতে বসেন, কিন্তু কতবার খেতে-খেতে হাত গুটিয়ে নেন। শেষে ছবির ভাত ঢেকে রেখে দরজায় শেকল দিয়ে আসেন বটে কিন্তু মনটা ভার হয়ে থাকে।

কারণ ছিল না আসার।

পাঠশালায় ঢুকে রোজকার মতো আজও ছেলেমেয়েরা যে যার জায়গা নিয়ে বসেছিল। কেবল কালী পণ্ডিতের লোহার চেয়ারখানা খালি, তিনপায়া কোণা-ভাঙা

টেবিলটার ওপর বেতখানা তেমনি শোয়ানো। শান-বাঁধানো জায়গাটায় কতকগুলো লম্বা কাঠের বাক্স উপুড় করে পাতা। তারই একখানায় বসে পাঠশালার পাঁচটা মেয়ে—ছবি, উমা, দুর্গা, বাসন্তী আর সুরমা।

আজ ছবি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে সে মন দিয়ে পড়াশোনা করবে— বড়ো হবে। অনেক বড়ো— অধীরকার মতো বড়ো, অত সাহসী! ধরে-বেঁধে নিয়ে গেলেও ভয় পাবে না।

সে এতক্ষণ বন্ধুদের শোনাচ্ছিল অধীরকাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কাহিনি। বলতে বলতে কখন তার মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে, চোখ ছলছলে হয়ে উঠেছে। সঙ্গিনীরা তার কথা শুনছে কি না লক্ষও করছে না। তার নিজের মুখটা কখনও রাগে, কখনও দুঃখে বেঁকেচুরে এক একসময় এক একরকম হয়ে যেতে থাকে।

হঠাৎ কখন একসময় খেয়াল হয়, এক দুর্গা আর তিনদিন ধরে আড়ি-দেওয়া শ্যামল ছাড়া কেউ শোনেনি তার কথা। ছবি এদিকে মুখ ফেরাতেই শ্যামলও উঠে চলে গেছে। যাক্ গে! বড়ো হিংসুক শ্যামল। অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলতে দেবে না সে ছবিকে, খেলতে দেবে না, ওমনি রেগে যাবে। ছবি কি একলা শ্যামলের নাকি! নিজে আড়ি দিয়ে আবার চুপি-চুপি কথা শুনতে আসাই বা কেন তবে। এসে আবার পালিয়েই-বা যাওয়া কেন? যাক্ গে। অন্যেরা ইশারা করছে, হাসাহাসি করছে। শেষে উমা যেন তাকে জোর করে চুপ করানোর জন্যই বলে, জানি! আজ হারান ঠাকুরের ভাগ্নির ভাব দেখেই তা বুঝেছি। পুলিশ এসেছে তো এসেছে! তাতে তার কি বাবা। সবাই তো জানে! সকালবেলা আমাদের বাড়ি এসে বলছে কী— উমা, তুই একবার ছবিদের বাড়ি যেতে পারিস? তোকে দুটো ডাব খাওয়াব।

গেলি তো তুই ডাবের লোভে? —বাসন্তী বলে।

আমি যাব? মা তাহলে চুলের মুঠি ছিঁড়ে দিত না? শেষে ওদের দিকের ঘাটে চান করতে গিয়ে দেখি, মায়াদি বাসন মাজতে মাজতে কাঁদছে। আমাকে বলল, ছবিকে একবার আসতে বলবি? তোর কাছে বুঝি চিঠিপত্তর কিছু আছে অধীরদার?

ছবি অবাক হয়ে বলে, কই না তো? তোরা হাসছিস কেন ভাই? কেউ কাঁদলে সেজন্য বুঝি হাসতে হয়? মায়াদি কেঁদেছে কাকার জন্যে— সত্যি সত্যি দেখেছিস? ছবি উমার কাছে ঘেঁষে আসে।

আহা, কাঁদবে না? —শাড়ি-পরা অকালপক্ক মেয়ে তিনটে মুখ টিপে টিপে হাসে তার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে।

ওরা তিনজনে ফিশফিশ করে সারাক্ষণ; হাসাহাসি, কানাকানি আছেই। পাঠশালার বন্ধু তাই, নইলে ওদের একটুও ভালো লাগে না। ওদের চারজনের মধ্যে দুর্গাটাই যা কেবল ভালো।

উমা, বাসন্তীদের নাকি আর পড়া হবে না, পাঠশালায় আসা বন্ধ হয়ে যাবে। ওরা নাকি বড়ো হয়ে গেছে। তাই বুঝি ওরা যখন-তখন ইচ্ছে করে করে গায়ের ওপর কাপড় টেনে দেয়। যেন বিন্তিপিসির মতো বড়ো হয়ে গেছে এমনি ভাব।

ছবিরও তো ইচ্ছে করে শাড়ি পরতে। কিন্তু মা এখন দেবে না। তাহলে সেও ওদের মতো বড়ো হতে পারত।

কালী পণ্ডিত এসে ঢুকতেই একমুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে যায় সমস্বর চেঁচামেচি। শুধু পাঠশালার পণ্ডিত নয়, খড়ের চাল-দেওয়া, উই-খাওয়া, ঘুন-লাগা বাঁশের খুঁটি-দেওয়া পোস্টাপিসটার পোস্টমাস্টারও তিনি। সে-কাজ সেরে আসতে আসতে বেশ বেলা হয়ে গেলেও ছেলেমেয়েরা তার অনেক আগে থেকেই এসে বসে থাকে। ইচ্ছে মতো চেঁচায়, ঝগড়া করে— মারামারিও।

কালী এসেই বেতগাছটা টেবিলের ওপর সশব্দে বাড়ি মেরে হুংকার দিয়ে ওঠেন, নামতা পড়। সবাই পড়বি। কেউ চুপ করে থাকবিনে কিন্তু।

ছেলেমেয়েরা তখনই সমস্বরে সুর ধরে— তিন দশে তিরিশ, চার দশে চল্লিশ, পাঁচ দশে...।

ছবি দেখে সেই একটানা সুরের মধ্যেই উমা আর বাসন্তী তখনও ফিশফিশ কবছে, মায়াদির নামটাও দু-একবার কানে আসে।

সে বলে, উমা! বলে দেব কিন্তু পণ্ডিতমশাইকে।

পাশ থেকে ঝগড়াটে গলায় বাসন্তী বলে, বলে দিবি তো বয়ে গেল। তুই বিদ্বেন হবি, পড়গে যা। আমাদের কী? আর ক'দিন বাদে আমরা পাঠশালাতেই তো আসব না।

তবে অধীরকার আর মায়াদিব নাম করে তোরা হাসতে পাবিনে।

ইস্, মুখের বিকৃত ভঙ্গি করে উমা উত্তর দেয়, হাসব। আমাদের ইচ্ছে। সবাই জানে মায়াদির কিত্তি। বুড়ো মেয়ে হয়ে মামিমার কাছে মার খায় কেন জানিস?

জানবার জন্য ছবির কোনও আগ্রহ হয় না। আহত অভিমানে সে চুপ কবে থাকে আর টুকরো টুকরো কথা তার মনের মধ্যে ভেসে বেড়ায় এলোমেলো হয়ে, অত বড়ো মেয়ে মায়াদি। শান্ত ভালোমানুষ। মার খায়! কেন?

নামতা পড়ার পর হাতের লেখা। সবাইকে দু-পাতা হাতের লেখা লিখতে দিয়ে এ সময় কালী পণ্ডিতের ঘুমোনোর সময়। একটিপ নস্যি নিয়ে মাথাটা আলগোছে চেয়ারের ওপর ছেড়ে দিয়ে খানিক নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে থাকতে একসময় কখন মাথাটা ঝুলে পড়ে চেয়ার ছেড়ে, নাক ডাকতে থাকে। ছেলেরা সেই সুযোগে কথা বলে, গুঞ্জন ক্রমে শব্দে পরিণত হয়। সে-শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছলে তবে পণ্ডিতের ঘুম ভাঙে। ধড়ফড় করে উঠে বসে হুংকার ছাড়লে তবে আবার পাঠশালা চুপ হয়ে যায়— এমনি ঘটে রোজ।

হাতের লেখা দেখাতে এসে কেউ বেতের বাড়ি খায়, গাঁট্টা খেয়ে কপালে ফুলে ওঠে কারোর, কারোর চিমটি খেয়ে চোখের জল পড়ে। ভুল বানান বলে পড়া না পেরে কেউ নীলডাউন হয়ে থাকে, কারোর মাথায় ইট চাপিয়ে বসিয়ে রাখা হয়।

এসব পাঠশালা করার মতোই একটা নৈমিত্তিক কাজ মাত্র। পাঠশালার কোন

ছেলেটা ভালো, কোনটা খারাপ সে উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার তিনি আজ পর্যন্ত করে দেখেননি। পড়া করছে না, পড়া পারছে না— ভবিষ্যৎ খারাপ হবে এসব কথা ভেবে শাস্তি তিনি দেন না। পড়া না পারলে শাস্তি পেতে হবে এটাই শুধু জানা কথা।

তিনি জানেন, এ পাঠশালায় ছেলেগুলোর পড়ার মেয়াদ বছর দুই-তিন, মেয়েদের হয়তো বছর খানেক।

কোনওমতে নামটা বানান করে লিখতে পারলেই মেয়েগুলোর পাঠশালার পড়া শেষ। তারপর ঘর-সংসারের কাজ করবে, ভাই-বোন রাখতে রাখতে ক্রমে নিজেরাও বিয়ের বয়সি হয়ে উঠবে। যাব ভাগ্য ভালো তার বিয়েটা হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি, যে মেয়ের হবে না সে ধুমসি হয়ে ঘরে বসে থাকবে। মুখে বয়সের ছাপের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে মোছা চোখের জল লেগে থাকবে।

কিন্তু কোনও মেয়েকে তো আজ পর্যন্ত পড়ে থাকতেও দেখলেন না কালী পণ্ডিত। সেই ধুমসি, কালো, সারা মুখে ব্রনের দাগওয়ালা মেয়েটারও একদিন হঠাৎ বিয়ে হয়। পালকি চড়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কেঁদে ভাসায়। এই তো তাঁর পড়ানোর দাম!

আর ছেলেগুলো? তাদেব কোনওমতে ইস্কুলের নিচু ক্লাসের উপযুক্ত করতে পারলেই হল। তার জন্য যতখানি ইচ্ছে বেত মারা যাবে। মাথা ফাটলে কিংবা হাত ভাঙলেও খুব ক্ষতি হবে না।

ছেলেগুলোর সবাই যে আবার ইস্কুলে ভর্তিই হবে এমন কোনও কথা নেই। এতদিন পাঠশালাটা চালাবার পর একটা অভিজ্ঞতা পণ্ডিতের হয়েছে... পড়াশোনাটা ভদ্রলোকদেরই। চাঁড়াল, কামার, কুমোরদের যে গোটাকয়েক ছেলে বছরে বছরে এককোণে বসে পড়ে যায়, পাঠশালা ছাড়বার পর তাদেব মধ্যে একটা কি দুটো ছাড়া কেউ আর ইস্কুলে ভর্তি হয়নি। ওদের অবস্থাও মেয়েগুলোর মতো। বানান কবে নামটা লিখতে শিখলেই হল। তারপর কেউ হাঁড়ি গড়ে, রুপো-লোহার দোকান সাজিয়ে বসে গঞ্জে, কেউ ক্ষেতে লাঙল দেয়।

এসবই তাঁর দেখা— দেখে দেখে চুল পেকে গেছে। তাঁর পাঠশালায় পড়া ভদ্রলোকদের ছেলেদের মধ্যে দু-একজন অনেক বড়ো হয়েছে। তারা পাঠশালা ছেড়ে ইস্কুলে গেছে, ইস্কুল ছেড়ে কলেজে, কলেজ ছেড়ে আরও ওপরে— ততখানি উঁচুর কথা ভেবে কালীর চিন্তা থই পায় না। তারপর তারা নাম করেছে, যশ করেছে। কিন্তু কালী পণ্ডিতের আব কোনও চিহ্ন থাকেনি কোথাও। গ্রামে এলে তারা দেখা করা তো দূরের কথা, দেখা হলেও কথা বলতে ভুলে যায়।

তাঁর জন্য না হোক, তাঁব পাঠশালাটার জন্যও কারোর মাথাব্যথা নেই। ছেলেমেয়েদের দেওয়া দু-আনা, চার আনা, আর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ন-মাসে ছ-মাসে ছুঁড়ে দেওয়া সাত টাকা আট আনার হিসেব ধরলে তাঁর মাসিক আয় পনেরো টাকা।

সে টাকায় সংসার চলে না বলে অনেক হাতে-পায়ে ধরে গ্রামের পোস্টমাস্টারিটা পণ্ডিত পেয়েছেন। কিন্তু ভালো লাগে না।

টাকার জন্য পণ্ডিতের দুঃখ নেই— বুনো রামনাথের গল্প তাঁর জানা আছে। ছেলেদের কতদিন সে-গল্প শুনিয়েছেন।

কিন্তু শোনালে কী হবে! সে শ্রদ্ধা নেই, সম্মান নেই! ছেলেগুলো যতদিন পাঠশালায় পড়ে, হয়তো শাস্তির ভয়ে চুপ করে থাকে। কিন্তু পাঠশালা ছেড়ে, যখন সদ্য গোঁফের রেখা-দেওয়া মুখে এক ক্লাস ডিঙিয়ে আর-এক ক্লাসে উঠতে থাকে তখন কেমন করে যেন কালীকে অশ্রদ্ধা দেখানোর একটা অধিকার ওরা তৈরি করে নেয়। তখন আর পণ্ডিতমশাই বলে না, বাবা-কাকাদের দেখাদেখি বলে 'মাস্টার'।

সে-ডাক পোস্টাপিসের মাস্টারির জন্য।

তাঁর ট্যারা চোখ নিয়ে হাসাহাসি করে। খোঁড়া পা নিয়ে— এমনকী পড়ানো নিয়েও। কেউ দাম দিতে চায় না।

কেবল একজনের কাছ থেকে দাম পেয়েছেন। খুশিতে কালী পণ্ডিতের ইচ্ছে হয়েছে সে-কথা সবাইকে ডেকে শোনাতে, কিন্তু কী ভেবে আবার থেমে গেছেন। এমনকী নিজের বউকে পর্যন্ত বলেননি সে-মানুষটার কথা। তিনি ছবির মা— মমতা।

ব্যাপারটা সামান্যই।

একদিন কালীকে ডেকে পাঠিয়ে মমতা বলেছিলেন, কালী ঠাকুরপো, ছেলেটাকে তার বাবা-কাকারা নিয়মমতো পড়াবে তা তুমি জানো। কিন্তু আমার ছবুটার ওই পাঠশালা পর্যন্তই। যতদিন পার, তোমার যতখানি বিদ্যে আছে সব দিয়ে ওকে শেখাও ভাই। তারপর যা থাকে ওর ভাগ্যে।

হয়তো সে-কথা বলতে গিয়ে মমতার গলা ধরে এসেছিল, চোখ মুছেছিলেন আঁচলে, কিন্তু কালী একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন।

ইচ্ছে হয়েছিল অনেক কথা বলবার, যা তিনি ভাবেন, কিন্তু বলেন না।

তবুও সব বলা না গেলেও অভিভূত কালী গলা পরিষ্কার করে শুধু বলেছিলেন, দেখব, আমি ছবুকে দেখব। এমন মা যার সে মেয়ের ভাগ্য ভালোই হবে— আমি বলছি, ভালো ভাগ্য হবে ছবির।

মমতা বলেছিলেন, ভালো ভাগ্য মানে তো বিয়ে? সে তো মেয়েদের আছেই।

একমাত্র ভাগ্য বিয়ে নয়। কী তবে বলতে চায় ঘোমটা-টানা রায়বাড়ির এই বউ। কোন স্পর্ধায় বলতে চায় বিয়ে নয়— অন্য কিছু! অন্য ভাগ্য।

ভারি আশ্চর্য আর নতুন লেগেছিল মানুষটাকে। ভারি খুশি হয়েছিলেন তিনি। সে খুশি মমতার দেওয়া টাকাকটার জন্য নয়, নতুন শোনা কথাটার জন্য।

কিন্তু নিঃশব্দে বেরিয়ে যাওয়া হয়নি। পূর্ণশশী এসে সামনে দাঁড়িয়ে হেসেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, বড়ো বউমা ডেকেছিলেন মেয়ের পড়াশোনার খোঁজ নিতে বুঝি?

কালীর উত্তর দেবার কিছু ছিল না।

পূর্ণশশী অবশ্য নিজের মনেই বলেছিলেন, মেয়েকে একেবারে জজ ম্যাজিস্টর করবেন মায়ে। নয় পেরিয়ে দশে পড়বে, আর পাঠাশালায় রাখতে দিলে তো কত্তা। বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি গেলে কোথায় যাবে লেখাপড়া? তখন হাঁড়ি ঠেলে, ছেলে

মানুষ করেই কূল পাবে না। মেয়েমানুষের কপাল!

প্রতিবাদ করে কী হবে— সে ভবিষ্যতের কথা কালীও ভাবেননি। কিন্তু সেদিন থেকেই তাঁর গলায় স্নেহের সুর লেগেছে ছবির জন্য।

আজও পড়া দেওয়া শেষ হলে যথারীতি বলে ছবি, খেতে যাব পণ্ডিতমশাই?

কালী বলেন, যা, বেশি দেরি করিসনে। এসে ভূগোল পড়া আর শ্রুতিলিখন দিবি।

বই-স্লেট নিয়ে বাড়িমুখো প্রায় খানিকটা ছুটে চলে ছবি। হঠাৎ দাঁড়ায় একেবারে পেছন ফিরে, মায়াদির কাছে যেতে হবে যে।

বাড়ি যাওয়া হয় না। আবার উলটোমুখো হাঁটতে শুরু করে সে। প্রায় দৌড়োনোর মতো করে হাঁটে। ভয়ও করে একটু একটু। পাঠশালার ছেলেমেয়েরা কিংবা বড়োরা যদি কেউ দেখে ফেলে যে সে ঠিক দুপুরবেলায় রোদের মধ্যে চলেছে ভট্চায্যি পাড়ার দিকে, তবে বকুনি খেতে খেতে তার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে বাবা! তাদের খিড়কির পুকুরের ঘাটে দাঁড়ালেই মায়াদিকে দেখে কথা বলা যায়, কিন্তু পাড়া ঘুরে যাওয়া— ক-তখানি হাঁটতে হবে তাকে!

খানিকটা দৌড়ে গিয়ে ফুটবল খেলার মাঠটার মধ্যে থেকে ছবি এবার আস্তে আস্তে হাঁটে। অনেকদূর চলে এসেছে সে— এবার আর কেউ দেখতে পাবে না তাকে। কেবল সামনের আমবাগানটা পার হতে পারলেই হয়ে গেল। কিন্তু এইবার তার বুক ঢিপঢিপ করে— ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা। কেউ কোথাও নেই। যদি কিছু হয়! যদি ধাঁই করে একটা ইট এসে তার মাথায় লাগে।

ভেবে একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে যায় সে। ভয়ে মাটির সঙ্গে পা দুটো যেন আটকে থাকে তার, তারপরই হঠাৎ সমস্ত শক্তি একত্র করে দৌড়োয়— ছুট্, ছুট্।

রঘু ভট্চায্যির বাড়ি ঢোকার সময় আবার পায়ের শব্দটা থামিয়ে নিঃশব্দ হয়ে যেতে হয়। উঠোনে বাঁশের ওপর ছেঁড়া ঝুলিঝুলি একটা বিবর্ণ তোশক ঝুলছে। কেবল ওটা দেখেই ছবির কেমন করে যেন মনে হয়— ওবা গরিব। খু-ব গরিব।

রায়দের বাঁধা পুরোহিত মায়াদির মামা এই ভট্চায্যি ঠাকুর। তাদের নিত্যসেবা নারায়ণের পূজারি। তা ছাড়া গ্রামের এ-বাড়ি, সে-বাড়িও পুজো করে বেড়ায়। নৈবিদ্যির চালে তার ভাতের অভাব হয়নি এ পর্যন্ত, কিন্তু শুধু ওই ভাতই— মুড়কি আর চিঁড়েও অবশ্য জোটে কোনও কোনও পুজোয়। কিন্তু হলে কী হবে? ছেলেমেয়ে একপাল। দিনরাত হাউমাউ, খাই-খাই। এ-সংসারের অভাব কোনওদিন যাবে না।

এসব মায়াদির কথা। ছবির মার কাছে একদিন গল্প করে গেছে মায়াদি সত্যনারায়ণের প্রসাদ খেতে এসে।

মায়াদির মা-বাবা কেউ নেই। মামার বাড়িতে থাকতে হয়। দিনরাত খাটে— রান্না করে, বাটনা বাটে, জল টানে, বাসন মাজে আর ছেলে রাখে। কিন্তু তবু হাসে। তাকে বা মণিদাকে ও-ঘাটে দেখলেই ওমনি মায়াদির ফরসা মুখটা হাসিতে ভরে

ওঠে। ওদের ঘাট থেকে লাল ফুল তুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়— কোনওটা আসে, কোনওটা আসে না।

অত সকালেই ওই পচা জলে নেমে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে দিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দু-একদিন অধীরকার কথাও জিজ্ঞেস করেছে।

কিন্তু মায়াদি কাঁদে কেন? মাসিমার কাছে মার খায় কেন?

সেইজন্যই তো খিদে ভুলে ছুটে এসেছে সে দুপুর রোদ্দুরে, সব কথা জেনে নেবে বলে।

খান তিনেক টিনের ঘরের একখানায় একদল ছেলেমেয়ে হুড়োহুড়ি করছে। পাশের ঘরটায় মায়াদির মামিমা ঘুমোচ্ছেন। তাঁর কাছ দুটো ছেলেমেয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে আছে ছেঁড়া মাদুরে।

সবচেয়ে শেষের অন্ধকার ঘরখানা মায়াদির, সে-কথা জানা আছে।

কাত হয়ে শুয়ে একটা ছোটো ন্যাংটো ছেলেকে মেঝেয় ফেলে চাপড়াচ্ছে মায়াদি।

ভ্যাপসা গন্ধ বার হচ্ছে ঘর থেকে। ছোটো জানলাটা আছে বটে কিন্তু আলো আসে না। ঘরটায় একপাশে নৈবিদ্যির ভিজে চাল শুকিয়ে জমা করা থাকে, গাছ থেকে পাড়া ও পুজোয় পাওয়া নারকেল থাকে। আঃ। একপাশে আছে একটা মস্ত কাঠের সিন্দুক, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে তিন-চারটে মুখ-বাঁধা বস্তা। সারা ঘরটায় ছেঁড়া তোশকের তুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। মাটিতে পাতা তোশকটা ছোটো ছেলেব পেচ্ছাপের গন্ধে ভরা।

পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে ছবিকে দেখে উঠে বসে মায়া। দুজনে দুজনের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে খানিক। উঠে বসেও এতক্ষণ ধরে যে হাতখানা দিয়ে আধ-ঘুমন্ত ছেলেটাকে একটানা চাপড়ে চলেছিল, সেটা কখন একসময় বন্ধ হয়ে গেছে। সেই হাতখানা দিয়ে ছবির হাতখানা টেনে নিয়ে মায়াই প্রথম কথা বলে। তার ঠোঁট কাঁপে, ছবু, যাবার সময় তুই দেখেছিস?

হ্যাঁ।

কী যেন প্রত্যাশা করে মায়া ছবির মুখের দিকে তাকায়, তারপর আবাব বলে, কিছু বলেছে? আমাকে বলবার জন্যে কিছু বলে দেয়নি তোকে?

ছবি নিঃশব্দে মাথা নাড়ে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মায়াকে মাথা নিচু করতে দেখে ছবি বোঝে মায়াদির খুব কষ্ট হয়েছে তার কথা শুনে। কিন্তু সে কী করবে! মিথ্যে কথা তো আর বলতে পারবে না।

কাকাটা যেন কী! কষ্ট হতে থাকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে। কিছু বলে গেল না কেন অধীরকা?

একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত সে জিজ্ঞেস করে বসে, তুমি অধীরকার জন্যে কেঁদেছ মায়াদি? তোমার মামিমা তোমাকে মারে?

মুখটা মুহূর্তের মধ্যে কেমন অন্যরকম হয়ে যায়। তীব্র গলায় মায়া বলে, কে বলেছে রে?

উমা আর বাসন্তীরা আজ পাঠশালায় হাসছিল তোমার মার খাওয়ার কথা নিয়ে। কেন মেরেছে মায়াদি?

মায়াদি কেমন অদ্ভুত করে হাসবার চেষ্টা করে। ঠিক হাসি নয়, কান্না পেলে তাকে চেপে রাখতে গেলে যেমন মুখ হয় তেমনি মুখ হয়ে গেছে। সেই মুখ থেকে আস্তে আস্তে একটা কথা বেরিয়ে আসে কেবল, সে তুই বুঝবিনে ছবু।

বুঝবিনে! বড়োদের কেবল ওই এককথা। কী এমন কথা যা ছবি বুঝবে না?

গম্ভীর মুখ নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ছবি একটু বসে থেকে উঠে আসতে যায়। মায়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ, এবার সে ছবির হাত ধরে বসিয়ে বলে, তুই যে এলি এখন— খেতে যাসনি? মুখটা যে শুকিয়ে গেছে, খিদে পায়নি তোর?

তুমি ডেকেছ যে?

তাই বলে না-খেয়ে ছুটেছিস? ইস্! দাঁড়া দেখি তোকে কী দিতে পারি। দাঁড়া একটু দুধ নিয়ে আসি, চিঁড়ে আর গুড় আছে এ ঘরে।

খেতে ভালো লাগে না ছবির। অন্যমনস্ক বিরক্ত হয়ে ঠান্ডা দুধে ভেজানো শক্ত চিঁড়ে মুখে পুরে চিবোয়। খাওয়া হল। সব হল, আসল কথাটার উত্তর পাওয়া গেল না।

মাযাদি তাকিয়ে তাকিয়ে তার খাওয়া দেখে আর ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকায়। খাওয়া শেষ হলে তার হাত থেকে তাড়াতাড়ি খালি বাটি সরিয়ে রাখে ঘরের এককোণে। একটু ইতস্তত করে ছবিকে একহাতে নিজের কাছে সরিয়ে আনে। তার চুলের গোছা সরিয়ে দিতে দিতে আস্তে আস্তে বলে, প্রদীপকে জিজ্ঞেস করিস ছবু। ওকে হয়তো কিছু বলে গেছে।

ছবির দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়া দেখেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না, জেদের মতো করে বলে, করিস না তুই জিজ্ঞেস। আর শোন— দরজার দিকে পা বাড়ানো ছবির হাতখানা যেন সে কিছুতেই ছাড়তে চায় না, অধীরদার কোনও খবর কিংবা চিঠিপত্তর এলেই আমাকে জানিয়ে যাবি, কেমন? যাবি তো ছবু?

মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে বেঁচে যায় ছবি। ঘরটার ভ্যাপসা গন্ধে আর ঠান্ডা দুধ-চিঁড়ে খেয়ে তার পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠেছে। আর না। চলতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়ায় সে। মা হয়তো ভাত নিয়ে বসেই আছে।

কিন্তু মায়াদিও ভালো। ঠান্ডা দুধ! তা কী করবে? ওর মামিমা যা! এই নিয়েই হয়তো বকুনি দেবে।

আবার তেমনি করে বুক ঢিপঢিপ-করা ভয় নিয়ে ছুটে আমবনটা পার হয়। ফুটবল খেলার মাঠটার মধ্যে এই ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে— কে? দূর থেকে তাকে খানিকটা চেনা লাগে, খানিকটা লাগে না। ইস্— ওর সঙ্গে তো

আড়ি, কক্‌খনো ও নয়।

কিন্তু শ্যামলই। সত্যিই সে।

ছবির যেন বিশ্বাস হয় না। শ্যামলের ফরসা ধবধবে মুখটা রোদে লাল হয়ে রয়েছে। কথা বলবার জন্য ঠোঁট কাঁপছে, কিন্তু আড়িটা যে ছবির দেওয়া। ছবি যদি কথা না বলে?

ছবিও ছুটে এসেছে। তারও বুক ঢিপঢিপ করছে, তারও রোদে মুখ লাল, কিন্তু শ্যামলের সেই লাল টকটকে মুখখানা দেখে অতটুকু মেয়ে ছবিরও বুঝতে দেরি লাগে না যে কখন থেকে ছেলেটা শুধু তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তার বুকের ভেতরটায় কেমন করতে থাকে।

সে আড়ি ভোলে, পুরোনো রাগ ভোলে। তারও ঠোঁট কাঁপে, চোখ ছলছল করে। শ্যামলের হাত ধরে প্রথম কথা বলে সে, তোর সঙ্গে আমার আর আড়ি নেই। আজ তার মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে।

তারপর দুজনে সেই আগুনের সমুদ্র পার হয়, কখনও দৌড়ে কখনও হেঁটে।

তাদের দুজনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে ছবির বন্ধুরা আবার হাসে মুখ টিপে। ছবির তা গায়েও লাগে না। সবাই জানে শ্যামলের সঙ্গে যত তার আড়ি, তত তার ভাব। হাসুকগে।

খাবার ছুটির পরে পড়া শুরু হয়ে গেছে। ছবি ভূগোল পড়া দেয়, শ্রুতিলিখন দিতে হয়। আর সারাক্ষণ মনটা তার ভার হয়ে থাকে। শ্যামলকে সে মায়াদির সব কথা বলেছে, কিন্তু শ্যামল কী করে উত্তর দেবে? সে-ও তো ছোটো।

বড়োরা সব অদ্ভুত। সব যেন কেমন। কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না। সবাই তাকে বোকা ভাবে, পড়ার সাথী উমা, বাসন্তীরা পর্যন্ত। ভাবুকগে। একদিন সেও তো বড়ো হবে! তখন সব বুঝবে। সব।

ওদিকে ক্রমে বেলা পড়ে আসে। পাঠশালার ভাঙা লতাপাতা গজানো জানলায় আর সিঁড়ির ধাপে ধাপে লুটিয়ে-পড়া রোদ্দুর আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে মিলিয়ে আসতে থাকে। ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে সারাদিনের চকচকে রং। ছেলেমেয়েরা সেই বাইরের দিকে তৃষিত চোখে তাকিয়ে থাকে। পাঠশালায় ঘড়ি নেই। ঘণ্টা, মিনিটের সময় ওরা গুনতে জানে না। কিন্তু বাইরের রোদের রং বদলানোকে ভালোভাবে চেনে। রোজ একই সময়ে কখন আপনা থেকে বই, স্লেট, পেনসিল গোছাতে থাকে।

খানিক পরে সোজা হয়ে বসে কালী পণ্ডিত বেতখানাকে টেবিলের টানা ড্রয়ারে রেখে দেন। মস্ত লম্বা হাই তোলেন, নস্যি নেন একটিপ, বলেন, যা, বাড়ি যা সব।

ওমনি হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ভাঙা জানলা টপকে, ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে কে আগে যেতে পারে তারই চেষ্টা চলে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই পাঠশালাটা নিস্তব্ধ। তারপর সারারাত ধরে দেওয়ালের ভাঙা গর্তে বসে পায়রারা ডাকে আর পাখা ঝাপটায়।



চার

ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় পূর্ণশশী খেতে দিচ্ছেন ইস্কুল-ফেরত পল্টু, প্রদীপকে— সুখদা আর কুলদাকে। এ ছাড়া সুখদার ছোটো দুটো ছেলেও আছে। মুড়কি আর ক্ষীর হয়েছে আজ। সামনের ধামা থেকে মুড়কি তুলে দিচ্ছেন বাটিতে, হাতায় করে ক্ষীর।

ছবির চোখ চকচক করে। আজ দুপুরে ভাত খায়নি, সে-কথা ভুলে গিয়েছিল। ক্ষীর আর মুড়কি যেন তার সেই ভুলে-থাকা খিদেটাকে মোচড় দিয়ে জাগিয়ে দেয়। বই-স্লেট দরজার কাছে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা বাটি টেনে নিয়ে সেও এসে বসে, আমাকে ঠাকমা।

পূর্ণশশী তার বাটিতেও মুড়কি তুলে দেন, ক্ষীর দেন। খেতে খেতে আবার বাটিটা বাড়িয়ে ধরে পল্টু, প্রদীপও। আর দুটো মুড়কি চায় তারা, আর একটু ক্ষীর।

ছবিও বাটি বাড়ায়, সবাইকে দিচ্ছ, আমাকেও দাও ঠাকমা। পেট ভরেনি আমার।

আর নেই, এই দ্যাখ— খালি বাটিটা পূর্ণশশী কাত করে দেখান।

হঠাৎ কেমন মাথা গরম হয়ে যায় রাগে। তীক্ষ্ণ রিনরিনে গলায় ছবি চেঁচিয়ে ওঠে, সবাইকে দিলে দুবার করে, আমাকে দিলে একবার মাত্তর, তাও কতটুকুন। পল্টুদা, মণিদা, ওরা চাইলে তো নেই বল না।

শোন কথা! —একটা মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থেকে পূর্ণশশী চেঁচিয়ে ওঠেন, লেখাপড়া শেখার ফল ফলছে দ্যাখ। মেয়ে এসেছে সোনার চাঁদ ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। কিসে আর কিসে। ছেলেদের মতো তুই কি রোজগার করবি? হবি তো বাপের বুকের শেল— আর দুদিন পরে তো বিয়ের চিন্তেয় বাপের গলা দিয়ে ভাত নামবে না..., কথা শেষ না করেই উঠে গিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে আর একটু

ক্ষীর এনে ছবির বাটিতে ঢেলে দেন পূর্ণশশী।

ক্ষীরমাখা হাতখানা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল এতক্ষণ। ঠাকুমা আর একটু ক্ষীর ঢেলে দিতেই মাথায় যেন ভূত চাপে মেয়েটার, খাব না আমি..., বলে রাগে টান মেরে বাটিটাকে একেবারে উঠোনের মধ্যে ফেলে দেয়।

অবাক! এত অবাক বুঝি পূর্ণশশী তাঁর জীবনে কখনও হননি। ছেলেরাও খাওয়া ভুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

মেয়ে নয়তো, বিষমাঝালি..., চেঁচাতে থাকেন পূর্ণশশী, কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে, বাক্যে মারে পুড়ে পুড়ে...।

চেঁচামেচি শুনে কে এসেছে, কে আসেনি, ছবি তো তাকিয়েও দেখে না। কেবল মা যখন এসে চুলের গোছা ধরে টেনে ওঠান, পিঠের ওপর দুমদাম কিল মারেন তখন বোঝে একটা মস্তবড়ো অন্যায় করে ফেলেছে সে হঠাৎ।

মা বলেন, খেতে হবে না তোর লক্ষ্মীছাড়ী, হ্যাংলা মেয়ে। দুপুরে ভাত খাসনি— এখন এসেছিস কেন মরতে।

মার গলা ভার, কথাগুলো কাঁপা কাঁপা।

শাশুড়িকেও বলেন মৃদু গলায়, ওকে ঘাড় ধরে উঠিয়ে দিলেই পারতেন মা। খেতেই দিলেন যদি তবে আর অত সব কথা বললেন কেন? ছেলেমেয়েব তফাত অতটুকু মেয়ে কী বুঝবে!

ব্যথা-করা পিঠটার কথা ভুলে গিয়ে ছবি শুধু বোঝে মা সব দেখেছে, সব শুনেছে। তার পিঠের ব্যথাটা যেন কমে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

পূর্ণশশী আগের চেয়েও অবাক হয়ে গেছেন যেন, বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের কানকে এমনি করে বলেন, বাবা, কী বলেছি তোমার মেয়েকে যে অমন রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরেছে? অপরাধ যদি হয়ে থাকে, ক্ষমা কর বউমা..., সত্যি সত্যি হাত জোড় করে ঠাকুমা মার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে! ছবি মাথা নিচু করে ফিক্ করে হেসে ফেলে।

মৃদু গোলমাল, কথা কাটাকাটির মধ্যে বাবা, বড়কা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার কাছে। মমতা এবার লজ্জিত মুখে ঘোমটা টেনে সরে গেলেন।

সুখদা কাব কাছ থেকে যেন ব্যাপারটা শুনে নিয়েছেন ততক্ষণে, এবার এসে ছবির হাত ধরে কাছে টেনে বলেন, আয় ছবু, ভাঁড়ার ঘরে যত ক্ষীর আছে ঠাকুমার, সব খেয়ে ফেলিগে চল। দেবে না কী রে?

ছবির পক্ষে প্রস্তাবটা ভালো কী মন্দ তা বোঝবারও সময় পাওয়া যায় না। মমতা এসে হঠাৎ পথ আগলে দাঁড়ান ছবির হাতখানা টেনে নিয়ে, গলা তাঁর গম্ভীর কিন্তু মৃদু। বলেন, না ঠাকুরপো, ওকে অমন করে ভুলিও না। একটু বুঝতে দাও।

সুখদা একবার তাকান বউদির ঘোমটা-টানা মুখের দিকে। আপনা থেকেই

তাঁর ধরা হাতখানা শিথিল হয়ে ছেড়ে যায়। তবু হাসবার চেষ্টা করে বলেন, তোমাদের যত কাণ্ড বউদি। ছেলেমানুষ। চেয়েছে, একটু দিলেই খুশি হয়, তা না...।

ছেলেমানুষ! মমতা রেগে ওঠেন, ছেলেমানুষ হলেও ও যে মেয়েমানুষ। এই কথাটাই বোঝে না আর সব মেয়েদের মতো, এটাই যে আমার জ্বালা।

এত যে কাণ্ড, এতক্ষণ কুলদা কিন্তু একটা কথাও বলেননি। যেমন বসেছিলেন রোয়াকে, তেমনি বসে ছোটো ছোটো চুমুকে চা খাচ্ছিলেন। এতক্ষণ পরে এপাশে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, এটা আবাব এখানে বসে ফোঁপায় কেন এ্যাঁ? তোরও পিঠে পড়েছে নাকি দু-চার ঘা?

ছবি সব ভুলে সেদিকে তাকায়। প্রদীপ কাঁদছে!

পাশে গিয়ে দেখে ওর খাবারের বাটি তেমনি পড়ে আছে, বাটিতে ক্ষীর শুকিয়ে চট্‌চটে হয়ে গেছে। হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে সে ফোঁপাচ্ছে।

দু-হাতে নাড়া দিয়ে ছবি বলে, অ্যাই দাদা, অ্যাই। মা তো মেরেছে আমাকে, তুই কাঁদছিস কেন? জানিস, একমুঠো চুল ছিঁড়ে গেছে মার হাতের মধ্যে।

কান্না-ভরা গলায় প্রদীপ বলে, তোকে সবাই কেবল বকে, কথায় কথায় মা মাবে। আমার কষ্ট হয় না বুঝি? তুই কেন বাটিটা ফেলে দিলি ভাই? নইলে তো মার খেতিস না।

ছবি পাশে হাঁটু মুড়ে বসে ফ্রকের কোণা দিয়ে ভাইয়ের চোখ মুছিয়ে দেয়। গম্ভীর তার মুখ, বলে, ঠাকমা ওইসব বলল— নইলে তো ফেলতাম না। কিন্তু আমি তো কাঁদিনি মার খেয়েও, তুই কাঁদলি? ওই দ্যাখ, পল্টুদা, মন্টু হাসছে। বড়োকা, বাবা সবাই। তুই কী রে দাদা! মমতা চুপ কবে রান্নাঘরে বসেছিলেন। সেখান থেকেই চোখ গেল ওদের দুই ভাইবোনের দিকে। মেয়েটার খুশি হয়ে ওঠাও দেখলেন। কে বলবে যে একটু আগেই খিদের মুখে খাবার খেতে গিয়ে এই মেয়েটাই গঞ্জনা শুনেছে, মার খেয়েছে। শেষ বেলাব পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে, চুলে— আলোয় যেন স্নান করছে মেয়েটা। দেখে বুকের ভেতরটা এক অব্যক্ত ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে। হঠাৎই চোখের কোণের জল মুছে ফেলে নিঃশব্দে মন দেয় নিজেব কাজে।

অনেক রাতে! কত রাত তা ছবি বলতে পারে না। যখন ঘুম ভেঙে গেলে অনেক দূর থেকে মাঝে মাঝে কেবল কুকুবের ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না, ঘরের কোণে লণ্ঠনটা নিবু নিবু হয়ে জ্বলতে থাকে, ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাস সারা ঘরে শব্দ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন একটা ভয় ছবির বুকের ভেতরটা ঠান্ডা করে হাত-পা শক্ত করে দেয়। সে চোখ খুলতেও সাহস পায় না। গড়িয়ে গিয়ে

মায়ের কাছে ঘেঁষে শোয়, মার হাতখানা নিয়ে নিজের গায়ের ওপর রাখে, কানের মধ্যে আঙুল পুরে দেয় নিঃশ্বাসের ফিশফিশ শব্দটা আটকাবার জন্য।

ঠিক তেমনি রাতে আজও তার ঘুম ভাঙে। বোধ হয় সে একটু নড়েছিল মার কাছে ঘেঁসে শোবার জন্য, কে যেন পাশ থেকে ফিশফিশ করে ডাকে, ছবু!

মা! মা ডাকছে! আজ আর ভয় নেই। আজ তাকানো যাবে। লণ্ঠনের একটুখানি আলো বাঁকা হয়ে মার মুখের ওপর পড়েছে। জোর করে বন্ধ-রাখা চোখ খুলে ছবি দেখে মা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। একটা নিঃশ্বাস এখন আর শব্দ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না— ফিশফিশ করে বলছে, ছবু, সোনা। তুই আমার একটামাত্র মেয়ে, তাও একটু ভালোবাসতে দেয় না কেউ—।

আর ঘুমের মধ্যে ছবি বুঝতে পারে মা তার পিঠে, গালে, চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

অভিমান কাকে বলে ছবি তা জানে না, ব্যথা লাগলেও সে-বোধটা তার বেশিক্ষণ থাকে না। এখন মমতার আদরে তার ঘুম পায়। ভেঙে-যাওয়া ঘুমটাই আবার তার চোখে ভালো করে আসন পাতে। আরও নিবিড় করে মাকে জড়িয়ে ধরে, অনায়াসে মমতার গায়ের ওপর একখানা পা তুলে দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়ে। ভারি শান্ত তার ঘুমনোর ভঙ্গিতে আর মগ্ন চৈতন্যের পাশে পাশে একটা কথা ভেসে ভেসে বেড়ায়— মা, আমার মা! —সেই মনে মনে বলা কথাটাই তাকে যেন একেবারে নিশ্চিন্ত করে দেয়।

কেবল মমতার চোখেই সহজে ঘুম আসতে চায় না।



পাঁচ

বিয়ে! বিন্তিপিসির নাকি বিয়ে হবে। দশবারের বার যে শেষবার, বর নিজেই এসে দেখে পছন্দ করে গেছে।

বিয়ে হবে তাদের বাড়িতে এটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। কলাগাছ পোঁতা হবে, ইফতিকার সানাই বাজাবে গাল ফুলিয়ে। আলো জ্বলবে। লোকজন, খাওয়া-দাওয়া। আর ভালো জামা-কাপড় পরে তারা ঘুরে বেড়াবে। উঃ কী যে মজা: এত মজা যে ভেবে শেষ করা যায় না।

কিন্তু আজ সকালে যে ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছে ছবি, তারপর থেকে মনটাই খারাপ হয়ে গেছে তার।

সে দেখেছে ভাঁড়ার ঘরের সামনে দিয়ে বাবা পায়চারী করে বেড়াতে বেড়াতে চাপা গলায় বলছেন, টাকা দিতে পারবে? বল তো নাকচ করে দিই। এর চেয়ে ভালো আর কি আশা কর তুমি? আগেই বা বলে দিলে না কেন? কালো মুখ্যু মেয়ে, সে-খেয়ালটাও রেখো।

ঠাকুমা পাতা বঁটিখানার ওপর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বসেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে এবার কথা বললে ছবি বুঝতে পারে ঠাকুমা কাঁদছিল এতক্ষণ, অমন করে বলিসনে কুলদা। কুচ্ছিত মেয়ে, মুখ্যু মেয়ে তা তো জানি। তাই বলে কি একেবারে তিন ছেলের বাপকে ধরে আনলি। কিছুই না হয় না থাকত, বয়সটাও একটু কম যদি হত।

ঠাকুমার কথা শেষ হবার আগে পেছন থেকে ঠাকুরদা বলে ওঠেন, ও নিয়ে কান্নাকাটি করলে কি ফল হবে কিছু? হবে? কথা যখন দেওয়া হয়েছে, পয়সাকড়ি যখন দিতে পারব না, তখন এ পাত্র হাতছাড়া করা হবে না।

গোলমাল শুনে মাও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠাকুমা এবার একেবারে হাঁউমাউ

করে কেঁদে ওঠেন, তাহলে বিস্তিকে তোমরা ওই দোজবরের হাতেই দেবে?

তারিখ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে, এখন তো বললে চলবে না— গম্ভীর গলায় কথা ক'টা বলে ঠাকুরদা চলে গেলেন সেখান থেকে। বাবা চুপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন।

মা একবার ঘোমটার ফাঁকে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন ভুরু কুঁচকে, তারপর এগিয়ে গিয়ে পাতা বঁটিখানা কাত করে দিয়ে বললেন, উঠে আসুন মা। কাঁদবেন না। বিস্তিটার কপাল!

ঠাকুমার দুই গাল বেয়ে জলের ধারা নামছে। সেদিকে তাকিয়ে ছবি একেবারে অবাক হয়ে যায়। ঠাকুমা তো বকে সবাইকে— তাকে, সেফুকে, মাকে— কাকিমা থেকে শুরু করে চাকর-বাকর সবাইকে। এখনও পিঠ কুঁজো করে সারা বাড়িময় কাজ করে বেড়ায়। সেই ঠাকুমাও আবার কাঁদে!

প্রদীপ বুঝিয়ে বলে, আহা, কাঁদবে না কেন— ঠিক মাঝখানটায় যে বসেছিল ওই তো বর।

যাঃ,— কিছুতেই বিশ্বাস হয় না তার, ওমা! ও তো বিচ্ছিরি, কালো, মোটা, অনেক চুল পাকা! ও কক্‌খনো পিশেমশাই হবে না আমাদেব।

চল মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবি— প্রদীপ প্রমাণ দিতে চায়, সেইজন্যেই তো কাঁদে ঠাকমা। বুঝিসনে?

শেষে সেফুর কাছে আরও খবর জানা যায়। লোকটার আগের বউ মরে গেছে, দুটো ছোটো ছেলেমেয়ে আছে, তাদের দেখাশোনা করার কেউ নেই। বিস্তিপিসিকে তাই তো বিয়ে করবে।

বর খারাপ কি ভালো তা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামানো যায় না। নিজেদের বাড়িতে একটা বিয়ে হবে, এটাই আসল কথা, মজার কথা।

কিন্তু বিস্তিপিসির কাণ্ডটা দ্যাখ একবার! এখনও ঠিক ঠাকুমার ঘরের বারান্দায় একগোছা পান নিয়ে সাজতে বসে, সারা বাড়ির লণ্ঠনগুলো পরিষ্কার করে তেল ভরে রাখে। যার বিয়ে হবে তাকে বুঝি এইসব করতে হয়? কেউ বিস্তিপিসিকে বলে দেয় না, বারণ করে না কেন? ছবি ভেবে ভেবে কিছুতেই কূল পায় না। আর নয়তো, কেউ বোধহয় পিসিকে বিয়ের কথাটাই বলেনি। তাই। সবাই যেন কেমন?

কিন্তু বিস্তিপিসির বিয়ের মজাটাই শেষ নয়। আরও একটা মজা আছে— বড়ো পিসিমা আসছে।

অনেকদূরে থাকে পিসিমা। কতদিন পরে আসছে। সে আঙুলে না গুণে বলা যায় না। সে যখন তিন বছরের তখন এসেছিল। আর আসেনি। এবার আবার আসছে। ঠাকুমাকে একটু খুশি দেখা যাচ্ছে খবরটা পাবার পর থেকে।

অনেক দূরে-থাকা পিসিমা। কতদূর সে জায়গা? ভাবতে গেলেই ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইঞ্জিন, রেলগাড়ি, লাল-নীল সবুজ নিশান।

অনেকে এর মধ্যে কোনওদিন গ্রামের বাইরেই যায়নি। গ্রামের স্টেশনটাও

অনেকের দেখা নেই। মণিদার যদি বা থাকে, ছবির নেই। কেবল গল্প, কেবল শোনা কথার রোমন্থন।

বড়ো পিসিমা কেমন দেখতে মা?

বিন্তির চেয়ে ভালো, দেখতেই তো পাবি।

কেবল দেখতে ভালো নয়, বড়োলোকও। অনেক নাকি টাকা আছে পিসেমশাইয়ের।

কিন্তু সেফু শুনেছে অন্য কথা। ছেলে নেই, মেয়ে নেই, কেউ নেই পিসিমার। পিসেমশাইও নাকি দেখতে পারে না তাকে।

যাঃ যাঃ! ছবি সেসব কথায় কানই দেয় না।

অনেকদূরে-থাকা, অনেকদিন পরে আসা, সুন্দর দেখতে পিসিমাকে নিয়ে সে এক কল্পনার জগৎ তৈরি করেছে কদিন ধরে। সেখানে কারও কোনও কথা ঢুকতে দেয় না সে।

মুখ বার করে জায়গাটা দেখে নিয়ে আগে আগে আসা পালকিখানা থেকে সুকুমারী হঠাৎ নেমে পড়ে বোসপুকুরটার কাছে। আশা, হাসি-কান্না মেশানো অদ্ভুত এক ভাব হয়েছে তার মনে, আনন্দে চোখে প্রায় জল এসে গেছে।

ওমা, জামগাছটা এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে দেখ। হরদার দোকানটাও আছে? কী কাণ্ড!

ছোটো মেয়ের মতো হাসি হাসি মুখ নিয়ে এগোতে থাকে সে। ছেলেমেয়েরা খবর পেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটতে ছুটতে এসেছিল। প্রদীপ আর পল্টু চিনতে পেরে দুটো হাত ধরে থাকে তার। ছোটোরা যারা আন্দাজে বোঝে তারাও চেনা মানুষের মতো গা ঘেঁষে চলে। ছবিও ছিল সে দলে।

কুলির মাথায় দুটো-তিনটে বড়ো বড়ো বাক্স আসছে। পেছনের পালকিটায় আসছেন পিসেমশাই।

চলতে চলতে সুকুমারী ওদের সবাইয়ের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে হাসে, কত বড়ো হয়ে গেছিস রে তোরা? মা কেমন আছে রে? বাবা? বড়দা? বউদি?

তারপর হঠাৎ ছবির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, প্রদীপ এটা তোর বোন না রে?

প্রদীপের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তার হাতখানা ধরেছে পিসিমা। ফরসা মোটা মোটা আঙুল। গরম আর ঘামে ভেজা।

ছবির হাত সে-হাতের মধ্যে কাঁপে। হাত ছাড়িয়ে হঠাৎ ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে তার।

বোসপুকুরের মেয়েদের ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে পিসিমা সবাইকে ডেকে ডেকে কথা বলছে, ও রাঙা ঠাকমা, দেখুন, চিনতে পারছেন? আমি সুকুমারী। ও খুড়িমা, কেমন আছেন? বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন আপনি। ছেলেরা খোঁজ-খবর নেয় তো?

যাকে দেখে সুকুমারী, তার সঙ্গেই একবার ইচ্ছে করে কথা বলে নেয়। সবাই

পেছনে ফিরে দেখে, আলোচনা করে। সুকুমারী যেন ঘোষণা করতে করতে চলেছে তার আসার কথা— সবাই দেখুক, সবাই শুনুক।

পিসিমার খুব আনন্দ হচ্ছে এটা ছবি বুঝতে পারে। রাতজাগা ক্লান্ত চোখ, গাড়ির কাপড়-চোপড়, চুলগুলো উস্কোখুস্কো হয়ে উড়ছে, তবু পিসিমার আনন্দ। সবকিছু জিজ্ঞেস করছে, সব তাতে হেসে উঠছে। আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে।

সে এমন মানুষ দেখেনি। এত যে কথা বলছে, হাসছে কিন্তু যেই সে হাত ছাড়িয়ে চলে যাবার মতলব করছে তখনই কেমন করে যেন বুঝে ফেলছে, ওমনি শক্ত করে তার হাত চেপে ধরছে ঘামে-ভেজা হাতে।

শুধু নিজের বাড়ির ছেলেমেয়েরাই নয়, পাড়া থেকেও চেনা-অচেনা একদল ছেলেমেয়ে সুকুমারীর পেছন পেছন চলেছে। কে সে তা ওরা জানেও না, তবু চলেছে। যেন আনন্দটা ওদেরও।

বৈঠকখানার উঠোন পেরিয়ে, মণ্ডপের বারান্দা পর্যন্ত এসে পিসিমা হঠাৎ দাঁড়ায়। উপুড় হয়ে সিঁড়ির গোড়ায় প্রণাম করে ছবির হাত ছেড়ে দিয়ে। সিঁথির সামনের দিকটায় মাথা তোলবার পরও খানিকটা মাটি আর টুকরো টুকরো ঘাস লেগে থাকে। সিঁড়ির পাশের কল্কেগাছটার তলায় যে কটা ফুল পড়েছিল সব তুলে নেয় পিসি— যেন ছেলেমানুষ। তারপরই হঠাৎ সব ভুলে ছুট দেয় প্রায় মণ্ডপের মধ্য দিয়ে।

সদর দরজাটার কাছে ঠাকুমা দাঁড়িয়েছিলেন— মা, কাকিমা, নতুন দিদিমা।

ঠাকুমা আজ মস্ত ঘোমটা টেনেছে নতুন বউয়ের মতো। ঘোমটার মধ্যে থেকে বলে, তুই একা এলি? জামাই?

সবাইকে প্রণাম করতে করতে পিসি বলে, আমার গ্রাম, আমার দেশ। একা আসব না তো কি সঙ্গে লোক নিয়ে দরজার কাছে পালকি থেকে নামব? জামাই তোমাদের শহুরে মানুষ, সে আসছে পালকি চড়ে।

সবায়ের পেছনে ছবি। কাজেই মার বলা কথাটা সে স্পষ্ট শুনতে পায়— পিসিমাকে মা বলে, হ্যাঁরে, এখন আর তেমন নেই তো? বেশ ভাব-সাব আছে?

ভাব? কথাটা বলে পিসিমা কেন চুপ করে গেল কে জানে? মার কথাটার কোনও উত্তর দিল না। কেবল বাড়ির মধ্যে ঢুকে কী হাসি।

কাকিমার পেটের ওপর হাত বুলিয়ে ফিশফিশ করে বলে, আবার?

চিৎকার করে বিন্তিপিসিকে ডাকে, ওরে ও বিন্তি! বিয়ে হবে বলে কি ঘর থেকে বেরুবিনে পোড়ারমুখী!

পিসির সেই ঘর-ফাটানো হাসি তার রাতজাগা শুকনো চেহারায় যেন মানায় না। এতক্ষণ পরে ছবি ছুটে পালায়। সিঁড়ির ওপরকার টিনের ঘরখানার একগাদা ফেলে রাখা আবর্জনার মধ্যে বসে থাকে চুপ করে। ভাবতে চেষ্টা করে। কেমন এক অদ্ভুত, আশ্চর্য মানুষ এই পিসিমা। ঠিক ধরা যাচ্ছে না, ঠিক ছোঁওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ছবির কেমন অস্বাভাবিক লাগছে সবকিছু। মনে হচ্ছে, অত জোরে ইচ্ছে করে কেউ

হাসে না। কাউকে সে এমন দেখেনি আজ পর্যন্ত। সবই যেন অদ্ভুত, সবই নতুন। তার হাতখানাই বা অত জোরে চেপে ধরেছিল কেন পিসি?

প্রদীপ খুঁজতে খুঁজতে এসেছে। পেছন থেকে ঝাঁকুনি দেয় সে ছবিকে, এই, পালিয়ে এলি যে বড়ো? পিসিমা যে ডাকছে তোকে? কত জিনিস এনেছে ভাই, দেখবি চল। হাত ধরে টানতে টানতে প্রদীপ তাকে নিয়ে যায়।

ঠাকুমা বলছেন, তোর যত কাজ সুরু। কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধো, তা না...। আগেই সব দিতে বসলি। জিনিসপত্র তো পালিয়ে যাচ্ছে না—।

মাও সেই কথা বললেন, কিন্তু পিসিমা কেবল হাসে।

অজস্র জিনিসপত্র সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পিসিমা বসে আছে আর দিচ্ছে সবাইকে। কে যেন পেছন থেকে বলে, জামাই আসছে—। ওমনি ঠাকুমা আবার ঘোমটাটা টেনে লম্বা করে। পড়ি কি মরি করে ছোটেন।

ছবি দেখে পিসির মুখ। হাসি হাসি মুখখানা পিসির কেমন হয়ে গেছে— কেমন অন্যমনস্ক হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে পিসি। তারপরই আবার যে কে সেই।

হাতভরা লজেন্স, একটা বড়ো পুতুল বাড়িয়ে ধরেছে পিসি তার দিকে। আর পিসির পাশে ওই যে রংচঙে ছবি আঁকা বইগুলো পড়ে আছে, ওগুলো বুঝি ছবি পাবে না। সে হাত বাড়ায় না, এগিয়েও যায় না। মমতার আঁচলের কোণ চেপে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিচ্ছিস নে যে? আর কী চাস তুই? কী নিবি? —অবাক গলায় সুকুমারী বলে, দিলে নিতে হয় রে।

ছবি আঙুল বাড়িয়ে বইগুলো দেখায়। বাতাসে পাতা উড়ে গিয়ে ভেতরকার ছবিগুলো তাকে আকর্ষণ করছে। কী আছে ওতে? গল্প? তার যে একটাও গল্পের বই নেই।

ওমা, ওই বই নিবি তুই? ও যে পন্টু আর প্রদীপের জন্যে এনেছিলাম। পড়তে পারিস বুঝি? নে, তবে তুই-ই নে।

সব বইগুলোই পিসি ছবির হাতে তুলে দিয়েছে। শুধু লজেন্স আর পুতুল ভালো না, শুধু বইও ভালো না, সবগুলো একসঙ্গে পেয়ে ভালো লাগছে। সেগুলো দু-হাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে তাড়াতাড়ি ওপরে রাখতে যায় ছবি, তার টিনের বাক্সে। উমা, বাসন্তী, দুর্গা সবাইকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করছে তার— কারোর নেই এরকম।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবার মুখে বড়ো কাকার ঘর। তার দরজায় ছেলেমেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সেও পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখবার চেষ্টা করে।

সেফু ফিশফিশ করে বলে, পিসেমশাই।

ঠাকুমা লম্বা ঘোমটা টেনে সামনে পাখা নিয়ে বসে আছেন। দাদু, বাবা, বড়কা সামনে বসে। সবচেয়ে ভালো ফুলকাটা থালার চারপাশে বাটি সাজানো। পিসেমশাই

খাচ্ছেন। খুব গম্ভীর মুখ আর কেমন নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর।

পিসিমার সেই হাসি হাসি মুখখানার পাশে ওমনি একখানা মুখ কল্পনা করতে গিয়ে হঠাৎ ছবির কেমন কষ্ট হয়। সে পালায় সেখান থেকে।

পাঠশালার ছুটি নিয়ে ভাত খেতে এসে রান্নাঘরে অন্যদিনের মতো মাকে না পেয়ে আজ ওপরে উঠে এসেছে ছবি।

ঢোকবার আগেই বাইরে থেকে কানে আসে কান্নাভেজা গলার স্বর। ঘরে চৌকির ওপর মা বসে আছে দরজার দিকে পেছন ফিরে আর পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কে? নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারা যায় না— সুকুমারী পিসিমা কাঁদছে। হাসিখুশি পিসিমাও আবার কাঁদে, কাঁদতে জানে।

খুব চাপা গলায় মা বলেন কাঁধের ওপর হাত রেখে, কাঁদসিনে ভাই, চুপ কর। কী করবি? সবই কপাল।

ভেজা দুই চোখ পিসিমার। আঁচলে ঘষে ঘষে চোখের জল মুছে ফেলতে চায় আর বলে, কপাল কপাল কর তোমরা, হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া কি আমার কপালে ছিল না? শুধু শাড়ি, শুধু গয়নায় যদি মেয়েমানুষের সাধ মিটত বউদি? জান, এই দশ বছর ও আমার পাশে শুয়ে ভেবেছে সেই মেয়েটাকে। হাড়জ্বালানি পোড়াকপালি একটা বিধবা নার্সকে।

মা বলে, সে কী রে? অন্য মেয়ের সঙ্গে ভাব ছিল নাকি ওর?

ছিল বিয়ের আগে। মেয়েটাকে ও বিয়ে করতে চেয়েছিল, বিধবা বলে মেয়েটাই নাকি রাজি হয়নি। এতদিন চিঠিপত্র লেখালেখি চলত। সে-চিঠি আমি লুকিয়ে পড়েছিও। ছিল দূরে দূরে, একরকম ছিল, আজ মাস কয়েক হল আবার মেয়েটা ওখানকারই হাসপাতালে চাকরি নিয়ে এসেছে। আজকাল ও ফেরে অনেক রাতে। আগে বাড়িতে মদ খেত। এখন অনেক রাতে বাইরে থেকেই মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে যখন— আমি আর ঘরে ঢুকতে দিই নে, কিন্তু আমার বুক ফেটে যায়।

ছবি বোঝে মাও কাঁদছে, ছিঃ ছিঃ, বানরের গলায় মুক্তোর মালা ঝুলিয়ে দিল সবাই মিলে! একটু দেখল না শুনল না?

পিসিমা বলে, মানুষটা কিন্তু ভালো, বউদি। পাজি কী গোঁয়ার-টোয়ার নয়। কখনও কড়া কথা বলে না, না চাইতেই সব দেয়। কোনও অভাব রাখেনি, যা ইচ্ছে হয় তাই মেটায়— কিন্তু তাতে কি? আসলেই যে ফাঁকি আমার। একটা ছেলেমেয়ে পর্যন্ত নেই আমার— কী দিয়ে ওকে বাঁধব বউদি।

মা গম্ভীর হয়ে বলে, ডাক্তার দেখিয়েছিলি?

দেখিয়েছি। তারা বলে ছেলেমেয়ের মুখ আমি নাকি কোনওদিন দেখব না।

মিথ্যে কথা— মার গলার স্বরটা কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে, চিরকাল সেই কথাই শুনে এলাম। অবিনাশ নিজেকে যেন একবার দেখায়। আমার তো মনে হয় দোষটা তোর নয়, ওর।

পিসিমা বুঝি আবার কাঁদছে, কান্না আটকানো গলায় বলছে, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে হয় না বউদি। কী হবে বেঁচে থেকে?

ছিঃ, ও-কথা ভাবতে নেই, দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর মতো মেয়েকে একদিন ঠিক বুঝবে অবিনাশ।

বাইরের কড়া রোদে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে ছবি। বড়োদের যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা। কেবল ফিশফিশ, চোখের জল— কিছু বোঝা যায় না। সে ডাকে, মা।

মমতা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়িয়ে হাসেন লজ্জিত হয়ে, ওমা! আজ যে তাড়াতাড়ি এলি বড়ো?

তাড়াতাড়ি কোথায়? রোদ্দুর দ্যাখ না তুমি।

সুকুমারী হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নেয়। এবার আর সে-হাত ছাড়িয়ে পালাতে ইচ্ছে করে না। ভালো লাগে চোখের জল মুছতে গিয়ে কপালের সিঁদুরে মাখামাখি হয়ে-যাওয়া মুখখানার দিকে, জলে ভেজা বড়ো বড়ো চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে। কোলের মধ্যে আড় হয়ে সে পিসিকে দেখে।

সুকুমারী তার চুলের গোছা চোখের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে বলে, ওকে পাঠশালায় পড়াচ্ছো এখনও? যা বাড়ি!

নিস্তেজ ম্লান গলায় মা বলে, ওই পাঠশালা পর্যন্তই। তাই কি আমাকে কম কথা শুনতে হয়, ন-দশ বছর বয়েস তো হল। আরও তিনটে মেয়ে পড়ে তাই রেখেছি, ওরা ছাড়লে ওকেও ছাড়াতে হবে। তারপর ওর কপাল। পড়াশোনায় খারাপ না, মাঝে মাঝে কালী তো এসে বলে যায়। আমি ভাবি, ভালো হলেই বা কি? ওই পর্যন্তই। আর তো হবে না।

পিসি ছবির মাথার ওপর আলতোভাবে হাত বোলায় আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কী যেন ভাবে খানিক। পিসির চোখ দুটো ঝকঝক করে। শেষে একসময় মাথা তুলে বলে, ওকে আমায় দেবে, বউদি?

শুনে মমতা প্রথমটায় চমকে ওঠেন, ছবিকে নিজের কাছে টেনে নেন। নিজের গায়ের সঙ্গে যেন সাপটে রাখতে চান, বিবর্ণ ভীতু ভীতু গলায় বলেন, কী বলছিস সুকু?

হ্যাঁ, যদি একটা মেয়ে বলে তোমার আপত্তি না থাকে।

কিন্তু অবিনাশ? তুই বললেই হবে কেন? —বাধা দেবার মতো অন্তত একটা অজুহাত পেয়ে মা বেঁচে গেছেন।

সে ভার আমার। দিলে মন ঠিক করে দিতে হয় কিন্তু, অন্তত একটা পাস না করিয়ে ওকে এখানে পাঠাব না। ইচ্ছে করলেই কাছে পাবে না মেয়েকে।

সে যে অনেকদিন রে। আর অতদূর।

মার মুখটা হঠাৎ যেন দুঃখে এঁকেবেঁকে যায়, ইচ্ছে করে তো লেখাপড়া শেখাতে, মনে তো কত ইচ্ছেই থাকে। তা তুই যদি পারিস। কিন্তু অতদিন— আর

কথা বলতে পারছে না মা, ভারী হয়ে গেছে স্বর।

পিসিমা কিন্তু আর-একটা কথাও বলে না, যেন রায় দিয়ে বসে আছে। যা বলেছে তার আর নড়চড় হবে না। ঠিক সেদিনকার সকালে দেখা ঠাকুমার মতো।

এতক্ষণ পরে অনেক দুর্বোধ্য কথা শোনার পর, এইবারকার কথাগুলোর মানে বুঝতে পেরেছে ছবি। সে মাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে ফেলে ফুঁপিয়ে। আঁচলে মুখ লুকিয়ে সজোরে মাথা নেড়ে জানায়, আমি যাব না, মা। পাঠিয়ে দিলেও যাব না।

মা হাত ধরে খেতে নিয়ে গেলে ভাতের প্রথম দুটো-একটা গ্রাস মুখে তোলে স্বাভাবিকভাবে, তৃতীয় গ্রাসটা মুখে নিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকায় স্থির দৃষ্টিতে।

মা বলেন, খাও, পাঠশালায় যেতে হবে না?

মুখভরা ভাত নিয়েই ছবি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে আবার, আমি যাব না, মা।

মমতার চোখও ছলছলে হয়ে উঠেছে। মেয়ের মাথায় বাঁ-হাতখানা রেখে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলতে থাকেন, এখনই তো যাচ্ছ না। কাঁদবার কী আছে? পিসিমার সঙ্গে যেতে পারলে তোমার ভাগ্যি জেনো। নইলে কপাল হবে পাথরচাপা। বিন্তির মতো তখন পান সাজবে, লণ্ঠন মুছবে আর সবায়ের গলগ্রহ হয়ে থাকবে। বল, হবে সেরকম?

সজোরে মাথা নেড়ে ছবি জানায়, না।

এখানে ইস্কুল আছে, সেখানে তো তোমার পড়া হবে না। তোমার ভাইয়েরাই কেবল লেখাপড়া শিখবে। কিন্তু পিসিমার ওখানে ইস্কুলে তুমি পড়বে, পাস করবে। তারপর কলেজে যাবে। বড়কার মতো অধীরকার মতো লেখাপড়া শিখবে।

ছবি খানিক ভাবে, তারপর মায়ের আঁচলে মুখ ঢেকে ধরা গলায় বলে, কিন্তু তোমার যে মন কেমন করবে? তুমি যে বল আমি একমাত্র মেয়ে তোমার— ?

কথা শেষ হবার আগেই মমতা হঠাৎ হেসে ফেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই দু-চোখে ফুটে ওঠে গভীর বিষণ্ণতা, বলিই তো। তুই তো একটাই আমার, তাই তো তোকে নিয়ে আমার কত ইচ্ছে। আমার ইচ্ছে যদি পূরণ হয় তবে কষ্ট চেপেও আমি থাকতে পারব।

ছবির চোখ দিয়ে জল গড়ায়, বাঁ হাতের তালুতে তা মুছে ফেলে শান্ত হয়ে আবার গ্রাস মুখে তুলে মাথা নেড়ে সে আবার বলে, আমি যাব, মা, পিসিমার সঙ্গে। আর কাঁদব না।

কাঁদব না বলতে গিয়েও আবার কাঁদে। মমতাও কাঁদেন। মেয়ের মুখে আসা চুল সরিয়ে দিতে গিয়ে মাথা নিচু করলে দু-ফোঁটা জল ঝরে পড়ে ছবির কপালের ওপর। তার মুখখানা তুলে ধরে হাসি-কান্না মিশ্রিত মুখে ফিশফিশ করে বলেন, তুই আমার বড়ো আশার জিনিস রে ছবু— এঁটো মুখখানাই চেপে ধরেন বুকের মধ্যে।

কেউ নেই আশেপাশে। ভারি নির্জন, জলে-ধোওয়া ঠান্ডা ঠান্ডা এই রান্নাঘরের বারান্দাটা।



ছয়

বিন্তিপিসির আজ বিয়ে। কে যেন ঠেলে ঠেলে ছবিকে তুলেছে, ওরে ওঠ ওঠ, দধিমঙ্গল হবে, ঘাটে যাবিনে?

সে উঠে দেখে উঠোনটা ভরা লোক। রায়বাড়ির দিদিমা এসেছে, এ-পাড়া, ও-পাড়া থেকে আরও কারা এসেছে। ছেলেমেয়েরা সব উঠে এসেছে, চার-পাঁচটা লণ্ঠনের আলো উঠোনটায় পড়েছে।

গোলমালে, মেয়েদের কথায় মাঝ-রাত্তিরটাকে যেন আর রাত্তির বলেই মনে হচ্ছে না।

বিন্তিপিসির কপালে ঠক্ ঠক্ করে দুখানা কুলো ছোঁওয়ানো হল; রায়বাড়ির দিদিমা আর অধীরকার মা— নতুন দিদিমা দুটো জল-ভরা হাঁড়ি মাথায় করে উঠে দাঁড়াতেই ধ্বজাধারীর ছেলের কাঁসর বেজে উঠল ট্যাং ট্যাং করে। মেয়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে উলু দিতে দিতে চলেছে আর ছেলেমেয়েরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হুড়মুড় করে তাদের পেছনে পেছনে। শাঁখ বাজছে ঘন ঘন, উলু পড়ছে, সবাইয়ের আগে ঢাকি ধ্বজাধারীর ছেলের একটানা কাঁসরের শব্দ— ট্যাং ট্যাং ট্যাং ট্যাং।

সমস্ত দলটা গিয়ে থামল পুকুরপাড়ে। হাঁড়ি ভরে জল নিয়ে দিদিমা উঠে দাঁড়াতেই আবার শাঁখ, আবার উলু।

কাকিমা এসেছে। মার পাশে পাশে চলতে চলতে বলে, ও দিদি! ওই দেখুন। ফরসা হয়ে এল যে, মেয়ে খাবে কখন?

মা বলে, ফরসা আবার কই রে? এই দ্যাখ, গায়ের লোম দেখা যাচ্ছে না এখনও। আহা যে না বিয়ে, দোজবরে বর। তার আবার অত বাছবিচার।

ঘরের এককোণে যেখানে সাজানো দু-খানা কুলো পাশাপাশি, তারই পাশে হাঁড়ি দুটোকে রাখা হয়েছে। কে যেন মস্ত এক থালা ভর্তি ভাত এনেছে, মাছ ভাজা একগাদা, একবাটি দই।

বিন্তি পিসির হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে রায়বাড়ির দিদিমা রসিকতা করেন, খা লো খা, সারাদিনের মধ্যে আর তো খেতে পাবিনে সেই চাঁদমুখ না দেখা পর্যন্ত।

কিন্তু সে-রসিকতায় কেউ হাসে না, সবাই কেমন গম্ভীর হয়ে আছে। বিন্তি পিসি একবার চোখ তুলে তাকায় ঠাকুমার দিকে। ঠাকুমা কাছে সরে এসে পিঠের ওপর হাত রেখে মৃদু গলায় বলেন, খা মা, যা পারিস দুটো মুখে দে।

পিসি প্রথম গ্রাসটা মুখে তুলতে গিয়ে বিষম খায়— কে যেন মৃদু কণ্ঠে বলে, আহা, আস্তে আস্তে খা মা— ষাট্ ষাট্।

ছবি সেই মুখখানাকে খুঁজে বার করে, অধীরকার মা নতুন দিদিমা। আস্তে আস্তে কথা বলেন সবসময়, কখনও হাসতে দেখা যায় না তাঁকে। ওঁর মেয়ে, কাকার বোন লতু পিসিমাও আছে। তার বিয়ে হয়েছে, মাথায় সিঁদুর আছে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ি কখনও যায় না। কেন— তা জানে না সে। নতুন দিদিমা তাকে ঘর থেকে বেশি বেরোতে দেন না, নিজেও মেশেন না বেশি কারুর সঙ্গে। হাসেন না, আর সব দিদিমাদের মতো গল্পও করেন না বসে বসে পা ছড়িয়ে।

পিসি মাছভাজা ভেঙে মুখে দেয়, দই দিয়ে মেখে ঠাকুমা জোর করে খাইয়ে দিলে খায় দু-এক গ্রাস, তারপর মুখ বুজে থাকে।

খাবিনে? খা আর দুটো।

সুকুমারী পিসিমা এবার বিরক্ত হয়ে বলে, কেন জোর করছ বারে বারে মা, এখন কি খেতে পারে মানুষ?

এরপর ছেলেমেয়েরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে পাতের ওপর। মাছভাজা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, দইমাখা ভাত খেয়ে হাত চাটে।

ছবি খায় না, এমনিতে সে এত ভালোবাসে মাছ খেতে, ভাজা পেলে তো কথাই নেই। কিন্তু এখন বিন্তি পিসির ওই শুকনো কালো মুখের দিকে তাকিয়ে, মাঝরাত্তিরের হঠাৎ ভাঙা ঘুমে, ঠাকুমার ছলছলে চোখ আর রায়বাড়ির দিদিমাকে কেউ না হাসা সত্ত্বেও রসিকতা করতে দেখে তার গায়ের মধ্যেটা কেমন করে। সে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

সুকুমারী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বোঝার চেষ্টা করে বলে, ছবুটার বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। শুবি? আয় এই বিছানায় শুয়ে থাক বিন্তির পাশে।

সে গিয়ে ধুপ করে শুয়ে পড়ে চোখ বুজে। বিন্তি পিসিমা হাতখানা আলগোছে দিয়ে আছে তার গায়ের ওপর— এটা সে চোখ বুজেই টের পায়।

তারপর সকাল হয়। সকাল থেকে বেলা দুপুর। লোকজন, গোলমাল, চেঁচামেচি, ব্যস্ততা। সকালে খানিকক্ষণের জন্য ইফ্তিকারের সানাই বেজেছিল। তখন ছবিও আর সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মেয়েদের মতো একরাশ কোঁকড়া চুল ইফ্তিকারের কাঁধের ওপর ছড়িয়ে থাকে, পুরুষমানুষের আবার অত বড়ো চুল। খুব মজা লাগে দেখতে, সেই চুল

দুলিয়ে, গাল ফুলিয়ে সে যখন সানাই বাজায়। ওর চোখদুটো তখন বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে, মুখ হয়ে যায় লাল। ছেলেমেয়েরা চারপাশে ভিড় জমিয়ে তাই দেখে।

ছবির আজ তাও ভালো লাগেনি। খানিকক্ষণ শুনে সে চলে এসেছে ঠাকুমার ঘরে, বিন্তি পিসিমার পাশে গিয়ে চুপ করে একদৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

একবারও কথা বলছে না পিসি, ঠাকুমা একবার এসে ভারী গলায় জিজ্ঞেস করেন, একটু ঘোল খাবি?

না— খুব আস্তে আস্তে মাথাটা নেড়ে জানায় পিসি।

ঠাকুমার আজ মুখটা অমন কেন? চোখদুটো কেবলই ছলছল করছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ চোখ মুছে নিচ্ছেন আড়ালে দাঁড়িয়ে। সুকুমারী পিসিমার সুন্দর চোখদুটো লাল হয়ে রয়েছে— মাঝে মাঝে এসে ঘুরে দেখে আবার চলে যাচ্ছে। কেবল পিসি নিজে চুপ করে আছে, চোখও মুছছে না, কাঁদছেও না।

খুব জোর গলায় কে যেন হেঁকে ওঠে হঠাৎ, ওরে ধ্বজাধারী ঢোলে কাঠি দে, গায়ে-হলুদ হবে রে।

অমনি ধ্বজাধারীর ঢোল বেজে ওঠে বাইরের উঠোনে, তার ছেলের ট্যাং-টেঙে কাঁসরও।

গোলমাল হই-চই-এর মধ্যেও সে কখন শুয়ে থাকতে থাকতে গুটোনো পাকানো বিছানাটার ওপরই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভাঙে মায়ের ডাকে। মা মাথায় হাত দিয়ে ডাকছে, ও ছবু, ছবু, খাবিনে? সব ছেলেমেয়েরা খেয়ে নিল, তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি কত? কত বেলা হয়েছে, চল খেয়ে নিবি।

চোখ কচলে উঠে বসে সে বলে, গায়ে-হলুদ দেখব যে আমি, কখন হবে?

সে তো কখন হয়ে গেছে রে, তুই ঘুমোচ্ছিলি তখন? ঢোল বাজল, সানাই বাজল...!

হয়ে গেছে?

এদিক-ওদিক তাকায় ছবি। ওই তো মেঝের ওপর চুপ করে বসে আছে পিসি। মুখে, কপালে, সামনের খানিকটা চুলে হলুদের ছোপ ছোপ দাগ লেগে আছে তখনও।

কখন উঠে গেল? কখন সব হয়ে গেল? পিসি যেন একটা যন্ত্র। যে যা করাচ্ছে তাই করছে। কেউ হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উঠছে, বসিয়ে দিচ্ছে বসছে।

ওই ঢেঁকিঘরের ঢেঁকিটা যেমন! পা দিয়ে ওঠাও উঠবে, আবার নামিয়ে দাও নামবে— আবার...।

হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলে ছবি।

মা তাকে বারান্দার এককোণে পাতা পেতে বসিয়ে দেন, পাতের ওপর দু-তিনখানা ইলিশ মাছভাজা দিয়ে বলে যান, খাও ভালো করে, মাছ আছে দু-তিনরকম, আস্তে আস্তে খাও।

খেতে ভালো লাগছে না একটুও, অসময়ে ঘুমিয়েই হোক আর যে-জন্যই হোক।

রান্নাঘর থেকে ঠাকুমার কথা শোনা যাচ্ছে, মার গলা পাওয়া যাচ্ছে। এখনও রান্নাঘর থেকে বেরুতেই পারছে না কেউ। এখনও থালা-ভরা কোটা মাছ রয়েছে, দুটো উনুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। কাকিমা মাঝে মাঝে বাইরে এসে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যাচ্ছে, মুখখানা আগুনের আঁচে লাল, ধোঁয়া লেগে চোখদুটো লাল।

কে কাঁদছে রে? মুখের গ্রাসটাকে তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে ছবি উৎকর্ণ হয়ে থাকে। বিয়েবাড়ির দুপুরবেলার সমস্ত গোলমাল ছাপিয়ে হঠাৎ কার হাঁউমাউ করা কান্না একবার কেবল সারা বাড়িটায় ছড়িয়ে পড়েই মিলিয়ে গেছে। যেন কেউ হঠাৎ গলা টিপে চুপ করিয়ে দিয়েছে মানুষটাকে।

ঠাকুমা ছুটে এসেছে। এসেছে মা কাকিমা সবাই, কে কাঁদল রে অমন করে? শুভ কাজ বাড়িতে, অমন অমঙ্গুলে কান্না কার?

কান্নাটা শোনা গিয়েছিল হরিনন্দনের ঘরের ওদিক থেকে, কিন্তু তা থেমে গেছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে প্রদীপ এসে দাঁড়ায় দরজার কাছে, মা, অধীরকাকার পাঁচ বছরের জেল হয়ে গেছে। চিঠি পেয়ে নতুন দিদিমা কাঁদছে।

খাওয়া রইল মাথায়, এঁটো হাতেই ছবি ছোটে। মমতা বলেন পেছন থেকে, ভাত ফেলে উঠে যাচ্ছ বড়ো, মারব কিন্তু ছবু।

ততক্ষণে সে একেবারে হরিনন্দনের বারান্দায়। সেখানে বড়ো দালানে নতুন দিদিমা মুখের মধ্যে শক্ত করে কাপড় গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে, কিন্তু শরীরটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে আর অস্ফুটে একটা গোঙানির মতো শব্দ বেরিয়ে আসছে কাপড়ের ফাঁক দিয়ে।

হরিদাদু অস্থির হয়ে পায়চারী করতে করতে কাঁপা কাঁপা গলায় বলছেন, হ্যাঁ, ওই, ওমনি করেই কাঁদবে। ওদের বাড়িতে বিয়ে, ওরা বলবে ইচ্ছে করে অকল্যাণ ডাকছো! খবরদার।

অনেকদিনের বিস্মৃতির পর আবার সেই কাটা ক্ষতে ছুরির খোঁচা-খাওয়া ব্যথায় ছবি চমকে ওঠে আজ। এর মধ্যে কত নতুন নতুন ঘটনা ঘটে গেছে। আনন্দে, উত্তেজনায় কাকার কথাটা সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আজ আবার মনে পড়েছে।

তার হাত ধোওয়া হয়নি, মুখ ধোওয়া হয়নি, ভাত খাওয়া শেষ না করেই উঠে এসেছে, কিন্তু কান্না আটকানো গেল না। সেও কাঁদতে থাকে নিঃশব্দে এককোণে, চুপি চুপি চোরের মতো দাঁড়িয়ে। আজ ভোর থেকেই কে জানে কেন মনটা কেমন তার হয়েছিল, সেসব না-জানা দুঃখ চোখের জলের ফোঁটা হয়ে গাল বেয়ে নামতে থাকে। এক অনুচ্চারিত ভাষায় তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে থরথর করে।

মা কাকিমা এসে জোর করে নতুন দিদিমা আর লতু পিসিমাকে খেতে না নিয়ে গেলে কতক্ষণ সে কাঁদত কে জানে। তাকেও নিয়ে গেল। মার মেখে দেওয়া দলা খেতে হল বকুনি শুনতে শুনতে।

ওদিকে বেলা পড়ে আসে। বাইরে থেকে ছেলেরা বাড়ির মধ্যে আসছে, হুড়োহুড়ি করছে। খেয়ে উঠে মা কাকিমা আবার ঢুকেছে রান্নাঘরে।

ক্রমে পড়ন্ত বেলার ছায়া ছায়া অন্ধকার নামে বাড়িতে। বাইরে উঠোনে ধ্বজাধারী ঢোলে খুব আস্তে আস্তে কাঠি বোলাচ্ছে ছেলেদের আব্দার রাখতে। ট্যাং ট্যাং করে দু-একবার কাঁসর বেজেই আবার থেমে যায়।

পিসিকে এবার দোতলায় ছবিদের ঘরে নিয়ে গিয়ে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে তার ওপর সাদা চাদর পেতে বসিয়ে রাখা হয়েছে। রাত্রে নাকি এই ঘরে আবার বরকেও আনা হবে।

অন্ধকার হয়ে গেছে বলে ঘরের কোণে একটা বড়ো লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, সাদা চাদরের ওপর তার ছায়াটা বাঁকা হয়ে পড়ে আছে। তার ওপর পিসি বসে, তার মুখখানা দেখাচ্ছে আরও শুকনো, আরও কালো।

নীচের উঠোনটা হঠাৎ আলোয় ভরে উঠেছে। ছুটে গিয়ে কার্নিশের ওপর ঝুঁকে পড়ে ছবি। বড়ো কাকা একটা হ্যাজাক আলো জ্বালিয়ে উঠোনের কাপড় শুকোবার লম্বা লোহার ডান্ডাটার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সারা বাড়িটা এখন আলোয় হাসছে, ভাঙাচোরা দাঁত বের-করা বাড়িটার অন্য রূপ এখন।

এত ভালো লাগে এই আলো জ্বললে। বাড়িতে বিয়ে, পৈতে থাকলে কিংবা দুগ্‌গা পুজোর সময় কেবল এই আলো জ্বালানো হয়। সমস্ত অন্ধকার কোথায় যে পালিয়ে যায়। তখন নাচতে ইচ্ছে করে, ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে করে।

করছেও তাই ছেলেমেয়েরা। সেফুর গলা উঠেছে সবাইয়ের ওপরে, ছবিরও ইচ্ছে করে যেতে, কিন্তু বড়ো পিসিমা থাকতে বলে গেছে যে।

আজ কত আলো! মস্ত থালার মতো চাঁদও উঠেছে, সাদা ধবধবে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে সারা ছাদময়। দূরের গাছপালাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আজ একটুও ভয় করছে না ছাদে থাকতে। অন্যদিন হলে একা একা এ-ছাদে ছবি আসতেই পারবে না— একশো টাকা দিলেও না।

ঘর থেকে বিন্তি পিসিমা ডাকে ক্ষীণ সুরে, ছবু।

সে গিয়ে পাশে বসে গায়ে হাত দিয়ে চমকে ওঠে, তোমার গা কী গরম ছোট্‌পিসি? জ্বর হয়েছে তোমার? ঠাক্‌মাকে বলে আসব?

পিসি তাকে উঠতে দেয় না, বলে, সবাই জানে রে, তুই বসে থাক।

তার একটা হাতের ওপর হাত রেখে পিসি চুপ করে বসে থাকে।

সুকুমারী এসে ঢুকতেই ছবি ছুটি পায়, সে ছুট দেয় নীচে। পাড়ার একটা মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছে সুকুমারী, বলে, দে মা, যেমন-তেমন করে সাজিয়ে দে। চুল-টুল বেশি আঁচড়াস নে, জ্বরও হয়েছে হতভাগীটার। যা না করলে নয় তাই করে দে। দেরি হলে বাবা আবার রাগ করবেন।

উঠোন-ভরা আলোয় এ-বাড়ির, ও-বাড়ির একদল ছেলে মিলে হুল্লোড় করে লুকোচুরি খেলছে, কে যেন খুব জোরে ধমকে তাদের হুল্লোড় থামিয়ে দিল। সবাই ছুট দিয়েছে বৈঠকখানার দিকে।

সেফু বড়োদের একটা রঙিন শাড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে কলাবউ-এর মতো পরেছে

দেখে ছবিরও এতক্ষণে ভালো জামাকাপড় পরার কথা মনে পড়ে। মমতাকে সে টেনে আনে কাজ থেকে। মা বলে, পরবি তো, সে বাঁদরটাকেও ডেকে আন। সারাদিনের মধ্যে টিকি দেখলাম না।

মণিদাকে ডাকতে বৈঠকখানায় যেতে হবে। তা হোক। আজ আর একটুও ভয় করছে না সদর দরজাটা পেরিয়ে ওই রাস্তাটুকু যেতে। আলো যে সবদিকে— গোলমাল, চেঁচামেচি। ভয় কিসের।

হঠাৎ গোলাঘরের পাশটা থেকে কে যেন ডাকে, ছবি।

সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, বুকের ভেতরটা হঠাৎ প্রথমটায় ধড়ফড় করে উঠেছিল তার। কিন্তু ধ্যেৎ। ও যে মায়াদি।

অন্ধকারের মধ্যে ওদিকে কোথায় যাচ্ছ মায়াদি?

যাচ্ছি কি রে, এলাম তো বিন্তিকে দেখতে। ঘাটের পথ দিয়ে এসেছি মামিমাকে না জানিয়ে।

হঠাৎ হাত-পা ঠান্ডা-করা, কান্না-পাওয়া সেই কথাটা মনে পড়ে যায়। কী বলবে সে এবার মায়াদিকে? কিছু খবর এলেই মায়াদি তাকে জানাতে বলেছিল যে! সে মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে।

ছবি! —একবার ডেকে মায়াদি অপেক্ষা করে থাকে একটুখানি সময়, কোনও খবর আসেনি, না রে?

এসেছে। —তেমনি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কান্না-ভরা গলায় ছবি বলে, পাঁচ বছরের জেল দিয়ে দিয়েছে ওরা।

ভালো করে মুখটা দেখা যায় না, তবু অতটুকু মেয়ে ছবিরও কেমন করে যেন মনে হয়, কাঁদছে মায়াদি। নইলে একটাও কথা বলছে না কেন? হঠাৎ পিছন ফিরল কেন তবে?

বিন্তিপিসিকে দেখবে না মায়াদি? চলে যাচ্ছ?

না রে— আজ আর যাব না...। সেই অন্ধকারের মধ্যেই চুপি চুপি আসা ছায়াটা আবার মিলিয়ে যায়— কেউ দেখে না, কেউ জানতেও পারে না।

জামা পরে নীচেও নামতে পারেনি, এর মধ্যেই সারা বাড়িটার সবাই হুলুস্থুল করে চেঁচিয়ে ওঠে— বর এসেছে, বর এসেছে। পাড়ার মেয়েবউরা শাঁখ বাজায়, উলু পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে আর তার সঙ্গে ধ্বজাধারীর ঢোল, ইফ্‌তিকারের সানাই বেজে চলেছে একটানা।

বিকেল থেকে পিসির জ্বর। এখন আর মাথা সোজা করে বসতে পারছে না— পিঠের নীচে একটা বালিশ দেওয়া। কী করে যে বিয়ে হবে? ছবি ভেবে কূল পায় না।

কিন্তু বিয়ে হয়ে যায়।

ছাদনাতলায় বর এসে বসলে খানিকক্ষণ পরে মেয়ের খোঁজ পড়ে। ঠাকুরদা আজ সারাদিন উপোস করে আছেন, এখন একখানা গরদের কাপড় পরে বসে

আছেন বরের সামনের আসনে।

বড়কা, বাবা, নন্দকাকা আর রায়দের ছোটোছেলে এসেছে পিসিকে পিঁড়িতে বসিয়ে তুলে নিয়ে যেতে।

ওঠ্ বিন্তি, বড়ো পিসিমা আস্তে আস্তে বলে, শক্ত করে বড়দার হাত ধরে থাকিস, তাহলে আর মাথা ঘুরবে না।

বিন্তি পিসির ছলছলে চোখে কেমন অসহায়তার ছাপ। সে করুণ চোখে তাকায় ঠাকুমার মুখের দিকে, মমতার মুখের দিকে, তারপর কাজললতা-ধরা হাতখানা দিয়ে মেঝেটা যেন আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকে ছবির, যেমন করতে থাকে পুজোয় বলি দেবার জন্য অনিচ্ছুক পাঁঠাটাকে যখন সবাই মিলে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যায়— কিছুতেই যেতে চায় না জন্তুটা, যত দড়ি ধরে টানাটানি কর, তত সে করুণ চোখে তাকায়, কেঁদে কেঁদে ডাকে।

শেষ পর্যন্ত পিসি ওঠে। তাকে সাতপাক ঘোরানো হয়। বরের দিকে তাকায় দুই লাল লাল চোখ তুলে। ছেলেমেয়েরা অনেকে খুশিতে হাততালি দিয়ে হাসে, মেয়েরা ঝুঁকে পড়ে সেদিকে। পিসি কিন্তু একবারও চোখদুটো সরায় না।

বর্ষীয়সী কে যেন ভিড়ের মধ্যে ফিশফিশ করেন, আজকাল আর মেয়েদের লজ্জা-টজ্জা নেই দিদি। দিব্যি প্যাটপ্যাট করে দেখে নিল।

কথাটা শুনে ছবিও ভাবে— কী দেখল পিসি অমন করে? দেখতে তো বিচ্ছিরি (বলতে নেই) পিসেমশাই। কালো, মোটা, মাথার চুলগুলো সোজা সোজা।

সুকুমারী পেছন থেকে মেয়েকে দু-হাতে জাপটে ধরে বসে আছে, সেফুকে বলে ফিশফিশ করে, শিগ্‌গির তোর জেঠিমাকে ডাক সেফু, একখানা পাখা আন।

জোরে জোরে মাথায় হাওয়া করে সেফু। পিসির মাথাটা ঝুলে পড়েছে সুকুমারী পিসিমার কাঁধের ওপর। সরে-যাওয়া ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চন্দন জেবড়ে যাওয়া কালো শুকনো মুখ আর বোজা চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে।

মমতার আঁচল টেনে ধরে ভিড়ের বাইরে এনে ছবি বলে, পিসি মরে যাচ্ছে, তবু বিয়ে দেবে? দেখছো না কেমন করে রয়েছে পিসি?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে মমতা হাসার চেষ্টা করেন, বোকা নাকি তুই? জ্বর হয়েছে, সারাদিন উপোস। তাই ঝিমিয়ে পড়েছে অমন। কিছু হয়নি।

দূর। ভালো না, একটুও ভালো না বিয়ে। বিচ্ছিরি। দেখতে চাইনে আমি...। ছবি ছুটে চলে যায় কাকিমার ঘরে। পাড়ার বউ-মেয়েদের গোটা দুই-তিন ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের পাশে সেও মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে কাকিমার বিছানায়।

ঢোল বাজে, সানাই বাজে, হারান ঠাকুরের উচ্চকণ্ঠের মন্ত্র পড়া কানে যায়। কেমন কান্না পায় তার।



সাত

খুব কেঁদেছে ছবি। কেঁদে কেঁদে চোখদুটোকে ফুলিয়ে ফেলেছে বিন্তি পিসির চলে যাবার সময়। ঠাকুমা, বড়ো পিসিমার কান্না দেখে সত্যি সত্যি যেসব ছেলেমেয়েরা কেঁদেছে কিংবা ইচ্ছে করে জামা দিয়ে, হাতের তেলো দিয়ে ঘষে ঘষে চোখ লাল করেছে, নাক টেনেছে বারে বারে। তাদের সবাইয়ের হার হয়েছে ছবির কাছে।

আসলে পিসির চলে-যাওয়া দেখে নিজের যাবার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সে অত বেশি কেঁদেছে। তাকেও যে যেতে হবে এই কথাটা এতদিন মনে পড়েনি, আজ মনে পড়ে।

কিন্তু কাঁদলেই তো আর যাওয়া বন্ধ হয় না। আজ সকাল থেকে মমতা যে বারে বারে চোখ মুছছেন, তবু তো যাওয়া বন্ধ হচ্ছে না। তবু তো একবারও বলছেন না, না ছবু, থাকগে, তোর গিয়ে কাজ নেই।

বাবা, ঠাকুমা কেউ প্রথমে রাজি হয়নি মার কথায়। সুকুমারী পিসিমা বলেছে কিছুদিন পরে পাঠিয়ে দেবে, তবে মত দিয়েছে। দাদু তো কিছুতেই মত দেয়নি, তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবে বলাতেও না। পিসিমার ওপর রাগ করে আছে কাল থেকে।

তবু পিসিমা নিয়ে যাবেই তাকে। সে তো জানে, মুখে বললেও সহজে তাকে আসতে দেবে না। কাছে রেখে লেখাপড়া শেখাবে।

বাবা মুখ ভার করে এক একবার ঘুরে যাচ্ছেন। সেফু, মন্টু, পল্টুদা, সবাইয়ের মুখ ভার। সবাইয়ের কষ্ট হচ্ছে— কেবল মণিদাটা কী হিংসুক! সে শক্ত হয়ে বসে আছে সকাল থেকে, কথা বলছে না তার সঙ্গে একবারও। কেবল এক

একবার ক্ষেপে গিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া করে আসছে, কেন আমি বুঝি যেতে পারতাম না বড়পিসির সঙ্গে। পন্টু যেতে পারত না, সেফু পারত না? তুমি ওমনি ছবুকে পাঠাচ্ছ, জানিই তো, ছবুই তো তোমার বেশি..., ঝগড়া করতে করতে আবার কেঁদেও ফেলছে।

তখন বেশ মজা লাগছিল। বাঁধা-ছাঁদা চলছে। টিফিনক্যারিয়ারে খাবারও ভরে দেওয়া হল। দুখানা বড়ো পালকি বৈঠকখানার উঠোনে এনে রাখা হয়েছে, বেহারারা তামাক খাচ্ছে। একটা যাওয়ার ব্যস্ততা। কে যাবে? না— ছবি যাবে।

সবাইয়ের কাছে আজ সে আদর পাচ্ছে। কেউ তাকে বকেনি একবারও। কিন্তু খালি ঘরখানায় যখন আর কেউ নেই, জামা পরিয়ে মা তার চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন, নীচে থেকে বড়কাকার ভারী গলা শোনা যাচ্ছে, তখন ছবির আর ভালো লাগে না। সে এবার মাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। নিঃশব্দে কেঁদে কেঁদে মমতার চোখ তো ফুলেই আছে, মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে এবাব তিনি শব্দ করে কাঁদেন।

খানিকক্ষণ পরে মা-ই নিজেকে সামলে নেন। নিজের চোখ মোছেন, তার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে কান্না-জড়ানো গলায় বলেন, ভালো হয়ে থেকো কেমন? লেখাপড়া কোরো মন দিয়ে।

হাত ধরে তাকে নীচে আনেন। সেখানে সুকুমারী পিসিমা কাঁদছে, ঠাকুমা, কাকিমা, সেফু, ছোটোরা অনেকে— কেবল মণিদা নেই।

বৈঠকখানার উঠোনে এসে দেখে লতু পিসিমা আর নতুন দিদিমা এসেছে, আরও অনেকে এসেছে ছবিদের যাওয়া দেখতে।

আর দেরি নয়, ওঠ পালকিতে— কে যেন পেছন থেকে তাড়া দেয়।

মা বলেন, দাদুকে আর বাবাকে প্রণাম করে এসো ছবু। পণ্ডিতমশাইকে এই টাকা দুটো দিয়ে প্রণাম করো। আগে পণ্ডিতমশাইকে। কালী পণ্ডিত কেমন করে যেন খবর পেয়ে এসেছেন— ছবির মাথার ওপর হাতখানা রেখে তিনি মমতার মুখের দিকে তাকান, কিন্তু ঘোমটা-টানা মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায় না— কেবল লক্ষ করলে ফোলা ফোলা চোখদুটো হয়তো নজরে পড়ে।

বাবা তার পিঠের ওপর হাত রেখে তাকে একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করেন, কিন্তু সোজাসুজি তার দিকে তাকাচ্ছেন না, মুখটা ফিরিয়ে রেখেছেন।

পিশেমশাইয়ের পালকিখানা আগে চলে গেল। সেদিকে দু-একজন এগিয়ে যায়। কিন্তু এ পালকিখানাকে কেউ যেন ছাড়তে চায় না। পিসিমা ভেতরে বসে মুখ বার করে আছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিকেও হাত ধরে ভেতরে বসিয়ে দিতে যাবে— হঠাৎ দূর থেকে কে যেন ডাকে, ছবু!

ছুটতে ছুটতে প্রদীপ এসেছে। প্যান্টের পকেট থেকে সে কাঁপা হাতে একমুঠো

কী যেন বার করে তার হাতে দেয়। কী? একমুঠো বেতফল। বলে, খিড়কির ঘাটের গাছগুলোয় হয়েছিল, এখনও পাকেনি ভালো করে, তবু নিয়ে এলাম।

মণিদার চোখ লাল, ঠোঁট কাঁপছে। সে কি শুধু রোদ্দুরের জন্য, না ছুটে আসার জন্য। এতক্ষণে ছবি স্পষ্ট করে বুঝতে পারে, হিংসে নয়— মণিদার খুব কষ্ট হয়েছে, তাই অমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে সারাটা দিন। চুপি চুপি কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে।

প্রদীপের হাতখানা ধরে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, আমি খানিকটা পর্যন্ত মণিদার সঙ্গে হেঁটে যাই মা? তারপরে পালকিতে উঠব?

শ্যামলও এসেছে। দুর্গা, উমা, বাসন্তী সবাই। ছবির শুকনো চোখ আবার জলে ভরে ওঠে।

বাবা শুনতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলেন, চলুক না, আমিও তো যাচ্ছি বোসপুকুর পর্যন্ত। প্রদীপও ফিরে আসবে আমার সঙ্গে।

তবে ছেলেমেয়েরা সবাই যাবে। সেফুও হঠাৎ চলতে শুরু করে।

কিন্তু কতটুকুই বা পথ। আস্তে হাঁটলেও ফুরিয়ে যায়। প্রদীপ ছবির হাত শক্ত করে চেপে ধরে কেঁদে ফেলে। শ্যামল তার আর-একটা হাত ধরে রেখেছে। পল্টু পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, মন্টু, সেফু ছলছলে চোখ বারে বারে মুছছে। দুর্গা, উমা, বাসন্তীদের বাড়ি থেকে বেরুনো বারণ— তবু ওরা এসেছে এতদূর। কেমন করে যাবে ছবি। কিন্তু তবু যেতে হয়। পালকিওয়ালাদের তাড়ায় ভেতরেও ঢুকতে হয়। মুখ বার করে ওদের দিকে তাকিয়ে ছবি হাত নাড়ে, চোখ দিয়ে জল পড়ে, চিৎকার করে অনাবশ্যক জোরে, মণিদা, সেফু! মণিদা! শ্যামল, দুগ্‌গা-আ!

ছবু-উ...! —প্রদীপ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে হাত নাড়ে, চোখের জলে তার সামনের সবকিছু ঝাপসা হয়ে যায়।

এবার ছেলেমেয়েরা সবাই মিলে হাত নাড়ে আর চেঁচায়- — ছবি! ছবি-ই-ই।

পালকির বেহারারা পথের কষ্ট কমাবার জন্য একসঙ্গে একটানা একটা সুরে চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে। দূর থেকে ভেসে-আসা শিশুকণ্ঠের শব্দ তাদের সেই মিলিত সুরে ডুবে যায়।

দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ করে ছবি প্রাণপণে তাকিয়ে থাকে। তবু একটু একটু করে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে মণিদারা। এবার আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু খানিক ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্টতা।



আট

সারা রাস্তা ফুলে ফুলে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে ছবি, অঝোরে। চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে গেছে। কী এক ব্যথায় তার বুকের ভেতরটা গুমরে উঠছে তা সে নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না।

মা'র জন্য কি তার বেশি কষ্ট হচ্ছে? ঠিক বুঝতে পারে না। তবে কী বাবা? তবে কি মণিদা? তবে কী...? তবে কে...?

এই তো কদিন আগেও বাড়িতে পল্টু, সেফুদের সঙ্গে বসে কত গল্প করেছে সে— গাড়ি চড়বে সে, ইস্টিমার চড়বে, শহরে যাবে— কত মজা। ওরা তাকে হিংসে করেছে— হিংসে করেছে পাঠশালার বন্ধুরা।

আজ সে-আনন্দ কোথায় গেল? তার ইচ্ছে করে পালকি থেকে লাফ দিয়ে সে ছুটে পালায়। ওদের সবাইকে ডেকে বলে, তোরা যা ভাই। চাইনে আমি যেতে, চাইনে মজা।

সুকুমারী পিসিমাও কাঁদছে, কিন্তু সে-কান্না তার মতো অত উদ্দাম নয়। তার যেন ছন্দ আছে, মাত্রা আছে।

পিসিমার বড়ো বড়ো সুন্দর চোখদুটো লাল হয়েছে, পাকা করমচার রঙের মতো লাল। মাঝে মাঝে আঁচলে চোখ মুছে ফেললেই আবার জল গড়িয়ে পড়ছে।

ছবিরও ইচ্ছে করছে অমন করে থেমে থেমে কাঁদতে, অমন স্থির হয়ে থাকতে। কিন্তু সে পারছে কই? তার বুকের মধ্যে কি যেন একটা কেবলই ওপর দিকে ঠেলে ঠেলে উঠে রাশ রাশ জল দিয়ে তার গাল মুখ ভাসিয়ে দিচ্ছে।

পালকিটা হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে মাটিতে নামল— বেহারারা একটু বিশ্রাম নেবে।

চোখ মুছে ফেলে পরম আগ্রহে ছবি পায়ে-চলা সরু রাস্তাটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এই পথ দিয়েই তো সোজা হেঁটে গেলে সে গ্রামে পৌঁছতে পারে।

ওই যে স্টেশন থেকে একদল লোক চলেছে গাঁয়ের দিকে। ওরা তাদেরই গাঁয়ের ওপর দিয়ে যাবে— হয়তো বৈঠকখানার ওপর দিয়ে, কিংবা বড়োপুকুরের পাড় দিয়ে। হয়তো বাবার সঙ্গে দেখা হবে ওদের— মণিদার সঙ্গেও। কিন্তু কেউ ওরা জানতে পারবে না যে ছবিকে ওরা দেখে গেছে।

আচ্ছা মা কী করছে এখন? নিশ্চয়ই তার কথা মনে করে কাঁদছে। মণিদা? মণিদাও! কেবল বাবার কান্নাটা কেউ বুঝতে পারছে না। বাবাদের মতো বড়রা তো আর জোরে জোরে কাঁদে না।

সকালবেলা রোজ খিড়কিপুকুরে মায়াদি আসবে, রোজ মণিদা যাবে মুখ ধুতে— ডাহুকটা ডাকবে, চ্যালামাছগুলো ঘুরে বেড়াবে, ভাঁটি ফুল ফুটবে— ছবি থাকবে না।

ভোরবেলায় সূর্য উঠবে— ছবি থাকবে না।

পাঠশালায় রোজ উমা, বাসন্তী, দুর্গা আসবে— শ্যামল কদিন মনখারাপ করে ঘুরে বেড়াবে— ছবি থাকবে না।

কোথাও থাকবে না ছবি— কোথ্থাও না।

পালকির গায়ে রাস্তার পাশ থেকে ছোটো একটা বুনো গাছ ঝুঁকে পড়েছে। বেহারারা পালকিটা আবার কাঁধে তুলে নেবার আগেই সে এবার গাছটা মুঠো করে প্রাণপণে চেপে ধরে কাঁদে, কোনও শব্দ হয় না। কেবল অব্যক্ত ভাষায় তার কাঁপা কাঁপা ঠোঁট দুখানা যেন বারে বারে বলে, যাব না, আমি যাব না।

সুকুমারী তার হাতের মুঠোটা আলগা করে দিতে দিতে ভারি গলায় বলে, ছবি! ওটা ছেড়ে দে। হাত কেটে যাবে।

পালকিটা চলতে শুরু করলে আপনা থেকেই হাতের মুঠোটা খুলে যায় টান লেগে কিন্তু সবুজ পাতাগুলোর রস তার হাতে লেগে থাকে তখনও— কেমন বুনো বুনো গন্ধ রসের।

এইবার তারা গাঁয়ের সীমানা পার হয়ে স্টেশনের বাঁধানো রাস্তাটায় পড়েছে। দূরে লম্বা লম্বা থামের মাথায় সরু তার দেখেই ছবি বুঝতে পারে। মোটা সাদা পাথরের গায়ে ইংরেজি অক্ষরের হিসেব— ওগুলো মাইলের চিহ্ন। বড়কার কাছে একদিন গল্প শুনেছে সে।

কান্নাভরা ঝাপসা চোখে সেগুলো যত দেখে তত তার বুকের ভেতরটা আকুলি-বিকুলি করে, হাত দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে ওই নাম-না-জানা বুনো গাছের বুনো গন্ধটা তার সারা মুখে মাখামাখি হয়ে যায়।

ছবি! —গাঢ় গভীর গলায় কে যেন তাকে ডাকছে। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়া চেতনায় সে ডাকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কে ডাকছে। মা?

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সুকুমারী বলে, ছবি! সোনা! লক্ষ্মী! আর কাঁদিসনে। দেখ তো আমি যে কতদিন পরে এসেছিলাম, আর কোনওদিন হয়তো আসতে পাব না, আমি কি অত কেঁদেছি?

অস্থিরতাটা একটু কমে। সে সুকুমারীর বুকে মাথা রেখে চুপ করে থাকে। জল এবার দু-গাল বেয়ে গড়ায়, মাঝে মাঝে তার মুখের মধ্যেও দু-এক ফোঁটা জল ঢুকে যায়— কেমন নোনা তার স্বাদ।

সুকুমারী বলে, এ-বাড়িতে যা কোনওদিন হয়নি তোকে দিয়ে তাই আমি করাব ছবি। তোকে লেখাপড়া শেখাব।

নিস্তব্ধ হয়ে ছিল, হঠাৎ এবার ফুঁসে ওঠে ছবি, আমার মা? আমি অতদিন থাকব নাকি? লেখাপড়া চাইনে। মাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

এতক্ষণ ছিল অনির্দেশ্য একটা ব্যথা, এবার সেটা কেমন আশঙ্কার মতো ছবির হাত-পা ঠান্ডা করে দেয়। আতঙ্কিত ফ্যাকাশে মুখে সে কাঁদতেও ভুলে যায়।

পিসিমা তার মাথাটা বুকের মধ্যে আরও নিবিড় করে চেপে ধরেছে, ছবি তা বুঝতে পারে। তার বুকের মধ্যে শিরশির করে কিন্তু মাথা তুলতে পারে না। তার ভেজা মুখখানায় কোমল হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সুকুমারী বলে, মার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি বলে তোর খুব দুঃখ তা আমি জানি ছবু। তাই বলে আমাকে কি তুই ভালোবাসবিনে?

তার শক্ত করে ঘুরিয়ে রাখা মুখখানা জোর করে তুলে ধরে লাল ভেজা ভেজা চোখে সুকুমারী যেন মিনতি করতে থাকে, আমাকে তুই মা বলে ভাবিস ছবি। আমার কেউ নেই— ছেলেমেয়ে কেউ না। তুই আমার মেয়ের মতো হয়ে থাকবি— পারবিনে ছবি? তার দু-চোখের গড়ানো জল এবার ছবির কপালে পড়ে, চুলে ঝরে পড়ে।

কত লোভ দেখানো হয়। তাহলে কি কাঁদে মানুষ? পিসি কী বলতে চায় তাকে? একজনের মেয়ে হয়ে কি আর-একজনের মেয়ে হওয়া যায়?

একটু অপেক্ষা করে সুকুমারী আবার বলে, পারবিনে ছবি?

কী পারতে হবে ভালো করে তা বোঝেও না, অন্যমনস্কের মতো মাথা নেড়ে ছবি জানায়, হ্যাঁ— সে পারবে।

তার কপালে চুমু খায় পিসি, তার চোখের ওপর চুমু খায় যেমন করে কাকিমা চুমু খায় তার এক বছরের খোকাকে। লজ্জায় আর নতুন অনুভূতিতে ছবি আড়ষ্ট হয়ে থাকে।

মা তো আদর করে কিন্তু মা তো চুমু খায় না। কোনওদিন তাকে চুমু খায়নি। মা কারোর সামনে আদর পর্যন্ত করতে লজ্জা পায়।

ছবি কেমন বিহ্বল হয়ে যায়। সমস্ত শরীর তার ক্লান্ত হয়ে গেছে কান্নায় আর ভাবনায়? সে কাঁদতেও পারছে না, ভাবতেও পারছে না আর।

সুকুমারী তার গুটিয়ে থাকা পা দুখানা আর-একটু সামনে ছড়িয়ে দেয়— মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। মেয়েটার আড়ষ্ট মুঠো করে থাকা হাত এবার শিথিল হয়ে পড়ে পাশে। তার ক্লান্ত চেতনায় নাড়া দিয়ে কে যেন কী বলছে, কে যেন গুনগুন করে কী বলছে— ছবি তার কিছু বুঝছে, কিছু বুঝছে না।

তার বোজা চোখের সামনে কখনও এসে দাঁড়াচ্ছে মা— কিন্তু তুমিই তো আমাকে দিয়ে দিয়েছ পিসিমাকে। চলে যাচ্ছি বেশ হয়েছে। নিঃশব্দ কান্নায় ঠোঁট তার ফুলে উঠছে।

মণিদা! মণিদা ভাই, কাঁদিসনে। আবার আমি আসব দেখিস।

অধীরকা! আমিও তোমার মতো কত দূরে চলে যাচ্ছি দেখেছ?

মাথাটা বারে বারে ঝুঁকে পড়ছে, হাতখানা কখন একসময় ঝুলে পড়েছে পালকির বাইরে— সুকুমারী ঠিক করে দেয় সযত্নে।

তারপর একটা হই-চই করা বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে ছবির স্বপ্নটা ভেঙে যায়। কে যেন কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে তার ঘুম ভাঙাচ্ছে, অ্যাই ছবি, ওঠ ওঠ। দ্যাখ দ্যাখ, ঘুমোচ্ছে কেমন করে।

বড়কার মুখটা ঝুঁকে পড়েছে তার মাথার ওপর। সবাইয়ের আগে স্টেশনে হেঁটে এসেছে বড়কা। শক্ত করে ছবি বড়কার হাত ধরে থাকে, গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত।

গদি-দেওয়া বেঞ্চ, গাড়ির ছাদে কি যেন একটা চাকাব মতো জিনিস লাগানো আছে। বড়কা বলে, ওটা পাখা। গাড়ি চললেই ওটা ঘুরবে, তখন আর গরম লাগবে না একটুও।

পিসেমশাই কুলিদের দিয়ে মাল তোলাচ্ছেন। পিসিমা বিছানা পেতে রাখছে বেঞ্চে— গদির ওপরেও আবার বিছানা!

অন্ধকার হয়ে এলেও স্টেশনটায় অনেকগুলো আলো জ্বলছে— সব দেখা যাচ্ছে তাতে। দুটো-তিনটে নীল-জামা পরা কুলি এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে।

সামনের খড়ের ছাউনি-দেওয়া ঘরের বারান্দায় তিন-চারজন মেয়েমানুষ কতকগুলো পোঁটলা সামনে নিয়ে বসে আছে বোকার মতো। আর একজন পুরুষমানুষ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বারে বারে কী যেন বলছে কালো কোট-পরা লোকটাকে। কে যেন কার নাম ধরে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে। যারা বসে আছে তারা কি যাবে না?

বড়কা বলে, না, ওরা বিনে টিকিটের যাত্রী। ধরে রেখে দিয়েছে।

ছবির কষ্ট হয় ওদের জন্য, বড়কা বললে ছাড়বে না? পিসেমশাই বললেও না?

টং টং করে কী যেন বেজে উঠল। পিসেমশাই এবার গাড়িতে উঠে পড়েছেন— গাড়ি থেকে কুলিদের পয়সা দিচ্ছেন, পালকির বেহারাদের পয়সা দিচ্ছেন। মোটা একটা ব্যাগ। পিসেমশাইয়ের অনেক টাকা। তাহলে ওই লোকগুলোকেও তো কটা টাকা দিতে পারেন? —ওই যারা বিনা টিকিটের যাত্রী।

একটা কালো প্যান্ট-পরা লোক মুখের বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে বাঁ হাতে একটা সবুজ নিশান দেখাচ্ছে। এই কথাটা সে কতবার শুনেছে— সবুজ নিশান দেখালে গাড়ি ছাড়ে।

এবার তবে ছাড়বে। ছবির হাত-পা হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে যায়। সবখানি শক্তি দিয়ে সে প্রাণপণে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে, তবু মনে হয় কী যেন সে হারিয়ে ফেলেছে, কী যেন সে দেখতে পাচ্ছে না।

এখুনি সে চলে যাবে কোথায়— কত দূর।

সে পাগলের মতো চিৎকার করে, বড়কা শিগ্‌গির, শিগগির তুমি এখানে এসো।

সুখদা জানলার ঠিক নীচেই দাঁড়িয়েছিলেন। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলেন, আমি তো এখানেই আছি রে। অত ঝুঁকিসনে।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে। সুখদা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকেন। পিসিমা, পিশেমশাই সবাই আর-এক জানলা দিয়ে মুখ বার করে আছে— পিসিমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কিন্তু ছবি দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে আছে। চোখ দুটো ভিজে ভিজে আসছে— তবু চোখ দিয়ে জল পড়ছে না।

সুখদা এবার হাত তুলে ছবির মুখখানা ছুঁয়ে দিয়ে বলেন, কেঁদো না ছবি। গিয়েই সবাইকে চিঠি দিও— কেমন?

ছবি মাথা নাড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তার আগেই গাড়ির গতি বেড়েছে— বড়কার চেহারা আড়াল পড়ে গেছে। এবার ছবির দু-গাল বেয়ে যত জল গড়াক না, বড়কা তো আর দেখতে পায়নি।

তারপর গাড়ি চলার তালে তালে কালো অন্ধকার থেকে কত অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে দুপাশের বনেজঙ্গলে। জ্বলেছে আর নিভেছে— কাছে এগিয়ে এসে আবার দূরে পালিয়ে গেছে। কত ছোটো ছোটো আলোর ফুলকির মতো গাগুলো, ছোটোখাটো দুটো একটা স্টেশন শট শট করে পার হয়ে চলে গেছে। একমনে চোখ পেতে থেকেছে ছবি সেই অন্ধকারে, আর কান পেতে শুনেছে একটা শব্দ। যেন নিঃশব্দে কুসুমপুর গ্রামখানা তখনও পেছন পেছন ছুটে আসছে, বলছে— ছবি আয়, ছবি আয়।

ওই জোনাকি পোকগুলো তো তাদেরই গাঁয়ের জঙ্গলে থাকে, ওই যে মাঝে মাঝে টিমটিমে আলো, সে তো গাঁয়ের আলো।

গাড়িব ঢাকনা দেওয়া আলোটার চারপাশে কতকগুলো পোকা মাথা ঠুকে ঠুকে মরছে— ফ্যাকাশে আলোর খানিকটা এসে পড়েছে ছবির মুখে। ওর জানলার ওপর রাখা মাথাটা মাঝে মাঝে ধাক্কা খাচ্ছে। জলের দাগ তখনও গালের ওপর শুকিয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে ওকে ধরে শুইয়ে দিয়ে সুকুমারী ওর মাথার কাছে বসে থাকে— রাত হয়েছে, তার নিজের শোবার কথাটা মনেই পড়ে না।

ছবির শ্রীহীন রুক্ষ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে সে ভাবে মমতার কথা।

শহরের মেয়ে বউ হয়ে এসেছে। সে-বউ দেখতে ভেঙে পড়েছিল গ্রামের লোক। শুধু বউ নয়— বেশ বেশি বয়সের বউ। গ্রামে অত বয়সের বড়ো বউ তখনও আসেনি। সবাই আশা করেছিল শহুরে মেয়ের দু-চোখে বোধ হয় থাকবে

অন্য এক দৃষ্টি— সে-চোখের দিকে তাকানো যাবে না। তার কথায় থাকবে ছুরির ধার— হাসিতে ব্যঙ্গ— চলায় বিরক্তি। সে সইতে পারবে না এ সংসারের উদয়াস্ত পরিশ্রমকে— বইতে পারবে না বউ হয়ে থাকার যন্ত্রণাকে।

কিন্তু কোথায়? ভারী শান্ত— ভারী ভীরু একটা মেয়ে। সে চোখ তুলে তাকাতে জানে না। তার কথার স্বর ভয়ের খাদে ডুবে যায়। তার চলা কাঠবেড়ালির পায়ের শব্দকেও হার মানায়।

কতটুকু তখন সুকুমারী। ছবির মতোই বয়স তার তখন। সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছিল সে। এই কি তার শহর থেকে আসা বউদি? কাউকে চমকানো গেল না— নতুন কিছু দেখাতে পারল না, উলটে সবকিছুকে মেনে নিল মাথা পেতে। যা পেল তাতে খুশি— যা পেল না তাতেও।

গান জানতেন মমতা, সেতার বাজাতে জানতেন। সেসব এনেওছিলেন সঙ্গে করে। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জনের একদিনের আপত্তিতে সেই যে চুপ করে গেল নতুন বউয়ের গলার স্বর, আর কেউ শোনেনি এ-বাড়িতে। আর কোনওদিন বাপের বাড়ি থেকে আসা হারমোনিয়ামটার ডালাও খোলেনি সে, সেতারটায় ধুলো পড়েছে— ভেঙেছে-চুরেছে। তারপর সেটা কোনদিন বুঝি নিজেই ফেলে দিয়েছে জঞ্জালের সঙ্গে।

সুকুমারী ভালো করে বোঝাতে পারত না। তবু অবাক বিস্ময়ে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত, তোমার রাগ হয় না বউদি?

শান্ত চোখ তুলে বড়ো ভাতের হাঁড়ি নামাতে নামাতে জিজ্ঞেস করতেন মমতা, কীসের রাগ ভাই?

এই ধর..., ঢোক গিলে সে বলত, তুমি তো শহুরে মেয়ে, তোমাদের কত সুখ ছিল— আমাদের এ-বাড়িতে কত কষ্ট, কত কাজ— তোমাদের কষ্ট হবে না? একটু গান পর্যন্ত গাইতে দেয় না বাবা।

হ্যাঁ ওটা একটা কষ্ট বটে— তাও প্রথম প্রথম হত। এখন তো আর হয় না ভাই। শহুরে হলেই কি সবাই সুখী হয়? মানুষ যা চায় সবসময় তা পায় না— আমার এই সুখ..., বলে হয়তো ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিভে যাওয়া কাঠগুলোকে আবার দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন মমতা, নয়তো বাটনা বাটতে বসতেন, নয়তো মাছে নুন-হলুদ মাখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। সুকুমারী স্পষ্ট করে আর মুখটা দেখতে পেত না। সে জানত মমতার মা-বাবা কেউ নেই, ভাইদের কাছে আশ্রয় পাওয়া মেয়ে, বিয়ে হয়ে গিয়ে নিজের সংসার পেয়ে খুশি হয়েছে বলেই দুঃখটাকে জয় করেছে। এর বেশি কোনওদিন সে ভাবতে পারেনি— ভাববার ক্ষমতা ছিল না বলেই।

তারপরে কত কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে সংসারে। পৃথিবীতেও। তার জীবনেও।

তারপর নিজের কথা ভাবতেই দিন চলে গেছে। গ্রাম্য মেয়ের সামান্য কামনা

থাকে— একটা বিয়ে। তাই হয়তো সবায়ের মতো তারও চাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশি সে কিছু চেয়েছিল। সে-কথা সুকুমারী জানতেন আর জানতেন বলেই বোধহয় তাকে বেশি ভালোবাসতেন। কিন্তু সেও তো স্বপ্ন— না-বোঝার স্বপ্ন।

যা সত্যি তাই কেবল সার্থক হল না। সুকুমারী সুখী হল না। এখন আর সে ছেলেমানুষের মতো কাউকে সুখের কথা জিজ্ঞেস করে না— তাকিয়ে দেখে বুঝতে চেষ্টা করে।

এবার দেখে এসেছে বউদির চুলগুলোর মধ্যে দুটো-একটা পাকা চুল। বউদি বুড়ো হয়ে গেছে। নিঃশব্দে থেকে থেকে একদিন কেমন করে যেন বুড়ো হয়ে গেছে।

অথচ কী যেন বলবার ছিল তার— কী যেন সাধ ছিল— আশা ছিল। সে-কথা কাউকে বলতে পারেনি— সে-কথা কেউ শুনতে চায়নি।

একদিন সুন্দর ছিল যে মেয়েটা, ষোলো বছরের একটা নিটোল স্বাস্থ্যের যৌবন আজ প্রায় প্রৌঢ়া হয়ে এসেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলো বুকের মধ্যে জমিয়ে রেখে রেখে আরও বেশি গম্ভীর, আরও বেশি দুঃখসহা হয়ে উঠেছেন মমতাময়ী। বিয়ের আগের জীবনে তিনি কী চেয়েছিলেন তাও যেমন কেউ জানেনি— এ জীবনে তাঁর কী পাওয়া হল না তাও কেউ জানে না। তিনটে ছেলেমেয়ে মরে গিয়ে নিজেকে সাতটা ছেলেমেয়ে মরে যাওয়া শাশুড়ির চেয়েও বেশি করুণ করে রেখেছেন সারাক্ষণ।

কিন্তু তবু বোঝা যায়। আসলে মমতা যে সুখী হননি সেটা এবারই স্পষ্ট করে বুঝে এসেছে সুকুমারী। যদিও ছত্রিশ বছরের বড় বউয়ের মুখে এখন আর সে-কথাটা মানায় না। তবু আজই, এতদিন পরেই বোধ হয় এই নিঃশব্দে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া প্রাণটা এত স্পষ্ট করে বলে ফেলেছে ছবিকে তার হাতে তুলে দিতে দিতে, ছবি, সত্যিই আমার মনের ছবি ভাই। ওকে তোর হাতেই তুলে দিলাম।

ছবি বউদির সেই অসুখী মনের প্রতীক। ওর চোখমুখের বন্য ভাবটা বুনো গাছের কথা মনে করায়। কী যেন একটা আকাঙ্ক্ষা আছে ওর— সেই লুকোনো জ্বালাটা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কী চাই ওর? কী?

ছবির মুখের দিকে ভালো করে আবার তাকায় সুকুমারী। মেয়েটার বিষণ্ণ মুখখানায় সারাদিনের কান্নার ছাপটা যেন গাঢ় হয়ে লেগে আছে, চওড়া কপালটা বিরক্তিতে কুঁচকে আছে। হয়তো স্বপ্ন দেখছে— মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে তাই।

ওকে সব দেবে সুকুমারী। স্বামীর কাছ থেকে ভালোবাসার বদলে আর যা কিছু পেয়েছে সে— টাকাপয়সা, জামা-কাপড়, গয়না। যা চায় ছবি— যা আছে সুকুমারীর। তাহলেও কি বুনো মেয়েটা শান্ত হবে না!

একবার ঘুমের মধ্যেই মস্ত বড়ো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ছবি। সুকুমারী একখানা হাত আলগোছে ওর গায়ের ওপর রাখতে ঘুমের ঘোরে সেই হাতখানাকে কী মনে করে আঁকড়ে ধরেছে মেয়েটা।



নয়

খুব ঘুমিয়েছে ছবি। সুকুমারী পিসিমা তাকে ডেকে তুলে খাবার খাইয়েছে। এখন তারা বসে আছে ইস্টিমারের অপেক্ষায়। আজ সারাটা দিন নাকি ইস্টিমারে কাটিয়ে কাল সকালে তবে তারা পৌঁছোবে শহরে।

এতক্ষণ গাড়িতে এসেছে ছবি। তাদের গ্রামের মাটি আর রেলগাড়ি গড়িয়ে আসা মাটিতে কেমন একটা যোগ আছে। এ মাটিতে কান পাতলে এখনও যেন শোনা যাবে সেই ডাকগুলো, ছবি-ই! ছবি-ই!

হেঁটে গেলে! ক-ত—ক-অ-ত মাইল হেঁটে গেলে তবে পৌঁছানো যাবে!

কিন্তু জলে কোনও উপায় নেই। ওই যে ইস্টিমারটা তার বিরাট সাদা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে দেখে ছবির যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মস্ত বড়ো নদীটা— কতদূর পর্যন্ত তার জল, কূল দেখা যায় না। কোথায় যে চলে যাবে তারা। মাটি থাকবে না— মাটির গন্ধ থাকবে না।

সিঁড়ি দিয়েছে ইস্টিমারের। পিসিমা শক্ত করে ছবির হাত ধরে রেখেছে, তার না চলে উপায় নেই। ভিড়, ঠেলাঠেলি। তার মধ্য দিয়ে অনিচ্ছুক পা দুটো টেনে টেনে সে চলেছে সবাইয়ের সঙ্গে।

কান্নার চেয়েও বেশি করে একটা আগ্রহ মেশানো কৌতূহলের ভাব তার চোখের জলকে বারে বারে চোখেই শুকিয়ে দিচ্ছে।

কাঠের সিঁড়ি, দড়ির রেলিং। পেছন থেকে অনবরত ধাক্কা খেতে খেতে মানুষগুলো যেন আপনা-আপনি উঠে যাচ্ছে।

সিঁড়ির ওপরেই সারি সারি মানুষ মালপত্র নিয়ে বসে আছে। এরই মধ্যে অনেকে বিছানা পর্যন্ত পেতে ফেলেছে। গোলমাল, হইচই। কিন্তু ছবিদের ওখানে

দাঁড়াতে নেই। ওটাকে বলে ডেক। তারা থাকবে কেবিনে। যারা বেশি টাকা দিতে পারে না— তারাই ডেকে থাকে। পিসেমশাইয়ের অনেক টাকা— মণিদা বলেছিল।

কে যেন ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। চমকে উঠে ছবির মনে হয় এ যেন তারই বুকফাটা কান্না।

কে কাঁদছে রে? ওই যে ওই কোণে একটা ছোটো মেয়ে, সেফুর মতো সে। খালি গায়ে তার ডুরে শাড়ি পরা। মাথার লাল লাল জটা-করা চুলের মধ্যে মোটা করে সিঁদুর দেওয়া। কপালের মস্ত বড়ো ফোঁটাটা বেঁকেচুরে গিয়ে সারা কপাল মাখামাখি হয়ে গেছে।

বিয়ে-হওয়া মেয়ে। ছবি ওরকম কুসুমপুরেও দেখেছে। কাঁদছে কেন? বোধ হয় মাকে ছেড়ে এসেছে, বোধ হয় ওরও কুসুমপুরের মতো একটা গ্রাম আছে, মণিদা আছে, বন্ধুরা আছে— তাই কাঁদছে। ওর পাশে বড়কার মতো বড়ো একটা কালো লোক বসে আছে চুপ করে। সে একটা কথাও বলছে না— মেয়েটাকেও থামাচ্ছে না, কেমন বোকার মতো লোকজনদের দিকে তাকিয়ে আছে হাঁ করে।

সুকুমারী বলে, চল ছবি, অমন করে দাঁড়ালি কেন?

খুব সুন্দর ঘর। ট্রেনে তবু আরও লোক ছিল— এ-ঘরটা নাকি তাদেরই কেবল। এখানেও পাখা আছে— আলো আছে। কাপড় রাখবার ব্র্যাকেট আছে, আয়না আছে। দরজার বাইরে খানিকটা খোলা জায়গা— সেখানে নীল লুঙ্গি-পরা একটা লোক দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, এবার সে পিসেমশাইকে একটা সেলাম করল।

ইস্টিমারটা হঠাৎ ভীষণ মোটা সুরে শব্দ করে উঠতেই ছবি চমকে সুকুমারীকে জড়িয়ে ধবে। সুকুমারী বলে, ভয় কী রে? ওটা জাহাজের বাঁশি। একটু পরেই ছাড়বে কিনা তাই।

খুব ব্যস্ততা আর গোলমাল বেড়েছে বাইরে। ইস্টিমারটা হঠাৎ একটু একটু কাঁপতে শুরু করেছে, আর সেই সঙ্গে কাঁপছে ঘরের সব কিছু।

আরও একবার বাঁশি বাজাল জাহাজটা— তার শব্দটা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। থেমে গিয়েও যেন গমগম করে চলে যাচ্ছে বহুদূরে। কত দূর? শব্দটা কি কুসুমপুরে যাচ্ছে? মা এখন কী করছে? হয়তো ডালে কাঁটা দিচ্ছে। শব্দটা শুনে কাঁটা রেখে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। হয়তো বাটনা বাটছে— শব্দটা শুনে বাটনা বাটা বন্ধ করে চুপ করে ভাবছে।

একটু একটু করে পাড় থেকে আলাদা হয়ে ইস্টিমারটা বেশি জলে গিয়ে পড়েছে। ছবির চোখ ছাপিয়ে আবার জল পড়ে, তবু জোর করে সে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে

কটা কাক উড়ে এসে বসেছে ইস্টিমারের রেলিংয়ের গায়ে। আবার উড়ে যাচ্ছে। ওদের বেশ মজা। যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারে। এখন কোথায় যাবে? কুসুমপুরে যেতেও তো পারে।

পিসিমা ডাকছে। তাড়াতাড়ি ফ্রকের কোণটা দিয়ে চোখ মুছে ফেলে সে।

সুকুমারী তার চুলে তেল মাখিয়ে পাশের ঘরের দরজাটা খুলে ভেতরে নিয়ে যায়। সেখানে একটা লোহার গোল জিনিস টিপে দিতেই জল পড়ে।

পিসিমাদের বাড়িতেও নাকি এমনি কল আছে, টিপলেই জ্বলা আলো আছে, আপনা থেকে ঘোরা পাখা আছে।

স্নান করিয়ে দেয় পিসিমা তাকে নিজের হাতে। ছবির ভারী লজ্জা করে জামা খুলতে। পিসিমা তাকে সাবান মাখাতে চায়।

কুসুমপুরে সে কখনও সাবান মাখত না। মাথায় খাবলা করে তেল মেখে বড় পুকুরটায় ডুব দিয়ে সে পাঠশালায় চলে যেত।

কেবল কোনওদিন, ছুটির দিন, মা হয়তো সবাইকে খাইয়ে, নিজে খেয়ে অনেকগুলো কাপড়-জামা কাচতে গেছে ঘাটে, হাট থেকে কিনে আনা গোল বলের মতো সাবান ঘষছে জামা-কাপড়ে, তখনও সেও যেত পেছন পেছন। মা জোর কবে সেই কাপড় কাচা সাবান দিয়েই ঘষে দিত তার গা-হাত-পা আর বলত, এত বড়ো মেয়ে হয়েছিস, নিজের গা-হাত-পা নিজে পরিষ্কার রাখতে পারিস নে?

কিন্তু পিসিমার সাবানের কী মিষ্টি গন্ধ। অনেক টাকা দাম বোধ হয়! পিসেমশাইয়ের অনেক টাকা আছে, তবু পিসিমার নাকি শান্তি নেই। টাকা থাকলেও নাকি শান্তি হয় না— মা বলছিল একদিন।

দুপুরে ছবি রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দিগন্তবিস্তৃত জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর পিসিমা আর পিসেমশাইকে ঘুমোতে দেখে সে সোজা আসে ডেকে। সেই ডুরে শাড়ি-পরা, ডুকরে কাঁদা মেয়েটাকে সে খুঁজে বার করতে চায় কিন্তু যতদূর তাকায় লোকগুলোর মধ্যে কোথাও সে নেই। বেশিদূর যেতে তার ভয় করে। যদি পথ হারিয়ে ফেলে সে, যদি আর না ফিরতে পারে?

ডানদিকে একটা কেবিনের মতো ঘর। অনেক মানুষ সেখানে— সবাই মেয়েমানুষ। তারা কেউ মাটিতে বিছানা পেতেছে— কেউ বেঞ্চে। কেউ শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে, ছোট ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে একজন ঝিনুকে করে।

ওর মধ্যে থেকে কখন হঠাৎ একটা মেয়ে বেরিয়ে এসেছে— রোগা, কালো কিন্তু সুন্দর একটা ফ্রক পরা, চুলে তার লাল ফিতে বাঁধা, পায়ে মোজার সঙ্গে জুতো, মাথায় কোঁকড়া চুল কিন্তু তার মতো অত বড়ো নয়। ছবি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

মেয়েটা কিন্তু নিজেই এসে ভাব করে তার সঙ্গে। হাত ধরে টানতে টানতে তাকে ঘরে নিয়ে যায়, মা, দ্যাখ ওর কত বড়ো চুল আর আমার চুল বড়ো হলেই তুমি কেবল কেটে দাও।

মেয়েটার মাও মেয়েটার মতো কালো। কালো পাড় সাদা একটা শাড়ি পরনে, মাথায় কিন্তু সিঁদুর নেই। খুব গম্ভীর মুখ, ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন কেবল মেয়ের কথা শুনে।

মিনু ওর নাম। ছবিরা যে শহরে যাচ্ছে— ওরাও সেখানে থাকে, ভাই-বোন ইস্কুলে পড়ে। বাবা নেই— মা হাসপাতালে চাকরি করে।

মেয়েমানুষ আবার চাকরি করে। ছবি এই প্রথম শুনল।

ওদিকের রেলিং-এর কাছ ঘেঁষে অনেকক্ষণ থেকে হাফপ্যান্ট পরা একটা ছেলে কী একটা বই পড়ছে মনোযোগ দিয়ে, মিনু সেখানেও টানতে টানতে নিয়ে যায় ছবিকে, দেখেছ ভাই— বইয়ের পোকা আমার দাদাটা। দিনরাত বই পড়ে পড়েই তো চোখটা খারাপ করেছে।

ভাইয়ের চুলের মুঠি চেপে ধরে আলগোছে টান দেয় মিনু, অ্যাই দাদা, দ্যাখ না আমার বন্ধু।

ছবিকে বন্ধু করে নিয়েছে এই ফ্রক-পরা, ফিতে বাঁধা শহরের মেয়েটা। খুব আনন্দ হয়। খুব ভালো ওরা। মিনুর ইস্কুলে তাকেও ভর্তি করে দিতে বলবে পিসিমাকে।

ছেলেটা একবার তাদের দিকে তাকায়। চোখ থেকে চশমাটা খুলে শার্টের কোণ দিয়ে মুছতে মুছতে লজ্জিত মুখে একটু হাসে।

মণিদার মতো দেখতে। না— মণিদা ওর চেয়ে ফরসা। ওইটুকু ছেলে চশমা পরেছে।

মিনুর টানাটানিতে বইখানা শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে সে পাশে রেখে দেয়— কী যেন একটা বলতে গিয়ে তার ঠোঁট দুখানা কাঁপে, কিন্তু কিছুই না বলে আবার সে অন্যমনস্ক হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেবল মিনুই অনর্গল কথা বলে।

ক্রমে মিনুর কথা বলাও কখন আপনা থেকেই থেমে গিয়ে তিনজনেই চুপ করে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। গোটাকয়েক গাঙচিল তীক্ষ্ণ চিৎকার করে করে জলের ওপর দিয়ে উড়ছে, ইস্টিমারের চলাটা আস্তে আস্তে কমে আসছে। সামনের গাছপালা দেওয়া চড়ার দিকে ওর গতি। কোনও স্টেশন এসে গেছে।

ইস্টিমারটা নোঙর করা হয়। লোকজন ওঠানামার ব্যস্ততা, জিনিসপত্র কেনা-বেচা, দাম-দস্তুর চলে। গোটাকয়েক ন্যাংটো ছেলে জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে কী বলছে ওদের তিনজনকে। দুজন ঘোমটা দেওয়া বউ ইস্টিমার থেকে নেমে মালপত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছে— বোধ হয় সঙ্গের লোকের অপেক্ষায়। তারপর আবার কখন চলতে শুরু করেছে জাহাজটা।

কখন যেন একসময় মিনুর দাদা অসীমও কথা বলে ফেলেছে। ছবির দিকে তাকিয়ে সে বলে, একটা জিনিস দেখবে?

ছবি আর মিনু দুজনেই একসঙ্গে মাথা নাড়ে। পিসিমার কথা ভেবে একটু একটু ভয় করে ছবির, তবু সে ফিরে যায় না।

প্রথমে অসীম ওদের ইস্টিমারটার যন্ত্রপাতির ঘরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। অবাক বিস্ময়ে তিনজনে সেই বিরাট যন্ত্রগুলোর চলা দেখে, শব্দ শোনে। মিনু দু-একবার কথা বলতে যায় বটে, কিন্তু সে-কথা কারুর কান পর্যন্ত পৌঁছায়ই না। ছবি এত শব্দ কখনও শোনেনি, এমন অদ্ভুত যন্ত্রপাতি কখনও দেখেনি। বিস্ময়ে নির্বাক

হয়ে তার কেবলই তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু অসীম তাদের আরও অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে যায়। সেটাকে সে বলে, বয়লার ঘর।

সেখানে ইস্টিমারের পেটের মধ্যে অন্ধকারে দাউ দাউ করা আগুন জ্বলছে আর অন্ধকারের মতো কালো একটা লোক অনবরত মস্ত বড়ো কোদালে করে গাদা থেকে কয়লা দিচ্ছে। আগুনের ফুলকিগুলো মাঝে মাঝে ছিটকে ছিটকে এধার-ওধার পড়ছে। লোকটার সারা গা দিয়ে কালো জলের মতো ঘাম নামছে। ছবি হঠাৎ অস্ফুটে আর্তনাদ করে ওঠে।

অসীম একটু হাসে, দেখেছ তো, এ না হলে ইস্টিমারটাই অচল হয়ে যেত। কীরকম কাজটা বল তো? আমিও বড়ো হলে এ কাজ করব।

করবি? —মিনু হঠাৎ বলে ওঠে, তুই যেন কী দাদা! তুই যে বলিস তুই টেগরার মতো হবি? আর মা বলেছে, বড়োমামা তোকে পুলিশের চাকরি দেবে। এটা বুঝি তার চেয়ে ভালো কাজ?

থাম থাম— অসীম যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছে হঠাৎ, পুলিশের চাকরি করতে আমার বয়ে গেছে।

এসে আর পুরোনো জায়গাটা পায় না তারা— দুজন লোক বসে রয়েছে সেখানে, আবার নতুন জায়গা বেছে নিয়ে বসে।

পকেটে থেকে একটা ছবিওয়ালা টুকরো কাটা কাগজ বার করে দেখায় তাদের অসীম, টেগ্‌রা।

ওইটুকু ছেলে জান কীরকম রিভলবার চালাত? কী সাহস! বেঁচে থাকতে ধরতে পারেনি পুলিশ।

একটা অস্পষ্ট বিবর্ণ ছবি। স্পষ্ট করে তার মুখ, চোখ কিছুই বোঝা যায় না, তবু তিনজনেই তার ওপর ঝুঁকে পড়ে একমনে দেখতে থাকে। বইয়ের পাতা থেকে কেটে নেওয়া ছবি।

দেখা শেষ হলে অসীম সেটাকে আবার তার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখে।

ওদিকে আস্তে আস্তে দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে যায়— গাঙচিলগুলোর চিৎকার কেমন করুণ, তীক্ষ্ণ আর একটানা হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে জলের ওপর, আবার থামছে ইস্টিমারটা, আবার দাঁড়াবে। সেই লোকটা কয়লা বন্ধ করেছে বুঝি? সারা শরীরে, সারা মুখে কালো কয়লার গুঁড়ো-মাখা পেশিবহুল হাতখানা একবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছবির— সে অমন কখনও দেখেনি।

খুঁজতে খুঁজতে অবিনাশ আসছেন। দেখে ছবির মুখ শুকিয়ে ওঠে। কতক্ষণ চলে এসেছে সে, নিশ্চয়ই পিসিমা তাকে ভীষণ বকবে। পিসেমশাই হয়তো ওদের সামনেই তার কান ধরে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু সেরকম কিছুই করেন না অবিনাশ, কেবল গম্ভীর গলায় বলেন, তোমার পিসিমা ডাকছেন ছবি।

ইচ্ছে নেই তবু যেতে হয়। তার তো কুসুমপুর ছেড়েও আসবার ইচ্ছে ছিল না, তবু তো আসতে হয়েছিল। এখন থেকে আর অনেক কিছুই নিজের ইচ্ছেয় করা যাবে না, এটা কেমন করে হঠাৎ যেন তার মনে হয় পিসেমশাইয়ের সঙ্গে চলে যেতে যেতে।

পেছন থেকে মিনু ফিশফিশ করে বলে দিয়েছে, কুমুদিনী হাই-তে ভর্তি হবে কিন্তু ভাই। বলে দিলাম। আবার এসো...।

অসীম কথা বলেনি— কেবল তাকিয়ে থেকেছে।

পিসিমা মৃদু বকুনি দেয়। আর তাকে একা বেরুতে দেয় না— চোখে চোখে রাখে। তাকে নাকি খুঁজে বার করতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লেগেছে।

নিজেদের কেবিনের রেলিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বাকি সময়টুকু কাটায় ছবি একা একা।

তারপর রাত হয়— রাত বাড়ে। সুকুমারী ছবিকে খেতে দেয়, ছোটো মেয়ের মতো বিছানায় শুইয়ে গাযে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। মাঝরাতে আধঘুম, আধজাগা অবস্থায় কখন বুঝি ইস্টিমার ছেড়ে গাড়িতে উঠেছে সে-কথা সে নিজেও জানে না। কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবাব কেঁদেছে, স্বপ্নের মধ্যে বিড় বিড় করে বকেছে। মাঝে মাঝে বুকের কাছে থমকে থাকা কান্নাটা কখন একসময় শব্দ হয়ে বেরিযেছে। আর সুকুমারী তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে সারাবাত জেগে কাটিয়ে এখন ডাকছেন, ছবি ওঠ, ওঠ, আমরা এসে গেছি।

এসে গেছি— উঠে বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে শহরটাকে দেখতে চায়। সারা স্টেশনটায় গোটাকয়েক কুলি ছুটোছুটি কবছে, চা-খাবারওয়ালারা চেঁচিয়ে খাবার বিক্রির জন্য দৌড়চ্ছে। সকাল হয়ে গেছে তবু অত বড়ো প্ল্যাটফর্মের সব আলোগুলো জ্বলছে, সব পাখাগুলো ঘুরছে। কেমন ধুলো ধুলো বিষণ্ণ সকাল। কেমন যেন। কুসুমপুরের সকাল তো এমন হত না।

ছবি এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুশি হয় না একটুও। মিনুদের খোঁজে ব্যগ্র চোখে। মিনুরাও নেমেছে গাড়ি থেকে, ছুটে এসে তার হাত ধরে নাড়া দিয়ে আবার দৌড়ে মার পাশ গিয়ে দাঁড়ায় সে। অসীম আসে না, দুরে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসে একটু, তারপর মার পেছন পেছন কুলি সঙ্গে নিয়ে চলে যায়।

বাইরে গিয়ে পিসেমশাই তাদের জন্য একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছেন। ঘোড়ার পায়ের কেমন তাল হয়। টক্‌টক্ ঠক্‌ঠক্ টকর, টক্‌টক্ ঠক্‌ঠক্ টকর।

গাড়ির জানলা দিয়ে ছবি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বাইরে। শহরটাকে তীক্ষ্ণচোখে দেখে। শহর।



দশ

মন ভালো নেই ছবির। আজ ক'দিনেও হল না। বিস্ময়টা কাটতে কয়েক ঘণ্টা মাত্র লেগেছে— সুইচ টিপে আলো জ্বালানো এখন আর অদ্ভুত লাগে না। কল টিপলেই জল পড়বে এটা সে জেনে ফেলেছে, কেমন করে পাখা ঘোরাতে হয় সেটাও আর কাউকে দেখিয়ে দিতে হয় না।

এখন তবে কী আছে? কিছু নেই। কিছু না। লাল মাটির ধুলো ধুলো বিষণ্ণ একটা শহর। ছবিকে তাও হতাশ করেছে। এখন সে লুকিয়ে এখানে-ওখানে চুপি চুপি কেঁদে বেড়াচ্ছে।

বাইরের ঘরে বড়ো বড়ো তিনটে আলমারি-ভরা খেলনা, পুতুল। সেগুলো দেখতে দেখতে সে কাচে চোখের জল মুছে মুছে দাগ করে দিয়েছে। কখন সে নিজেও জানে না।

পেছন দিকের বাগানটায় কটা জবা ফুলের গাছ আছে, একটা কামিনী ফুল, আর কটা গন্ধরাজ গাছ একসঙ্গে খানিকটা জায়গা ছায়া করে রেখেছে। সেখানে বসেও বেশ কাঁদা যায়।

কিন্তু তার পছন্দ রান্নাঘরের পাশের জামরুল গাছটার তলা। তার মোটা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে কত কথা ভাবা যায়, আকশটা দেখা যায় যতদূর তাকাও। মাঝে মাঝে কাক কাঁচা জামরুল ঠুকরে গায়ে মাথায় ফেলে।

এখানে এসে পিসিমাও যেন কেমন হয়ে গেছে। সেই উদাস-উদাস ছাড়া-ছাড়া ভাব আর নেই। এখন পিসিমা চাকরদের সঙ্গে ঝগড়া করছে, নিজের হাতে রান্না করছে, জোরে জোরে হাঁটছে, জোরে জোরে কথা বলছে আর চোখ রেখেছে ছবির দিকে। একরাশ খেলনা-পুতুল বার করে দিয়ে বলেছে, কোথাও যেও না

ছবি, এখানে বসে খেলা করো। আরও এনে দেব।

যেন পিসিমা জানে না যে এসব ছবির ভালো লাগে না।

কী যে ভালো লাগে ছবি তা নিজেও জানে না। কান্না পায়। কেবল কান্না পায়।

একটা সঙ্গী নেই, সাথী নেই। ছবি কি পিসিমার ওই খেলনা আর পুতুল নিয়ে দিন কাটাবে? পিসিমার দেওয়া একরাশ জামা-কাপড়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে মরবে? কিছু চায় না সে এসব। তাকে আবার ফিরিয়ে দিক গাঁয়ে। সেখানে দাদু, ঠাকুমা। বকুক গে! কিন্তু এখানে থাকলে সে যে মরেই যাবে তা কি কেউ বোঝে না?

পিসি বলেছে, সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস ছবি। তোকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। নতুন নতুন ফ্রক করে দেব। কাঁদিস নে।

কাঁদিস নে বললেই যেন কান্না থামানো যায়। মার কাছে লাইনটানা কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে চিঠি লিখতে গিয়ে, মণিদার কাছে লিখতে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে সে— কালি আর চোখের জলে মিশিয়ে একাকার করে দিয়ে।

চোখের জল তার এখন গাল বেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে— মাথা নিচু করে সেগুলোকে একবার সে গুণবার চেষ্টা করে। পিসিমা ঘুমুচ্ছে বলেই সে এসে বসতে পেরেছে এখানে— নইলে তার কোথাও যাবার জো নেই।

পাশের বাড়িটায় কয়েকবার সে ছোটো মেয়ের গলা শুনেছে, কিন্তু পিসিমা বলেছে ওদের সঙ্গে নাকি মিশতে নেই।

কেন মিশতে নেই ছবি তা জানে না। কেবল ইচ্ছে করছে ওদের সে একবার দেখে, কথা বলে।

হাওয়া দিচ্ছে বেশ। কোনমুখো হাওয়াটা সে ইচ্ছে করলেই বলে দিতে পারে। একমুঠো ধুলো বাতাসে ছড়িয়ে দিলেই বোঝা যায়। তাদের পাঠশালার সবাই জানত এটা। শিরশির করে জামরুল গাছের পাতাগুলো নড়ছে। ঝরঝর, থরথর করে নারকেল গাছটার পাতা কাঁপছে। এই নিঝুম দুপুরটায় ছবি ভাত খেয়ে পাঠশালায় ফিরে যেত। কখনও হাঁটত, কখনও হাঁটতে গিয়ে থেমে যেত একসময়। পা দিয়ে ধুলো ছিটিয়ে ছিটিয়ে অন্ধকার করে দিত। হাঁটতে হাঁটতে ফিশফিশ করে নিজের মনেই ছড়া বলত।

সত্যি সত্যিই কে যেন ফিশফিশ করে কথা বলছে তার পেছনে দাঁড়িয়ে। পেছন ফিরে তাকিয়ে সে অবাক। দুটো মেয়ে। চেহারা দেখে ছবি পর্যন্ত বলে দিতে পারে যে ওরা দুই বোন। ছোটো মেয়েটার খালি গা, একটা ছেঁড়া ইজের পরনে। সারা গায়ে ধুলো, চুলে পর্যন্ত যেন ধুলো লেগে আছে। যেন ধুলো নিয়ে খেলা করতে করতে এইমাত্র উঠে এসেছে।

বড়ো মেয়েটা ছবির চেয়ে খানিকটা বড়ো। তার গায়ে একটা জামা আছে—

জামাটার বুকের দিকটা আঁটো, মেয়েটাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে তাতে, কিন্তু সেইটুকুই কেবল আস্ত আছে। নীচের অংশটুকু ঝুল-ঝুল করে হাঁটুর ওপর ঝুলছে।

ময়লা ছেঁড়া ছেঁড়া জামা-কাপড়, ধুলো-মাখা হাত-পা, কিন্তু কী সুন্দর ওরা। ধুলো-বালি মাখা খানিকটা সৌন্দর্য যেন ছবির সামনে মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে।

মিনুকে দেখেছিল সে। সে তো পরিষ্কার। তার পরনে ছিল সিল্কের জামা, চুল ছিল আঁচড়ানো, পা দুটো ঢাকা ছিল জুতো-মোজায়। তখন মনে হয়েছিল হঠাৎ— এই বুঝি সৌন্দর্য। সুন্দর কাকে বলে স্পষ্ট ধারণা হয়নি বলেই মিনুকে সুন্দর লেগেছিল।

জটা-করা লাল লাল চুল, পা তার ধুলো, নোংরা নোংরা মেয়ে দুটো, কিন্তু হাঁ করে ওদের দেখতে ইচ্ছে করে। এরকম ইচ্ছে আগে কোনওদিন করেনি তো। তার মতো দুটো মেয়ে কিন্তু চোখদুটো তার মতো নয়। অত বড়ো চোখ কারুর হয়? অত কালো? অত সুন্দর। অত ছোটো কপাল, অত ফরসা। ওরা কি ধুলো মেখে ফরসা হয়েছে? নাকি ওদের গায়ে রক্ত নেই।

বড়ো মেয়েটা এসে তার হাত ধরে, তুমি কাঁদছো কেন ভাই?

কাঁদছে নাকি? সত্যিই তার চোখে জল। কিন্তু সেটা এখনকার নয়— আগের। ছবি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে হাসার চেষ্টা করে। লজ্জিতের হাসি, দুটি নতুন মানুষের অভ্যর্থনা করার হাসিও।

ছোটো মেয়েটা গাছের চারপাশে খুঁজে খুঁজে গোটা কয়েক কাকে ঠোকরানো জামরুল পেয়েছে, তার একটা সে ছেঁড়া প্যান্টের এককোণে মুছে একটা তার দিদিকে দেয়, একটা পরমানন্দে নিজে চিবোতে চিবোতে ছবিকে বলে, খাবে ভাই? এ গাছের জামরুল যা মিষ্টি!

কাকে ঠোকরানো। একটু ঘেন্না করে ছবির, তবু হাসিমুখে সে হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বড়ো মেয়েটা ধমকায় ছোটো বোনকে, ওকে ওই জামরুল দিচ্ছিস পিলু! ও কেন পড়ে থাকা জিনিস খেতে যাবে— ওদের বুঝি গাছ না। হ্যাঁ ভাই, তোমাকে বুঝি আমাদের বাড়ি যেতে বারণ করেছেন উনি? উনি— কে হন তোমার?

গম্ভীর হয়ে ছবি বলে, আমার পিসিমা।

পিসিমা? প্রথম প্রথম আমরাও তো পিসিমা বলতাম— সেই যখন প্রথম এসেছিলাম তখন, না রে পিলু? তখন তো আমরা আসতাম— জামরুল খেতাম, ঘরে যেতাম। কিন্তু এখন যাই না... এখন আর জামরুল খেতে দেয় না। আমাদের দেখতে পারে না আর— না রে পিলু? অনর্থক মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মেয়েটা কথা বলে, জোর করে টেনে টেনে।

কেন? এখন যেতে দেয় না কেন? ছবি হঠাৎ বোকার মতো প্রশ্ন করে।

এখন? এমনি। শুধু শুধু, এমনিই, কে জানে— বলবার ধরন দেখে বেশ বোঝা যায় মেয়েটা কিছু একটা গোপন করছে, কিছু একটা বলতে চাইছে না। তারপরেই হঠাৎ চকিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে যাবার জন্য পা বাড়ায় কেমন ভয়-পাওয়া ভাব নিয়ে, পিলু, চল— বকে যদি।

ছবিও উঠে দাঁড়ায়, পেছন থেকে বলে, দাঁড়াও, আমিও যাব। তোমাদের বাড়ি যাব আমি।

মেয়েটা ঠিক অবাক হয় না, একটা বোকা ভাব তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে, তুমি যাবে? আমাদের বাড়ি? তোমার পিসিমা বকবে না? আমরাও আগে পিসিমা বলতাম— সেই যখন প্রথম এসেছিলাম। তুমি আমাদের বাড়ি দেখবে? হি হি— হাত ধরে টানতে টানতে সে যেন কিছু একটা মজার জিনিস দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে ছবিকে।

এই নাকি বাড়ি! টিনের চাল-দেওয়া ছোটো দুখানা ঘর। উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েটা বলে, বল তো মা কে? হি হি—।

এই বুঝি ওদের মা। ঢলঢলে হাতে দু-গাছা শাঁখা খুলে খুলে পড়ছে, মাথার সামনের দিকের চুল উঠে গেছে অনেকখানি, আর মেয়েদুটোর মতো বড়ো বড়ো চোখ, কিন্তু চোখ কোটরে ঢুকে গেলে কি এত খারাপ দেখায় মানুষকে।

কাঁথা সেলাই করছে, হাতের কাছে একরাশ জমা করা কাপড় দিয়ে।

সেই মা একবার কেবল চোখ তুলে তাকায়। খ্যাসখেসে গলায় জিজ্ঞেস করে, ও-বাড়িতে এসেছ বুঝি? অবিনাশবাবু কে হন তোমার?

মানুষের গলার স্বর কি এত নির্জীব হয়! এত প্রাণহীন! আর কিছু জানাবার নেই, আর কিছু বলবার নেই, আবার ডুব দেয় নিস্তব্ধতায়— আবার চোখ কুঁচকে সেলাই করে।

ঘরটার এককোণে একটা বিছানা গোটানো রয়েছে, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে দুটো মুখ-বাঁধা বস্তা। আর সারা ঘরটায় এ-কোণে, ও-কোণে নোংরা ময়লা ধুলো আর জঞ্জাল। সারা উঠোনময় ধুলো, বাতাসে উড়ছে।

ছবি বেশ বুঝতে পারে ওরা গরিব। পিসিমার মতো ওদের আলমারি ভরা কাপড় নেই, খাট নেই, পুতুল নেই। নেই বলেই আরও বেশি করে সেটা যেন দেখানোর চেষ্টা আছে ওদের— আরও বেশি করে গরিব হয়ে থাকা— গরিব আর নোংরা।

সেই মা আবার চোখ তোলে। বড়ো বড়ো কালো গর্তে ঢাকা গর্তে ঢোকা চোখ ছবির মুখের ওপর ফেলে চাপা চাপা গলায় জানতে চায়, তোমাকে এনেছে কেন পিসিমা— কাছে রাখবে বলে?

ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ে ছবি। কিসের ভয় তা সে নিজেও জানে না। তবু ভয়।

হঠাৎ শিরা-ওঠা ফাটা হাতে ছবির মুখখানা তুলে ধরে ওদের মা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কী যেন দেখতে চায়। কাকে যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, কী আছে এ মেয়ের! আমার পিলুটাকে নিল না— খেত-পরত, বেঁচে যেত। ও নাকি বিষের বড়ি। আর এ— হঠাৎ মুখখানা ছেড়ে দেয়, এ মেয়ে বনধুঁতরো। আমার মেয়েরা চোর! চোর তো বেশ— আঁটকুঁড়ি! তুই? তোর খাবে কে অত? নেয়নি আমার পিলুটাকে...। সঙ্গে করে এনেছে মেয়ে। ভালো মেয়ে।

সেই কর্কশ কথা বলা মুখখানার দিকে তাকিয়ে, তীব্র স্বরের ইনিয়ে-বিনিয়ে কথাগুলো শুনতে শুনতে ছবির হঠাৎ হাঁউমাউ-করা কান্না পায়। কিন্তু শক্ত হয়ে সে চোখের জল আটকে রাখে। সারা মুখ লাল হয়ে যায়, কান দুটো লাল টকটকে হয়ে যায়, এক অদ্ভুত আতঙ্কে তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে। বড়ো মেয়েটাকে দেখে যেমন প্রথমে পাগল বলে মনে হয়েছিল, ওদের মাকেও তাই মনে হয়।

কেবল ছোটো মেয়েটাই আশ্চর্য শান্ত। সে ছবির হাত ধরে টেনে ওঠায়, বলে, চল, মা বড্ড বকে সবাইকে। নিলুদিকে তো দিনরাত— আমাকে একটু কম।

ছবি যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। সে পেছন ফিরে চলে যাবার সময় সেই মা হঠাৎ ভালো করে চোখ তুলে তাকায়, ক্লান্ত গলায় বলে, ওকে ঠাকুরঘর থেকে দুখানা বাতাসা এনে দে, নিলু।

না, ছবি বাতাসা খেতে চায় না। নিলু ছুটে গিয়ে জোর করে তার হাতে গুঁজে দিলে সেগুলো তার হাতের চাপে গুঁড়ো হয়ে যায়। সে শুকনো বিবর্ণ মুখে প্রায় ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় শোনে, নিলু বলছে পিলুকে, দেখিস আর আসবে না ও। মা-টা যেন কেমন নারে, পিলু? কাউকেই ভালোবাসে না। যদি ও পিসিমাকে বলে দেয়?

না, ছবি বলতে চায় না নিলুর মায়ের কথা, কাউকে বলবে না সে। নিলু আর পিলু লজ্জা পেয়েছে সেইজন্যই ছবি বলবে না কাউকে। কিন্তু আর যাবে না ওদের বাড়ি।

ও-বাড়ি থেকে দুবার সে পিসিমার ডাক শুনতে পেয়েছিল, নিলুর মায়ের তীক্ষ্ণ কর্কশ কথাগুলোর চেয়েও বেশি আতঙ্কিত করেছিল সেই ডাকটা।

দরজার কাছে তাকে থমকে দাঁড়াতে দেখে সুকুমারী বলে, বারণ করেছি তবু গিয়েছ ওদের বাড়ি? আর যেও না— তারপর একখানা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলে, তোর মার চিঠি, ছবি। প্রদীপও লিখেছে।

মার চিঠি! ছবি চিঠিখানা সুকুমারীর হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে বাইরের ঘরের একেবারে কোণের আলমারির পাশে গিয়ে বসে।

মার চিঠি! হেসে, কেঁদে, কী করবে সে ভেবে পায় না। চিঠিটা পড়তে তার খানিকটা সময় লাগবে। কিন্তু পড়তে সে চায় না। বারে বারে চোখের সামনে তুলে

ধরে সে। নাকের সামনে নিয়ে গন্ধ নেয়। মার রান্না-করা হলুদ-মাখা হাতের গন্ধ পাচ্ছে সে, গ্রামের গন্ধ পাচ্ছে। কী লিখেছে মা! ছবি সোনা আমার।— সে ডাকে এখান থেকেই সাড়া দেয় সে— মা! মা! আমার মা!

নিলুদের মা আছে, তার বসে-যাওয়া বড়ো বড়ো চোখের স্থির কুটিল দৃষ্টিটা ভাসে। ইস্টিমারে দেখা মিনুর মায়ের মার্জিত চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু তার মা? তার মার মতো কেউ নয়।

কিন্তু মার চেহারাটা যে কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ভাবতে গেলে। ভাবতে পারছে না কেন সে। উচ্ছ্বসিত কান্নায় এবার ছবি ভেঙে পড়ে। তিনটে মার চেহারাই কেমন করে যেন এক হয়ে গেছে। মমতার চেহারাটা আলাদা করে ভাবতে পারে না এটাই তার কাছে যন্ত্রণা হয়ে ওঠে।

পিসিমা আসছে। আলমারির পাশ দিয়ে তার ফরসা ফরসা পা দুখানা দেখা যাচ্ছে। ছবি কান্নাটাকে একেবারে গিলে ফেলে।

সুকুমারী ডাকে, ছবি, খাবে এসো।

তাকেও একটু কাঁদতেও কি দেবে না পিসিমা!



এগারো

পিসেমশাইকে দেখে তার ভয় আজও গেল না। ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে থাকে মানুষটার কাছ থেকে। এত গম্ভীর হয় মানুষ! আর এত কাজ থাকে তাব! সারাটা দিন বাইরে বাইরেই কাজ। সেই সকালে উঠে বেবিয়ে যান আর কত রাতে যে ফিরে আসেন ছবি তা এতদিন জানতই না। জেনেছে কাল।

অনেক রাতে হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল দরজায় ঘা দেবার শব্দে। পিসিমা জোরে চেপে ধরেছে দরজাটা ভেতর থেকে, আঁচলটা লুটোচ্ছে মাটিতে, বুকের কাপড় খসে গেছে।

ওপাশ থেকে কে যেন কী বলছে, জড়ানো জড়ানো স্বরে।

পিসিমা বলছে, না, খুলব না। এতদিন যা করেছ করেছ— আর নয়, এখন একটা মেয়ে আছে আমার কাছে এটা মনে রেখ। এত রাতে কেলেঙ্কারী কোবো না।

তবু সেই জড়ানো গলার মিনতি শোনা গেল বারকয়েক। দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দটা যত জোরে হল তত জোরে পিসিমা চেপে ধরল দরজা। তারপর কে যেন মানুষটাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল, সেই জড়ানো গলার স্বর আস্তে আস্তে চলে গেল। তখনও পিসিমা তেমনি দাঁড়িয়ে।

তারপর হঠাৎ আলো জ্বলা ঘরের দিকে পিসিমার চোখ গেল, চোখ গেল ছবির দিকে। সুকুমারী ছুটে এসে আলো নেভাল। ছবিকে দু-হাতে টেনে তুলে ধরে নিজের বিছানায় নিয়ে গিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কটা কথাও বলেছিল, তুই আমার আড়াল হয়ে থাক, ছবি। আমাকে একটু ভালোবাসিস।

ভয়ে, আতঙ্কে শক্ত হয়ে গিয়েও, সেই জড়ানো গলার স্বরটা পিসেমশাইয়ের বলে চিনতে পারার পরেও সে কিছু জিজ্ঞেস করেনি পিসিমাকে— একটা কথাও বলেনি।

কিন্তু এই প্রথম তার কেমন মায়া হয়েছিল, ভালোবাসতে ইচ্ছে করেছিল পিসিমাকে— মাকে ভালোবাসার মন নিয়ে। কিন্তু কেমন করে তা বোঝানো যায় ছবি তা জানেনি। তাই মাঝরাতের হঠাৎ-জাগা চোখে ভয়ের ঘোরটাই কেবল তার চোখের ঘুম কাড়েনি, কী একটা উপলব্ধিও যেন তার হয়েছিল। মনে হয়েছিল, কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক আছে পিসিমা-পিসেমশাইয়ের মধ্যে। কেউ শান্তি পাচ্ছে না। কারুর সুখ নেই। কিন্তু সে-কষ্টটা কিসের— কিসের!

অনেকদিন পরে নিলু তাকে বলেছিল, তোর পিসেমশাই মদ খায় ছবি— জানিস?

মদ খাওয়াটা খুব খারাপ এটা ছবি জানে, কিন্তু পিসেমশাইয়ের ওপর কিছুতেই রাগ করতে পারেনি সেদিন। কেমন করে যেন তার মনে হয়েছিল পিসেমশাই ইচ্ছে করে খায় না মদ। তবু কেন খায়।

কিন্তু সেসব পরের কথা। সেদিন রাতে অত কথা ছবি ভাবতে পারেনি।

রাতের কাণ্ড, সকালে উঠে কিন্তু তাব কিছু বোঝা যায়নি। পিসিমা উঠে সংসারের কাজ করেছে, পিসেমশাই চা খেতে খেতে কী লিখছেন খাতায়। কোথাও কিছু হয়নি। রাত্রের সবকিছু যেন দুঃস্বপ্ন।

আজ ছবির ইস্কুলে ভর্তি হবার দিন। পিসেমশাই সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন শুনে অসহায় মুখে সে পিসিমার দিকে তাকায়। সুকুমারী বোঝে ব্যবস্থাটা ছবির পছন্দ হয়নি, মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, যাও লক্ষ্মী মেয়ে। আমার যে সময় নেই সঙ্গে যাবার।

আসলে ছবি সাহস পাচ্ছে না। এই ধুলো ধুলো বিষণ্ণ শহরটাকে তার যেমন পছন্দ হচ্ছে না, তেমনি কোনওকিছুই না। ইস্কুলের কথা ভাবতেও তার ভয়, কেমন হবে সেটা কে জানে।

ঘোড়ার গাড়িতে উঠে একপাশে সে কুঁকড়ে বসে থাকে আর একটা নাম-না-জানা ভয় তার সারা শরীর শক্ত করে দেয়।

চমকে ওঠে যখন পিসেমশাই একখানা হাত মাথার ওপর রেখে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেন, ভয় করছে, ছবি?

এই প্রথম কথা পিসেমশাইয়ের সঙ্গে তার? ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, রাগ নেই তো। অদ্ভুত শান্ত দুটো চোখ মমতা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ভয় কী? পিসেমশাই বলেন, ওরা যা যা জিজ্ঞেস করবে ঠিকমতো বলতে পারলেই হল। ইস্কুলে ভর্তি হবার আগে ওরকম ভয় সবারই থাকে। পিসেমশাইয়ের সেই শান্ত চোখ আর বলা কথাগুলো ছবিকে হঠাৎ খুশি করে তোলে।

ইস্কুলে ঢুকে সে একেবারে অবাক। এটা নাকি আবার ইস্কুল। এত বড়ো বাড়ি, এত বড়ো বাগান। কতরকমের ফুল ফুটেছে। কী বিরাট মাঠ!

এইখানে পড়তে পাবে সে? কিন্তু যদি ওকে না নেয়? যদি বলে, গাঁ থেকে আসা ছবি এখানে পড়তে পাবে না— কালী পণ্ডিতের পাঠশালায় ফিরে যাক।

আনন্দের সঙ্গে এক অনির্দেশ্য আশঙ্কাও ছেয়ে থাকে মনটাকে। বিরাট লম্বা ঘরখানায় ঢুকে আরও সে হতভম্ব হয়ে যায়। মস্ত বড়ো টেবিলটার ওপাশে ফরসা, সুন্দর একজন মেয়েমানুষ। তিনি তার নাম জিজ্ঞেস করেন, তাবপর আর-একজনকে ডেকে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলেন।

ছবি এবার পিসেমশাইয়ের মুখের দিকে অসহায়ের মতো তাকায়। অবিনাশ বলেন, যাও ওঁর সঙ্গে, ভয় কী?

না, ভয় নেই। মিনুর মুখে এইসব মেয়েমানুষ মাস্টারমশাইদের কথা সে শুনেছে। কেউ ফুলদি, কেউ সেজদি— ছোড়দি। কেউ ভালো, কেউ খারাপ। কেউ বকে, কেউ বকে না।

এই দিদিমণি কি ফুলদি? যাই হোন, মুখখানা ভারি সুন্দর, হাসি হাসি। তিনি একটা খালি ঘরে নিয়ে গিয়ে ছবিকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেন ভূগোলের প্রশ্ন সে বলতে পারে, বাংলা বানানও লিখতে পারে, ইংরেজি কয়েকটা শব্দের মানেও তার জানা।

সব বলার পরেও তার ভয় যায় না, ভর্তি হয়ে গেছে শুনে তার বিশ্বাস হতে চায় না।

হেডমিস্ট্রেস অমলা নন্দী বলেন, যাও তো সুধা, ওকে ওর ক্লাসটা একবার দেখিয়ে নিয়ে এসো।

ওই তো মিনু। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে উঠতে যাবে, মিনু দূর থেকে ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে তাকে ইশারা করে। ওরকম করতে সে কাউকে দেখেনি এতদিন, কিন্তু মজা লাগে বেশ।

ক্লাস-ভর্তি মেয়ে। ফ্রক-পরা তার মতো মেয়ে আছে, শাড়ি-পরা বড়ো মেয়েও আছে। অতবড়ো মেয়েরাও পড়ে!

কী যেন লিখছে সবাই।

তাদের পাঠশালায় কোনওদিন শ্রুতিলিখন আর অঙ্ক ছাড়া কিছু লিখত না তারা— তাও স্লেটে। এখানে খাতায় কালি দিয়ে লিখতে হবে। তার হাতের লেখা

যা খারাপ! যদি বকুনি খায়? তা হোক। মিনু আছে এখানে।

ইস্কুল থেকে হাসিমুখে সে গাড়িতে ওঠে। কিন্তু পিসেমশাই এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তাকে— এ তো বাড়ির রাস্তা নয়। দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে গেছে, ঘোড়ার খুরের শব্দে গমগম করছে সংকীর্ণ জায়গাটুকু। শব্দ উঠছে— ঠক্ ঠক্ ঠকর— ঠক্ ঠক্ ঠকর।

একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থেমেছে। বাড়িটা টালির, সামনে ছোট্ট বাগান। গেট দিয়ে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ঢুকতে হয়। একটা কুকুর ছুটে এসে পিসেমশাইয়ের পায়ের কাছে লুটোপুটি খায়, ঘেউ ঘেউ করে। সে-শব্দে সামনের দরজাটা খুলে যে এসে সামনে দাঁড়ায় তাকে ছবির ভারি চেনা চেনা লাগে— তবু চিনতে পারে না। ঠিক এই মুখখানাই কোথায় দেখেছে সে। কোথায়?

ফরসা রং কিন্তু রোগা। কালো পাড়, সাদা শাড়ি পরনে। বিষণ্ণ একখানা মুখ।

এ মুখ বিস্তি পিসির মতো, তেমনি হাসি। কিন্তু বিস্তি পিসি নয়।

এগিয়ে এসে ছবির হাত ধরে মুখখানাকে তুলে ধবে আস্তে আস্তে বলে, এই বুঝি?

বেশ বোঝা যায় এ বাড়িতে পিসেমশাই আরও এসেছেন, নইলে ঘরেব মধ্যে পাতা বিছানাটায় কেউ অমন করে শুয়ে পড়ে!

ছবিকে সংকুচিত হয়ে একপাশে দাঁড়িযে থাকতে দেখে মেয়েটা তাকে আদর করে চেয়ারে বসায়।

কে উনি? চেনে না সে, তবু ভারি ভালো লাগে। কখন একসময় উঠে গিয়ে মেয়েটা দুটো গ্লাস হাতে করে এসেছে— আদর করে ছবিকে শরবতটুকু খাইয়ে আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেয।

পিসেমশাইয়ের কাছে নিয়ে গেলে মৃদু গলায় তিনি বলেন, খাব না।

কেন? অত বাগ করছ কেন?

রাগ? রাগ করতে পারলে তো বেঁচে যেতাম, সরমা। টাকাগুলো ফেরত পাঠিয়ে অমন অপমান করলে তবু রাগ করতে পারলাম কই।

তবে?

হিংসে হয়। তোমার মতো ওমনি শান্ত করে রাখতে পারিনে কেন মনটাকে।

পারবে, চেষ্টা করলেই পারবে। তোমার অমন সুন্দরী বউ, একটা মেয়ে পেয়েছ, আর ছটফট করে বেড়ালে চলবে কেন?

সুন্দরী বউ? পিসেমশাই হঠাৎ উঠে বসেছেন, জান, কাল ও আমাকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি।

হয়তো ছাইপাঁস আবার গিলেছ তাই।

গিলেছিই তো। এবার জাহান্নামে যাব। তোমার কাছে এলে তুমি কেবল

উপদেশ দেবে, ওর কাছে গেলে চুপ করে থেকে ও আমার ভয় বাড়িয়ে দেবে। আমি তবে কোথায় যাব?

আমার কাছে তুমি কী চাও বল তো?

কী চাই? কী চাই?— পিসেমশাই যেন দিশেহারার মতো পথ হারিয়ে ফেলেছেন। যা চাই তা তুমি আমাকে দেবে, সরমা?

ছিঃ ছিঃ— মেয়েটা যেন কেঁপে উঠছে, ওইজন্যেই যেদিন আমাকে এখানে বদলি করেছিল আমার বুক কেঁপে উঠেছিল, আমি আসতে চাইনি। কারুর সংসার আমি ভাঙতে চাইনি। আমার বুড়ো মা, ছোটো ভাই-বোন ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ। বিধবা আমি সে-কথা মনে করে আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমাকে ভুলে যাও।

শুধু ক্ষমা? এবার থেকে তোমাকে ঘেন্না করব, সরমা। কিন্তু শুচিতার বড়াই কোরো না তুমি। নার্সদের আবার শুচিতা...।

এতক্ষণে ছবির সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত সব কথা। পিসেমশাই এত কথা বলতে পারেন তবে! ওই মেয়েটা বিধবা— নার্স।

কথা বলতে বলতে সরমা বুঝি কেঁদেছিল। এবার সে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সরে দাঁড়ায় একপাশে, কাঁপা গলায় বলে, বেশ, যা ইচ্ছে তোমার বলে যাও আজ, কিন্তু আর এসো না। আমার ছেলে বড়ো হয়েছে— তার কাছে আমি আর মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতে পারব না। তুমি কী বুঝবে? তুমি...। তোমাকে দেখলে আমার...। কিন্তু আর এসো না। সারা শরীর ফুলে ফুলে উঠছে তার কান্নায়। চোখে আঁচল দিয়ে সে ছুটে পাশের ঘরে চলে যায়।

পিসেমশাই খুব চটে গেছেন মুখ দেখে বোঝা যায়। আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে জুতো পরে বেরিয়ে এসে তার হাত ধরে গাড়িতে ওঠেন। হাতখানা ঠান্ডা, কাঁপছে অল্প অল্প।

ছবি একবার পেছন ফিরে তাকায়। মনে হয় কার যেন বুক-চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে, মনে হয় কে যেন একবার ডাকল পেছন থেকে। এখনই বুঝি কেউ এসে তাদের যেতে বারণ করবে, এখুনি তার হাত ধরে নিয়ে যাবে ঘরে। আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ আসে না। সব ছবির ভুল— কল্পনা। কেউ আসে না। কেবল কুকুরটা গেট পর্যন্ত এসে সমানে লেজ নাড়ে আর ঘেউ ঘেউ করে। ঘোড়ার খুরের টরে টক্ ঠক্-ঠকাস্ ঠকর-ঠকর শব্দগুলোর সঙ্গে বহুক্ষণ পর্যন্ত তার ডাকটাই শোনা যায়।

দরজার সামনে গাড়ি থামার শব্দ পেয়ে পিসিমা এগিয়ে এসেছে— মনে হল এতক্ষণ দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার দিকে তাকিয়ে।

স্নান করে লাল শাড়ি পরেছে, কপালে মস্ত বড়ো একটা সিঁদুরের ফোঁটা জ্বলজ্বল করছে, ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে রয়েছে সারামুখে। কে বেশি সুন্দর? হঠাৎ যেন সে মুখখানা থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়া যায় না— হঠাৎ মনে হয় দেখে-আসা মেয়েটার সঙ্গে এ-মুখের কোথায় খুব মিল আছে, কোথায় যেন নেই। মুখখানা ভারি বিষণ্ণ— যেন হাসতে পর্যন্ত ভয় পায়। এ মুখখানা গম্ভীর কিন্তু অহংকারী। হঠাৎ ছবির মনে হয় পিসিমা তার নাম শুনতে পেলে রেগে যাবে— কেন মনে হয় তা সে জানে না।

সেই গম্ভীর মুখখানা নিয়েই পিসিমা বাতাস দিচ্ছে পিসেমশাইকে আর তিনি কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে আছেন। কী যেন বলছেন পিসেমশাই, সেই গম্ভীর মুখখানায় একটু হাসি ফুটল।

খেতে বসেও পিসেমশাই অন্যমনস্ক, পিসিমা কিন্তু খুশি, সত্যি? মাথার দিব্যি দিয়েছ কিন্তু! রাখবে তো?

রাখব, রাখব। কিন্তু একবারে যে পারব না— একটু একটু করে ছাড়ব, কি বল? পিসেমশাই হাসবার চেষ্টা করছেন কথা বলতে গিয়ে, পিসিমাও হাসিমুখে মাথা নাড়ছে।

কিন্তু সেই মেয়েটার চোখের জল মনে পড়ছে ছবির, তার ছুটে চলে-যাওয়া মনে পড়ছে। একজন কাঁদলে আর-একজনকে কি হাসতে হয়। পিসিমাকে এই প্রথম এত খুশি দেখাচ্ছে।

এখন কি সে সব কথা বলে দেবে? পিসেমশাই তো বারণ করে দেয়নি তাকে।

কিন্তু না। সে বলবে না। পিসিমাকে না। কোনেওদিন কাউকে বলবে না সে।

সুকুমারী ছবির মুখের দিকে তাকায়, হ্যাঁ রে, তোর কী হল? ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিস— একটু হাসবি নে? একটু খুশি হবি নে?

চেষ্টা করলে কী হাসা যায়? তার যে হাসি পাচ্ছে না— খুশি আসছে না। কিন্তু হাসলে এমন সুন্দর দেখায় পিসিমাকে এই প্রথম দেখল ছবি। ও-হাসিটা সুখের হাসি। হাসুক পিসিমা। ছবি কোনওদিন সরমা পিসির কথা বলে দেবে না— কোনওদিন না।



বারো

মন বসছে। মন ফিরছে।

সুকুমারী ছবির খুশি খুশি মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হবে না খুশি হবে ভেবে পায় না। এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাচ্ছে পুরোনো কথা।

সে হয়তো চেয়েছিলও তাই, কিন্তু তাই বলে এমন করে ভুলবে? নিষ্ঠুর স্বভাব। এমনি করে যখন ভুলে যেতে পারে নিজের মায়ের কথা, তখন সুকুমারীর-ই বা ভরসা কোথায়? চোখের সামনে থেকে সরে গেলে তাকেও ওমনি করে ভুলে যাবে।

ছবির চোখ-মুখে চঞ্চলতা। নটা না বাজতেই সে ভাতের তাড়া দেয়। বারে বারে পথের দিকে তাকায় ঝিয়ের আশায়, বারে বারে চুল আঁচড়ায়, বইগুলোকে গোছায়। সে জানে না সুকুমারীর নিঃশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার কথা। কেন মনটা খারাপ লাগে সুকুমারী নিজেও বুঝি তা জানে না।

ভীরু ভীরু মেয়েটা ক-মাস আগেও কেঁদে কেঁদে বেড়াত এ-ঘরে ও-ঘরে। মাঝে মাঝে পাশে এসে বসত চুপি চুপি, কী দেখত তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার আপনা থেকেই উঠে চলে যেত। রাতে একা শুতে ভয় পাবে বলে তাকে কাছে নিয়ে শুতে চাইলে প্রথমে আপত্তি করত, বালিশ আঁকড়ে ঘুমোনোর ভান করত। মাঝরাতে হঠাৎ দেখত কে যেন গুটিশুটি হয়ে শুয়ে আছে পাশে। রাত আরও গভীর হলে, ঘুম আরও গভীর হলে সেই মেয়েটাই নিজের অজ্ঞাতে কখন তাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরত। সেই মেয়েটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না এখন।

তবু সুকুমারী মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতে চায় ছবিকে, মাকে চিঠি লিখেছিস? হ্যাঁ রে? সেই কবে চিঠি দিয়েছে বউদি— উত্তর দিলিনে?

ছবি তার বইতে মলাট দিচ্ছে নিবিষ্ট হয়ে পিসেমশায়ের এনে দেওয়া লাল-নীল কাগজে। মুখ নিচু করে সে মাথা নাড়ে।

খুশি হবে কিনা সুকুমারী বুঝতে পারে না, এমন করে ভুলে যাচ্ছিস তুই? আর তো বলিসও নে কারুর কথা? তোরা সব কাদার তাল...।

পিসিমা কি মনে করাতে এসেছিল, না কি বকে গেল তাকে? ভুলে যাচ্ছে! ছবি নাকি ভুলে যাচ্ছে!

একটা মুহূর্ত ছবির বই-ধরা হাতখানা আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তার নিচু করা মুখখানা কালো হয়ে ওঠে, কয়েক ফোঁটা জল বইয়ের খসখসে পাতার ওপর পড়ে মিলিয়ে যায়। কে জানে সে-কথা। সবাই জানুক ছবি ভুলে গেছে কিন্তু সে তো জানে সত্যি কথাটা।

আরও বেশি করে সে মাকে ভাবে, ভাবে বাবাকে, মণিদাকে, সবাইকে— সব্বাইকে।

মা মিলে গেছে আর-সব চেহারার মা-দের সঙ্গে, বাবার চেহারা ভাবতে গেলেই রোজ দশটায় ছেঁড়া ছাতা হাতে তালি মারা ধুতি-পরা নিলুদের বাবার চেহারাটাই কেবল ভেসে ওঠে। মণিদাকে ভাবতে গেলে মিনুর দাদার কথা মনে পড়ে। তার গাঁ মিলে গেছে শহরের সঙ্গে— এই লাল ধুলোর দুঃখ দুঃখ মুখ করা শহরটার সঙ্গে। সব একাকাব। ছবি আর কাউকে আলাদা করে ভাবতে পারে না। দুর্গা, উমা, বাসন্তীকে ভাবতে গেলে স্কুলের মেয়েদের মুখ দেখে সে, সেফুকে ভাবতে গেলে ও-বাড়ির পিলুর কথা মনে হয়।

চোখের জল রগড়ে সারা মুখময় মাখিয়ে ফেলতে ফেলতে নিজের মনে বিড়বিড় করে, আমি তো ভুলতে চাইনি, আমি চাইনে ভুলতে।

তারা কান্নাভেজা মুখখানা তুলে ধরে সে যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে সবায়ের কাছে— যেন সবাই এসে দাঁড়াল এইমাত্র।

কিন্তু সে কটা মাত্র মুহূর্তের ব্যাপার। বাইরে স্কুলের ঝিয়ের তারস্বর চেঁচানি তাকে সজাগ করে তোলে। সে খুশি হয়ে ওঠে।

খুশি হয়ে ওঠে সব মেয়েদের সঙ্গে বইখাতা নিয়ে যেতে যেতে। খুশি হয়ে ওঠে চটিতে ধুলো ছিটিয়ে আর মেয়েদের সঙ্গে হো হো হি হি করে হাসতে। ভাঙা পাহাড়ের মাঝখানকার সরু পথটা তাদের সে-হাসিতে ঝনঝন করে বাজতে থাকে। পাহাড়ের গা থেকে বুনো ফুলগাছের লতানো ডাল ধরে টেনে দেয কেউ, কেউ ফুল ছেঁড়ে, বড়ো মেয়েরা চেয়ে নিয়ে খোঁপায় পরে, আবার সেটা কখন হয়তো পড়ে যায় সে খেয়ালও কেউ করে না। চেঁচিয়ে কথা বলে। সামান্য কথা, সামান্য ব্যাপার, কিন্তু কথার চেয়ে হাসি বেশি, হাসির চেয়ে হুল্লোড় বেশি। সব ওই রাস্তাটুকু।

তারপর ঢোকে ইস্কুলের মস্তবড় কাঠের গেটের হাঁ-করা মুখের মধ্য দিয়ে। সবাই চুপ। একটা কথা নেই, হাসি নেই। কেবল মেয়েদের চটির খস্‌খস্‌ শব্দ, জুতোর খট্‌মট শব্দ। কে যেন জোর করে মুখ বন্ধ করে দিয়েছে সবায়ের। সে কে?

কে আবার? জানে না যেন। হেডমিস্ট্রেস অমলাদি যে নিজে দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়, মেয়েদের লাইন করা হলে তবে যাবেন।

লাইনে দাঁড়িয়ে এ ওর গায়ে ধাক্কা দেয়, কানের কাছে মুখ নিয়ে কে কাকে কী যেন ফিশফিশ করে বলতে যায়। কে শব্দ করছে। হিস্‌-স্‌-স্‌! অমলাদি নিজে ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রেখে বোঝাতে চাইছেন— চুপ করো মেয়েরা। চুপ করো।

তারপর ক্লাসে ঢোকো। দরজা পর্যন্ত সবাই শান্ত, সবাই ভালো। তারপর— হুড়মুড়, দুপদাপ, খট খট। তারপর আবার চুপ। উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই। হাসি হাসি মুখটা দরজা ছেড়ে এসে চেয়ারে বসেছে— সুধাদি।

অত চুপ নয়, অত ভয় নয়। ও যে সুধাদি, ভালো দিদি।

আজ ছবি পাহাড়ের গা থেকে ঝুঁকে পড়া ডালের ফুলটা দেবে সুধাদিকে। অনেক মেয়ে দেয়— সে কোনওদিন দেয়নি।

কাঁপা কাঁপা হাতে ফুলটা নিয়ে সে টেবিলে রাখে। নাম ডাকতে ডাকতে সুধাদি একবার আঙুল দিয়ে নাড়ে, হাসিমুখে বলে, ফুল। তোর মতোই বুনো, না রে ছবি?

আরও একদিন সুধাদি তাকে ওই কথা বলেছিল। কেন যে তাকে বুনো বলে সে জানে না। একদিন একা পেলে সে জিজ্ঞেস করবে। ফুলটা না দিলেই হত। বুনো! দিয়ে এখন লজ্জা করছে।

মিনু বলে, কী বললেন রে তোকে আস্তে আস্তে?

ছবি উত্তর দেয় না, চুপ করে থাকে।

টিফিনের সময় দপ্তরির ঘরের পাশে জল খেতে যায় সে আর মিনু দুজনেই। সেখানে বাদাম গাছতলায় সুধাদি বসে বসে বই পড়ছে। তাদের দেখে মাথা তুলে একটু হাসে দিদি, কী রে, কী চাস? টিফিন খাসনি?

সুধাদি একটা ইংরেজি বই পড়ছেন। অনেক লেখাপড়া শিখলে ওরকম বই পড়া যায়। ছবিও একদিন পড়বে কিন্তু আজ তার অন্য চিন্তা। হঠাৎ বলে, আমাকে বুনো বললেন কেন তখন?

ভাবে, সুধাদি হয়তো বিরক্ত হবেন তার প্রশ্ন শুনে কিন্তু আশ্চর্য, হাসছেন।

শব্দ করে হেসে উঠে সুধাদি বলে, ওমা, কখন কী বলেছি সেই কথাটাই তুমি মনে করে রেখেছ মেয়ে? বুনো বললাম কেন? তুমি যে বুনোদের মতোই সরল,

ছবি। এখনও গ্রামের গন্ধ গা থেকে মেলায়নি। অন্য সব মেয়েদের মতো তো হতে পারনি এখনও। শহুরে ভাষায় তাকেই বলে বুনো। গায়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করেও দেয় সুধাদি।

এ কথায় মনটা খারাপ হয় কিন্তু রাগ হয় না। রাগ হয় অন্য ব্যাপারে। এখনও অনেক মেয়ে তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। মোটরে আসা জজ সাহেবের মেয়ে, শহরের সবচেয়ে বড়ো উকিল প্রতুলবাবুর মেয়ে আর তাদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ানো মেয়েরা তাকে নিয়ে রসিকতা করে। নতুন নতুন মিথ্যে কথা বানিয়ে বললে— ছবি তা বিশ্বাস করতেই নিজেরা হেসে গড়াগড়ি খায়, কী বোকা ভাই মেয়েটা! কী বোকা!

কিন্তু ওরাই তো আর সব নয়। আরও মেয়েরা আছে যারা ওরকম নয়। মিনু আছে, মলিনা আছে, নিভা, শান্তা, বেবি আছে— ওরা ছবির বন্ধু।

জজ সাহেবের মেয়ে ঠাট্টা করলে তার সঙ্গে ঘোরা মেয়েরাও ইচ্ছে করে করে হাসে। কিন্তু সে মোটরে উঠে ধুলো উড়িয়ে চলে যায় যখন তখন তো তার পেছন পেছন ঘুরে বেড়ানো মেয়েদের নেয় না। যেতে তো হয় সেই ঝিয়েব সঙ্গে নয়তো বাড়ির চাকরেব সঙ্গে একা একা গোমড়ামুখে।

আর ছবিদের দলটা তখন ভারী। সারা রাস্তা তারা গল্প করতে করতে হাঁটে। মাঠের খেলায় তারা থাকে এক, দোলনায় চড়বার সময় তারা এক।

জজ সাহেবের মেয়েকে অমলাদি খুব ভালোবাসেন— সব বড়োলোকের মেয়েদেরই ভালোবাসেন। সরকারি কলেজের সাহেব প্রিন্সিপালের বাঙালি বউ-এর মেয়েকে, ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়েকে— সবাইকে। ওদের কারুর শরীর খারাপ হয়ে অমলাদি ব্যস্ত হয়ে পড়েন, নিজে কোলে কবে দোতলার ঘরে শুইয়ে দিয়ে আসেন। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে ওবা মোটরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন। ওদের টিফিন খাবার ব্যবস্থা তাঁর ঘরে। ছবি দেখেছে, বড়ো বড়ো ক্লাসের মেয়েরা এ কথা নিয়ে হাসাহাসি করে। একদিন ফিশফিশ করে কে যেন বলছিল, এমন বড়োলোকের পা চাটা ভাই অমলাদি।

কিন্তু ছবিদের ভালোবাসে সুধাদি। বুনো বললে সুধাদির কথায় তাই একটুও রাগ হয় না। কিন্তু ওই মেয়েগুলোর কথা সহ্য করা যায় না কিছুতেই।

সে বুনো থাকবে না। তার সেই ঘাড় বাঁকানো ভাবটা ফিরে আসে। আর বুনো থাকবে না সে।

ছুটির পরে বাড়ি ফিরবার পথে বিস্কুটের দোকানের সামনের ছোট্ট কাঠের পোলটার ওপর হঠাৎ আজ দেখা হয়ে যায় নিলু আর পিলুর সঙ্গে। এ-ক'দিনও দু-একবার দেখা হয়েছে কিন্তু ছেঁড়া ছেঁড়া দেখা।

কথা হয়নি— হয় ওরা সাহস করেনি, নয়তো তারই সাহস হয়নি পিসিমার জন্য।

ঠিক সেদিনকার দুপুরের মতো ছেঁড়া জামা গায়ে— ঝুল ঝুল করা ছেঁড়া। খালি পায়ে এক পা ধুলো, খোলা লাল লাল একরাশ চুল, হাতে দুটো করে রং-ওঠা রবারের চুড়ি। ওরা দু-বোন পোলের একপাশে ভয়ে ভয়ে সরে দাঁড়িয়ে মেয়েদের পথ করে দিয়ে আগ্রহভরা চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে দলটার দিকে। পথ না করে দিলে এখুনি যেন মেয়েরা বকে উঠবে ওদের। একজনের হাতে ছোট একটা তামার ঘটি, আর একজনের হাতে শালপাতায় জড়ানো কী যেন।

মেয়েরা যেতে যেতে ওদের দিকে কেউ তাকায, কেউ তাকায় না। কেবল ছবি চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় পাশ ঘেঁসে। মেয়ে দুটো যেন চমকে ওঠে। রঙ-বেরঙের ফরসা জামাকাপড় পরা, বইখাতা হাতে করা মেয়েদের মধ্যে থেকে কেউ এসে ওদের পাশে দাঁড়াবে এটা যেন কল্পনাই করেনি। ভারী খুশি মুখে ছবির দিকে তাকিয়ে নিলু বলে, তুমিও কুমুদিনীতে পড় না? জানো রোজ তোমাকে আমরা দেখি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে— ঝিয়ের সঙ্গে যাও যখন।

তোমরা পড় না? ছবি জানতে চায়। ঠোঁট উলটে বড়ো মেয়েটা বলে, কী করে পড়ব বল? আমি কিছুদিন পেরাইমারিতে পড়েছিলাম— পিলুটার তাও হল না। বাবা বলে আমাদের বই কিনে বাড়িতে পড়াবে। মুহুরির মেয়ের আবার অত শখ কেন?

মুহুরি কী?

বা রে, জানো না? উকিলের মুহুরি, যে আমার বাবা—। আমাদের তো কতদিন চালই থাকে-না। খিদে পেলে মা বলে, মর সব। পিলুটাকে তো দিয়ে দিতে চেয়েছিল— নেয়নি তোমার পিসিমা। সেইজন্যে তো মাব অত রাগ দেখলে না? আমার ছোট্ট ভাইটার কবে থেকে অসুখ— এখন আর ডাক্তার আসে না? এখন ঠাকুরবাড়ির চন্নামেত্ত খায়। তাই আনতে গিয়েছিলাম আখড়ায়। মা বলে ওতেই ভালো হবে। বাবা বলে ও মরবে। হাতের ঘটিটা দেখিয়ে ছবির কৌতূহল নিবৃত্ত করে মেয়েটা।

পিলু বলে, তুমি সেদিন খুব রাগ করেছ না? দিদি আর আমি তারপর ভাব করতে কতবার তোমাদের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছি— যদি বকে তোমার পিসিমা। তুমি যাবে আর একদিন? আর মা কিছু বলবে না।

ছবি বলে, যাব।

নিলু জানতে চায়, আচ্ছা ভাই, ইস্কুল থেকে ফিরে তুমি কী খাবে?

পিসিমা ছবিকে গরম গরম লুচি ভেজে দেয় শুনে নিলু একবার জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চেটে নেয়, পাশে পাশে চলা ছোটো বোনটা ছবির মুখের দিকে

লোভীর মতো তাকায়। নিলু তখনও নিজের মনে গুনগুন করে বলে চলে, আগে যেতাম ও-বাড়ি— অনেকদিন আগে। তখন মাঝে মাঝে তোমার পিসিমা আমাদের লুচি দিত— খাবার দিত। কিন্তু এখন দেখতে পারে না। গেলেই বকে। কিন্তু আমি তো...। অনির্দিষ্টভাবে ছেঁড়া ছেঁড়া খাপছাড়া কথাগুলোর মাঝখানেই হঠাৎ সেদিনকার মতোই চুপ করে যায় সে। কী একটা কথা সে বলতে চায় না আজও।

ছোটো বোনটা হঠাৎ একসময় ম্লান গলায় বলে, আমার একটাও পুতুল নেই জানো। একটা চার পয়সা দামের কাচের পুতুল ছিল তাও ভেঙে গেছে। কেন হঠাৎ ও-কথা বলে কে জানে, কিন্তু ছবির চোখ ছলছল করে। তার তো অনেক পুতুল আছে— সে খেলেও না। মেয়েটার ছেঁড়া ঝুলি ঝুলি জামাটা দেখে মনে পড়ে, তার এর মধ্যেই কতগুলো জামা জমে গেছে। সেখান থেকে তো কিছু ওদের দিতে পারে— ওদের যে কিছু নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে যেন তার মনে হয়, না, দেওয়া যায় না। ওসব জিনিস তার দেবার জো নেই। ভালো না লাগলেও রেখে দিতে হয়— ইচ্ছে না থাকলেও থাকতে হয়। পিলুর বড়ো বড়ো করুণ চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে মনে হয়, পিসিমা কেন নিল না ওকে। তার চেয়ে কত— কত সুন্দর, আর কত শান্ত মেয়েটা। ওকে পিসিমা যদি নিত তবে তো তাকে আসতে হত না— মন-কেমন-করা কান্নায় মাঝে মাঝে বুকের ভেতরটা উথলে উঠত না।

অন্যমনস্ক হয়ে কখন ওদের বাড়িতেই সে ঢুকেছে বুঝতে পারেনি। তাকিয়ে দেখে ঠিক তেমনি তুলো-ওড়া, ধুলো-ওড়া ছেঁড়া লেপ-তোশক ছড়ানো ঘর। সেদিনকার চেয়েও বেশি। তার মধ্যে সেদিনকার দেখা মা স্থির হয়ে বসে আছে একটা হাড় জিরজিরে ছেলে কোলে করে। ছেলেটার চোখ দুটো নিলুর আর পিলুর মতোই বড়ো— দেখতে সুন্দর ছিল বোঝা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে কেমন ভয় করে ওঠে ছবির হঠাৎ। চোখের তারা মাঝে মাঝে স্থির হয়ে যাচ্ছে বড়ো বড়ো নিঃশ্বাসের সঙ্গে। বুকের পাঁজরা ওঠা-নামা করছে ঘন ঘন।

সেফুর ছোটো ভাই যখন মারা যায় তখন সে ওমনি চোখের দৃষ্টি দেখেছিল তার— ওমনি বারে বারে তার ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছিল। নিলু পিলুরা কি কিছু বুঝতে পারছে না— বুঝতে পারছে না ওদের মা। ঝুঁকে পড়ে ছোটো ঘটি থেকে কয়েক ফোঁটা জল ঝিনুকে করে তার মুখের মধ্যে দিলে ছেলেটা আকুল আগ্রহে তা গিলে ফেলে। তার গলার মধ্য থেকে কেমন একটা শব্দ উঠছে। আতঙ্কে, আশঙ্কায় ছবি একেবারে অবাক হয়ে নিলুর মায়ের নির্বিকার মুখের দিকে তাকায়। কই কাঁদছেন না তো একটুও। বরং ছবিকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছেন, কাছে সরে গেলে ভাঙা ভাঙা মিনমিনে গলায় বলেন, বোস। সেদিন কী বলতে কী বলেছি— কিছু মনে করো না তুমি। তার শাস্তি হচ্ছে দেখ! ছেলের দিকে আঙুল তুলে দেখান,

কিছু বোলো না মা তোমার পিসিকে। রাগ করে হয়তো উঠিয়ে দেবে শেষে। আজ এক বছরের ভাড়া বাকি। উঠিয়ে দিলে তো কিছু করবার নেই আমার। বলবে না তো?

সেই স্থির নিষ্ঠুর দৃষ্টি এখন করুণ হয়ে তাকিয়ে আছে ছবির মুখের দিকে। কোলের ওপর খাবি-খাওয়া ছেলেকে নিয়ে দুঃখ নেই— ভয় নেই। ভয় উঠিয়ে দেবার।

হঠাৎ কেমন কান্না পায়। কোনও কথার উত্তরে মাথা নাড়ে, না-বুঝেই সে অনির্দিষ্টভাবে এদিক-ওদিক মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে আসে।

সে তো সেদিনকার কথা কিছুই বলেনি পিসিমাকে। গরিব বলেই কি পিসিমা ঘেন্না করে ওদের? ওরা ছেঁড়া জামা পরে থাকে— ধুলো মেখে থাকে বলে? কিন্তু সে তো ওদের দোষ নয়। ওদের বাবা যে উকিলের মুহুরি। মুহুরি হলে লোকে যে গরিব হয়— ছবি তা এই প্রথম দেখল।

খুব নিঃশব্দে বাড়ি ঢোকে। রান্নাঘরে পিসিমা খাবার করছে।

সুকুমারী বলে, এত দেরি করলি কেন রে ছবি? আজ না শনিবার?

বই নিয়েই পিসিমার পাশ ঘেঁষে বসে পড়েছে ততক্ষণে। ঘিয়ের গন্ধটা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে— নিলু, পিলুরাও কি পাচ্ছে?

ভাবতে গিয়ে তার চোখে জল আসে। গরম গরম ভেজে রাখা লুচিগুলো দেখে তার আর অন্যদিনের মতো আনন্দ হয় না একটুও। কানের মধ্যে বাজছে ছোটো ছেলেটার বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নেবার শব্দটা— যা কানে গেলে বুকের মধ্যেটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

দু-একবার পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে ছবি। সুকুমারী বলে, বইপত্তর শুদ্ধুই রান্নাঘরে বসলে। হাত-মুখ ধুয়ে এসো— ঠান্ডা হয়ে গেল যে সব।

তবু ওঠে না। তার ঠোঁট কাঁপে, শেষে একসময় বলে, নিলু, পিলুদের এ-বাড়িতে ঢুকতে দাও না কেন পিসিমা?

সুকুমারী স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে এক মুহূর্ত, তারপর গম্ভীর গলায় বলে, তুমি বুঝি আবার গিয়েছিলে ওদের বাড়ি? সে-কথাও শোনা হয়ে গেছে তোমার? জানিস কেন ঢুকতে দিই নে? লোক ওরা ভালো নয়। বড়ো মেয়েটা কোথায় চলে গেছে কার না কার সঙ্গে। ওই নিলু মেয়েটা লোভী, তেমনি চোর। দু-তিনবার আমার কাপড়, মাথার তেল চুরি করেছে। পাউডার, সাবান যে কত চুরি করেছে তার তো ঠিক নেই। তবু কিছু বলিনি— অভাবে স্বভাব নষ্ট। চেয়ে নিলেই তো পারিস। তারপর আবার ছুঁড়ির যা কাণ্ড— ওই হরনাথের মেয়ে... হঠাৎ কথা থামিয়ে, প্রায় চমকে ওঠে সুকুমারী, থাক, অত কথায় তোমার দরকার নেই। ছোটো মেয়েরা হবে নিষ্পাপ, নির্মল। তোমাকেও আমি তেমনি

দেখতে চাই, ছবি।

ছবি হঠাৎ পিসিমার হাত ধরে মিনতি করে, কিন্তু পিলু, ও তো কোনও দোষ করেনি। ওকে একটু আসতে দিও, খেলতে দিও আমার সঙ্গে।

সুকুমারীরও গলা কেমন করুণ হয়ে ওঠে, খেলো, কিন্তু ঘরে-টরে নিও না ওদের। ভালো পুতুল-টুতুলও বাইরে নিও না। ওই ছোটো মেয়েটাকে আমিই কি কম ভালোবাসতাম? অমন সুন্দর দেখতে কিন্তু ধুলো-কাদায় কী যে হয়ে থাকে। দিতে তো চেয়েছিল কিন্তু সাহস হল না— কে জানে যদি...।

পিসিমার সব কথা কানেও যায় না। পিসিমা খেলতে বলে দিয়েছে, তাহলেই হল। পিলুকে নিয়ে প্রথমে খেলা শুরু করলে নিলুও আসবে। একদিন দুদিন হয়তো বকবে পিসিমা— তারপর আর কিছু বলবে না।

নিলু নাকি চোর? ধ্যেৎ, ওসব বাজে কথা। ছবির যে বন্ধু হবে সে চোর হবে না।

ছবিকে হঠাৎ অবাক করে দেবার ভঙ্গিতে সুকুমারী বলে, খেয়ে চট করে চুল-টুল ভালো করে আঁচড়ে নাও গে ছবি। আজ এক জায়গায় যেতে হবে।

কোথায় পিসিমা? কোথায়?

বায়োস্কোপে। দেখেছিস কোনওদিন— বায়োস্কোপ আজ যাচ্ছ, আর ন-মাসে, ছ-মাসে যাবে। ছোটোদের দেখতে নেই ওসব জিনিস।

কেন দেখতে নেই কে জানে। তা জানবার দরকার নেই, কিন্তু আজ তো যাবে। ছবি হঠাৎ টান টান হয়ে ওঠে খুশিতে। সে কখনও দেখেনি বায়োস্কোপ।

একবার তাদের গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরের গঞ্জে এসেছিল বায়োস্কোপ— তাঁবু খাটিয়ে তারা দেখিয়েছিল ছবি। সে যেতে পায়নি। মণিদা দেখে এসে গল্প করেছিল, কাপড়ের গায়ে লোকে হাঁটে, চলে, কথা বলে, মারামারি করে...।

মিনুর কাছে গল্প শুনেছে— এখানে তাঁবুতে হয় না। মস্ত বড়ো বাড়িতে পর্দার গায়ে হয়, গদি আঁটা চেয়ারে বসে সে ছবি দেখতে হয়।

দেখে এসে অনেক রাত পর্যন্ত কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না ছবির চোখে। সে একেবারে মুগ্ধ অভিভূত হয়ে গেছে। তার মনের গোপন কোণে একটা আশা তৈরি হচ্ছিল এতদিন ধরে, সুধাদিকে দেখার পর থেকে। সে ওমনি একজন দিদিমণি হবে। কিন্তু আজকের সন্ধেবেলাটা তার সব চিন্তাকে উলটে-পালটে দিয়েছে।

ওইরকম হওয়া যায় না? ওইরকম। ওই মেয়েটার মতো। যার কথায় মেয়েরা শব্দ করে কাঁদছিল— পিসেমশাই পর্যন্ত রুমাল দিয়ে চোখ মুছছিলেন মুখ ফিরিয়ে। অন্ধকারের মধ্যেও সবাইকে সে তীক্ষ্ণ চোখে দেখেছে— সে নিজে কাঁদেনি কিন্তু অনেকগুলো ফোঁপানির শব্দ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার শব্দের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে বসে

থেকে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেছে তারও।

ওইরকম ক্ষমতা চাই। স্বপ্নের মধ্যেও বিড়বিড় করে, ওইরকম হতে চাই আমি।

কিন্তু স্বপ্ন সত্যি হয় না। আচমকা ঘুম ভাঙা ছবি হঠাৎ অনুভব করে পিসিমা বিছানায় নেই। দরজাটা খোলা। কে যেন কাঁদছে— তীক্ষ্ণ তীব্র চিৎকারে রাতের নিস্তব্ধতাকে চিরে চিরে দিয়ে কার একটানা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কে সে? সে কি পিসিমা? কে কাঁদছে অমন বুকফাটা কান্না?

হঠাৎ! হঠাৎই মনে হয় নিলু, পিলুদের কথা— বিকেলে দেখা ভাইটার কথা। কোলে করে বসে থাকা নির্বিকার মুখখানা।

কিন্তু দরজা পর্যন্ত এসে আর এগুনো যায় না। সুকুমারী এসে হাত ধরে আবার ঘরে নিয়ে আসে, ওদের ছেলেটা মারা গেল। কিন্তু তুই কোথায় যাচ্ছিস? পিসিমার চোখে জল টলটল করছে, পিসেমশাই গেছে, বিধু গেছে। যা করবার ওরাই করবে। তুমি যেও না, ছবি। কী দেখবে— দেখবাব কিছু নেই।

ছবি ছেলেটাকে দেখতে চায় না। ওর চেয়ে অনেক সুন্দর সুস্থ-সবল শবীর নিয়ে মারা গিয়েছিল সেফুর ভাই। ওই কঙ্কালসার চেহারা দেখলে দুঃখের চেয়ে আতঙ্ক হবে বেশি। সে শুধু দেখতে চায় নিলুদের মাকে। ওই স্থির, নিষ্ঠুর চোখ ছাপিয়ে জল পড়ছে। সত্যিই তবে প্রাণ আছে— কাঁদতে জানে ছেলে মরে গেলে, যেমন করে কাকিমা কেঁদেছিল।

কিন্তু পিসিমা যেতে দেয় না।

ছবির ভারি সুন্দর স্বপ্নটা নষ্ট হয়ে গেছে কান্নায়। বায়োস্কোপ দেখতে গিয়ে অনেক চেষ্টাতেও চোখে জল সে আনতে পারেনি, কিন্তু এখন তার চোখ ছাপিয়ে জল আসছে। সহজে— অনায়াসে।



তেরো

স্কুলে মিনুর সঙ্গে ছবির বেশি ভাব সে-কথা সবাই জানে— সব মেয়েরা। বেবির সঙ্গেও একেবারে কম ভাব নেই এ-কথাও সবাই জানে। কিন্তু আজ আর এই মুহূর্তে বেবির সঙ্গে ভাব রাখতে ইচ্ছে করছে না মিনুর চোখের জল দেখে।

বড়ো ঝগড়াটে মেয়ে বেবিটা। খেলতে গিয়ে কত কিছু হয়— তাই বলে ঝগড়া করতে হবে। হাডুডু খেলতে গিয়ে মিনু নাকি দম ছেড়ে দিয়ে আর একবার একদম নিয়েছে বেবিকে ছুঁয়ে দেবার আগে, স্বচক্ষে দেখেছে সে। মা কালীর নামে দিব্যি করে সে-কথা বললেও মিনু কিছুতেই তা মানে না। সে বলছে সে দম নেয়নি। বেবি রেগে আগুন হয়ে বলে, তা মানবি কেন? মা কালীর দিব্যি দিলাম তাও মিথ্যে বলছি আমি? বলবি নে কেন? আমাদের মা কালীকে তোরা মানিসনে তো— তাই গায়েও লাগে না। তোরা তো খ্রিস্টান, তোদের ছুঁলেও আমাদের জাত যায় জানিস? এ-কথা শুনে মিনু হঠাৎ কেঁদে ছুটে পালায়। বলে, দাঁড়াও, আমি অমলাদিকে বলে দিচ্ছি।

বেবি বলে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, বলগে যা, বলগে— তোরা যে আবার দুজনেই এক কিনা।

স্বভাবতই খেলা আর জমে না। যারা এ ঝগড়ায় অংশগ্রহণ করেছিল, যারা করেনি, সবাই একে একে সরে যায়। কেবল অত বড়ো মাঠটার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে ছবি। আর খানিকটা ভয় পাওয়া, খানিকটা জেদি, হিংসুটে হিংসুটে ভাব করে তখনও দাঁড়িয়ে থাকে বেবি।

বেবি একগুঁয়ের মতো তার হাত ধরে টেনে বলে, দোলনায় চড়বি, ছবি? বলতে গেল। ওঃ ভারী তো ... বলগে না ...। যা সত্যি কথা তা বললেই ...। বয়ে গেছে, দিক না নালিশ করে।

কিন্তু বেশ বোঝা যায় সে ভয় পেয়েছে। অমলাদিকে বলে দেবার ভয়টা এখন তাকে আস্তে আস্তে পাংশু করে দিলেও সে সেটাকে চাপ দেবার চেষ্টা করে আবার হাত ধরে টানে, আয় না ভাই। এখুনি তো ছুটির ঘণ্টা পড়বে— গোনা দুটো ঝুল খেয়ে যাই।

না। এতক্ষণ, এত কাণ্ডের পরে ছবি প্রথম কথা বলে, না, তুই কেন ওকে অমন করলি। মা কালীকে সবাই মানে জানিস— নিশ্চয় ও দম নেয়নি তাই ...।

না রে না, বেবি যেন গোপন কথা বলার মতো করে কাছে এগিয়ে আসে। ওরা আমাদের ঠাকুর মানবে কী? ওরা যে খ্রিস্টান, জানিস নে?

না। ছবি তা জানত না। জানে না। আজ জানল। জেনে তার আর বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। সে চিরকাল জানে খ্রিস্টান হয় সাহেব-মেমরা, তারা জাত মানে না— ম্লেচ্ছ। তাদের ছুঁলে জাত যায়। খ্রিস্টানরা এক অদ্ভুত মানুষ, সাহেব-মেমরা সেজন্যই তো অদ্ভুত। তাদের সম্বন্ধে কত মজার গল্প শুনেছে সে, অবিশ্বাস্য কিন্তু মজার। তারা হাত দিয়ে খেতে জানে না, তারা জুতো পরে বিছানায় ঘুমোয়, তাদের ভাষা বোঝা যায় না— খ্রিস্টানরা এমনি মজার।

কিন্তু সাহেবও নয়— মেমও নয়, কালো কুটকুটে তারই বয়সি মিনু, তার মতো বাংলা কথা বলে, তার মতো হাত দিয়ে টিফিনের সময় রুটি ছিঁড়ে খাওয়া মিনুটা— সেই কিনা খ্রিস্টান। খ্রিস্টান সেই স্টিমারে দেখা, ভুলতে না-পারা, চশমা চোখে অন্যমনস্ক ছেলেটাও। তাদের মা।

তার এতদিনের বন্ধু মিনু খ্রিস্টান! তার ভাই অসীমদা খ্রিস্টান! কই কখনও তো মনে হয়নি— কোথাও অস্বাভাবিক লাগেনি মিনুকে তার চেয়ে, বরং আরও ভালোবাসতে ইচ্ছে করেছে তাকে, আরও— আরও।

ছুটির ঘণ্টা পড়তে বেবিও দৌড়োয়— সে হয়তো এখন ভিড়ের মধ্যে মুখ লুকিয়ে পালাবে। কিন্তু ছবিকে আশ্চর্য করে দিয়ে গেছে। ক্লাসের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে গিয়ে কখন একসময় মিনুর সঙ্গেই প্রায় ধাক্কা খায় ছবি। তার বইগুলো আলাদা করে দিতে দিতে মিনু বলে, বাবা। কী করছিলি রে মাঠে বসে? ঘণ্টা শুনিসনি?

মিনুর চোখদুটো তখনও ছলছলে কিন্তু মুখের হাসিটুকু আগের মতোই।

অমলাদিকে বলিসনি? ছবি জানতে চায়।

না থাকগে— কী হবে বলে? বেবিটা ঝগড়াটে সে-কথা সবাই জানে। বলে দিলে তো শাস্তি পাবে।

চল।

চল— ছবিও বলে কিন্তু পরক্ষণেই সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়, চল, তোদের বাড়ি যাই। নিয়ে যাবি ভাই?

তোর পিসিমা যদি বকেন?

কেন? প্রশ্নটা করে ছবি নিজেই কেমন লজ্জা পায়, তারপর জোর করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, বলুকগে, চল। মিনু, তোদের ঠাকুরকে দেখাবি কিন্তু।

চলতে চলতে খানিকটা দলছাড়া হয়ে দুজনে অনর্গল কথা বলতে বলতে যায়। মিনু বলে, যিশু ছাড়া তো আমাদের ঠাকুর নেই ভাই। জানিস, যিশুকে ওরা ক্রুশিফাই করেছিল? কিন্তু মহাপুরুষদের কখনও মৃত্যু হয় না, ওরা কেবল শরীরটাকে মারতে পারে।

ক্রুশিফাই কী? ছবি একেবারে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সত্যি মরেনি তবে?

দেখবি চল। আমাদের বাড়িতে একটা ছবি আছে। কথাটা শেষ করে মিনু একবার আড়াআড়ি করে বুকে হাত রাখে। তা দেখে ছবি ফিক করে হাসে, ও কী রে? ওরকম করলি কেন?

যাঃ। খুব লজ্জিত মুখে মিনুও হাসে। করতে হয় যে। তুই ভাই দাদার মতো। দাদাও ওমনি, চার্চে যদিও বা যাবে কখনও উপাসনা করবে না, উপাসনা যদিও বা করবে তো কখনও বাইবেল পড়া শেষ হলে ক্রুশ করতে চায় না। কেবল হাসে ফিক ফিক করে, মা যে কত বকে...।

মিনুর মা চাকরি করেন, হাসপাতালে। মা চাকরি করেন এটা ছবির কাছে অদ্ভুত লাগে— দেশের বাড়িতে থাকতে সে কোনওদিন এমন কথা শোনেনি। মা-দের কাজ তো কেবল রান্না করা আর খেতে দেওয়া...।

তোর মা বুঝি রান্না করেন না?

কেন করবে না? আমাদের তো আর রাঁধুনি রাখবার পয়সা নেই, মাকেই তো সব করতে হয়। আমরা তো আর বড়োলোক না...।

মিনুকে ইস্কুলে দেখলে কিন্তু মনে হয় কত যেন বড়োলোক তারা। সাজগোজ করে না কিন্তু ফিটফাট-ছিমছাম হয়ে থাকে, যা ছবি হাজার ভালো জামা পরে এলেও হয় না। সেইজন্যই কিনা কে জানে, মেয়েরা সেধে সেধে মিনুর সঙ্গে কথা বলে, জজ সাহেবের মেয়ে পর্যন্ত।

ছোট্ট বাড়ি, সরমা পিসির বাসার মতো টালির ছাদ দেওয়া ছোটো ছোটো দুখানা ঘর কিন্তু বেশ সাজানো-গোছানো। বাইরের ঘরটাতে ঢুকেই কেমন ভালো লাগে। পিসিমার বাড়িতে তো অত ঘর, আলমারি, চেয়ার-টেবিল কিন্তু কেমন ছড়ানো-ছিটানো। এলোমেলো হয়ে এখানকার জিনিস ওখানে পড়ে থাকে।

নিলুদের বাড়িতে যাও। সেখানে তো কিছুই নেই— যা আছে সব ছেঁড়া, ময়লা, তুলো-ওঠা, ধুলো-ওড়া। সেখানে দাঁড়ানো যায় না।

কিন্তু এখানে? বসবার ঘরখানায় একটা গোল টেবিলের চারপাশে চারখানা চেয়ার, টেবিলের ওপর ফুলদানিতে ফুল। দেওয়ালে একখানা মাত্র ছবি কিন্তু সেখানা ভালো করে দেখতে গিয়ে ছবির চোখ একেবারে আটকে যায়। অমন করে

রক্ত পড়ছে লোকটার শরীর থেকে। কাঠের গায়ে পুঁতে দেওয়া একটা অর্ধনগ্ন দেহ, মাথায় তার মুকুট। তাকিয়ে দেখে সে বুঝতে পারে সেটা সোনার নয়, রুপোরও নয়— সেটা কাঁটার। কাঁটার মুকুট! আর পায়ের কাছে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ও কারা কাঁদছে? যারা তাকে ভালোবাসে? দেখতে দেখতে ছবিরও কখন দু-চোখ পুরে জল এসেছে যেন।

পাশের ঘর থেকে মিনু এসে বলে, আয় ভাই, দাদা ডাকছে। ছবিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুঝিয়ে বলে, ওই হল ক্রুশিফিকেশন। ক্রুশ করতে জানিস, ছবি? এই দ্যাখ, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি— দু-একবার দেখিয়ে দিলে ছবিও শিখে ফেলে। এবার আর সে হাসে না। ছবিটা তার মনে গভীর নাড়া দিয়েছে। কেমন কষ্ট হচ্ছে, রাগ হচ্ছে তার, কিন্তু মহাপুরুষদের তো মৃত্যু নেই।

নেই-ই তো। —মিনু বলে। জানিস, ওরা অমন করে কষ্ট দিল, তবু যিশু বলেছিলেন— ভগবান, ওরা জানে না ওরা কী করছে, তুমি ওদের ক্ষমা কর। ক্ষমাই যিশুর ধর্ম।

কথাগুলোকে মিনুর মুখে কেমন নতুন শোনায়। ছবিও বুঝতে পাবে সে শোনা কথা বলছে, বড়োদের মুখে কথাকে নকল করছে— তবু খারাপ লাগে না। তার হঠাৎ মনে হয় সেও পুজো করবে যিশুকে। তাদের দেবতার ছবির পাশে ওই ছবিটাও রেখে দেবে আর সবাইকে বুঝিয়ে বলবে, মাবতে চাইলে কী হবে, মহাপুরুষের মৃত্যু নেই।

পাশের ঘরে মিনু নিয়ে যায় ওকে। জানলার কাছে মাটিতে বসে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় মোটা চশমা চোখে রোগা ছেলেটা আজও তেমনি বই পড়ায় তন্ময় হয়ে আছে, চোখ তুলে তাদের দেখে হাসে, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো না।

সে আর মিনু দুজনেই হাঁটু মুড়ে বসে তার পাশে। বই থেকে মুখ তুলে অসীম বলে, নিহিলিস্ট কাদের বলে জান, ছবি?

ছবি তা কেমন করে জানবে। সে তো পড়ে ক্লাস সিক্সে আর অসীমদা সামনের বছর ম্যাট্রিক দেবে। সে কী-ই বা জানে। কিচ্ছু না।

অসীমই বুঝিয়ে দেয়। বলে, আমাদের দেশে যেমন টেরোরিস্ট, রাশিয়ায় তেমনি ছিল নিহিলিস্ট। এখানে যেমন টেরোরিস্টরা ইংরেজদের তাড়াতে চেয়েছিল, রাশিয়ায় তেমনি ওরা জারকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তার জন্যে ওদের গোপন দল ছিল। বিশ্বাসঘাতকতা করবার উপায় ছিল না কারুর, তাহলে তাকে মরতে হবেই। সে তুমি যেখানেই থাক। ওরা ঠিক খুঁজে বার করে নেবে। উঃ, তুমি যদি পড় সে-গল্প, ছবি!

অসীমদার মুখে শুনতে ইচ্ছে করে গল্পগুলো কিন্তু তার আগেই চটির শব্দ করে ওদের মা এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। গল্প শোনা হয় না। কী মনে করে সে মিনুর মাকে একটা প্রণাম করতে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে

দেন তিনি তাকে, ছিঃ ছিঃ, প্রণাম কেন? প্রণাম নয়। প্রণাম করে না।

করে না। বড়োদের তো প্রণামই করতে হয়। কে জানে কেন উনি অমন করলেন। পাশ থেকে মিনু বলে ফিশফিশ করে, খ্রিস্টানদের প্রণাম নিতে নেই যে? তুই কিচ্ছু জানিস নে।

ছবি জানত না অনেক কিছুই। জানত না মিনুদের খ্রিস্টান হবার ইতিহাস। অসীমও সে-কথা বলতে চায়নি কিন্তু মা পাশের ঘরে গেলে মিনুর জেদে তাকে বলতে হয়। ভালো করে সেও জানে না। কাটা কাটা, ছেঁড়া ছেঁড়া। মার ঠাকুমার গল্প।

চোদ্দো বছরের বিধবা মেয়েকে লোভ দেখিয়ে শহরে নিয়ে এসেছিল গ্রামের একটা পাজি লোক, তারপর ফেলে পালায়। সে মেয়েকে আর কে ঘরে নেবে? গ্রামের কার ঘরে তার জায়গা হবে, নিজের বাবা-মাই যখন সমাজের ভয়ে সাহস পাচ্ছে না মেয়েকে নিতে! তার উপায় কী হবে?

সত্যি কী হল তারপর? ছবি ব্যাকুল বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, কেউ কাছে থাকতে দিল না— নিজের বাবা-মা পর্যন্ত না?

দিয়েছিল একজন। এক পাদরি সাহেব। সে সেই অভাগী মেয়েকে বলে, বুঝিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দেয়, তাকে লেখাপড়া শেখায়। তারপর সেই মেয়ে নিজে ইচ্ছে করে বিয়ে করে এক দারোয়ানকে, খ্রিস্টান দারোয়ান। তাদের এক ছেলে হয়েছিল— অসীমের দাদু। দারোয়ানের ছেলে কিন্তু অনেক লেখাপড়া শিখে সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন। তাঁর হয়েছিল তিন ছেলে, এক মেয়ে। অসীমদের মা।

মামারা কিন্তু দাদুর মতো না, জানো? দাদু নিজে কত লেখাপড়া জানতেন, মামাদের কিন্তু লেখাপড়ার দিকে ঝোঁকই হল না। তারা চিনল টাকা, বলল চাকরি করব। দাদু তিনজনকেই চাকরি দিলেন, একজন কেরানি হল, দুজন পুলিশ। পুলিশ মামা..., বলে অসীম হঠাৎ হাসে।

মিনু এসে বলে, ছবি আয়, দাদা এসো, মা খাবার দিয়েছে।

বাইরের ঘরের টেবিলের ওপর তিনখানা থালা, চেয়ার-টেবিলে সামনা-সামনি বসে খেতে খেতে ছবির অদ্ভুত লাগে। খাওয়াটাও যে কত আনন্দের এমন করে এর আগে যেন সে বোঝেনি কোনওদিন।

খেতে খেতে মিনু বলে, জানিস দাদা, আমরা খ্রিস্টান শুনে ছবি একেবারে অবাক হয়ে গেছে। হি হি...। আমাকে ক্রুশ করতে দেখে হাসছিল তোর মতো। তুইও তো ওমনি করিস, চার্চে যেতে চাসনে। শুধু শুধু মার মনে কষ্ট দিয়ে তোর বুঝি আনন্দ হয়?

অসীম মুখ তুলে বলে, আহা, কী বা হয় চার্চে? কেবল আ-মে-ন, হে প্রভু যিশু, তুমি আমাদের পবিত্র কর, পাপ থেকে মুক্ত কর। সুর করে করে তাই বলা।

আমার ভালো লাগে কী জানিস? দুমদাম এই— বলে সে একটা আঙুলে বিশেষ একটা ভঙ্গি করে, চালাও শটাশট— যেমন টেগরা চালিয়েছিল।

হঠাৎ দরজার ওপাশ থেকে রূঢ় কঠিন গলায় কে ধমকে ওঠে, খোকা? ফের ওইসব কথা? বুকে একটা ক্রুশ এঁকে মিনুর মা এসে সামনের চেয়ারখানায় বসেন। রূঢ় কঠিন দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকান একবার, কিন্তু তারপর কোমল হয়ে আসে মুখ, খাওয়া হয়েছে? মিনু, এবার তোমার বন্ধুকে একটা গান শুনিয়ে দাও।

মিনু বলে, দাদাও গাইবে, মা। আমি একা না।

অসীম শক্ত হয়ে মাথা নিচু করে থাকে। ছবির সামনে সে গাইতে চায় না বুঝেও মা বলেন, গাও খোকা। কেন গাইবে না?

মিনুই প্রথম আরম্ভ করে, প্রভু, তোমার অসীম করুণা...। অসীমও গায় কিন্তু ছেঁড়া ছেঁড়া সুরে, বিরক্ত মুখে। শেষ হলে মুখ ভেংচে বলে, আহা মেয়ে আর গান পেল না— প্রভু তোমার অসীম করুণা। কেন? সেই গানটা গাইতে পারলি নে, 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু'। সেদিন শেখালাম কত করে।

ওদের মা বলেন, না, ও-গান মিনু গাইবে না। তুমিও গাইবে না। আমি বারণ করেছি। ওটা বিদ্রোহের গান, ওতে হিংসার প্রবৃত্তি হয়।

অসীম তবু তর্ক করার চেষ্টা করে ক্ষীণ সুরে বলে, ও তো স্বদেশি গান— বিদ্রোহ কোথায়? দেশের কথা আছে।

কিন্তু ও-গান ইংরেজদের বিরুদ্ধে। আমরা তা গাইতে পারি না। আমরা তাদের বিরুদ্ধে নই।

কিন্তু দেশটা তো আমাদের। ইংরেজরা গায়ের জোরে...।

চুপ কর খোকা। অত বড়ো বড়ো কথা আমি তোমার মুখে শুনতে চাই না। রূঢ় ধমকে শুধু অসীমকে নয়, ছবি-মিনুকে পর্যন্ত যেন কাঠের মতো শক্ত করে দেন ওদের মা।

কিন্তু ও কী! যার গলার স্বর অত কঠিন হতে পারে এত তাড়াতাড়ি সে আবার কাঁদতেও পারে? মিনুদের মা কাঁদছেন। রুমালে চোখ মুছে ফেলে ধরা গলায় বলতে থাকেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি খোকা, তোকে দিয়ে আমার কোনও আশা পূর্ণ হবে না। তুই! তুই আমার কথা একবারও ভাবিস নে! তোর বাবাকে যে ওই স্বদেশিওয়ালারাই মেরেছিল সে-কথাও ভুলে যাস?

ছবি এবার আড়ষ্ট হাত-পা ঝেড়ে নিয়ে ওঠে, তাকে যেতে হবে সে-কথা যেন তার এতক্ষণে মনে পড়ে, কিন্তু মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে থাকে। যাবার আগে খুশি হওয়া গেল না, যে-খুশিটা এখানে এসে হয়েছিল। এমন ছোট্ট সংসার কিন্তু তারও কোথায় যেন একটা দুঃখ আছে। এ-দুঃখটার রূপ নিলুদের মতো নয়, পিসিমার মতো নয়। কিন্তু তবু তাকে অস্বীকার করা যায় না।

মিনু আর অসীম দুজনে তাকে পৌঁছে দিতে যায় বাড়িতে। হাঁটতে হাঁটতে অসীম বলে, মা যেন কেমন। আগে বকবে একবার, তারপর কাঁদবে, তারপর বাবার কথা তুলবে। শেষে যিশু! খ্রিস্টান বলে কি বাংলাদেশ আমার নয়? জানিস মিনু, ওই যে নতুন নার্স টোনির মা, ও এসে এসেই মার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। জন্মে তো ইংল্যান্ড চোখে দ্যাখেনি, তবু লন্ডনকে বলবে হোম। স্বদেশির নাম শুনলেই ওরা কাঁপতে থাকে।

মিনু কথাগুলো শোনে কিন্তু উত্তর দেয় না। আর ছবি তখন অন্যমনস্ক হয়ে দেখে, রাস্তার পাশের গাছগুলোয় নতুন পাতা গজাচ্ছে। ধুলো ধুলো বিষণ্ণ শহরটায় কেমন জ্বলজ্বলে একটা ছাপ লেগেছে, হলদে হলদে অজস্র ফুলে ভরে আছে কতকগুলো অচেনা পাহাড়ি গাছ। কী মাস এটা? ফাল্গুন। বসন্তকাল। দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া দিচ্ছে, কোকিল ডাকছে থেকে থেকে। ছবির মনটা হঠাৎ কেমন করে ওঠে, গ্রামকে মনে পড়ে, মনে পড়ে মাকে, মণিদাকে— সবাইকে। সব্বাইকে।

কেমন করে এতদিন পরে আজ হঠাৎ পুরোনো কথা এত স্পষ্ট করে, এত বেশি করে মনে পড়ছে— মনে পড়ছে কত ক-ত কথা। সে যেন গন্ধ পাচ্ছে ঘাসের, মাঠের, ঘাটের। গন্ধ পাচ্ছে মটর ফুলের, সরষে ফুলের, আমের মুকুলের। শহর আর গ্রাম, গ্রাম আর শহব সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সেও যেন কেমন একটা ভালোবাসার টান অনুভব করতে থাকে, সে টান মার জন্য নয়, মণিদার জন্য, আরও কিছুর জন্য— কী একটা যেন। সে দেশ! সে অসীমের মতো অত কথা বোঝাতে পারে না, বলতে পারে না, কিন্তু অনুভব করতে পারে। কী যেন একটা ঠেলে ঠেলে বুকের কাছটায় উঠে আসে, দুঃখ না, কান্না না, একটা আবেগ। মনে পড়ার আবেগ। ঝাপসা ঝাপসা একটা স্মৃতির পাতা যেন বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তার চোখের সামনে দিয়ে, বারে বারে মনে হতে থাকে, কতদিন এসেছি আমি— ক-ত দিন। কে জানে কত দিন।

অসীম হঠাৎ বলে, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, গানটা জান ছবি? শুনেছ?

ছবি বলে, হ্যাঁ জানি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি— অধীরকা গাইত। আকাশ কেমন করে বাঁশি বাজায়, অসীমদা?

মিনু বলে, ছবিও গান জানে, দাদা। সেই গানটা ছবি? সেই—যায় যাবে জীবন চলে, বন্দেমাতরম বলে।

ছবি গম্ভীর হয়ে বলে, হ্যাঁ, ওটাও অধীরকা গাইত। মুকুন্দ দাসের গানও গাইত অধীরকা— ভুলি ভেদভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান, সাথে আছে ভগবান, নাহি ভয়।

মিনু বলে, গা না ভাই, গা।

বাঃ, এসে গেছি দেখছিস নে?

বাড়িতে পৌঁছে মিনু সুকুমারীর কাছে ছবিকে দিয়ে বলে, রাগ করতে পারবেন না কিন্তু মাসিমা। ছবিকে আমার মা দেখতে চেয়েছিলেন, তাই ওকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম।

কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে মিনু, ছবি ওরকম পারে না। কোনও কথা সে সাজিয়ে-গুছিয়ে বলতে পারে না। হয় লজ্জায় চুপ করে থাকে না হয় এলোমেলো বলে।

মিনুর কথা শুনে সুকুমারী বলে, না, রাগ আর কী...। কিন্তু... বড্ড দেরি করেছে। যাক গে। এসো তোমরা কিছু খেয়ে যাও।

আমরা যে খেয়ে এসেছি মাসিমা। ছবিকে না-খাইয়ে রাখিনি তাই বলে।

সুকুমারী মিনুর কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে হাসে একটু, তা হোক, আর একবার না হয় খেলেই।

সামনে বসিয়ে খাওয়াতে খাওয়াতে বলে, রবিবারে এসো সকালে— ছবির সঙ্গে খেলা করো। ওর তো সঙ্গী-সাথী বিশেষ নেই।

মিনু বলে, রবিবারে তো আসতে পারব না, মাসিমা। সেদিন আমরা চার্চে যাই, দুপুরে মা বাইবেল পড়ে। সেদিন হয় না।

চার্চে?

ছবি বোঝে মুখটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা বুঝতে দিতে চায় না পিসিমা।

ওরা চলে গেলে সুকুমারী বলে, এমনিতে তো বেশ ছেলেমেয়ে দুটো, কিন্তু খ্রিস্টান। কপাল! আগে জানলে রান্নাঘরে বসাই। ছবি, জামাকাপড় ছেড়ে মাথায় গঙ্গাজল দেবে এসো। দেখ তো কাণ্ড। সব ছুঁয়ে নেড়ে একাকার, আগে কি জানি?

পিসিমা যেন এক মুহূর্তের মধ্যে একেবারে অন্য মানুষ। ছবি কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— সে জামাকাপড় ছাড়বে না, মাথায় গঙ্গাজল দেবে না। কিছুতেই করবে না সে।

দেশে থাকতে দেখত দুঃখীরামের মায়ের মাজা বাসন ঘরে ঢোকানো হত না। অমন ঝকঝকে করে মাজা, তবু সব আবার ঠাকুমা একটা একটা করে ধুয়ে ঘরে তোলাত। তার কাজ নেওয়া চলত কিন্তু জল চলত না— ছোঁওয়া চলত না। সে ছিল চাঁড়াল।

আর মিনুরা খ্রিস্টান। খ্রিস্টান কিন্তু তাতে কী?

হঠাৎ কোথা থেকে কয়েক ফোঁটা জল গায়ে পড়তেই চমকে দেখে পাথরের বাটিতে তুলসীপাতা ভিজিয়ে পিসিমা গঙ্গাজল ছিটোচ্ছে। শিউরে উঠে ছবি ছুটে ঘরের মধ্যে পালায়। চোখের কোণ দুটো ভিজে উঠেছে তার।

সুকুমারী পেছন থেকে চেঁচায়, ও ছবি দাঁড়া, জামা ছাড় আগে, ঘরে ঢুকিস নে। ও ছবি...।



চোদ্দো

পিসিমা বলে, নিলু চোর। তাই বাড়ির মধ্যে ওদের ডাকা যায় না। বাগানে বসে খেলা করতে হয়। কিন্তু তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি ববং কেমন একটা আকর্ষণ বেড়েছে বাড়ির। আগে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছেই হত না— মনখারাপ হয়ে যেত, আজকাল লাগে না। ফিরে এসে খেয়ে বৈঠকখানা ঘরের ভেতরেব দরজাটা খুট করে খুলে ছবি বাগানে আসে, ওদিকে বেড়ার ধারে উঁকি মারতে থাকে দু-জোড়া চঞ্চল চোখ, ছবির গেটটা খুলবার অপেক্ষায়। তারপর তিনজোড়া চোখ, আগে একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে হাসে— খুশির হাসি, অপেক্ষা করে থাকাব হাসি। তিনজোড়া হাত জামা-কাপড়ের তলা থেকে বার করে জিনিসগুলো— পুতুল, খেলনা।

ছবিব ভালো দামি পুতুল (লুকিয়ে আনা, পিসিমা দেখলে বকে), নিলুদের ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুতুল একজায়গায় জমা হয়। পিলু ইট দিয়ে উনুন তৈরি করে তাতে মাটির হাঁড়িতে ভাত চাপায়। নিলু পুতুলগুলোকে সাজায়। এমন সুন্দর করে সাজায় যে ছবি মুগ্ধ হয়ে দেখে। পিসিমার ফেলে-দেওয়া জরিব পাড় কনে-পুতুলের কুঁচি দেওয়া কাপড় হয়, ছবির আনা পাউডার দিয়ে আলতা দিয়ে পুতুলকে সাজাতে সাজাতে নিলু একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বলে, কতটুকু কাপড়ে দেখ পুতুলের হয়ে যায় কিন্তু মানুষের...। এমন সুন্দর শাড়ি, কিন্তু কেবল পুতুলের— নারে?

মাঝে মাঝে সেই জরির টুকরো কোমরে গুঁজে রাখে, সন্ধেবেলা উঠে যাবার সময় বুকের কাপড়ের মধ্যে খেলনা লুকিয়ে নিয়ে যায় দুটো-একটা, ছবি তা দেখে রাগ করে না, তার হাসি পায়, কষ্ট হয়। সে জানে, নিলু হয় পরদিন

না হয় দু-দিন পরেই ওমনি করে লুকিয়েই আবার সেগুলোকে রেখে দেবে।

নিলুর মুখের দিকে তাকিয়ে কে জানে কেন— ছবি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। নিলুর যদি ছবির মতো জিনিসপত্তর থাকত? তাহলেও কি অমন হত ওর স্বভাব? পিলুটা তো অমন নয় কিন্তু নিলু ভারী ছটফটে— ছটফটে বলেই বোধ হয় কোনও কাজ ও ভেবে করতে পারে না। এমনকী ছোট্ট একটা পুতুল পর্যন্ত চুরি করে রাখতে পারে না।

হঠাৎ কখন পুতুল ফেলে, বেড়ার ফাঁকে মুখ রেখে নিলু চেঁচায়, অ্যাই পরিবানু, শোন— শোন।

ডেকে সে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকে ছবির মুখের দিকে, এই মেয়েটাকে দেখেছিস ছবি, দ্যাখ, কী সুন্দর দেখতে। প্রাইমারি স্কুলে পড়ে আবার জানিস? কতবার ওর নাম কাটা গিয়েছে কিন্তু বড়ো দিদিমণির পা জড়িয়ে ধরে এমন কেঁদেছে যে আবার ইস্কুলে নিয়েছে ওকে। এখন বড়ো দিদিমণির বাড়িতে যত ঘুঁটে লাগে দেয়, তার বদলে বিনে পয়সায় পড়তে পায় ইস্কুলে।

ছেঁড়া ময়লা তেলচিটে কাপড়-পরা মেয়ে, হাতে একটা বালতি ঝুলিয়ে এসে দাঁড়ায়। পরিবানু। কী অদ্ভুত নাম!

নিলু বলে, দ্যাখ ভাই, বেশ সুন্দর দেখতে না?

সুন্দর! গা দিয়ে খড়ি উড়ছে, সারা মুখ খসখসে, গায়ে ময়লা জমেছে, চুলগুলো তেলের অভাবেই বুঝি লাল কিন্তু তবু কী সুন্দর।

নিলু বলে, গোবর কুড়িয়ে আনলি বুঝি? মেয়েটা নিঃশব্দে মাথা নাড়ে, তারপর লোভীর মতো তাকিয়ে থাকে ওদের খেলনাগুলোর দিকে, পুতুলের দিকে।

জানিস ছবি, ও ইস্কুলে ক্লাসে প্রত্যেকবার ফার্স্ট হয় কিন্তু ওকে ফার্স্ট করে না। কোনও প্রাইজ দেয় না। তাহলে নাকি ভদ্দরলোকেরা চটে যাবে, মেয়ে দেবে না। না রে পরিবানু?

মেয়েটা হাসে একটু, সম্মতির হাসি। ওর ডান হাতখানা গোবর মাখা, আঙুলে মাছি উড়ে বসছে। সামনে দাঁড়াতেও যেন লজ্জা করছে তার।

নিলু বলে চলে, জানিস ভাই, ওরা গরিব। ভীষণ। আমাদের চেয়েও। আমাদের তো বাবা আছে তবু, চাকরি করে, ওর তাও নেই। ওর মা ঘুঁটে বেচে, কাঁথা সেলাই করে দেয়, কিন্তু কারুর বাড়িতে চাকরি করে না...। পাঠানদের নাকি তা করতে নেই।

পাঠান? ওরা তবে মুসলমান? ছবি জানে পাঠান কাদের বলে। ইতিহাসে পড়েছে সে, মোগল আর পাঠান। শের শাহ পাঠান ছিলেন। বীর শের শাহ, হাত দিয়ে যিনি বাঘ মেরেছিলেন। অদ্ভুত বিস্ময়ে ছবি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে

মেয়েটাকে। তারপর হঠাৎ বলে, দাঁড়া নিলু, পুতুলগুলো রেখে আসি। পরিবানুদের বাড়িতে যাব।

আর সেই কথা শুনে এই প্রথম মেয়েটাও কথা বলে, আমাদের বাড়ি যাবে?

বাংলা বলতে পার তুমি? তোমার...।

বাংলা? বড়োদের মতো হাসে পরিবানু। আমার জন্ম এ-দেশে জানো? আমি মার সঙ্গেও বাংলা বলি। কিন্তু আমাদের বাড়ি— তুমি যাবে? কেন?

নিলুও বলে, পিসিমা যদি বকে, ছবি?

অবাধ্য ঘোড়ার মতো ঘাড় ঝাঁকিয়ে সে বলে, না, বকবে না।

যে মেয়েটা বড়ো দিদিমণির পা জড়িয়ে ধরে পড়ার জন্য, বিনে পয়সায় তার বাড়ির ঘুঁটে জোগায় তাদের সংসারটা একবার দেখতেই হবে তাকে। আর কিছু সে জানে না।

ছবি গেলে নিলু, পিলুকেও যেতে হয়, কিন্তু বিমর্ষ আর শঙ্কিত হয়ে থাকে সারাক্ষণ। ফিশফিশ করে নিলু বলে, মা যদি জানে—। এদিকে খিদে পেলে খেতে দেবে না কিন্তু কোথাও যদি খেয়ে আসি— তাতেও বকুনি। কেবল বকবে— কেবল।

শ্যাওলা-ভরা পুকুরটার পাড়ে যে হুমড়ি খেয়ে পড়া ঘরখানার সামনে দাঁড়িয়ে পরিবানু তার মাকে ডাকে সেখানে কি মানুষ থাকতে পারে? কাছিমের পিঠের মতো উপুড়-করা ঘরখানা দেখলে ভয় হয়। কিন্তু কেউ বেরোয় না, কেবল একটানা একটা কাতরানির শব্দ ভেসে আসে। শঙ্কিতমুখে পরিবানু বলে, আবার জ্বর এসেছে মার— সকালে ছিল না। দুপুরে দুটো ভাত খেয়েছে ওমনি...। আসবে ভেতরে? ভাসা ভাসা শঙ্কিত চোখে সে তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে। ছবির ফরসা জামা-কাপড়ের দিকে বারে বারে তাকায়।

নিলু বলে, ছবি চল, ফিরে যাই।

ছবি তবু নড়ে না। তার যেন জেদ চেপেছে। সে একবার ভেতরে যাবে। যাবেই।

ঘরের মেঝে মাটির, দেওয়ালের মতো শুকনো খটখটে নয়। ভেজা ভেজা স্যাঁৎসেঁতে। তার ওপর ছেঁড়া কাঁথা গায়ে কাঁপছে পরিবানুর মা। জটা-ধরা চুলের মধ্যে থেকে এখনও উঁকি দিচ্ছে তার টিকালো নাক, ভেঙে-যাওয়া চোয়ালের ওপর দুটো সুন্দর চোখ। পরিবানুর মাকে দেখলে এখনও কেমন করে যেন চেনা যায় সুন্দরী বলে।

পরি বলে, ওরা নিলু, পিলু আর তুমি?

ছবি।

হ্যাঁ, ছবি। একটা ছেঁড়া বিবর্ণ গালচে পেতে দিয়েছে পরিবানু তাদের

বসবার জন্য— এখনও তার জ্বলে-যাওয়া সুতোর কারুকার্য মিলিয়ে যায়নি। ছবি অবাক হয়ে সেখানা দেখে। ওর মা বলে ভাঙা ভাঙা বাংলায়, ওটাই আছে সম্বল। সবটা আমার করা জান? কাশ্মীরি মেয়ে আমি— একদিন আমারও দিন ভালো ছিল পরির বাবা বেঁচে থাকতে, কিন্তু এখন নসিব দেখেছো? কাঁদছে পরির মা চোখে কাপড় দিয়ে, শুধু এই পরিটার জন্যে বেঁচে আছি। কিছু করতে পারিনে ওর জন্যে, বলি চল কাশ্মীর চলে যাই— ও যাবে না। বাংলাদেশ ও ছাড়বে না, বাংলা শিখবে, বাংলাদেশের ছেলে বিয়ে করবে ওর ইচ্ছে। তবে থাক— আমি কী করব! কিন্তু আমি মরলে, তখন কী হবে তোর, বল?

পরিবানু হাত ধুয়ে এসে মায়ের পাশে বসেছিল, সে রেগে বলে, ধ্যাৎ, কেবল মরার কথা বলবে তুমি। বারণ করিনি তোমাকে? অন্য কথা বলতে পারো না?

আচ্ছা আচ্ছা। মা থামে। তারপর কী ইশারা করে। মেয়েটা উঠে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে মাটির থালায় শক্ত শক্ত নিমকির মতো জিনিস এনে ওদের সামনে রাখে। নিলু, পিলু খায়, ছবিও খায়। পরিবানু আধভাঙা কাচের গ্লাসে জল আনে। তাও খায়।

আস্তে আস্তে ছোট্ট স্যাঁৎসেতে মাটির ঘরখানায় অন্ধকার নেমে আসছে। পুকুরপাড়ের গাছগুলোর ডালে একদল বাসায় ফেরা পাখি কিচিরমিচির করে ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে— করুকগে। ছবি তন্ময় হয়ে রুগ্ন, হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে কথা বলা পরিবানুর মায়ের মুখে কাশ্মীরের গল্প শোনে, ফলের বাগানের, নদীর, পাহাড়ের।

পরিবানু ততক্ষণে ঘরের কোণে ছোটো একটা প্রদীপ জ্বালিয়েছে, সেখানে একমনে সে মাথা নিচু করে বই নিয়ে পড়ছে। ওই আলোতে কি চোখে দেখা যায়? ছবি তো পড়ে ইলেকট্রিক আলোয় চেয়ার-টেবিলে বসে। দেশের বাড়িতে লণ্ঠন জ্বালাতে হত। কিন্তু সে-কথা পিসিমা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ পিসিমার কথা মনে পড়তেই লাফিয়ে উঠে পড়ে সে। এতক্ষণ নিশ্চয় তার খোঁজ পড়ে গেছে।

প্রদীপের আলো আঁচল আড়াল দিয়ে পরিবানু ওদের পুকুরের অন্ধকার রাস্তাটা পার করে দেয়। সারি সারি আরও কতকগুলো হুমড়ি-খাওয়া ঘর এদিকটায়, তার একটা ঘরে কে যেন কার সঙ্গে ঝগড়া করছে, আর-একটা থেকে আসছে ছোটো ছেলেমেয়ের তারস্বর চেঁচানি। কী অন্ধকার এদিকটা। এতটুকু আলো নেই।

নিলু বলে, এটা মুসলমান পাড়া, কোচোয়ান, বাবুর্চিদের পাড়া। অন্য জাতও আছে দু-এক ঘর।

বড়ো রাস্তা থেকে এ ঘরগুলো যেন নিজেদের ইচ্ছে করে আড়াল করে রেখেছে— আলো থেকে, বাতাস থেকে, রাস্তার কোলাহল থেকে। কেবল পুকুরপাড়টার চারধার ঘিরে মশার গুঞ্জন উঠছে, ব্যাং ডাকছে মক্‌মক্ করে, মস্ত বড়ো ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটায় বসে পেঁচা ডাকছে কর্কশ স্বরে।

আর হুমড়ি-খাওয়া ঘরখানার এককোণায় একটা মেয়ে এতটুকু একটা প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় চোখ কুঁচকে পড়া করছে। ঘরের কোণে শুয়ে তার মা জ্বরে কাতরাক্— পড়াটা সে শেষ করে নেবেই। সে স্বপ্ন দেখছে বাংলার, তার মা স্বপ্ন দেখছে কাশ্মীরের।

কিন্তু থাক পরিবানু। ছুট— ছুট। পড়ি কি মরি করে পিলুর হাত ধরে ছবি ছোটে। ঢিব ঢিব করা ভয় নিয়ে বাড়ির মধ্যে পা দিয়ে আপনা থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে তার। পিসিমার ঠাকুর পুজোর ঘণ্টা বাজছে টিং টিং টিং। এখনও তার খোঁজ পড়েনি তবে।

ভালো মেয়ের মতো হাত-পা ধুয়ে পড়তে বসে, বারেবারে, তবু অন্যমনস্ক হয়ে যায় ছবি। এত উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলোতেও কিছুতেই ঝাপসা হচ্ছে না একটা ছবি— ঘরের কোণে এতটুকু আলোয় চোখ কুঁচকে পড়া করছে একটা মেয়ে। তাকে ঘিরে বাইরে নেচে বেড়াচ্ছে অন্ধকার, গুঞ্জন উঠছে মশারা, শ্যাওলা-ঘেরা পুকুর থেকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে আসছে। কিন্তু সেই বুক-চাপা অন্ধকারের মধ্যেও কচুর পাতায় ফোঁটা ফোঁটা করে জমা হচ্ছে টলটলে শিশির। জমা হচ্ছে।



পনেরো

তারপরও ছবি দু-একবার পরিবানুদের বাড়িতে গেছে— লুকিয়ে লুকিয়ে, পালিয়ে। ঝুলে-পড়া অন্ধকার ঘরখানায় যেদিন শুধু পরিবানুর মাকে শুয়ে শুয়ে কাতরাতে শুনেছে। উঁকি দিয়ে দেখেছে মেয়েটা নেই, ওমনি আবার চুপি চুপি পালিয়েও এসেছে।

কিন্তু আজ আর পালিয়ে যাওয়া যায় না। পায়ের শব্দ ক্ষীণ হলেও পরিবানুর মায়ের কান এড়ায় না, ক্ষীণকণ্ঠে সে বলে, কে? পরি? একটু পানি দে। ভাষাটা বাংলা নয়, কিন্তু বুঝতে পারা যায়।

ছবির আর চলে যাওয়া হয় না, সে এগিয়ে এসে বলে, আমি।

জ্বরতপ্ত লাল লাল দুই চোখ মেলে সেই মা তাকায়। চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি মাথার কাছ থেকে চাটাইখানা এগিয়ে দেবার চেষ্টা করে ভাঙা বাংলায় বলে, তুমি? পরির দোস্ত। বোসো। ও গেছে দোকানে বার্লি কিনতে, আসবে এখুনি। বেগমের বাড়ি থেকেও তো ডেকে গেছে, সেখানে যাবে— সেখান থেকে এসে খানা পাকাবে। মেয়েটার যদি কোনও হুঁস থাকে...।

বেগম কে? সেখানে যাবে কেন? অপরিসীম কৌতূহলে ছবি যেন ফেটে পড়ে।

পরিবানুর মা ছবির এনে দেওয়া জল খেয়ে ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলে ঠোঁট মুছে একটু ম্লান হাসির চেষ্টা করে বলে, চেন না বেগমকে। বড়ো রাস্তার পশ্চিম দিকের মস্ত গেটওয়ালা বাড়িটা— ফুল বেগম। খুপসুরৎ।

বাড়িটা চেনে ছবি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো লোহার গেট আছে, তার দুপাশে দুজন দারোয়ান পাহারা দেয়। সারা বাড়িটা লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা আর সেই লোহার বেড়া ঢেকে ফুটে থাকে একরকম নীল ফুল, গাঢ় নীল। ভারি সুন্দর

দেখতে। ছবির কতদিন ইচ্ছে হয়েছে ওই ফুল কটা ছিঁড়ে নেয়— ওই বিরাট বাড়িটার মধ্যে একবার ঢোকে। নিলু গল্প করেছে ওর মধ্যে নাকি ফোয়ারা আছে— আপনা আপনি জল পড়ছে দিনবাত— কেউ ঢালছে না। আপনা থেকেই জলটা উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আর আছে হরিণ, খাঁচায় ভরা চিতাবাঘেব বাচ্চা আর নানাবকমের পাখি। কিন্তু ও-বাড়ির মধ্যে কেউ ঢুকতে পারে না— ওটা ফুলবিবির বাড়ি। নিলু বলেছিল ফুলবিবি— বেগম বলেনি। কেমন করে ঢুকেছিল নিলু কে জানে— সে-কথা আর জিজ্ঞেস কবা হয়নি, কিন্তু হিংসে হয়েছিল সে-কথা শুনে। এখন হিংসে হয় পরিবানুর ওপর। ওকে লোক দিয়ে ডেকে পাঠায় বেগম।

রোজ যায়?

হ্যাঁ, রোজ।

কেন ওখানে কী?

পরিবানুর মা বলে, নোকরি। নোকরি করতে যায় মেয়ে। বেগম তো একেবারে রাখতে চায়, কিন্তু মেয়ে তা শুনবে না। ওর..।

খুব মৃদু পায়ে ঘরে ঢুকে ছবিকে দেখে একটু হাসে পরিবানু, ভারি মিষ্টি খুশির হাসি।

ওব মা বলে, লোক এসেছিল, যেতে বলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা হঠাৎ পাংশু আর কঠিন করে একমুহূর্ত কেমন নিস্তব্ধ হয়ে থাকে মেয়েটা। জেদি গলায় বলে, দেব ছেড়ে ও-কাজ। রোজ রোজ তলব আমার ভালো লাগে না।

ছেড়ে দিলে চলবে কী করে বল? তোর বই কেনার পয়সা, খাতা, পেনসিল— পাবি কোথায়? আমার ঘুঁটে বেচা পয়সায় দেখিস না পেট-ভরে একবেলা খাই না।

আর কথা বলে না— ছবি বোঝে আর কথা বলার নেই। তাব দম আটকে আসে।

অতটুকু মেয়ে পরিবানু চাকরি করবে। বেগম তাকে লোক দিয়ে ডেকে পাঠায় এমন চাকরি। কিন্তু ছবি বেশ বোঝে লোক দিয়ে ডেকে পাঠানোটা খুব সম্মানের নয় সবক্ষেত্রে। এমন চাকরি যা পরিবানু পছন্দ করবে না। কী সে কাজ?

এর মধ্যেই কখন ঘবের এককোণ থেকে তাব ছেঁড়া ময়লা কাপড়খানা ছেড়ে পরিবানু পরে এসেছে একটা আস্ত রঙিন কাপড়, চুলটাও আঁচড়ে নিয়েছে। আঁচলে ঘষে ঘষে মুখটাকেও সে খানিকটা চকচকে করেছে। আর তাতেই, এই সামান্য পরিবর্তনেই আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। আশ্চর্য। ছবিকে মুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকতে দেখে পরিবানু আবার হাসে— বড়ো মেয়েদের মতো হাসি। তারপর ওকে ইশারা করে বাইরে আসবার জন্য।

পাশাপাশি চলতে চলতে ছবি বলে, তুমি চাকরি কর? এইটুকু মেয়ে তুমি? রোজ ওই বেগমদের বাড়িতে যাও?

আবার হাসে মেয়েটা, যাই। তুমি যাবে?

আমি? আমাকে ঢুকতে দেবে?

দেবে। আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। দেখবে কী চাকরি করি আমি।

ঢুকতে দেবে? ছবিব যেন বিশ্বাস হতে চায় না। সেই ফোয়ারাটা দেখা যাবে, হরিণ, চিতাবাঘের বাচ্চা দেখা যাবে। সেই নীল ফুল আনা যাবে। আজ নিলু, পিলু বিকেলে ভাগ্যি খেলতে আসেনি— তাই তো এমন একটা সৌভাগ্য হয়ে গেল তার।

সত্যিই ঢুকতে দিল তাকে। দরজার দারোয়ানটা পরিবানুর সঙ্গে কী একটা রসিকতা করল কিন্তু পথ আটকাল না। আর ভেতরে ঢুকে ছবি একেবারে অবাক হয়ে গেল।

পরিবানু ওকে সামনের বারান্দাটা দেখিয়ে বলে গেল, আমি ওদিকে থাকব, কাউকে বললেই ডেকে দেবে। তোমার যা ইচ্ছে দেখ, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আমার নাম কোরো।

কথা শেষ করে অদৃশ্য হয়ে গেল পরিবানু— ত্রস্ত পায়ে। ছবি ভীতু ভীতু মুখে খানিক সেই প্রকাণ্ড চত্বরটায় দাঁড়িয়ে থেকে শেষে এগিয়ে গেল ফোয়ারাটার দিকে, সেখান থেকে দেখতে গেল হরিণটাকে, চিতাবাঘের বাচ্চাটাকে— পাখিগুলোকে। খুঁজে খুঁজে নিজেই দেখে নিল যা যা শোনা ছিল। কেউ তাকে বাধা দিল না— কেউ বার করে দিল না। কাউকে দেখতে পর্যন্ত পাওয়া গেল না। যতক্ষণ পারল সে সেই মখমলের মতো নরম ঘাসের ওপর পা ঘষে ঘষে, চলে বেড়াল, চুপি চুপি বেড়ার ধারে গিয়ে গোটা কয়েক নীল ফুল ছিঁড়ে নিয়ে এল, তবু কেউ এল না। দরজায় দারোয়ান থাকে কিন্তু ভেতরটা কেমন নির্জন— ছমছমে। একসময় সে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল, দেখল বেলা পড়ে আসছে। একসময় হঠাৎ ভারি চমৎকার একটা রান্নার গন্ধ ভেসে এল কোথা থেকে যেন— বাতাসে নাক রেখে সে গন্ধটা অনুভব করার চেষ্টা করল। তারপরই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল কথাটা— বেগম!

বেগমকে দেখা হয়নি। পরিবানু কেমন করে চাকরি করে দেখা হয়নি।

যে বারান্দার ধারে পরীবানু তাকে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল সেখানে এসে সে একবার থমকে দাঁড়াল। কোথায় যেতে হবে সে জানে না। কোন ঘরে পরিবানু আছে তাও সে জানে না। এখান থেকে বেরিয়ে যেতেও সাহস হচ্ছে না— যদি পরীবানু না থাকলে তাকে বেরোতে না দেয়।

খুব নিঃশব্দ পায়ে সে উঠে এল বারান্দার ওপর। কোনদিক থেকে যেন অনেকগুলো কথার শব্দ আসছে। দীর্ঘ বারান্দা পেরোতে ছবির বুকের ভেতরটা

ঢিব ঢিব করছে— মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি কেউ তাড়া করে আসবে, এখুনি যেন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠবে এ নিস্তব্ধতা ভেঙে যাওয়ায়।

গলার শব্দ লক্ষ করে ঠিক ঘরখানার সামনে এসেই দাঁড়িয়েছে সে। কিন্তু ভেতরে ও কী? ও কে?

একটা অর্ধউলঙ্গ দেহ। ফরসা ধবধবে রং কিন্তু চামড়া ঝুলে ঝুলে পড়া। একটা অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি। পর্দাটা ফাঁক করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ছবি, কিন্তু ভয়ে তার গায়ের মধ্যে কাঁপছে, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, বুকের ভিতরটায় ধড়ফড় করছে এমন করে, যেন সে-শব্দটা ওদের কানে গিয়েও পৌঁছোবে না।

অর্ধউলঙ্গ দেহটাকে সবাই মিলে কী করছে?

কী ও? কেমন লালচে একটা রং মাখাচ্ছে সারা গায়ে— কে একজন খোলা চুলে আস্তে আস্তে মাখিয়ে দিচ্ছে সেই রং। সাদা চুল কালো হয়ে যাচ্ছে। ফরসা চামড়া, ঝুলে পড়া বুকের নীচেটা, হাতে পায়ের রং হয়ে উঠেছে অন্যরকম। পরিবানুও আছে— মাথা নিচু করে, সে এখন সেই চামড়া ঝুলে-পড়া শরীরটায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। এই চাকরি। পরিবানুর চাকরি।

কে জানে কেন ছবির হঠাৎ গা বমি বমি করে, অসহায়ের মতো কান্না পায়। হয়তো চেপে রাখা রুদ্ধশ্বাস ভয়টা তাকে এমন করেছে। হয়তো গলা দিয়ে শব্দও বেরিয়ে যেত কিন্তু তার আগেই পর্দা সরিয়ে পরিবানু বেরিয়ে আসে। তার বিরক্ত মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, দু-হাতে মাখানো লাল রঙ— কাপড়েও লেগেছে, নাকের পাশে, চুলে।

ছবির হাত ধরে সে একেবারে বাইরে টেনে এনে গেট দিয়ে বেরিয়ে এসে বাঁ হাতে ধরা পয়সা ক-আনা গুনে আঁচলে বাঁধে।

তারপর তেমনি হাসিমুখে বলে, দেখেছো বেগমকে?

ছবি মাথা নাড়ে।

আমাকে চাকরি ঠিক করে দিয়েছে সরিফনের মা— রান্নাঘরের রাঁধুনি। বেগমকে অনেক বলে-কয়ে...। এতে আমার খাতা পেনসিলের দাম উঠে যায়, মাকে মাঝে মাঝে চিনি কিনে দিই, ফল কিনে দিই।

ছবি বলে, ওই বেগম? ওই? ন্যাংটো হয়ে...?

ফিক করে হেসে ফেলে পরিবানু চলতে চলতে। রাস্তার লাইটপোস্টের আলোব একচিলতে এসে পড়েছে তার মুখে। সেই হাসিটুকু দেখে এখন আর ওকে ছবির বড় বলে মনে হয় না, গম্ভীর মনে হয় না। ছেলেমানুষি খুশিতে সেও উচ্ছল হয়ে উঠে সামনের তেলেভাজার দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ, দাঁড়াও ফুলুরি কিনি। খাবে ফুলুরি? খাও তোমরা?

পিসিমার কঠিন নিষেধ আছে কিন্তু সে-কথা বললে পরিবানুকে এমন সহজ করে পাওয়া যাবে না। ছবি বলে, খুব! কত খাই।

দুজনে ফুলুরি খেতে খেতে বেগমের কথা মনে পড়ায় হাসে আবার।

বয়েস কত জান ফুলবিবির? পঞ্চাশের ওপব। মেহেদি বং মাখে গায়ে, চুলে দেয় কলপ— নইলে সাদেক মিয়াঁর মন হয় না। তার যে আরও তিনটে বেগম— তাদেরও আলাদা আলাদা মহল। তারা অল্পবযসি— সুন্দর। একে আর তাই এখন দেখতে পারে না সাদেক মিয়াঁ। বুড়ো কিনা তাই বুড়িকে আর দেখতে পারে না। পারবে কী করে, পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়েছে যে।

পঞ্চাশ বছরের বুড়ি! হি হি...। দুজনেই হেসে ওঠে কিন্তু তারপবই পরিবানু আর কেন যেন হাসে না। হঠাৎ তার গলার স্বব গম্ভীর হয়ে যায়, বলে, জান, বেগম কাঁদে। ওর তো ছেলেও নেই, মেয়েও নেই, কার কাছেই বা কাঁদবে? ওই বাঁদীদের কাছেই কাঁদে। আমাকে রাখতে চেয়েছিল, বলেছিল যত্ন করে রাখবে। কাছে থাকতে হবে। এখনও বলে...।

থাক না কেন? বিস্মিত হয়ে ছবি জানতে চায়।

কেন থাকব? ওই হারেমে ঢুকলে আর কোনওদিন বেরোনো যায়? বেগমদের কতগুলো করে বাঁদি থাকে জানো? আমি বাঁদি হব না, মবে গেলেও না। বেগমের জন্যে আমার কষ্ট হয় এটা ঠিক কিন্তু আমি ওব কাছে সারাজীবন থাকতে পারব না— কিছুতেই না। আর তা ছাড়া...।

কী একটা কথা যেন পরিবানু হঠাৎ বলতে গিয়েও থেমে যায়। তার মুখের দিকে তাকিয়েও সে-কথাব আভাস পাওয়া ছবিব সাধ্য নয় ববং রাস্তার লাইটপোস্টের দিকে তাকিয়ে এবাব অন্য কথা মনে পড়ে। ফেরার কথা। পিসিমার কথা।

পড়ি কী মবি করে সে ছোটে! ঝুপড়ি ডাল মেলে অন্ধকাব করে রাখা জামগাছটার তলায়, দরজাব গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। মাথার ওপর গাছের ডালে পাখিব ছানাগুলো চ্যাঁ চ্যাঁ কবে চেঁচাচ্ছে।

বিধু লণ্ঠন হাতে করে বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, মা, এই তো দিদিমণি

সিঁড়িব ওপর গম্ভীব নিস্তব্ধ হয়ে পিসিমা দাঁড়িয়ে আছে বাগ-থমথমে মুখ নিয়ে।

কোথায় গিয়েছিলি? পিসিমা কি এত রাগতে পারে? এত থমথমে হয় মানুষের গলার স্বর?

পরিদের বাড়িতে।

চোখ কুঁচকে সুকুমারী বলে, পরি কে?

ওই যে, যার মা ঘুঁটে দেয়, কাঁথা সেলাই করে।

সেই পাঠান মেয়েমানুষটা? তাদের বাড়ি গিয়েছিলি তুই ভর সন্ধেবেলা? আরও গিয়েছিস কোনওদিন? হঠাৎ সুকুমারী টানতে টানতে ছবিকে নিয়ে সিঁড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। আমি ভাবলাম বাগানে খেলা হচ্ছে রোজকার মতো।

সন্ধে হয়ে গেছে-- দেখি নেই। সঙ্গী হয়েছে তোমার ভালো-- একটা খ্রিস্টান, একটা মুসলমান, একটা চোর...।

চোর না। কক্খনো কিছু চুরি করেনি নিলু।

না করেনি, সুকুমারীর মাথায় যেন খুন চেপেছে, সিল্কের ফ্রক পরানো সেই মেমপুতুলটা তবে কোথায়? আমি আজ দেখিনি ভেবেছিস তোর পুতুলের বাক্স? চোর না। একেবারে সাধু! আবার ভর সন্ধেবেলা মুসলমানের বাড়ি ঘেঁটে এল— লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, এইজন্যে তোকে এনেছিলাম, এইসব কুশিক্ষার জন্যে? কান ধরে গালে ঠাস করে একটা চড় মারে সুকুমারী। যা কলতলায়-- আমি গরমজল করে নিয়ে যাচ্ছি, হাত-পা ধুয়ে তবে ঘরে উঠবি।

পিসিমা তাকে মারল! বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠছে কান্নায়। তাকে মারল পিসিমা। কিন্তু কান্না আসতে দেবে না সে— দাঁতে দাঁত চেপে খানিক সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কলতলায় গিয়ে ঠান্ডা জল গায়ে ঢালে হড়হড় করে-- তারপর অন্ধকার ঘরখানায় আলো না-জ্বেলেই চুপচাপ এককোণে বসে থাকে।

নিলু চোর, মিনুরা খ্রিস্টান, পরিবানুরা মুসলমান। ওদের ছুঁতে নেই, ওদের কিছু খেতে নেই। মানুষকে ছোঁবে মানুষ, তাতে জাত যাবে-- তাতে স্নান করতে হবে। আবার তাদের স্বাস্থ্য পড়ানোর সময় ডাক্তারবাবু আরকে ভেজানো যে মানুষের ফুসফুসটা এনেছিলেন, নাড়তে দিয়েছিলেন তাদের, সে-কথা শুনেও পিসিমা তাকে চান করিয়েছিল— বকেছিল।

মরা-গলা মানুষের টুকরো! ছিঃ। রাম রাম।

সে-কথা শুনে তারও ঘেন্না হয়েছিল। ফুসফুসটা ধরেছিল বলে সেদিন সে ডানহাতে আর ভাত খেতে পারেনি সেটা ঠিক। কিন্তু তাই বলে জ্যান্ত মানুষকেও অমন ঘেন্না করা যায় কখনও, আরকে ভেজানো মরা মানুষের ফুসফুসকে ঘেন্না করার মতো। কেন করে পিসিমা? কেন তাকে শেখাতে চায় ঘেন্না করানো? অথচ এমনিতে কত ভালো-- কখনও বকে না, কখনও মারে না।

চোখ দিয়ে জল পড়ে, অন্ধকারের মধ্যে সে কঠিন হাতে তা মুছে ফেলে।

কে যেন তার মাথায় হাত রেখে আদর করে ডাকছে, ও ছবি, লক্ষ্মী সোনা, মেরেছি তোকে— বড্ড রাগ হয়েছিল। ওঠ— শুবি চল।

কিন্তু ছবি উঠতে চায় না— বিড় বিড় করে কী যেন বলে, বিরক্ত মুখে পাশ ফিরে শোয়।

তাকে দু-হাতে সাপটে তুলতে গিয়ে সুকুমারী হঠাৎ চমকে ওঠে, গা গরম। জ্বর হয়েছে।

তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়েই ঘুমন্ত ছবির শিথিল হাত থেকে ঠকাস করে মাটিতে পড়ে--- সিল্কের ফ্রক-পরা একটা মেমপুতুল।



ষোলো

জ্বরটাকে রাতে আমল না দিলেও পরদিন থেকে সেটা বেশ ভালো করেই বাড়তে থাকে। সাবাদিন ছবি প্রায় অচৈতন্য— তারপরের কযেকটা দিনও। সুকুমারী দিন-রাত তার বিছানার পাশে বসে আছে ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে। অবিনাশ মাথার কাছে ঝুঁকে পড়ে দাঁতে-দাঁত চেপে রাখা মেয়েটাকে নাড়া দিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, ছবি! ছবি! কী হয়েছে তোমার? কী কষ্ট হচ্ছে?

ছবি কথা বলে না, কেবল শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কথা বলে যখন তা হয় অসংবদ্ধ প্রলাপ। কান পেতে শুনে শুনে সুকুমারীর কী মনে হয় কে জানে, অবিনাশের কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলে। একটাও ঠিক কথা বলছে না। টুকরো টুকরো কথা— কী সব বলছে? কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে, ওর অভিমান হয়েছে।

ভালো হয়ে গিয়ে ছবির সে-অভিমানের কথা আর মনে নেই। বরং সুকুমারী মনে করিয়ে দিলে তার হাসি পায়।

সুকুমারী বলে, কী ভয়টাই পাইয়ে দিয়েছিলি, ছবি— বাবাঃ! কী যে বলতিস সব আবোল-তাবোল। আমার এমন ভয় করত...।

যাঃ। ছবি এখন শুনে লজ্জা পায়। সে বুঝি খুব পাগলামো করেছে অসুখের মধ্যে? আরও একবার মার কাছে থাকতে এমনি অসুখ হয়েছিল তার, সেবারও কি এমন আবোল-তাবোল কথা বলত? কে জানে? কেউ তো সে-কথা তাকে জানাযনি।

ছবির হঠাৎ নিজের মুখটা দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে চেনাই যায় না যেন মুখটাকে। মুখ আবার এমন বদলে যায় নাকি? কেমন

অন্যরকম। কেমন একটু সুন্দর ...। কেমন করে হল? আর কি তাকে বুনো বলবে সুধাদি? এখনও?

বিকেলে বাগানের সিঁড়ির ওপর পুতুলকে কাপড় পরাতে পরাতে নিলুর সঙ্গে গল্প করে ছবি। আজই সে প্রথম বাইরে এসে বসতে পেরেছে। কথা বলতে বলতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছবির মনে হয় এগিয়ে আসা মানুষটাকে যেন সে চেনে। ও সরিফনের মা। পরিবানুদের বাড়িতে একদিন মাত্র দেখেছিল ওকে।

বুড়ি সরিফনের মার কিন্তু সরিফন বেঁচে নেই, তবু সবাই তাকে ওই নামে ডাকে— পরিবানুই বলেছিল।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বোঝার ভারে। কাঁকালে একটা ধামা আর হাতে একটা থলে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে। বেগমের বাড়ির রাঁধুনির জোগানদার ও।

ছবি বলে, ডাক তো নিলু, ডাক তো ওকে।

সবিফনের মা! ও সরিফনের মা! নিলু চেঁচায়।

কে? কে ডাকছে? এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুড়ি গেটের সামনে দাঁড়িযে পড়ে।

পিলু ছুটে গিয়ে গেট খুলে দেয়, হাতছানি দিযে তাকে আরও কাছে আসতে বলে ছবি।

কাঁকালে ধামা আর হাতে বোঝা নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালে বোঝা যায় বুড়ির মাথাটা স্থির থাকছে না, অল্প অল্প কাঁপছে। মুখের সামনের দিকের কটা দাঁত নেই, চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, ঝুলে-পড়া ভুরুর নীচে ছোটো ছোটো দুটো চোখ— বিষণ্ণ।

আমাকে চিনতে পারছো, সরিফনের মা?

বুড়ি ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে চেনবার চেষ্টা করে। নিলু, পিলুর দিকে আঙুল বাড়িযে বলে, ওদের চিনি। আমড়া আর তেঁতুল খেতে যেত আমাদের পাড়ায়।

ছবি বলে, বোসো না তুমি। দুটো বোঝা নিয়ে যে হাঁফিয়ে গেছ।... পরিবানুকে আসতে বোলো তো... বিকেলে যেন আসে বাগানে।

ইয়া আল্লা! বুড়ি হঠাৎ ডুকবে উঠে ধামা নামিয়ে মাটিতে বসে পড়ে, এবার মাথাটা ঘন ঘন কাঁপছে, ছোটো ছোটো চোখদুটো জলে ভরে উঠেছে। ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলতে ফেলতে বুড়ি হায় হায় করে। সে কি আছে নাকি?

নেই? চমকে উঠে ছবি বলে, কোথায় গেল?

হায় খোদা! কোথায় তা কী সরিফনের মাকে বলে গেছে বেত্‌মিজ মেয়েটা। ...মা'টা বিমারে ভুগছিল কতদিন থেকে, কত তাকে বলেছি রাজি হয়ে যা পরি— বেগম তোকে বাঁদি করে নেবে। ...মেয়ে বলে, বাঁদি হব না। ...মা'টা মরে যাক সেও ভি আচ্ছা।

নিলু শুনে বলে, কেন বাবা, বেগমের বাড়ি চাকরি তো মজারই। ভালো ভালো জামাকাপড় পরা যায়— ভালো ভালো খাওয়া...।

ছবি বিরক্ত মুখে নিলুকে থামিয়ে দিয়ে সরিফনের মায়েব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আগ্রহ নিয়ে, তারপর— কী হল তারপর?

মা'টা তো মরে গেল চারদিন আগে। পরিকে বললাম— এবার চল বেগমকে বলি। আমার সরিফন নেই— কেউ নেই। তুই আর আমি থাকব..। সে বলল, আমি লেখাপড়া না শিখতে পারি, ঘুঁটে বেচব। লেকিন বাঁদি বনেঙ্গে নেহি...।

ছবি বলে, তবে নেই বলছ কেন সরিফনের মা?

নেই! হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বুড়ি। গালের কোঁচকানো চামড়া পর্যন্ত কাঁপতে থাকে তার। পরশুদিন থেকে আর দেখতে পাচ্ছি না। তাকে। কত জায়গায় খোঁজ করেছি। বেগমের খানসামা মুন্নাতের সঙ্গে মনে মনে আমি ওর সাদি পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছিলাম— সেও অনেক খুঁজেছে, কিন্তু কোথাও নেই। দীননাথের সঙ্গে চলে গেছে নিশ্চয়ই।

দীননাথ কে সরিফনের মা?

কে আবার? বাবুবাজারে গেঞ্জির কারখানায় কাজ কবত এক কম্‌বখ্‌ত ছোকরা— ছবিদের জাতের ছেলে সে। সরিফনের মা-দের পাড়ায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত— পরির সঙ্গে ভাবও ছিল তার। বেইমান মেয়েটা শেষে তাব সঙ্গে...। আল্লা জানেন, পরিবানুকে কত ভালোবাসত সরিফনের মা, কিন্তু ..।

প্রায় লোল হয়ে আসা শরীরে একখানা আধময়লা কালো পাড় শাড়ি আব তার সঙ্গে অদ্ভুত রংচঙে একটা সিল্কেব ব্লাউজ পরেছে। ব্লাউজেব গলা নেমেছে বুকের কাছে, হাত দুটো কাঁধ ছাড়িয়ে ঝুলে পড়েছে কব্জি পর্যন্ত, মাথার সামনের কটা চুল পেকে একেবাবে সাদা হয়ে আছে। সরিফনেব মার দোল খাওয়া মাথা, পরিশ্রান্ত মুখ আর জল মুছে ফেলা চোখের দিকে তাকিয়ে ছবি যেন হঠাৎ পরিবানুর মুখটাকেই দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে।

আবার ধামা কাঁকালে তুলে, থলে হাতে সরিফনের মা যাবার জন্য পা বাড়ায়। তার আর কী? রান্নাঘরের জোগানদার হয়ে তিরিশটা বছর তার কেটে গেছে। বুড়ো হয়ে গেছে— এমনি করে খাটতে খাটতে একদিন সে মরে যাবে ওই পরিবানুর মায়ের মতোই। কেউ নেই যে মববার সময় একবার আল্লার নাম শোনাবে। ভেবেছিল .. কিন্তু বেইমান মেয়েটা...।

নিলু বলে, আচ্ছা তো পরিবানুটা? না রে ছবি?

ছবি কিছু ভাবতে পারছে না। বেত্‌মিজ্‌। কাকে বলে বেত্‌মিজ্‌। সে কি বাঁদি হতে চায়নি বলে, নাকি হিন্দু ছেলের সঙ্গে কাউকে না জানিয়ে চলে গেছে বলে?

কিন্তু ছবি তাকে ভুলবে না। মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে-পড়া এক অন্ধকার

কুঁড়ের মধ্যে তেলের প্রদীপের আলোর সামনে বাংলা বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়া একটা মেয়ে। কাশ্মীরে তার দেশ ছিল নাকি একদিন। কিন্তু সে-কথা বললে সে হাসে। গোবর-মাখা আঙুলে তার মাছি বিন্‌বিন্ করে, সেই হাত ধুয়ে ফেলে সে বইয়ের পাতা ওলটায়। বড় দিদিমণির যত ঘুঁটে লাগুক সে দেবে শুধু বড়ো দিদিমণি তাকে যেন একটু ক্লাসে বসতে দেয়। সে ফার্স্ট হবে কিন্তু তার নাম খাতায় উঠবে না, প্রাইজ পাবে না। সে বেগমের কাছে সুখে থাকতে চায় না— মাকে মরে যেতে দেখেও না। সে মুসলমান কিন্তু হিন্দু ছেলের সঙ্গে তার ভাব... সে...!

বিকেলের ছায়া দীর্ঘ হয়ে নামছে পৃথিবীতে, কাঁঠাল গাছটার ঝাঁকড়া ডালপালাব মধ্যে এর মধ্যেই অন্ধকাব বাসা বাঁধছে। আসন্ন সন্ধ্যাকে ঠিক চোখেব দেখায় ধরা যাচ্ছে না, কিন্তু অনুভব করা যাচ্ছে সারাদিনের সমাপ্তিকে— শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ দিয়ে। রাস্তার ও-পাশের বাড়িটা সেই কবে থেকে তালাবন্ধ পড়ে আছে— কেউ খোলে না। তাব চওড়া সিঁড়িতে বসে একটা রাস্তাব গোরু আরামে রোমন্থন করছে। রাস্তার ওপরের লম্বা হয়ে বহুদূর চলে-যাওয়া ইলেকট্রিক তারে একটা বাদুড় উলটো ঝুলে আছে, মরে গেছে বোধহয় শক খেয়ে রাত্রে।

নিলুও কখন কথা থামিয়ে দিযে পুতুলেব বাক্স গুছোচ্ছে মাথা নিচু করে। ছবির আব কিছু ভালো লাগছে না— একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়ায়।

গুছোনো পুতুলের বাক্স তার দিকে এগিযে দিয়ে নিলু বলে, এটা নিয়ে যা।

ক্লান্ত গলায় ছবি বলে, ওটা তোর কাছে থাক। আমার আব খেলতে ভালো লাগে না।

তবু নিলুকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে, নে না, আমি বলছি। পিসিমা বকবে কি না ভাবছিস? বকুক গে... । কদিন পবে তো চলেই যাচ্ছি মাব কাছে বকলে বয়ে গেল। ও-পুতুলগুলো তোকে দিলাম নিলু, তোকে আব পিলুকে।

ওরা গেট খুলে চলে গেলে ভেতরের দিকের দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে রাস্তার দিকে চোখ পড়ে, একেবারে নির্জন হয়ে গেছে এই মুহূর্তে— একটা লোকও যাচ্ছে না। সেই একমুহূর্তের শূন্য রাস্তাব দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনটা কেমন কবে ওঠে ছবির। মনের ওপর একটা দুঃখ চেপে বসে থাকলে সেটা যেমন ছায়ার মতো সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে, ছবির যেন তাই। কান্না এসেও আসছে না, দুঃখটাও স্থায়ী হচ্ছে না, কিন্তু সহ্য করাও যাচ্ছে না। এখন খুব খানিকটা কাঁদতে পারলে যেন শান্তি পাওয়া যেত।

ঘরে গিয়ে সে পেনসিলের বাক্স থেকে মমতার লেখা সব চিঠিগুলোকে বার করে। ঠিক পড়া নয়— ঝাপসা ঝাপসা চোখে অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রথম চিঠিখানায় মা লিখেছিল, ছবি, সোনা আমার। তারপরের খানা— মা ছবি। তাবপরের খানা— স্নেহের ছবি। তারপর— কল্যাণীয়া.. । সবসুদ্ধ চারখানা

চিঠি— এতদিনে মা মাত্র তাকে চারখানা চিঠি লিখেছে আর ক্রমশ তা সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। এ ছাড়া আর একখানা চিঠি আছে, সেখানা বাবার,

স্নেহের ছবি,

তোমার গ্রীষ্মের বন্ধ কবে হইবে সত্বর জানাইলে তোমার বড়োকাকা তোমাকে আনিতে যাইবেন।

তোমার শরীর কেমন আছে? স্কুল কেমন লাগে?

এখানে সকলে একপ্রকার। তোমার মায়ের শরীর ভালো না।

আঃ

তোমার বাবা।

ঝাপসা চোখদুটো হঠাৎ মুছে ফেলে খুশি মুখে এবার চিঠিগুলোকে তুলে রেখে সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। বাবার চিঠিখানা তার সব দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়েছে— সে যেন চোখ বুজে গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

অন্ধকারে কে যেন তার মাথার কাছে এসে বসেছে। পিসিমা।

পিসিমার যে কী হয়েছে! থেকে থেকে তার কাছে এসে বসে থাকে, তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় একটু, আবার একসময় উঠে যায় কথা না বলে। কী যেন একটা বলতে চায় পিসিমা কিন্তু বলতে পারে না।

কী এমন কথা? সে-কথা শুনলে কি তার কান্না আসবে? সেই ভয়ে পিসিমা বলছে না। নাকি বলতে গিয়ে পিসিমার নিজেরই কান্না আসবে— সেই ভয়ে বলছে না।

সুকুমারী ডাকে, ছবি!

পিসির গলার স্বর কেঁপে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে ছবির মুখে হাত বুলিয়ে সে আগে বুঝে নেয় ছবি জেগে আছে কিনা। একটু থেমে, একটু ইতস্তত করে কখন একসময় মরিয়াব মতো বলে ওঠে, ছবি, তুই যাস নে।

যাস নে! ছবির স্থির হয়ে থাকা শরীরটা কেঁপে ওঠে। হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠতে গিয়ে হঠাৎ কান্নাটাকে গলার মধ্যে আটকে ফেলে রুদ্ধস্বরে সে বলে, না, আমি যাব।

পিসিমাও কি কাঁদছে? কে জানে। কিন্তু গলার স্বরটা ভার, বলে, তবে আমি কী নিয়ে থাকব? কাকে নিয়ে থাকব?

সে-কথা ছবি কী জানে! এতদিন যেমন করে ছিল তেমনি করে থাকবে। এতদিন কি ছবি ছিল? ছবি তো সেদিন এসেছে। তাকে তো কদিন পরেই ফিরিয়ে দেবার কথা ছিল। সে-কথা পিসি ভুলে গেছে। সে কি মায়ের কাছে যাবে না— কুসুমপুরে যাবে না? চিরকাল এখানেই থাকবে? ভয়ে, আশঙ্কায় তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে থরথর করে। সে হঠাৎ হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠে, না, আমি যাব,

আমি যাব-ই।

সুকুমারী এবাব রোগা দুর্বল মেয়েটার হাঁউমাউ করা কান্না থামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যতবার ছবিকে কাছে টেনে নিতে যায় ততবার সে ছিটকে চলে যায়, হাত সরিয়ে দেয়, মুখ ফিরিয়ে নেয় আর কেবল কাঁদে। তার চোখের জলে সুকুমারীর হাত ভিজে ওঠে।

ছবি! ও ছবি! শোন। সুকুমারী ব্যগ্র ব্যাকুল গলায় আকুতি করতে থাকে, যাবি। যাবি। জানি তোর মনকে ভোলাবার ক্ষমতা আমার নেই। যাবি তুই— কাঁদিসনে, আর কাঁদিসনে।

তখন ছবি শান্ত হয়, আর সে ছিটকে সরে যায় না, মুখ ফিরিয়ে নেয় না, কিন্তু কাঠের মতো শক্ত হয়ে থাকে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুকুমারী বলে, কিন্তু ছবি, আর যে ওরা তোকে আসতে দেবে না। তোর যে লেখাপড়া কিছুই হবে না। সেবার কত করে নিয়ে এসেছি, এবার একেবারে আটকে রাখবে তোকে।

ছবি বলে, ইস্।

সত্যি ছবি। তুই তো আমার বাবাকে চিনিসনে। তাঁর কথার ওপর কারুর কথা চলে না। ইচ্ছে থাকলেও কেউ তোকে পাঠাতে পাববে না আর...।

এবার কাঠেব মতো শক্ত কবে রাখা শবীবটা ছবির আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে সুকুমারীব কাছে ঘেঁসে আসতে থাকে। এবার সে গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবে, আর কাঁদে না।

এবার ওকে কাছে টেনে নিয়ে মাথার ওপর মুখখানা রেখে কানে কানে বলার মতো করে সুকুমাবী বলে, গিয়ে কী হবে, ছবি? জানি মার জন্যে তোর খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু একটু কষ্ট করে থেকে লেখাপড়া শিখে মার কাছে গেলেই তো বেশি আনন্দ হবে— তাই না? তাব চেয়ে চল ছবি, আমরা পুরী বেড়াতে যাই— মধুপুর যাই। ক-ত নতুন জায়গায় বেড়াব। নাইবা গেলি কুসুমপুরে ছবি।

কুসুমপুর! কু-সু-ম-পু-র! অন্ধকারে তাকিয়ে তাকিয়ে, খুব তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েও তো কই কুসুমপুরকে দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না, চেনা যাচ্ছে না। তার জায়গায় ভেসে উঠছে অন্য কতকগুলো ছবি— পুরী! মধুপুর! নতুন দেশ! নতুন জায়গা।

কিন্তু মা? মা।

মা তো লেখাপড়া শিখতেই পাঠিয়েছে তাকে। গেলে যদি আর আসা না হয়। দাদুর কথার ওপর যে কেউ কথা বলতে পারে না। বাবা না, বড়কা না, মা না, ঠাক্‌মা না...।

কী করবে ছবি তবে? কী করবে? হঠাৎ পিসিমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সে।

সুকুমারী তার পিঠের ওপর হাত রেখে মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরে নিজের জলে-ভেজা চিকচিকে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করে, তবে কী করবি, ছবি? যাবি তো?

জানলা দিয়ে একঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়েছে কখন যেন, নারকেল গাছেব পাতাগুলোর ঝরঝবানি শোনা যাচ্ছে। অল্প অল্প আলোয় ছবির মাথা নাড়াটা কোনদিকে ভালো বোঝা যায় না। কী যেন বলছে ও। কী? আকুল আগ্রহ নিয়ে কান পেতে থাকে সুকুমারী।

তবে আমি যাব না। যাব না আমি।

ছবি! ছবু!

খুশিতে কী করবে ভেবে পায় না পিসিমা। তার এলোমেলো ছড়ানো চুলগুলো সরিয়ে চওড়া কপালে একটু চুমো খায়, মাথার ওপর হাত রেখে বলে, আমি জানতাম, ছবি। খুব কষ্ট হবে কিন্তু সহ্য করতে থাকতে হয়. নইলে কি বড়ো হাওয়া যায়? তোকে অনেক বড়ো হতে হবে. ছবি। কেমন করে হবি সে-কথা আমি জানি না. কিন্তু তুই তা জানিস। বড়ো হলে আমাকে মনে রাখবি তো. ছবি? এলোমেলো কথা বলে যায় সুকুমাবী। ছবি তাব কথাব উত্তরে কিছু বলে কি না, সে তা দেখতে চায় না, শুনতেও চায় না; ছোট শিশুব মতো তাকে বুকের কাছে নিয়ে বসে থাকে সে অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না অবিনাশেব সাড়া পাওয়া যায়।

মেয়েটাকে কোলের কাছে নিয়ে কোলটা যখন ভবে উঠেছে মনে হয়, অন্ধকাবে যখন খুশি আব দুঃখ-মেশানো চোখের জল মুছে ফেলছে আঁচলে, তখনই হঠাৎ কেমন করে অবিনাশের জন্যও একটু নতুন উপলব্ধি হতে থাকে সুকুমারীর।

অবিনাশেব একটা মস্ত বড়ো ব্যথাব জায়গা আছে সে-কথা তার জানা। সেখানে ঘা দিয়ে দিয়ে যন্ত্রণা সে কেবল বাড়িয়েই দিয়েছে--- বুঝবার চেষ্টা করেনি, ভালোবাসা দিয়ে ফেরাবার চেষ্টা করেনি। তাই অবিনাশও ক্রমে ক্রমে দূরে সরে গেছেন, দুজনের মধ্যে মস্ত এক সাগরের ব্যবধান হয়ে গেছে দিনে দিনে।

ছবি এসে সে-ব্যবধান অনেকখানি কমিয়েছে— অনেক কাছাকাছি আসতে পেবেছেন তাঁরা ওকে উপলক্ষ্য করে। ছবি তাকে কী দিয়েছে সে জানে না -- কিন্তু সুকুমারী তা জানে।

ছবি কেন তাঁর নিজের হল না? কেন সেই স্বপ্ন দেখা, কল্পনা করা মেয়েদের একটা হয়ে ছবি এল না?

ছবি! অবিনাশ ডাকছেন।

সুকুমারী উঠে আলোটা জ্বালিয়ে দিল। একরাশ জামা-কাপড় এনেছেন অবিনাশ, সেদিকে একবার তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে মেয়েটা বসে থাকে।

অবিনাশ বলেন, এই ছিটগুলো নিয়ে এলাম। সঙ্গে দিয়ে দিও— ফিরে আসে ভালোই নইলে থাকবে।

সেগুলো একবার উলটে-পালটে দেখে সুকুমারী বলে, ডাক্তারকে জিজ্ঞেস কোরো তো এই সময় ওকে পুরী নিয়ে যাওয়া ভালো কিনা? ফেবার পথে মধুপুব হয়ে আসব।

সে কী? ও না বাড়ি যাবে?

ছবি যাবে না বলছে। ওকে নিয়ে আমরা পুবী যাব।

যাবে না? অতি সাধারণ কথা। কিন্তু মনে হয় অবিনাশের বুক থেকে যেন ভারী বোঝা নেমে গেল একটা, তাহলে তো আরও কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে। একটা লিস্ট কবে ফেল কী কী লাগবে। ছবির জুতো, মোজা, জামা, বিস্কুট, ওভ্যালটিন, হরলিক্‌স - সব লিখো। সব সঙ্গে থাকা ভালো— নতুন জায়গা।

নতুন জায়গা! ছবি শূন্যদৃষ্টিতে জিনিসপত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। পিসেমশাইয়ের অনেক টাকা। তাকে কত জিনিস দেয়-- কত জিনিস দিয়েছে? আবও আসবে।

সে তো কুসুমপুরে যাবে না। সে নতুন জাযগায যাবে। মাকে দেখেনি সে ক ত-দি-ন। তবু সে যাবে না।

বড়কা যদি আসে তবে ফিরে যাবে।

মা জিজ্ঞেস করবে, কেন ছবি এল না।

সে যে লেখাপড়া শিখবে। কুসুমপুবে থেকে আব যদি তাকে না আসতে দেয়।

মা চোখ মুছে ফেলে ভাববে, ভালোই হযেছে, আব আমি কাঁদব না। যেমন ছবি ভাবছে, আব আমি কাঁদব না।

সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধবে থাকে। জামাব ছিটগুলো হাতেব মুঠোর মধ্যে নিযে দলা পাকায। নতুন আনা পুতুলটার বং কবা লাল ঠোঁটটা খুঁটে খুঁটে মেটে রংটা বাব করে ফেলে।

সুকুমাবী বলে, ছিটগুলোকে অমন দলা পাকিও না, ছবু। সিল্কের জিনিস সেলাই কবতে অসুবিধা হবে।

পিসিমা কী জানে! পিসিমা তার কী জানে! ছবি কান্নাটা চাপবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু অত সহজে কান্না চাপা যায় না।

অনেক রাতে পাশে পিসিমা থাকে না। সে ঘুমিয়েছে মনে করে পাশের ঘরে পিসেমশাইযের কাছে যায়। রোজ যায়, আবার চলে আসে। পাশে কেউ না থাকলে ছবির ভয় করে, কিন্তু পিসিমাকে সে বলেনি সে-কথা।

আজও পাশের ঘর থেকে কথার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আজ আর ভয় করছে না, বুকের মধ্যে কী যেন একটা জমে আছে তার, সেটা ঠেলে ঠেলে ওপরের দিকে উঠছে।

সন্ধেবেলা খানিক কেঁদেছিল কিন্তু তারপর জোর করেই সে-কান্নাকে থামিয়ে দিয়ে ভেবেছিল আর কাঁদবে না।

এখন সেই থমকানো কান্না দমকে দমকে তার গাল, বালিশ ভিজিয়ে দিতে থাকে। আরও বেশি করে বালিশে মুখটা চেপে ধরে সে— শব্দ না হয়।

বড়কা বড়কা! তুমি তো ফিরে যাবে। মাকে কিন্তু ভালো করে বুঝিয়ে বোলো, মণিদাকে বোলো, দুর্গা, বাসন্তীকে বোলো, মায়াদিকে বোলো, কুসুমপুরের সব্বাইকে বোলো— ছবি আসবে না। ছবি অনেক লেখাপড়া শিখবে। ছবি নতুন দেশে যাবে।

ন-তু-ন দেশ।

যাবার আগে ছবির গায়ে বারে বারে একজনের কথা মনে হয়। কে?

কুসুমপুরের সবায়ের জন্য তো অনেক কান্না কেঁদেছে সে— আর না। নিলু, পিলুদের তো আবার এসেই দেখতে পাবে। মিনুরাও মামার বাড়ি যাবে ছুটিতে— ওদের কারোর জন্যই কষ্ট নেই। ও আর-একবার দেখতে চায় সেই মেয়েটাকে! সেই মেয়েটা! পিসেমশাই যার বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এসেছিল।

কিন্তু রাগ করলে তো লোকের মুখ লাল হয়, পিসেমশাইয়ের মুখ কেমন সাদা হয়ে গিয়েছিল। ছবির হাত-ধরা হাতখানা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল আর কাঁপছিল অল্প অল্প।

সকালে সে অবিনাশের কাজ করার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, পায়াটা আঁচড়ায় নখ দিয়ে। আজকাল পিসেমশাইয়ের সঙ্গে তার ভাব— আর ভয় করে না একটুও।

অবিনাশ কাজ করতে করতে একসময় মুখ তুলে বলেন, কী চাই, ছবি?

কিছু না।

উঁহু কী যেন একটা মতলব আছে মনে হচ্ছে। সেই চাট্‌নির শিশিটা বুঝি? হাসেন পিসেমশাই।

না।

তবে? পুতুল? তোমার খেলনা-পুতুল সব নিয়েছ তো সঙ্গে?

ছবি বলে, ধ্যাৎ। আমার পুতুল খেলতে ভালোই লাগে না।

তবে কী ভালো লাগে?

ছবি সে-কথার উত্তর না দিয়ে আরও কাছে ঘেঁষে এসে খুব আস্তে আস্তে

বলে সেই পিসিমার কাছে আমাকে একবার নিয়ে যাবেন, পিসেমশাই?

অবাক হয়ে কলম থামিয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে অবিনাশ বলেন, কার কথা বলছিস?

ওই যে ইস্কুলে ভর্তি হবার দিন গেলাম।

ও সরমা! পিসেমশাই অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তার দিকে বিষণ্ণ চোখ তুলে জিজ্ঞেস করেন, সেদিনকার কথা বলেছিস বুঝি পিসিমাকে? ছবি মাথা নেড়ে জানায় যে সে জানায়নি। পিসেমশাই তো বলতে বারণ করেনি— তবু না।

যাবি? তুই এখনও ওকে মনে রেখেছিস? চল, আর যাব না ভেবেছিলাম, তোর জন্যেই যাই।

চল্— বলেও অবিনাশ খানিক বসে থাকেন, দোয়াতের মধ্যে কলমটা ডুবিয়ে তুলতে ভুলে যান, তারপর হঠাৎ একসময় ধড়মড় করে উঠে পড়ে বলেন, চল্ চল্, বাইরে যাবার আগে একবার দেখাটা করেই যাই।

পিসেমশাই কোথাও নিয়ে বেরোলে পিসিমা একটুও আপত্তি করে না, খুশি হয়। কিন্তু আজ জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ এত বেলায়। যা রোদ, রোগা মেয়ে...।

কী বলবেন বুঝতে না পেরে একটু ইতস্তত করে অবিনাশ ছবির মুখের দিকে তাকান, বলো না তোমার মেয়েকে। ও যে যেতে চাইছে।

কোথায়? সেটাই জানতে চাইছেন সুকুমারী।

পিসেমশাই মাথা নিচু কবে আছেন। ছবি বুঝতে পারে সত্যি কথাটা কিছুতেই বলতে পারছেন না তিনি, বলতে পারছেন না মিথ্যে।

ঘাড় শক্ত করা জেদ নিয়ে ছবি বলে, যাব না তাহলে বেশ। কোথায় আবার? ভাঙা পাহাড়টার কাছে যে সাঁওতাল পাড়াটা আছে সেই পর্যন্ত। রোদ কোথায়? কোথায় রোদ দেখ না তুমি। সবসময় বাড়ি বসে থাকতে বুঝি ভালো লাগে?

সুকুমারী ছবির রাগ দেখে হঠাৎ হেসে ফেলেন। যে বেশি কথাই বলে না, তার মুখে অত কথা শুনে তাঁর আশ্চর্যও লাগে। বলেন বাবা! মেয়ের রাগ দেখ। কেবল জিজ্ঞেস করেছি কোথায়। যা না, আমি কি বারণ করেছি?

রাস্তায় বেরিয়ে পিসেমশাই একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নেন।

আবার সেই ঘোড়ার পায়ের তাল গুনতে গুনতে চলা, সেই দুই পাহাড়ের মাঝখানের সরু পথটায় দুটো ঘোড়ার চারজোড়া পায়ের গম্ভীর শব্দ কান পেতে শুনতে শুনতে কখন নিজেই একসময়ে বুঝতে পারে যে সে এসে গেছে।

এখন তার বুকের মধ্যেটা দুরদুর করে, হাত-পা কেমন ঠান্ডা হয়ে আসে। নতুন কোনও কিছু দেখলে, কোথাও গেলে তার ওমনি হয়। কেন হয় তা সে জানে না।

অবিনাশের পেছন পেছন গেট খুলে সে ভেতরে ঢোকে। সেদিনকার কুকুরটা তো ছুটে এল না। বারান্দায় অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল পাতা। এমন তো ছিল না সেদিন। ভেতর থেকে খুব ছোটো শিশুর কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

পিসেমশাই সে-শব্দটা শুনে একবার থমকে দাঁড়ালেন কেবল, তারপর বারান্দায় উঠে দরজাব কড়া নাড়লেন।

দরজাটা খুলে গেছে। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কালো, মোটা এক মেমসাহেব। সরমা পিসি তো নয়।

মেমসাহেব। কিন্তু কালো।

এতদিন সে জানত মেমসাহেবরা নাকি ভীষণ ফবসা হয়, দুধের মতো সাদা তাদের রং। কিন্তু সবাই তা নয়, খুব কালো মেম আছে, সাহেব আছে।

অসীমদা বলেছে, আসলে ওবা মোটেই মেমও না, সাহেবও না। তারা থাকে বিলেতে, ইউরোপে। এরা ভারতবর্ষেরই লোক, সাহেবদেব সঙ্গে কোনও একদিন ওদেব পূর্বপুরুষদেব কোনও মেয়ের কী ছেলের বিয়ে হয়েছিল, তাবপর থেকে বংশ বংশ ধবে তাবাও সাহেব হয়ে গির্জায় যায়, লন্ডনকে বলে হোম!

অসীমদা এমন মজা করে কথা বলে... সত্যি না হেসে পাবা যায় না।

কিন্তু সরমা পিসিব বাড়িতে ওরা কোত্থেকে এল?

পিসেমশাই এতক্ষণ ধবে কী কথা বলছেন? ছবি দেখে, মেমেব মাথা নাড়া দেখে পিসেমশাইয়ের মুখটা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে, তবু বারে বারে কী সব জিজ্ঞেস কবছেন। ফিরে এসে হাত ধরে বলেন, চল ছবি।

সরমাপিসি কোথায় গেল? চলে যাব কেন?

নেই।

ছবি তবু পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়, তার কান্না পায়, নেই? কোথায় গেল?

জানিনে।

ওই মেমসাহেব জানে। পিসেমশাই, মেমসাহেব জানে।

না ছবি— অবিনাশ বলেন, উনি বাসাটা ভাড়া নিয়েছেন। ভাড়াটে কোথায় গেছে উনি কেমন করে জানবেন?

ছবি অনিচ্ছুক পা দুটোকে টেনে টেনে চলতে থাকে। বারে বাবে ফিরে তাকায় বাড়িটার দিকে, তার বিশ্বাস হতে চায় না। তার ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ওই মোটা কালো মেমসাহেবকে নিজে জিজ্ঞেস করে, মেমসাহেব! মেমসাহেব! তুমি নিশ্চয়ই জান। তুমি জান সরমা পিসি কোথায় গেছে? ওই যে কালো, রোগা চেহারা। যার মা অসুখে সবসময় শুয়ে থাকে। যার ছেলে আছে। বিধবা বলে যাকে ক্ষমা কবতে হয়। মেমসাহেব তুমি জান?

কিন্তু ছবি যে ইংরেজি জানে না। ইংরিজি না জানলে তো ওদের সঙ্গে কথা বলা যায় না। হঠাৎ অবিনাশের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলে। কেন যে কান্না পায় সে নিজেও ভালো করে বুঝে উঠতে পারে না।

অবিনাশ জোর করে গাড়িতে তোলেন। রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেন, শরবত খাবি, ছবি? চল, আমরা শরবত খাইগে।

এখন খেতে ভালো লাগবে না, তবু আপত্তি করা যায় না পিসেমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। খানিকটা অবাক হওয়া, খানিকটা বাধা পাওয়া, খানিকটা রাগ-ভরা সেই বিচিত্র মুখখানার দিকে তাকিয়ে ছবি তার কান্নাটাকে গিলে ফেলে গাড়ি থেকে নামবার আগেই।

এরকম দোকানে ছবি কখনও আসেনি। পর্দা-দেওয়া ছোটো ছোটো ঘরের মতো একটাতে পিসেমশাই তাকে নিয়ে বসে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে কী যেন বলে দেন আস্তে আস্তে।

একটু পরেই লোকটা থালার ওপর একটা গেলাস নিয়ে এসে ছবির সামনে রাখে, সাদা সাদা বরফ ভাসছে তাতে। খেতে বেশ ভালো— চুমুক দিতে দিতে সরমা পিসির চলে যাবার দুঃখটা খানিকটা বুঝি ভোলা যায়।

পিসেমশাইও খাচ্ছেন কিন্তু তার মতো গেলাসে চুমুক দিয়ে নয়। পাশে রাখা শিশিটা থেকে হলদে কী একটা ঢেলে নিচ্ছেন, তার সঙ্গে সাদা সিরাপ মিশিয়ে খাচ্ছেন। কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ আছে তার।

ছবি যা খাচ্ছে, পিসেমশাই তা খাচ্ছেন না। তবে ওটা কী?

জিজ্ঞেস করতে যাবে এমন সময় হঠাৎ চমকানির মতো ছবির মনে পড়ে যায়— মদ! একেই বুঝি মদ বলে— যা খেয়ে প্রথম প্রথম অনেক রাতে ফিরত পিসেমশাই। যার জন্য পিসিমা ঢুকতে দিত না ঘরে।

কেমন লজ্জা আর অপরাধবোধ চেপে ধরে হঠাৎ, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে থাকে তার।

মদ খাচ্ছেন পিসেমশাই। অনেক চেষ্টায় ছবি একবার মাথাটা তুলে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করে মুখটা।

মদ খেলে কি লোকদের চোখ দিয়ে জল পড়ে? পিসেমশাইয়ের চোখ দিয়ে জল পড়ে গ্লাসের হলদে জলটার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

পিসেমশাই কাঁদছেন! মদ খেলে লোকেরা কাঁদে তাহলে? তবে কেন খায় লোকে অমন বিচ্ছিরি জিনিস— যা খেলে কাঁদতে হয়।



সতেরো

রোগা শরীরটা সেরে উঠে উজ্জ্বলতা মেশানো এক নতুন ভাব এসেছে ছবিব দেহে। তার চোখদুটো যেন স্বপ্ন দেখে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে আছে। যেন সে কোনও এক আনন্দের সন্ধান নিয়ে এসেছে তার দু-চোখ ভরে, তাব সারা শরীবে, তার ফুলো ফুলো মুখখানাতে।

আজও নিলু তার কাছে বসে মুখের দিকে ভক্তের মতো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা শুনছে। শুনছে সমুদ্রের কথা, পাহাড়ের কথা, মন্দিরেব কথা, মন্দিরের দেবতাদের কথা।

সমুদ্রের ঢেউ এসে ভেঙে ভেঙে পড়ত পাড়ে ছবিদের পায়ের কাছে— ভিজিয়ে দিত। স্নান করবার সময় ভাসিয়ে নিয়ে যেত, আবাব ফিরিয়ে দিয়ে যেত। ছবি ঝিনুক কুড়োত বালিতে, আর নুড়ি, শামুকের খোলস। তারা যে হোটেলটায় ছিল তার দরজায় চক দিয়ে কাঁচা হাতের লেখা ছিল বড়ো বড়ো করে, 'বালি খুঁড়িলেই ঝিনুক পাওয়া যাইবে।'

হয়তো ছবির মতো কোনও মেয়ে ছিল সেখানে, হয়তো কোনও ছেলে— তা কে জানে।

কিন্তু বালি খুঁড়ে ঝিনুক অনেক পেয়েছে ছবি, ছোটো-বড়ো সুন্দর পাথর। সে তার কিছু দিয়েছে নিলু, পিলুদের। কিছু রেখেছে অসীম আর মিনুর জন্য।

অসীম তাকে চকোলেট দিয়েছিল, সে দেবে তার নিজের হাতে জোগাড় করা সুন্দর পাথর, দেবে ময়ূরের পাখা। খুব খুশি হবে অসীম— নিশ্চয়ই হবে।

ছবি অনর্গল গল্প করে যায়। কথা দিয়েও সে যেন তার নতুন পাওয়া অভিজ্ঞতাকে কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তার সমস্ত মন, চেতনা যেন

কতদূর থেকে তার বর্ণনাকে বয়ে আনে।

নিলুর খানিকক্ষণ ভালো লাগে। পিলু চকচকে নুড়ি-ঝিনুকগুলো খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে কিন্তু ভালো লাগে না। ওই ছায়াঘন গাছটার তলায় বসে ছবির আনা পুতুলগুলো, একবোঝা খেলনা নিয়ে খেলা করার চাইতেও কি বেশি ভালো এই গল্প আর গল্প।

ছবি ভুলে গেছে পুতুলের কথা, খেলার কথা। ওরা বারে বারে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, বারে বারে উশখুশ করছে— ছবির খেয়ালও নেই।

কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হয়েছে। হঠাৎ থেমে গেছে তার কথা। চমকে সে কান পেতে শোনে। তারপব নিলুর মুখের ওপর তার সেই দূরে ভেসে যাওয়া দৃষ্টি ফেলে বলে, কে রে?

এক উচ্চকণ্ঠের গান ছবিকে চমকে থামিয়ে দিয়েছে।

নিলু বলে, তোরা যেদিন গেলি তার কদিন পরেই ওরা এসেছে ও-বাড়িটায়— ভাড়াটে। বেশ বড়োলোক ভাই। কত চেয়ার, টেবিল, খাট এল। ছেলেটার কিন্তু মা নেই। বাবা আছে। খুব আদুরে ছেলে, পড়াশোনা করে না— কেবল জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গান করে।

অনেক খবর জোগাড় করেছে নিলু এরই মধ্যে। ছবির কানে তার কিছু ঢোকে, কিছু ঢোকে না। সে অবাক হয়ে সেই উচ্চকণ্ঠের গান শোনে।

ওইটুকু ছেলে! কতই বা বড়ো হবে তার চেয়ে। ছবি এবার তাকে দেখতে পাচ্ছে। ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে গুলতি ছুঁড়ছে একটা গাছের ডাল লক্ষ করে। বেশ হয়েছে। পাখিটা উড়ে এসে ছবিদের কাঁঠাল গাছের মাথায় বসেছে।

ছেলেটা তেমনি চেঁচিয়ে গান করতে করতে রাস্তার একটা কুকুরের পা লক্ষ করে গুলতি ছুঁড়েছে। এবার কুকুরটা হঠাৎ আর্তনাদ করে ছুটে পালাল।

তার সেই কেঁ-উ, কেঁ-উ শব্দটা শুনে ছবির ভারি কষ্ট হয়, ভারি পাজি তো ছেলেটা। দেখেছিস নিলু, পাখি না পেয়ে কুকুরটার ওপর ঝাল ঝাড়ছে।

তার কথার স্বরেই হোক কিংবা তাদের দেখতে পেয়েই হোক গান থামিয়ে ছেলেটা হঠাৎ চুপ করে গেছে। সে চোখ নামিয়ে এবার মাটিতেই ঠাঁই ঠাঁই করে গোটাকয়েক গুলতি ছুঁড়ে হঠাৎ কী মনে করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। যেন রাগটা ছবির হয়নি, হয়েছে তার।

ছেলেটাকে ভালো করে দেখা গেল ইস্কুলে যাবার দিন। বাড়ির সামনে কাঠের গেটটা ধরে দাঁড়িয়ে একটা চাবুকের মতো জিনিস নিয়ে নিজের মনেই বাতাসে শপাং শপাং করে বাড়ি মারছে, আর গুনগুন করে গান গাইছে আপনমনে। ছবিকে দেখে এবার সে জোরে জোরে গেয়ে ওঠে, হয়তো সেদিনকার

কথা মনে করে। কিন্তু আজকের গান বাংলা— গায় আর শাঁই শাঁই করে বাতাসে বাড়ি মারে।

হঠাৎ হাসি পায় ছবির, পাগল নাকি ছেলেটা? ওর পড়াশোনা নেই? স্কুল নেই?

কতদূর পর্যন্ত ছেলেটার উচ্চকণ্ঠটা শোনা যায়। গলাটা কিন্তু সত্যিই ভালো। ভালো না ছাই। না, গলাটা ভালোই। বেশ গান গায়।

ছবি কি গাইতে পারে? কে জানে! ছবি তো নিজেই জানে না। গান গাইতে পারলে কিন্তু বেশ মজা।

কী গান গাইছিল ছেলেটা? 'মনের গহনে তোমাব মুরতিখানি। ওগো সুন্দর।'

মনের গহনে মানে কী? সুন্দর কে?

কিন্তু ও-কথা ভুলে যেতেও বেশিক্ষণ লাগে না মেয়েদের চেঁচামেচিতে। অনেকদিন পরে বন্ধ স্কুল খুলেছে, কত কথা জমা হয়ে আছে — কত গল্প। আবার সারা রাস্তা হো হো হি হি..। আবার ধুলো ছিটিয়ে মনের খুশিতে চলা। বড়ো মেয়েরা কিন্তু ছোটো মেয়েদের চেয়ে গম্ভীর। তারা নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে কথা বলে। ওদের কথা অন্যরকম। ওদের গল্প অন্যরকম।

ক্লাস নাইনের প্রভাতীদি আসেনি। আর নাকি আসবে না। কেন?

ওমা! বিয়ে হয়ে গেছে যে তার ছুটির মধ্যে। ছবি অবাক হয়ে থাকে— কেমন অদ্ভুত লাগে ভাবতে গেলে। বিয়ে হয়ে গেলে আর বুঝি পড়া যায় না? কেন?

কেন আবার— শ্বশুরবাড়ি থেকে পছন্দ করবে না। মেয়েদের পড়া তো বিয়ে পর্যন্তই। এখন আবার কী?

ইস্কুলে ঢুকেই মাঠের মধ্যে আর একদল মেয়ের ভিড়। ওরা কাকে যেন ঘিরে রয়েছে। কে? ক্লাস টেনের মালতীদি, মালতীদির কপালে কত বড়ো একটা সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুর। মালতীদিরও বিয়ে হয়ে গেছে, ওর শ্বশুরবাড়ি ভালো— পড়তে দেবে বিয়ের পরেও।

ওরা সবাই কী সব জিজ্ঞেস করছে— হাসছে। ওদের সব কথা ছবি বুঝতে পারে না।

মিনু আসেনি? মিনু? ছবি মেয়ের দলের মধ্যে তাকে খুঁজতে থাকে।

তারপর সারাদিন তাদের গল্প চলে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে। মিনুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা কোথাও মেলে কোথাও মেলে না। কেউ বেশি দেখেছে, কেউ কম দেখেছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না।

কেবল একটা দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে মিনু— ওরা আর বেশিদিন এখানে থাকবে না। অসীম এবার ম্যাট্রিক দেবে, তারপর ওরা চলে যাবে মামাবাড়ি—

কলকাতায়। সেখানে অসীম কলেজে পড়বে— মিনু পড়বে ইস্কুলে।

কলকাতা! ছবির স্বপ্ন সে-দেশটা।

সে-কথা শোনবার পর থেকে মনটা কেমন খারাপ হয়ে যেতে থাকে মাঝে মাঝেই।

মিনু সান্ত্বনা দেয়, তার তো এখনও দেরি আছে, ভাই।

ছবি মিনুকে সেই ছেলেটার গল্প বলে।

মিনু বলে, ভারী পাজি ছেলে তো। ওর মাকে নালিশ করে দিস?

ওব মা নেই।

তবে কে আছে? সবসময় গান-করা ছেলেরা বখাটে হয় জানিস? তুই তোর পিসিমাকে বলে দিস।

ছবির কিন্তু নালিশ করতে ইচ্ছে করে না। শুধু শুধু পিসিমাকে বলতে যাবে কেন সে— ও তো আর কিছু বলেনি। কিন্তু মিনু বলেছে বখাটে! কে জানে।

বিকেলে স্কুল থেকে ফিরবার পথে আবার দেখা যায় ছেলেটাকে— ওদের মাঠটায একটা সাইকেল নিয়ে অনবরত পাক খাচ্ছে গোল হয়ে আর গান করছে চিৎকার করে। আবার গান! ছেলেটার কি গলাও ভেঙে যায় না?

বিকেলে যখন নিলুদেব সঙ্গে রোজকাব মতো বাগানে খেলা কবতে আসে তখন দেখা যায়, লম্বা কী একটা জিনিস চোখে লাগিয়ে ছেলেটা তাদের বাগানের দিকেই তাকিয়ে আছে।

নিলু বলে, আজ আমরা ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম জানিস? খুব বড়োলোক ওরা— তোর পিসেমশাইয়ের চেয়েও। ওদেব একটা কলেব গান আছে, সেটাতে পিন দিতে হয় না— কিছু না, আপনা থেকেই বাজে। তাকে বলে রেডিয়ো। সেখান থেকেই তো গান শেখে সাধনদা। সাধনদার বাবা আমাদের বিস্কুট দিয়েছেন।

ছবি বিবক্তিতে চুপ করে থাকে। কথাটা ঠিকই। পিসিমাব কলের গান আছে, কিন্তু রেডিয়ো নেই।

নিলু বলে, ডাকব দেখবি?

উত্তবের অপেক্ষা না রেখেই সে হঠাৎ হাত নেড়ে ডাকে, সাধনদা, সাধনদা-আ।

ছেলেটা চোখ থেকে যন্ত্রটা নামিযে একবার এদিক-ওদিক তাকায়, গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে বেড়ার কাছে দাঁড়ায়।

রোগা, ফরসা আর লম্বা চেহারা, চুলগুলো লালচে রঙের। সবায়ের মতো কালো নয়— ছবি আড়চোখে একবার দেখে নেয় চেহারাটা। ছেলেটা চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে নিলুকে বলে, কে ডাকছিল? তুমি?

কৃতার্থের ভঙ্গিতে নিলু বলে, হ্যাঁ আমরা, ছবিও।

মিথ্যে কথা বলিসনে— আমি ডাকিনি। ছবি লজ্জিত অপ্রস্তুত আর বিরক্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে।

তার কথা শুনে ছেলেটা একটু হাসে, নিলুকেই বলে, কেন ডাকছিলে?

আপনার হাতে ওটা কী, সাধনদা?

বাইনাকুলার। এ দিয়ে দূরের জিনিস দেখা যায়।

আমাদের একটু দেখতে দেবেন? নিলু, পিলু দুজনেই এগিয়ে এসে আগ্রহভরা দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকায়।

সাধন ছবির দিকে তাকিয়ে বলে, দেখবে?

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে ছবি জানায় সে দেখতে চায় না। নিলু, পিলু সমস্বরে বলে, আমরা দেখব, সাধনদা।

যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে খুশিতে নিলু প্রায় চেঁচায়, ও বাবা, ও-ই বকসিদের বাড়িটা কত কাছে এসে গেছে। কে যেন বসে আছে বারান্দায়— ওদের মেজছেলে। ও বাবা, কী মজা! ছবি দ্যাখ দ্যাখ— দূরের সব জিনিসগুলো ক-ত কাছে দেখাচ্ছে।

খুব মজার জিনিস নিশ্চয়। তবু ছবি শক্ত হয়ে বসে থাকে, দেখতেও চায় না, কোনও রকম আগ্রহ পর্যন্ত প্রকাশ করে না।

নিলুর পরে পিলু দেখে, তারপরে নিলু আরও একবার চোখে লাগিয়ে দেখতে গেলে ছেলেটা হঠাৎ যন্ত্রটা টেনে নেয় হাত থেকে, আর দেখো না, দাও দাও।

আরও একবার দেখবার ইচ্ছেটা ফুরোয়নি নিলুর, সে একটু বিমর্ষ মুখে বলে, আর-একদিন দেখাবেন, সাধনদা? আপনাদের বাড়ি গিয়েই না হয় দেখব।

পিলু বলে, আমাদের আবার বিস্কুট দেবেন, সাধনদা?

গেট খুলে বেরিয়ে যেতে যেতে ছেলেটা একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে মুখ বাঁকিয়ে বলে, যা যা ভাগ, হ্যাংলা কোথাকার।

নিলুর মুখ সে-কথা শুনে একটু ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, চোখ ছলছল করে, দেখলি ছবি, হ্যাংলা বলল আমাদের।

ছবি এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার সেও হঠাৎ কঠিন গলায় বলে, বলবেই তো। হ্যাংলামোপনা করলি কেন? দেবেন সাধনদা— দেবেন সাধনদা! যেন ওর সঙ্গে কথা না বললে চলছিল না।

চোখদুটো ছলছল করছিল কিন্তু ছবির কথায় তা এবার জলে ভরে ওঠে নিলুর। সে একটু মাথা নিচু করে থাকে, তারপরেই কী মনে করে হঠাৎ খুশি হয়ে ওঠে বলে, চল ভাই, আমরা খেলিগে। আর কখনও যাব না ওদের বাড়ি।

হয়তো খেলত ছবি। খেলতে বসেছিলও সে কিন্তু আবার ছেলেটার

উচ্চকণ্ঠের গান কানে যেতেই উঠে পড়ে বলে, না, আর খেলব না। এখানে খেলা করা আমরা ছেড়ে দেব রে নিলু। বখাটে ছেলেটার জ্বালায় এখানে বসা যাবে না।

তবু সেই ছেলেটারই গান শোনবার জন্য ছবি বাইরের ঘরে বারে বারে এসে দাঁড়ায়। জানলার ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে চায় ছেলেটা কী করছে।

এখন ওদের সিঁড়ির ওপর বসে একটা বাঁশি বাজাচ্ছে সে। এলোমেলো সুর, ঠিক সুরটা ধরবার চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে শেষে বাঁশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কতকগুলো ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে এদিক-ওদিক ছুঁড়ে একসময় ছেলেটা কী মনে করে উঠে যায়।

এখন আর গান গাইছে না। মনটা খারাপ নাকি? বোধ হয় বাবার কাছে বকুনি খেয়েছে। বেশ হয়েছে।

ছবিরও হঠাৎ গান শিখতে ইচ্ছে করে। সুকুমারী শুনে হাসেন, ধৈর্য নেই তো কোনও কিছুতেই। মাস্টার রেখে দিচ্ছি— মন দিয়ে শিখলেই হয়।

একাগ্র হয়ে গানের সাধনাতেই লেগে যায় ছবি। ইস্কুল থেকে ফিরে সে মাস্টারেব কাছে গলা সাধে, যেদিন মাস্টার আসে না সেদিন নিজে নিজে গায়। গায় আব মাঝে মাঝে কান পেতে শোনে ছেলেটা আর উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠেছে কিনা।

বিকেলের খেলা ছবিকে ছাড়া কিছুতেই জমে না। নিলু, পিলু বিমর্ষমুখে চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ছবির সুর লেখা খাতাখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে যায়।

সাধনাটা বেশ কয়েক মাস চালিয়ে যায় ছবি। কতকগুলো গানও সে শিখে ফেলে। সুকুমারী মাঝে মাঝেই গম্ভীর হয়ে বসে তার গান শোনে, অবিনাশও শোনেন। নিলু, পিলুদেরও শোনায় ছবি। তারপরেই হঠাৎ একদিন কেমন করে যেন তার খেয়াল হয, কিচ্ছু হচ্ছে না। কিচ্ছু হচ্ছে না।

সে স্বরলিপির খাতাখানা ছিঁড়ে ফেলে। হাবমোনিয়ামটার ডালা সেই যে বন্ধ করে দেয, সুকুমারীর হাজার বলাতেও আর খোলে না, আর গান গাইতে বসে না।

মাস্টারমশাইকে চলে যেতে হল।

তা কী করব? আমার এ গান আর ভালো লাগছে না— গলা নেই, কিছু না। নিজের মনেই বিড়বিড় করে সে কাকে যেন কৈফিয়ত দেয়।

এতদিনের গান শেখার সাধনাটা তার একেবারে পণ্ডশ্রম মনে হয় যতই, ততই রাগ আব হিংসেতে তার বুকের ভেতরটা জ্বলেপুড়ে যেতে থাকে। মাস্টার না বেখে, কারুর কাছে না শিখেও ওই ছেলেটা কী কবে অমন গলা পেল? অমন করে গান গায় কেমন করে?

হিংসে হয়, রাগ হয় কিন্তু তার সঙ্গে আরও কী একটা অনুভূতি তাকে যেন ক্রমশ বদলে দিতে থাকে। নতুন আর-একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে না পারলে তার ভালো লাগে না। এতদিনকার জগৎ তার ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে আসতে থাকে, অন্য একদিকে— সে হঠাৎ বই পড়ার স্বাদ পায়।

লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে এসে, বাগানের সিঁড়িতে বসে বসে পড়ে। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

নিলুকে বলে, তুই শোন ভাই— তোরও ভালো লাগবে।

আমি যে কিছু বুঝি না?

খুব বুঝবি, শোন না আমি পড়ছি।

একটা অনুবাদ করা বিলিতি গল্পের বই এনেছে আজকে। এ-দেশের গল্প নয়, ছেলেটা আর মেয়েটা দুজনেই বিদেশি। কিন্তু হলে কী হয় একটুও অপরিচিত লাগে না।

মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে গেল ডাকাতরা, তার সঙ্গী ছেলেটা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এল কেমন করে তারই গল্প। ছবি মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে থাকে গল্পটা শেষ হয়ে গেলে। মেয়েটা যেন সে নিজে। ছেলেটাকে সে কখনও মণিদার সঙ্গে তুলনা করে, কখনও অসীমের সঙ্গে, কিন্তু সব কেমন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গিয়ে অন্য একটা চেহারা ভেসে ওঠে চোখের সামনে— রোগা, ফরসা আর লম্বা একটা ছেলে, লালচে লালচে চুল।

না, ও কক্‌খনো নয়, ও তো বখাটে ছেলে। বখাটে ছেলেরা কখনও সাহসী হয় না।

নিলুর ও গল্প ভালো লাগে না।

তখন আর-একটা বই খুলে বসতে হয় তার জন্য। পাতালপুরীর রাজকন্যার উদ্ধারের গল্প। একশো বাইশটা সাপ সেই পাতালপুরীর রাজকন্যাকে পাহারা দিচ্ছে, কে যাবে সেখানে? কার আছে এত সাহস সেই বিষ ওগরানো নিঃশ্বাসের মধ্যে থেকে তুলে আনবে পদ্মের মতো সুন্দর রাজকুমারীকে। যার চোখের জলের প্রতিটি ফোঁটা হয়ে যায় প্রতিটি সোনার পদ্ম।

নিলু নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকে যখন ছবি জোরে জোরে সে-কাহিনি পড়তে থাকে, শেষ হলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসটা ছেড়ে বলে, যাক বাবা, রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়েটা হল শেষ পর্যন্ত। তারপর খানিক সে ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবে, গম্ভীর হয়েই বলে, জানিস ছবি, গরিব হওয়া খুব পাপ। মা বলে, আমার নাকি কোনওদিন বিয়েই হবে না। কে বিয়ে দেবে? বিয়ে হয়ে তবু মেয়েরা জামা-কাপড় পায়, গয়না পায়। আমি সেসব কিছুই পাব না। আবার ওদিকে হরনাথের মেসের সুকুমার আমাকে সেদিন একটা শাড়ি কিনে দিয়েছে বলে মা কত মারল। নিজেরাও

দেবে না— কেউ দিলেও নিয়ে ফেলে দেবে। হরনাথও মাঝে মাঝে খাওয়ায়, একটা মালা দিয়েছে, পাউডার দিয়েছে। কিন্তু ও ভাই ভারি অসভ্য। বারণ করলেও শোনে না। আমাকে...।

ছবি খানিক অবাক হয়ে নিলুর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটাকে বুঝতে চেষ্টা করে। বিয়ের কথা ভাবছে নিলু! বিয়ে!

আজই প্রথম মনে হয় সে আগের চেয়ে খানিকটা বড়ো হয়েছে। মাঝখানের অনেকগুলো দিন গড়িয়ে কেমন করে কোথা দিয়ে কেটে গেছে।

আজ সে নিলুর মুখের দিকে ভালো করে তাকায়, আগের চেয়ে বড়ো আর সুন্দর হয়েছে নিলু। না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে, দিনরাত অসুস্থ বাবা আর মার বকুনি-পিটুনি খেয়েও নিলুর বড়ো হওয়া কেউ আটকাতে পারেনি। আজ আর ফ্রক নয়, ছেঁড়া একটা শাড়ি পরেছে। নিলু বড়ো হচ্ছে। সে এখন বিয়ের কথা ভাবে। আর সে বাগানের গাছতলায় রান্না-বাড়ি খেলতে চায় না, চুপিচুপি ছবির পুতুল চুরি করে কাপড়ের তলায় ঢেকে নিয়ে যায় না, ছবির পুতুলের জরি পাড় শাড়ির টুকরো কোমরে গুঁজে রাখে না। তার এখন অন্য চিন্তা। সে গল্প শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

সুকুমারের কথা আগেও দু-একবার বলেছে ছবিকে কিন্তু আজকের মতো এমন করে বলেনি।

ছবি বলে, আর যাসনে তুই ওই মেসটাতে, নিলু। কেন যাস?

না গিয়ে উপায় নেই ভাই— মেয়েমানুষের বিয়েটাই তো আসল। ও যখন আমাকে বিয়ে করবে বলেছে— দেখি..।

নিলু উঠে চলে গেলে ছবিও বই বন্ধ করে উঠে পড়ে। ধ্যাত! রূপকথার গল্পগুলো কেবল বানানো। সত্যি সত্যি যা হয় না তারই গল্প।

নিলুদের মতো মেয়েদের নিয়ে কেউ লিখতে পারে না। আর পড়ব না এসব গল্প। কেবল রাজকুমার, রাজকুমারী, রাক্ষস, পক্ষীরাজ ঘোড়া। আর কিছু নেই। কিচ্ছু নেই।



আঠারো

চোখে পড়ার মতোই।

ইস্কুলে যাবার পথে বাঁদিকে যে পাঁচিলওয়ালা বাড়িটা আছে, তাব দেওয়ালে সাদা রঙের খুব বড়ো বড়ো লেখা— কাল হরতাল।

হরতাল মানে কী? —ছবি তা জানে না।

মিনুকে আগে জিজ্ঞেস করতে হবে, মিনুও যদি না জানে তবে অসীমদাকে জিজ্ঞেস করে সে জানবে।

হরতাল! এমন অদ্ভুত কথা সে কখনও শোনেনি। আজ শেষ হলেই তো কাল? কাল হরতাল।

ইস্কুলের দেওয়ালেও ঠিক তাই লেখা— কাল হরতাল।

সারা রাস্তা বড়ো মেয়েরা কী সব বলতে বলতে এসেছে। স্কুলে ঢুকে ছবি দেখে মেয়েরা ভাগ ভাগ হয়ে জটলা পাকাচ্ছে এখানে-ওখানে। কেউ বসে আছে কাঁধে হাত রেখে দু-তিনজন একসঙ্গে ঘুরেও বেড়াচ্ছে মাঠের মধ্যে।

কী যেন একটা হবে। কী হবে?

ছবির মনে হয়, হঠাৎই মনে হয়— ওই মানে-না-বোঝা কথাটাই যেন কী এক নতুন কিছু করবে।

মিনু বলে, চল, ক্লাস টেনের শোভাদিকে জিজ্ঞেস করিগে।

শোভাদিরা মাঠের একেবারে কোণায় অনেকে দল বেঁধে বসে আছে, কী একটা কাগজ একজন পড়ছে, আর সবাই শুনছে। ওদের দেখে তাড়াতাড়ি কাগজখানা লুকিয়ে ফেলে শোভা বলে, কী রে মিনু?

হরতাল মানে কী, শোভাদি?

মানে? শোভা একটু ইতস্তত করে, অন্য মেয়েদের মুখের দিকে তাকায়,

তারপর বলে, অমলাদিকে গিয়ে বলবিনে তো? বেলাদি, ফুলুদি— কাউকে না। চিনুদি কিন্তু অমলাদির একেবারে ডানহাত, কিছু শুনলেই ওমনি টুক করে গিয়ে লাগাবে, আর সব দোষ পড়বে সুধাদির ঘাড়ে।

ছবি আরও বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, ব্যগ্র গলায় বলে, না শোভাদি, কাউকে বলব না আমরা, বলুন আপনি।

আমাদের দেশের সব স্বদেশি ছেলেদের ইংরেজরা ধরে ধরে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল জানিস তো?

মিনু মাথা নেড়ে জানায় সে জানে। ছবি ভাবে অধীরকার কথা। স্বদেশি তো অধীরকাও? তাকেও কি আন্দামানে নির্বাসন দিয়েছে?

শোভা বলে চলে, ওখানে ওদের ওপর অত্যাচার করার সুবিধা হয় কিনা। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে সে-দেশ— দেশের লোক কিছু জানতেও পারে না তো, যা ইচ্ছে তাই করা যায়।

ছবি মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করে সেই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের দেশটাকে, আরও কাছে ঘেঁষে আসে সে।

ওরা সেখানে সেই অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছে না, ওরা দেশে ফিরে আসতে চায়। আটকে রাখবে বাখুক কিন্তু দেশের লোকের চোখের সামনে রাখলেই হয়। কী করে সে-কথা শোনানো যায়? ওদের কথা তো ইংরেজ শুনবে না। অস্ত্র-শস্ত্র নেই যে লড়াই করবে? তাই ওরা উপোস করে আছে। না খেয়ে শুকিয়ে থাকবে, দেশের লোকের কাছে যতদিন না ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

কিন্তু ওরা যে মরে যাবে! ছবির চোখ ছলছল করে, না খেয়ে কি মানুষ বাঁচতে পারে? তাব তো কত সময় মনখারাপ হলে খেতে ইচ্ছে করে না কিন্তু বেশিক্ষণ আবার থাকাও যায় না। খুব খিদে পেলে খেতেই হয়। ওরা কী করবে খিদে পেলে?

শোভা বলে, মরবে। মরতে কি ওরা ভয় পায়? আব দেশের লোকই কি চুপ করে আছে নাকি? হরতাল তো সেইজন্যে। সমস্ত বাংলাদেশে কাল দেখিস স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার, অফিস-টফিস, সব বন্ধ থাকবে। কোনও কাজ হবে না। খুব জব্দ হবে ইংরেজ। শেষে বলবে, আচ্ছা মেনে নিলাম তোমাদের কথা— এনে দিচ্ছি ছেলেদের। তোদের ক্লাসে বলে দিস, কেউ যেন কাল ইস্কুলে না আসে।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়তেই শোভাদিরা বার করা কাগজগুলোকে আবার বুকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে লাইন করতে যায়। মিনুরাও যায়। শোভা পেছন থেকে ডেকে বলে, ছবি, মিনু, বলে দিস কিন্তু মেয়েদের।

ছবির বুকের ভেতরটা উত্তেজনায়, নতুন কিছু একটা হবার আগ্রহে ঢিপঢিপ করে। আজ শেষ হলেই তো কাল। কী হবে কাল? কী যেন একটা হবে।

কেবলই তার মনে হতে থাকে সারা ইস্কুলটায় একটা চাপা ফিশফিশানি যেন

ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। টিফিনের সময় রোজকার মতোই আজও মেয়েরা দল বেঁধে বেড়ায়, চিনেবাদাম খেতে খেতে গল্প করে. থেকে থেকে তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় ছবি, তারপর হতাশ হয়ে ফিরে আসে— অন্য কথা বলছে ওরা, অন্য গল্প করছে। হরতালেব কথা কেউ বলছে না।

কেবল শোভাদি তার বন্ধুদেব নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুবে বেড়িয়ে কী যেন বোঝনোর চেষ্টা করছে। তাদের কথা কেউ শুনছে— কেউ শুনছে না। কেউ একটু দাঁড়াচ্ছে— কেউ পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

ছবির ইচ্ছে করে সেও কিছু বোঝায়। কিন্তু পারে না। কথা বলতে গেলে সব কথা সে গুছিয়ে বলতে পারে না— সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু হরতাল সবাইয়ের করা উচিত। না খেয়ে বেশিদিন মানুষ বাঁচে না। ওবা যদি মরে যায়? সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ের দেশে ইংরেজ ওদের ধরে নিয়ে রেখেছে।

চোখের উপর অধীরকাব চেহারাটা ভেসে ওঠে। খাচ্ছে না। না খেয়ে খেয়ে একেবারে রোগা হয়ে গেছে কাকা। হয়তো মরে যাবে। হয়তো মরেই গেছে। তাব কান্না পায়।

কেউ শুনছে না কেন শোভাদির কথা।

শোভাদি বলেছে অমলাদি যেন না জানে। অমলাদি জানলে কী হবে? কী? হেডমিস্ট্রেসের বুঝি আর কষ্ট নেই? সব দোষ সুধাদির ঘাড়ে চাপে কেন? সুধাদির দোষ কী? দোষ তো ইংরেজের।

আজ সুধাদির ক্লাস জবা দিদিমণি নিয়েছেন। সুধাদি আজ ইস্কুলেই আসেননি।

শোভাদিকে সুধাদি খুব ভালোবাসেন— আজ এলে খুব ভালো হত। শোভাদির কথা কেউ শুনছে না কিন্তু সুধাদিব কথা শুনত। অসংখ্য টুকবো টুকরো চিন্তায় মাথা ভরে নিয়ে ছবি বাড়ি ফেরে। নিলুকে হরতালের কথা বোঝায় সে। বোঝে কি বোঝে না নিলু, কে জানে, মাথা নাড়ে, শোনে একমনে।

ছবি খুব গম্ভীর হয়ে বলে, সব যখন বন্ধ হয়ে যাবে খুব জব্দ হবে তখন ইংরেজ। তখন বলবে— আচ্ছা বাবা, খোল সব, এনে দিচ্ছি ওদের। হরতাল এমনি জিনিস।

অন্তত একটা জায়গা আছে যেখানে সেও শোভাদির মতো বোঝাতে পারে। কথাগুলো এলোমেলো হয়ে গেলেও কেউ হাসবে না— কেউ ভুল ধরিয়ে দেবে না। কেবল বড়ো বড়ো দুটো চোখ অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলোকে শুনবে— না বুঝলেও মাথা নাড়বে।

পবদিন সারা সকালটা ছবি ছটফট করে। বইগুলোকে বার করে তার পাতা খোলে বটে কিন্তু পড়তে গিয়ে একবর্ণও তার মাথায় ঢোকে না। বই রেখে বাইরের ঘরের জানালায় চোখ রেখে সে রাস্তা দেখে।

কী যেন একটা হবে। তার মনে হয় রাস্তাটাতেই সেটা প্রথম দেখা যাবে। কী যেন একটা। সে নিজেও তা ভালো করে বুঝতে পারে না। একটা চেঁচামেচি, একটা মারামারি। কী? কী?

কিচ্ছু না। ওই তো একজন লোক বেশ হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, একজন লোক চলে গেল সাইকেল চেপে। একটা খালি ঘোড়ার গাড়ি ঝরঝর করে চলে গেল— তিনজন লোক কথা বলতে বলতে চলেছে। সব রোজকার মতোই। সব তেমনি আছে।

তবু কী যেন একটা নেই। কী নেই?

গান! গান নেই— সেই ছেলেটা— সাধন যার নাম, সে আজ আর গান করছে না। তাকে দেখা পর্যন্ত যাচ্ছে না। কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সবকিছু। চিৎকার নেই, মারামারি নেই— নতুন কিছু একটা নেই। না শুনতে পেলে মনখারাপ হয়ে যাওয়া গান পর্যন্ত নেই।

পিসিমা কিন্তু বড্ড চটে যায়, মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, চেঁচিয়ে কানের মাথা খেয়ে দিল রে বাবা। ওর কি মাথার ওপর কেউ নেই?

কেই-বা আছে এক বাবা ছাড়া? ও তো ইস্কুলেও যায় না— বাড়িতে নাকি আলমারি ভরা বই আছে, তাই পড়ে। হরতালের কথা ও কেমন করে জানবে? কিন্তু গেল কোথায়?

ওর নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে ছবির কেমন কষ্ট হতে থাকে, ইচ্ছে করে ছেলেটাকে ডেকে হরতালের কথাটা জানিয়ে দেয়। কিন্তু নিজের থেকে কথা বলতে লজ্জা করে, যদি তাকেও হ্যাংলা বলে। থাক বাবা।

ভেতরে হঠাৎ সুকুমারীর উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়, সে কিরে? একটা দোকানও খোলা পেলিনে?

চাকর বিধু বলে, কী করব? বলল হরতাল, কিছু বেচবে না।

তবে যা খগেনের দোকান থেকে গোটাকয়েক ডিম আর আলু অন্তত এনে দে। মেয়েটা ইস্কুলে যাবে।

বিধু বিরক্ত গলায় বলে, সেই দোকানই কি খোলা আছে নাকি মা? আসার সময় দেখে এলুম যে পাড়ার এই টুকুন-টুকুন সব ছেলেরা মাথায় টুপি দিয়ে ভলন্টারি করছে। বলছে দোকান খুললেই খগেনের মাথা ফাটাবে।

ছবির খুব ভালো লাগে শুনে। তার ইচ্ছে করে ওমনি ভলান্টিয়ার হতে। একদিন ভালো না খেলে কী হয়। ওরা যে উপোস করে আছে।

অবিনাশও ঘরে যেতে যেতে সুকুমারীর চেঁচামেচি শুনে বলেন, যা ঘরে আছে তাই দিয়ে চালাও। হরতাল হয়েছে— বিধু তার কী করবে? ছবিদের ইস্কুলও কি আজ খোলা হবে নাকি?

আজ তো ইস্কুলে যেতে নেই। পিসিমাকে বলাই হয়নি সে-কথা। বলতে

গিয়ে হঠাৎ ছবি ফিরে আসে।

এতক্ষণ কী হবে না-হবে ভেবে রাস্তায় যে অপ্রত্যাশিত কিছু একটা দেখবার আশায় উঁকি মারছিল, এবার সত্যি সত্যি সেদিক থেকে অনেক গলার শব্দ ভেসে আসছে।

একদল ছেলে চলেছে— বড়ো ছেলেরা, ছবির বয়সি ছেলেরাও আছে। লম্বা লাইন করেছে, কয়েকজনের হাতে নিশান। সামনের একদল ছেলে গান করছে— এলোমেলো সুর, কথা বোঝা যায় না ভালো করে।

ওরা চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? ইচ্ছে করে ডেকে একবার জিজ্ঞেস করে।

হঠাৎ চোখ যায় সামনের বাড়ির দিকে— সেখানে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনের সেই যন্ত্রটা চোখে লাগিয়ে ও চলে যাওয়া দলটাকে দেখছে।

বেশ তো ছেলেটা। অতটুকু ছেলেগুলো পর্যন্ত রোদে মুখ লাল করে ঘুরছে আর ও ইয়ার্কি করে পেছনে থেকে হাসছে। ছিঃ, ওর কি লজ্জা নেই? ছেলেটার সঙ্গে একটু ঝগড়া করে আসা যেত যদি।

রাগে কটমট করে সে তাকিয়ে থাকে সেদিকে, ততক্ষণে রাস্তার দলটা এগিয়ে চলেগেছে অনেকদূর।

ওরা কেমন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, চেঁচাবে, পতাকা ওড়াবে। আর সে? ইস্কুলে পর্যন্ত যেতে বারণ। ইস্কুলে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকলে কীই বা লাভ হল। কেমন হল হরতাল— ইংরেজরা জব্দ হয়েছে কিনা কী করে সে বুঝবে? না দেখে সে থাকতে পারবে না। তাকে যেতেই হবে।

ঝি মানদা ছবিকে দেখে অবাক হয়, তুঁই যাইবা স্কুলৎ? কেউ আঁয় না— তিনগো-চারগো আঁয়ে।

কেউ আসেনি। একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে যাবে কি না? শোভাদিরা নিশ্চয় বকবে। কিন্তু প্রচণ্ড আগ্রহ আবার তাকে সামনে টানে। কেউ আসেনি। সেই না আসাটা কেমন সেটাই ছবি দেখবে।

পাঁচিলটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে ওরা— চারটে মেয়ে। ছবিকে নিয়ে পাঁচজন হয়।

প্রণতি জিজ্ঞেস করে, তুই যে বড়ো এলি ছবি? তোদের শোভাদি বকবে না?

তুই এলি কেন? ছবি পালটা প্রশ্ন করে।

আমি? না এলে বাবা মেরেই ঠান্ডা করে দিত না? বাবা যে গভর্নমেন্টের চাকরি করে। আমরা ওসব হরতাল-টরতাল মানিনে।

সুষমা বলে, ধর ইস্কুলে গিয়ে যদি দেখি কেউ আসেনি তাহলে কী হবে?

ওপাশ থেকে সবচেয়ে গম্ভীর আর শান্ত মেয়ে অঞ্জলি বলে, হি হি, বেশ হয় তাহলে। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে ইস্কুল ছুটি হয়ে যাবে।

প্রণতি বলে, তাই বুঝি? কাল অমলাদির সঙ্গে আমার বাবার দেখা হয়েছিল।

অমলাদি বলেছেন একটা মেয়েও যদি আসে তাকে নিয়েই চারটে পর্যন্ত ক্লাস করবেন।

ছবিই কেবল একটা কথাও বলে না। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনে-পেছনে, এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে যায় কিছু একটা দেখবার আশায়— কিছু একটা ঘটবার আশায়।

সে-ঘটনাটা দেখা যায় ইস্কুলের কাছাকাছি এসে।

এখানে-ওখানে ভিড় জমে আছে টুকরো টুকরো। একদল ছেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে রাস্তার ওপরেই, তাদের কয়েকজনের মাথায় সাদা টুপি। কয়েকজন ছেলে হাতজোড় করে রাস্তার ওপর বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকা একদল মেয়েকে কী বোঝাচ্ছে। আর ইস্কুলের মস্ত বড়ো হাঁ-করা কাঠের দরজাটার সামনে— ও কে? ও কী!

মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে কয়েকজন ছেলে। সামনে হতভম্বের মতো একদল মেয়ে দাঁড়িয়ে, আর কাঠের মতো শক্ত মুখ নিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন অমলাদি। পাশে মোটা লাঠি হাতে দাবোয়ান।

কাঠের মতো সেই শক্ত মুখখানা এগিয়ে এসে গম্ভীর গলায় ডাকে, এসো মেয়েরা, দাঁড়িয়ে থেকো না। স্কুলে ঢোকো।

আগের থমকে দাঁড়িয়ে পড়া মেয়েদের পেছনে পড়ে গেছে ছবিরা।

মেয়েরা ইতস্তত করছে, অমলাদি আবারও ডাকছেন, কাম অন, দাঁড়িয়ে থাকবে না।

তিনটে মেয়ে ঢুকে যাচ্ছে। কেমন করে ঢুকছে ওরা? ছেলেরা যে শুয়ে আছে। ওরা মাথা নিচু করে শুয়ে থাকা শরীরগুলো লাফিয়ে পার হচ্ছে। কিন্তু বাকি মেয়েরা তো ঢুকছে না। তারা এবার ফিরে দাঁড়িয়েছে— চলে যাচ্ছে। ওরা চলে যাচ্ছে।

এবার ছবিদের দলটাকে ডাকছেন অমলাদি।

ছেলেরা আরও সরে এসে পথটাকে আটকে দিচ্ছে।

মেয়েরা একবার অমলাদির মুখের দিকে তাকায়, যেন তাঁকেই কেবল খুশি করার জন্যে লাল লাল মুখ নিয়ে আলতোভাবে ডিঙিয়ে যায় দেহগুলো।

এবার ছবিকে যেতে হবে। একমুহূর্তের মধ্যে আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় সে, কেউ নেই— একটা মেয়েও না। নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগে আর ভয় ভয় করে ছবির।

অমলাদি ডাকছেন, কই ঢোকো— তুমিও ঢোকো।

কেমন করে ঢুকবে ওদের ডিঙিয়ে?

ছেলেদের মধ্যে একসঙ্গে তিন-চারজন চিৎকার করে ওঠে, বন্দেমাতরম্।

শোভাদি তো বলেছিল, আসিস নে ছবি। তবু কেন এল সে। সে নিজেই

জানে না কেন এসেছে।

ওদেব ডিঙিয়ে যেতে হবে। সে তা পারবে না।

হঠাৎ পেছন ফিরে ছুট লাগায় সে— ছুট! ছুট!

সারা রাস্তাটা প্রায় দৌড়ে বাড়ির কাছাকাছি এসে একবার দিনরাত গান-করা ছেলেটার দিকে তাকায়। যদি দেখা যায় অন্তত তাকেও এই মজার কথাটা বলে নেওয়া যাবে।

কিন্তু তাকে দেখা যায় না।

অসময়ে ফিরতে দেখে সুকুমাবী বলে, ইস্কুল বুঝি ছুটি হয়ে গেল, হ্যাঁ রে?

ছবি উত্তর দেয় না। কিছুই যেন বোঝে না পিসিমাটা। জানে না যে আজ হরতাল।

কেবল বিকেলে যখন ইস্কুলের পিওন একটা চিঠি দিয়ে যায় পিসেমশাইয়ের নামে তখন একটু ভয় করে। সে খামখানা উলটে-পালটে দেখে, অমলাদি নিশ্চয় তার কথা লিখেছেন। নিশ্চয় তাড়িয়ে দেবেন ইস্কুল থেকে।

রাত্রে ফিরে এসে সেই চিঠি খুলে পড়ে অবিনাশ খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে হঠাৎ ডাকেন, ছবি।

ভয় পেয়ে একটু একটু কবে ছবি কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

তুই নাকি স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছিস?

স্কুল না— দরজার কাছ থেকে।

অবিনাশ হঠাৎ হেসে ফেলেই গম্ভীর হয়ে যান। দরজার কাছ থেকে কিরে? স্কুলে ঢুকিসনি?

ঢুকব কী করে? ওরা শুয়েছিল দরজা আটকে। অমলাদি বললেন ওদেব গায়ের ওপর দিয়ে যেতে, তাই যাইনি।

তবে গেলি কেন? গেলিই যদি তো চলে আসবি কেন? জানিসনে ওটা সরকারি স্কুল— সরকার থেকে টাকা বন্ধ করে দেবে যে-কোনও গোলমাল হলে। গেলি কেন?

কেন যে গেল ছবিও তো সেটাই ভাবছে। গেলে যে হরতাল ভাঙা হয়-- ইংরেজরা জব্দ হয় না এটা সে বোঝেনি।

কে জানে ইংরেজরা জব্দ হয়েছে কিনা!

অবিনাশ বলেন, যাও পড়োগে। কাল সকালে আমার কাছ থেকে উত্তর নিয়ে স্কুলে যেও।

কী উত্তর দেবে পিসেমশাই। কে জানে কী উত্তর!

মিনুকে মারেনি কিন্তু দাদাকে মেরেছে তার মা।

অসীমদাকে? শুনে কষ্ট হয় আবার হাসিও পায় হঠাৎ। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে

যে ছেলে তাকে আবার কেউ মারে নাকি?

মারবে না কেন? সকালে ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে গেছে প্রার্থনা পর্যন্ত না করে। অনেক বেলায় ফিরে এল মাথায় একটা সাদা টুপি পরে। দাদা নাকি দোকান-ইস্কুল বন্ধ করছিল অন্য ছেলেদের সঙ্গে। টুপিটা নাকি কংগ্রেসি টুপি। মা সেই টুপি কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে দাদাকে দুটো চড় মেরে ঘরে শেকল দিয়ে রাখল। আমাকে বলল, থাক, তোমাকে আর ইস্কুলে যেতে হবে না— তুমিও আবার কি করে আসবে? তখনই মা কী একটা দরখাস্ত লিখে হাসপাতালে পাঠাল— সেটা নাকি চলে যাবার দরখাস্ত। এখানে আর থাকবে না মা। দাদাকে এবার মামাদের হাতে দিয়ে দেবে। ওখানে শাসনে থাকবে।

অসীমের জন্য ছবির এবার কষ্টে কান্না পায়। অসীমদাটা ভারী ভালো। কী যে ভালো— বলা যায় না। মামাদের হাতে দিয়ে দিলে শাসনে থাকবে? অসীম যাদের বলে পুলিশ মামা— সেই মামারা?

কিন্তু অসীমদাকে কেউ শাসন করতে পারবে না, কেউ না। পারবে না। দিয়ে দিলেই বা কী?

আজ সবাই এসেছে— সবাই। শোভাদি তাকে দেখে হাসছে দূর থেকে। কেন? কে জানে?

সবাই এসেছে কিন্তু একজন আসেনি— ক্লাসে ঢুকে সেটা টের পাওয়া যায়। সুধাদি। আজও আসেনি সুধাদি।

শোভাদি তো সুধাদির বাড়ির পাশে থাকে। কেন আসছে না সে-কথা শোভাদি হয়তো জানে।

টিফিনের সময় ছবি জানতে চাইলে শোভা তার হাত ধরে একপাশে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বলে, কাউকে বলিসনে ছবি— সুধাদিকে অ্যারেস্ট করেছে। অমলাদি জানতে পারলেই চাকরি খেয়ে দেবে।

অ্যারেস্ট? কথাটার মানে ছবির জানা আছে। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় ভাবনায়। অ্যারেস্ট করেছে। অধীরকার মতো? যদি আর না ছাড়ে— কোনওদিন না ছাড়ে? এ-কথা বলা যাবে না। অমলাদি যেন না জানতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য। কেমন করে যেন অমলাদি জেনেছে। কদিন পরে টিফিনে মিনু শুকনো মুখে ছুটতে ছুটতে আসে, সুধাদি চলে যাচ্ছে রে ছবি।

চলে যাচ্ছে? সুধাদি কি একদিনও এসেছে যে চলে যাবে?

এসেছে। থানা থেকে ছাড়া পেয়ে সুধাদি এসে তার বরখাস্তের চিঠি পেয়েছে।

সেই চিঠি হাতে করে সুধাদি দাঁড়িয়ে আছে দপ্তরির ঘরের পেছনে বাদাম গাছটার তলায়। শোভাদি আর আরও কয়েকজন মেয়ে ঘিরে আছে— কাঁদছে দু-একজন। তাদের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ছবিরও একসময় কান্না পায়।

শোভাদি বলছে, আমরা সবাই মিলে অমলাদির কাছে গেলে কিছু হবে না দিদি? মেয়েদের সবাইকে বুঝিয়ে নিয়ে যাব।

সুধাদি শুনে করুণভাবে একটু হাসে, না রে, তাতে কি কোনও ফল হয়? উলটে তোরাও শাস্তি পাবি। আমি তো পার্মানেন্ট হইনি— ইচ্ছে করলেই ছাড়িয়ে দিতে তো পারেই। টিচাররা পর্যন্ত চাকরির ভয়ে একটা কথা বলছে না।

করবার কিছু নেই। তার মানে সুধাদি চলে যাচ্ছে— যাবেই।

চলে গেল। একটা ইস্কুলের দিদিমণি, এতদিন পড়িয়েছে ছবিদের, এতদিন কাজ করেছে— আজ চলে গেল একটা বাইরের লোকের মতো। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের হাত থেকে একটু হেসে, একটু চোখ মুছে চলে গেল সুধাদি বড়ো কাঠের দরজাটার হাঁ-করা খোলা মুখ দিয়ে।

শোভাদির চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, জানিসনে তো সুধাদিরা কী গরিব। তিন-চারটে ছোটো ছোটো ভাই-বোন। বাবা তো বুড়ো মানুষ, তার ওপর মাথার গোলমাল হয়ে গেছে কিছুদিন থেকে। বড়ো ভাই আন্দামানে। ওই একা সুধাদি সংসার চালাত। এখন কী হবে ওদের— কে জানে।

কী হবে কেউ জানে না।

ছবি এই প্রথম সুকুমারীর সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলে। সুধাদির ঘটনাটা বলে জিজ্ঞেস করে, কী হবে পিসিমা ওদের এখন?

এমন প্রশ্ন ছবি কোনওদিন করে না, উত্তর একটা দিতেই হবে। খানিক ভাববার চেষ্টা করে গম্ভীর হয়ে সুকুমারী বলে, সব কপাল। কপাল। কপালে আছে কষ্ট— তার করবে কী?

কপাল না। ছবি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, অমলাদি তো ইচ্ছে করে ছাড়িয়ে দিয়েছে। সুধাদির তো কোনও দোষ নেই— পুলিশের তো দোষ। নিলুরা এত গরিব— তাও বল কপাল। সুধাদিকে ছাড়িয়ে দিল— তাও বলবে কপাল। তুমি কিছু জানো না পিসিমা।

থতমত খেয়ে সুকুমারী বলে, তবে কী? তুই বল না।

ছবি খুব ভেবে উত্তর দেবার চেষ্টা করে। শেষে হতাশ হয়ে বলে, আমি তো বুঝতে পারিনে। কিন্তু তুমি কেন বলতে পারবে না? তুমি?

সুকুমারী বলে, আমি কি লেখাপড়া জানি? মুখ্‌খু মানুষ— আমি অত কথা কোথা থেকে জানব?

তবে কে বলতে পারে? হয়তো মা পারত।

মা? অনেকদিনের বিস্মৃত নামটা জেগে উঠেছে। সুকুমারী দেখে— ছবির সারা মুখটা লাল, একটা গোপন কথা মনে পড়ে যাওয়ার মতো মুখ হয়ে উঠেছে তার, সেটাকে সে ঢাকতে চায়।

এখন আর কথা বলবে না ছবি— কথা জমবে না। এখন সে চুপ করে বসে

থাকবে নিস্তব্ধ হয়ে, আর নয়তো কোনও কোণায় গিয়ে মার চিঠিগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে পড়বে। কেউ দেখে ফেললে ভারী লজ্জা পায়। সে-লজ্জা সুকুমারী ওকে দেয় না।

তারপর কদিন থেকে সমানে সুকুমারীর পেছন পেছন ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়ে— কী একটা বক্তব্য আছে তার, কিন্তু সুকুমারী বুঝতে পারছে না। অবশেষে অবিনাশ বুঝেছেন।

ছবি সুধাদিকে তার মাস্টার রাখতে চায়। সুধাদির কাছে ছাড়া সে আর কারুর কাছে পড়বে না। পড়বেই না তবে।

অবিনাশ বলেন, রাখুক, আমার তো আর চাকরি যাবার ভয় নেই।

ছবি মিনুকে সে-কথা জানালে মিনু বলে, আমারও ইচ্ছে করে ভাই কিন্তু আমাদের তো মাস্টারের কাছে পড়বার মতো পয়সা নেই। আর স্বদেশি করা মেয়েদের মা তো দু-চক্ষে দেখতে পারে না।

ছবি বলে, তুই আমাদের বাড়ি আসবি। আমরা একসঙ্গে পড়ব।

আমি? আমরা— জোর করে ভুলে থাকা, মনে না করতে চাওয়া কথাটাই বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে, আমরা যে চলে যাচ্ছি ভাই। আর তো একমাস. . . — দুজনেই জানে সে-কথা কিন্তু উচ্চারণ করেনি। এখন সে-কথা মনে পড়ে দুজনেই ঠোঁট কাঁপে, চোখ ছলছল করে, কথা এগোয় না।

হঠাৎ ছবি কেঁপে ওঠে, মিনুর গলাটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে, মিনু তোরা যাস নে। সত্যি যাবি ভাই? সত্যি?

মিনুরও চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে, মুছে ফেলে সে এক অদ্ভুত কথা বলে, তোরা যে হিন্দু, নইলে আমার দাদার সঙ্গে তোর বেশ বিয়ে হত, আমরা একসঙ্গে থাকতাম, নারে?

দাদা মানে অসীমদা। নিলুর মুখে সেদিন বিয়ের কথাটা শুনে যেমন অবাক আর আশ্চর্য লেগেছে আজ আর তেমন লাগে না। আজ ছবি মাথা নেড়ে কী বলতে গিয়েও আবার চুপ করে যায়। লজ্জা করে তার, খুশির লজ্জা। অসীমদা খুব ভালো— ছবির খুব ভালো লাগে। বিয়ে হলে ভালো হত। ওরা যেন না যায়— ভগবান, ওরা যেন না যায়।

কিন্তু চলে গেল মিনুরা।

ছবি খুব কেঁদেছে সুধাদির সঙ্গে স্টেশনে গিয়ে। অসীম কেঁদেছে, মিনু কেঁদেছে, আর আশ্চর্য মিনুর মাও কেঁদেছেন। প্রথমে খানিক অবাক হয়ে থেকে শেষে ছবিকে দু-হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছেন হঠাৎ।

কাঁদতে কাঁদতে সুধাদিকে বলেছেন, কী জানি! যে ভয়ে এখান থেকে সরিয়ে

নিচ্ছি ছেলেকে সেটা হয়তো সব জায়গাতেই. . .। শুধু শুধু ছেলেমেয়েগুলোকে কাঁদালাম।

তিনজনে মিলে খুব কেঁদেছে আর চোখের জলে ঝাপসা মুখ নিয়ে যতক্ষণ পেরেছে মিনু আর অসীমের হাত আঁকড়ে ধরে থেকেছে ছবি— তারপর কখন একসময় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়ি চলে গেছে স্টেশন ছেড়ে। সুধাদি তার হাত ধরে বুঝিয়ে, ভুলিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এনেছে, নইলে সে কতক্ষণ কাঁদত কে জানে।

মিনুর জন্য তার কান্না পায় ঠিকই, কিন্তু অসীমদার জন্য একটা উদ্বেগ তার মনটাকে ছেয়ে রেখেছে। মামাদের শাসনে থাকতে হবে অসীমদাকে— পুলিশ মামা। কে জানে সেখানে থেকে থেকে হয়তো সে ওইরকমই হয়ে যাবে। মস্ত বড়ো চাকরি করবে, সব ভুলে যাবে পুরোনো কথা— ছবিকেও। কোনওদিন দেখা হলেও হয়তো চিনতে পারবে না। মনে করিয়ে দেবার জন্য তখন কেবল অসীমদাকে একটা কথা বলবে ছবি, চালাও শটাশট— টেগ্‌রার মতো। আর ওর দেওয়া বইটা যত্ন করে রেখে দেবে সে— হারাবে না কিছুতেই। মিনু বলেছিল, হিন্দু হলে অসীমদার সঙ্গে বিয়ে হতে পারত। বেশ হত তাহলে। হিন্দু না হলে হয় না? কেন? সে-কথা সুধাদি নিশ্চয় জানে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে।

সারা রাস্তা নিস্তব্ধ হয়ে একটা কথা ভাবতে ভাবতে এসেছে ছবি, যাদেরই ভালোবাসা যায় তারাই কেন চলে যায়? পরিবানুকে ভালো লেগেছিল— সে কোথায় চলে গেল। চলে গেল সরমা পিসি— অসীমদা আর মিনুও থাকল না। চলে যাওয়ার কষ্টটা বড়ো বিচ্ছিরি— এত কান্না পায়, বুকের মধ্যে কেমন করে, অথচ কাউকে বোঝানো যায় না। সুধাদিকেও না।

সুধাদি দেখতে কালো, রোগা আর লম্বা। এলোমেলো চুলগুলো মুখের চারপাশে উড়ে বেড়ায়, সেগুলোকে সরিয়ে দিতে দিতে হাসে— কথা বলতে বলতে হাসে— সবসময় হসে। সুধাদিকেও তো ভালোবাসে ছবি— আর কেমন করে মনে হয় সুধাদিও চলে যাবে একদিন।

কখন অন্যমনস্ক হয়ে শক্ত করে সে সুধার হাত চেপে ধরেছে।

সুধা বলে, কী ছবি? খুব মন-কেমন করছে বন্ধুদের জন্যে?

সে-কথা স্বীকার করতে গিয়ে আবার গাল বেয়ে জল গড়ায়, ভাঙা গলায় ছবি বলে, সবাই কেবল চলে যায়। আপনিও যাবেন ওদের মতো?

তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে সুধা হাসে, না রে পাগলি মেয়ে। আমি যাব না।



উনিশ

কথা রেখেছিল সুধাদি। দুটো বছর ধরে সুধাদি তার নিত্যসঙ্গী ছিল— তার হাত ধরে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অস্ফুট শৈশবকে সুধাদি কৈশোরের পথে এগিয়ে দিয়েছিল— হয়তো আরও দিত। কিন্তু কী যে হল।

একেবারে অবাক হয়ে, একেবারে বিহ্বল হয়ে ছবি একদিন আবিষ্কার করল সে বড়ো হয়েছে। বেশ বড়ো হয়ে গেছে!

সে তাকাল নিলুর দিকে— নিলু তার দিকে। আরও সুন্দর হয়েছে নিলু। না খেতে পাওয়া— শুকিয়ে যাওয়া হাতে-পায়েও যেন নতুন করে কিসের রং লেগেছে।

ছবি তার হাত-পা নেড়েচেড়ে দেখে। মাঝে মাঝে অকারণেই সারা শরীর দেখতে পাওয়া আয়নাব সমানে গিয়ে দাঁড়ায়, স্নান করতে করতে হঠাৎ চুপ করে থাকে।

আর! আর! বাগানের কামিনী গাছটার তলায় বসে খেলা তাদের আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে কবে নিজেরাই তারা জানে না। আজকাল সিঁড়ির ওপর বসে থাকে বই নিয়ে, নয়তো কোনও সেলাই নিয়ে, নয়তো খালি হাতে। শুধু শুধু।

ও-বাড়ির উঠোনে ছেলেটা ঘুরে বেড়ায়, গান গায় কিন্তু গুলতি আর ছোঁড়ে না। ঘুরে বেড়ায় নয়তো বসে থাকে— শুধু শুধু। মাঝে মাঝে সাইকেল করে কোথা থেকে যেন ফেরে, গেটটার কাছ দিয়ে যাবার সময় হাসে একটু, কথা না বলে। কখনও কথা বলে একটা-দুটো— বেশি না।

মাঝে মাঝে পিলুকে দিয়ে গানের খাতায় গান লিখিয়ে আনে ছবি। সুধাদি তা দেখে, দেখে হাসে। সুধাদিও বুঝেছে ছবি বড়ো হয়েছে। সুধাদি তাকে দেশ-বিদেশের গল্প শোনায়— কবিতা শোনায়—

অন্ধ তব মোহবন্ধ দাও মুক্ত করি,
রেখো না বসায়ে দ্বারে জাগ্রত প্রহরী।

সে আর পিলু একসঙ্গে আবৃত্তি করে, 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির... ।' নয়তো মুখস্থ করে,

ক্ষীণপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার,
এই চিরপেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু—।

সুধাদি আরও কী যেন বোঝাতে চায়, সব মানুষ সমান হবে। এ দেশ স্বাধীন হলে কেমন লাগবে দেখতে। ছবি তা বুঝতে চেষ্টা করে, কখনও পারে— কখনও পারে না।

আর ছেলেটা রোজ দাঁড়িয়ে থাকে— সে ইস্কুল গেলে তাকিয়ে থাকে। ফেরবার সময়ও। লজ্জা করে কিন্তু ভালোও লাগে, মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে সে চলে যায়।

এমনি করেই দিনগুলো হয়তো কাটত— কাটছিলও।

কোথায় বুঝি যুদ্ধ বেধেছে। ম্যাপ দেখিয়ে সুধাদি তাকে বোঝায়। কোথায় কোথায় বোমা ফেলেছে হিটলার। কোথায়? সে অনেকদূর। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়। তা দিয়ে ছবি কী করবে?

তার নতুন পাওয়া কৈশোর তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আচ্ছন্ন করে রেখেছে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।

ওই ছেলেটা পিলুর হাত দিয়ে মাঝে মাঝে বই পাঠিয়ে দেয়। সুধাদিও মাঝে মাঝে এনে দেয়— কিন্তু আর-এক হাতে থাকে আর-একখানা বই, বলে, গল্প পড়ার অনেক সময় পাবি ছবি, এটা পড়। বুঝতে শেখ।

অনেক বড়ো বড়ো কথা লেখা থাকে তাতে, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সাম্যবাদ। সুধাদিকে খুশি করার জন্য ছবি তা পড়ে কিন্তু কতটুকু সময়ই-বা থাকে সুধাদি! বাকি সময়টুকু তার একার। তখন কপালকুণ্ডলা হয়ে বনে বনে পথ হারিয়ে বেড়ায়, আয়েষা হয়ে যায় স্বপ্নে, মৃণালিনী হয়ে যায় মনে মনে।

বাগানে গিয়ে নিজের হাতে ফুলগাছ লাগায়। ভালো লাগে তার সবকিছুকে— সবকিছু। গলার স্বর বদলে যায়, চোখের দৃষ্টি নম্র হয়ে আসে, সবসময় বিরক্ত হয়ে থাকা ভাবটা কেটে যায়। কথায় কথায় সে হাসে— উচ্ছল হয়ে ওঠে।

সেই উচ্ছলতাকে বাধা দিয়ে সুধাদি তাকে অন্য কথা বোঝায়, এই একটা সময় যাচ্ছে, ছবি জানিস। ইংরেজের এমন একটা দুর্বল সময় আর হবে না। কিন্তু কংগ্রেস হাইকম্যান্ড... ইস্!

বলে, কলকাতার মিটিং-এ সুভাষ বোস বলেছেন জানিস, সময় এসে গেছে— এখন যদি ঘা দেওয়া যায় ভেতর থেকে... ইস্— ইস্।

সুধাদির আজকাল কেবল ওইসব কথা। আজকাল ঠিকমতো পড়াতেও আসে না, কী করে বেড়ায় কে জানে। সুধাদির কথা মনে হলেই তার অধীরকার কথা মনে পড়ে— কোথায় যেন মিল আছে দুজনের। কোথায়? তা ঠিক বোঝা যায় না।

সুধাদির মুখে শুনে ভালো লেগেছে ওদের নেতার কথা, **Give me Blood, and I will give you Freedom!** স্বাধীনতা পেতে হলে রক্ত দিতে হবে। অধীরকাও বলত ওমনি কী একটা কথা— কিন্তু সে খুব ছোটোবেলায়, এখন আর তা ভালো করে মনে করা যায় না। সে ভাবতেও চায় না। কিন্তু সুধাদি তাকে ভুলতে দিতে চায় না, বলে, ছবি, এ যুদ্ধ আমাদের নয়। মরুক ইংরেজ। একদিকে হিটলার— একদিকে জাপান। ইংরেজের এখন কেমন অবস্থা দেখেছিস? সুধাদির চোখদুটো যেন জ্বলজ্বল করে, এ যুদ্ধে আমাদের নীতি কী জানিস? না এক পাই— না এক ভাই। কেউ যাবে না ওদের সাহায্য করতে।

কিন্তু তবু সবাই যায়। বক্সীদের বড়োছেলে নাকি যুদ্ধে চলে গেছে। পাড়ার বেকার ছেলেদের নাকি আর চাকরির ভাবনা নেই। সুধাদির মতো তো কই ওরা ঘৃণা করছে না ইংরেজদের? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বড়ো বড়ো লোকের বাড়িতে গিয়ে হাত পেতে যুদ্ধের জন্য ভিক্ষে নিয়েছেন টাকা— দিচ্ছে কেন তবে লোকে? যাচ্ছে কেন? তবে সুধাদিরা ওসব কথা বলে কেন? কী ভীষণ করে ভাবতে পারে ওরা— আজকাল প্রায়ই নাকি মিটিং-এ বক্তৃতা দেয়।

ছবি অত ভাবতে পারে না— দরকারও নেই। কিন্তু ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন উড়ে যেতে দেখে, দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের মতো লাল রঙে লেখা পোস্টার দেখে তার আতঙ্ক হয়।

আর আতঙ্ক হয কাল আসব বলে চলে গিয়ে সুধাদি যখন আর আসে না। একদিন— দুদিন— তিনদিন। শেষে ওই সাধনই খবরটা দিয়ে যায় তাকে— সুধাদিকে ধরে নিয়ে গেছে মিটিং থেকে।

কেমন করে ও জেনেছে কে জানে?

কেউ ওর কাছে জানতেও চায়নি তবু সেধে সেধে বলে যায়।

মাঝে মাঝে হঠাৎ কোথা থেকে বিকট সুরে সাইরেন বেজে ওঠে, মাঝে মাঝে কোনও প্লেন ঝাঁকে ঝাঁকে কাগজ ছড়িয়ে দ্রুত পালায়, সন্ন্যাসী পাহাড়ের মাথা থেকে দুজন কোন দেশের গুপ্তচর যেন ধরা পড়ে।

আর আসে মানুষ। বার্মা দেশ থেকে দলে দলে লোক এসে ভরিয়ে ফেলেছে শহরটা— আবার এখান থেকেও চলে যাচ্ছে। এ শহরটা নাকি বিপজ্জনক। লোক আসছে— যাচ্ছে।

কিন্তু সুধাদি আর আসবে না। সেও নাকি এই শহরটার মতোই বিপজ্জনক। সে, না এক পাই, না এক ভাই বলে জেলে চলে গেছে। সঙ্গে গেছে আরও অনেক ছেলেমেয়ে।

কেমন ত্রস্ত-ব্যস্ত ভাব সারা শহরে। গুজব-গল্প, ভয়-ভাবনা ছড়িয়ে আছে রাস্তায়-ঘাটে, ঘরে-বাইরে। ইস্কুলেও।

রাস্তার আলোগুলো ভুতুড়ে হয়ে গেছে। বাড়ির আলোগুলোতেও কালো কালো ঢাকনা পরিয়ে দিতে হয়েছে। আলো জ্বাললে তাদেরও ছায়া পড়ে কালো হয়। আর চমকে চমকে উঠতে হয়।

আজকাল সাধন আর চেঁচিয়ে গান গায় না— গম্ভীর হয়ে গেছে। ইস্কুলে যাবার সময় দাঁড়িয়ে থাকে না। আজকাল বরং ছবিকে দেখলে মাথা নিচু করে। ওর আবার কী হল?

কান্না পায় নিলুদের অবস্থা দেখে। ছেঁড়া তালি-মারা ধুতি পরা, ছেঁড়া বিবর্ণ ছাতা হাতে করে রোজ দশটায় কোর্টে চাকরি করতে যাওয়া লোকটা তবু চালিয়ে চাচ্ছিল সংসার। কিন্তু কবে বুঝি একদিন সে-চাকরিও চলে গেলে নিঃশব্দে রোজকার মতোই নিলুর বাবা ফিরে এসেছিল। নিলু বলেছিল, তার বাবার হাঁপানির অসুখ বেড়েছে— বুড়ো হয়ে গেছে তাই চাকরি নেই। পিসিমা বলেছিল, হাঁপানি নয়, বোধ হয় যক্ষ্মা।

কে জানে কী! কেউ জানবার আগে, কেউ শোনবার আগে হঠাৎ একদিন নিলুর মায়ের আর্তনাদ শোনা গেল, নিলু-পিলুদের সমস্বর ভয়-পাওয়া কান্না শোনা গেল আর সেইদিনই প্রথম সবাই জানতে পারল নিঃশব্দ, জীর্ণ-শীর্ণ-বিবর্ণ লোকটা আজ মারা গেছে। নিলু-পিলুর সঙ্গে ছবিও সেদিন খুব কেঁদেছিল— ওদের কাঁদতে দেখে। সারাদিন সেদিন নিলুব মা কেঁদেছিল ঘরের কোণে কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে থেকে। সেদিন পাড়ার দু-একজন বউও কাছে বসেছিল, উঠে বসবার জন্য সাধাসাধি করেছিল, কে যেন একটু শরবতও করে এনেছিল।

পরদিন থেকে নিলুর মা কিন্তু আর কাঁদেনি। আগেকার মতোই হয় বসে থেকেছে নয়তো ঘরের এটা-সেটা কাজ করেছে। আগেকার সেই বিবর্ণ পাড়ওয়ালা ছেঁড়া ছেঁড়া শাড়ি পরনে, কেবল হাতের লাল রবারের চুড়ি দুটো ছিল না আর সিঁথিটা সাদা। অন্যদিনের চেয়ে বেশি সাদা!

পরদিন থেকে পাড়ার লোকেরাও আর কেউ খোঁজ নেয়নি। কেবল পিসিমা বিধুকে দিয়ে বাজার করে চাল পাঠিয়ে দিত। চাল পাঠিয়ে দিয়েছিল কয়েকদিন কিন্তু রোজ তো আর পিসিমা দেবে না। ছবি সেই পথটা শিখেছে— সে চাল চুরি করে বাগানে রেখে দেয়— পিলু সন্ধের সময় নিয়ে যায়। তাও কি রোজ দেওয়া যায়— মাঝে মাঝে। ছবি আর কত দিতে পারে— তাও শুধু চাল! ওদের কী

হবে? কে দেখবে নিলুদের? ওদের যে কেউ নেই।

অসহায় হয়ে ঘুরে বেড়ায় ছবি— কী করবে সে ভেবে পায় না।

মা একটার পর একটা চিঠি লিখছে পিসিমাকে তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য। তাতে কি সে খুশি হবে? কিছুতেই সে-কথা সে ভালো করে ভেবে দেখতে চায় না— জোর করে ভাবনাটাকে সরিয়ে দেয়। কাকে সে বলবে? যাবার নাম হলেই পিসিমা ছলছলে চোখে সরে যায়— হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে আসে। পিসেমশাই গম্ভীর হয়ে থাকেন। সুধাদি নেই। ছিল এক নিলু। সেও আজকাল বেশি আসত না— এলে গম্ভীর হয়ে থাকত, কী যেন ভাবত অন্যমনস্ক হয়ে। কয়েকদিন বলেছে, আমি চলে যাব ছবি— এখানে থাকব না।

ছবি সে-কথায় কান দেয়নি ভালো করে।

নিলু তবু বলেছে নিজের মনেই, কেন থাকব এখানে? পেটভরে ভাত খেতে পাইনে আমরা। আমার একটা আস্ত কাপড় নেই, একটু সাবান মাখতে পাইনে, পাউডার নেই। আমাকে সব দেবে বলেছে...। বলতে বলতে কথা শেষ না করেই দ্রুতপায়ে আবার চলে গেছে মেয়েটা। ছবি কখনও অবাক হয়েছে, কখনও অভিমান করে চুপ করে থেকেছে কথা না বলে। নিলু এসেছে জ্বালাভরা চোখ নিয়ে, নিজের মনে বকবক করে আবার চলে গেছে।

ছবি নিজের ভাবনায় এত ডুবে ছিল যে আর একটা বড় হওয়া ক্ষিদে আর কান্না-মেশানো মুখের দিকে সে তাকায়নি। তাকালেও তার মনের অস্থিরতাকে সে ধরতে পারেনি। সুধাদি থাকলে পারত— আর বলত এসব যুদ্ধের পাপ, রাজায় রাজায় যুদ্ধ— ইংরেজ এবাব মরবে।

সব খারাপ। সব খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন-কে-দিন। এখন আকাশেই কেবল এরোপ্লেন ওড়ে না, রাস্তায় মিলিটারি ট্রাকগুলো সাবা বাড়িটা কাঁপিয়ে চলে যায়।

ভয়-ভাবনা-দুশ্চিন্তায় পিসেমশাই যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন— হয়ে যাচ্ছে সারা শহরের লোক।

আর সবচেয়ে বেশি কান্না পায় সেই কথাটা মনে করলে— ইস্কুলটাই উঠে যাবে। সব মেয়েরা চলে যাচ্ছে এখান থেকে। মেয়েরা চলে গেলে কাকে নিয়ে চলবে ইস্কুল? ইস্কুলটা উঠে গেলে ছবিই বা কেন থাকবে?

তা ছাড়া কত কিছু নাকি হতে পারে? বোমা পড়তে পারে, শহরটা ধ্বংস হয়ে যেতে পাবে। সবকিছুই হতে পারে। হতে পারে না কেবল তার পডাটা। আর দুটো বছর পরেই সে ম্যাট্রিকটা পাস করতে পারত— কলেজে পড়তে পারত। এতদিনে পিসিমার আবার মনে পড়েছে ছবি পরের মেয়ে— এতদিনে আবার অধিকার তার হাত বাড়িয়েছে। তারও মনে হচ্ছে, সে নিজের ইচ্ছেয় কিছু করতে পারে না। আসেনি— এখন থাকতেও পারে না।

পিলু পেছন থেকে বলে, দিদি এসেছে, ছবিদি?

নিলু? কই না তো। নিলু আজকাল আসে না কেন রে পিলু? বলিস, ছবিদি খুব রাগ করেছে।

আসেনি শুনে পিলুর মুখ শুকিয়ে যায়। দিদি তাহলে বোধ হয় সত্যিই চলে গেছে ছবিদি। কাল রাত্তিরে কোথা থেকে যেন বাড়ি এল। মা জিজ্ঞেস করলেও বলল না। মা তখন চুলের মুঠি ধরে খুব মারল। দিদি আমাকে বলেছে মেসের অমরদা দিদিকে নাকি একটা চাকরি করে দেবে। সেখানে কোনও কাজ করতে হবে না, কিন্তু অনেক টাকা পাওয়া যাবে। অমরদা তো আর সুকুমারের মতো পাজি, মিথ্যেবাদী না। মিথ্যে কথা বলে পালিয়ে যায় না। দিদি বলেছিল, অমরদার সঙ্গে কলকাতায় চলে যাবে।

কথা শেষ করে তার বড়ো বড়ো ভাসা ভাসা চোখ ছবিব মুখের ওপর মেলে দিয়ে কাঁদতে থাকে পিলু, কী হবে ছবিদি? দিদি নিশ্চয়ই চলে গেছে।

ছবি বলে, চল তো দেখিগে।

সত্যিই নিলু নেই। বাড়ির আশেপাশে খুঁজে, এ-বাড়ি ও-বাড়ি দেখেও পাওয়া গেল না। তার জমানো জিনিসগুলো খুঁজতে খুঁজতে বেরুল কটা ভাঙাচোরা কাগজের বাক্স, দু-টুকরো সাবান, আধশিশি গন্ধতেল, একটা কম দামি পাউডারের কৌটো।

সবকিছুই ফেলে গেছে সে— লুকিয়ে লুকিয়ে রাখত। পিলুও দেখেনি কোনওদিন।

নিলুর জিনিসগুলো দেখতে দেখতে ছবি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা তুলে দেখে অসহায়, যন্ত্রণামাখা দুই চোখ মেলে দিয়ে সামনে বসে আছে নিলুর মা। সেই দু-চোখের দিকে তাকিয়ে তাব বুকের ভেতরটায হঠাৎ ধড়ফড় কবে ওঠে, নিলু তো চলে গেছে কিন্তু এখন তার ছোটো দুটো ভাইবোন নিয়ে কী কববে তার মা? কী করবে?

কী করে খবর পেয়ে সুকুমারীও চলে এসেছে পিলুদের বাড়ি। উঠোন পেরিয়ে বারান্দায় উঠে, হতদরিদ্র ঘরখানার যেখানে ছবি মাটিতে লেপ্টে বসে নিলুর জিনিস একটা একটা করে সযত্নে তুলে রাখছে তার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। পা বাড়াতে পারছে না— কে যেন প্রাণপণে চেপে ধরেছে তার পা দুখানা। পাগলের মতো পায়ের কাছে মাথা কুটছে নিলুর মা— বোকা-হাবা চেহারার একটা বিধবা বউ। ও দিদি, নিলু নেই। খেতে দিতে পারতাম না, ধরে ধরে মারতাম গায়ের জ্বালায়। ও দিদি।

সুকুমারীর চোখ ছাপিয়ে জল আসছে, জল আসছে ছবির চোখে, পিলুর চোখে— এতক্ষণের রুদ্ধশ্বাস ভয়টা একজনের মাথাকোটার শব্দে জল হয়ে

বেরিয়ে আসছে। কপালটা ফুলে নীল হয়ে উঠেছে নিলুব মায়ের। মার কান্না দেখে নিলুর দু-বছরের ছোটো ভাইটাও তারস্বরে কান্না জুড়েছে।

সুকুমারী হাত ধরে তুলে বসিয়ে দিয়ে নিলুর মায়ের মাথা কোটা বন্ধ করে বলে, উনি বাড়ি আসুন। আমি যেমন করে পারি খুঁজে আনব। কেঁদো না তুমি।

সে-কথা শুনে পিলু দু-হাতে ছবিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। অজস্র ধারায় ছবির চোখের জল তার মাথার চুলে ঝরে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে ফিশফিশ করে সে উচ্চারণ করে, নিলু! নিলু!

চলে গিয়ে পিসিমার হৃদয় জয় করে গেছে নিলু।

পুলিশে খবর দেবাব আগে একবার ভালো করে হোটেলটায় খোঁজ করতে যেতে হয় অবিনাশকে। ছবি পিসেমশাইয়ের ফিবে আসার অপেক্ষায় থাকে, কিন্তু সামনে যায় না, আড়ালে আড়ালে থাকে। তার কেমন করে যেন মনে হয়— সব কথা পিসেমশাই তাকে বলবেন না। সব কথা তার শুনতে নেই, শুনতে গেলে তাকে মিষ্টি করে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেবে ওরা। তাই চিন্তিত মুখে ফিরে আসা পিসেমশাইয়ের কথা শোনবার জন্য দরজার আড়ালে লুকোতে হয়— নিলুব কথা যে। কোথায় গেল নিলু? কী খবর এনেছেন পিসেমশাই?

ওরা ঠিক করে কিছু বলতে পারল না। বলছে তো, লোকটা নাকি মিলিটারির কন্ট্রাক্টার। কলকাতা থেকে এসেছিল— কাল হোটেল ছেড়ে গেছে।

তবে? তবে কী হবে? ওই কি নিয়ে গেছে?

মিলিটারি কন্ট্রাক্টার তো, কীসেব ব্যাবসা তাই বা কে জানে? ভুলিয়ে-ভালিয়ে মেয়ে নিয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। আমি পুলিশে খবর দিয়েছি।

মিলিটারি কন্ট্রাক্টার! মেয়ে খুঁজতে এসেছিল। তাই নিলুকে নিয়ে গেল! নিয়ে কী কববে? ব্যাবসা তো লোকে জিনিস দিয়ে করে— মেয়ে দিয়ে কী ব্যাবসা! কী করবে নিলুকে দিয়ে। কী করবে?

হঠাৎ অল্পদিন আগে বড়ো হওয়া ছবির সারা শরীর কাঁপিয়ে একটা অজানা আতঙ্ক ভর করে। তার ঠোঁট শুকিয়ে যায়, হাত-পা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়, দেওয়ালে মাথা বেখে সে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। একটা বোবা কান্নায় তার গলা বুজে বুজে আসে কিন্তু কাঁদতে পারে না। তার কেবলই মনে হতে থাকে পিসেমশাই জানে না। কেউ জানে না। নিলুকে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে যায়নি— কারুর সঙ্গে যায়নি সে। একা গেছে। একেবারে একা! যেমন চঞ্চল হয়ে সে কাছে এসে বসত, যেমন চঞ্চল হয়ে সে উঠে যেত হঠাৎ, ঠিক তেমনি করেই সে বেড়াচ্ছে। কোথায়? কোথায়? আর ফিরবে না নিলু! আর ফিরবে না?



ভাঙা ভাঙা ঘুমেব আচ্ছন্নতার মধ্যেও কেমন করে যেন টের পাওয়া যায় একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। শাড়ির আঁচল গুটিয়ে ছবি উঠে বসে শোনে কে যেন করুণ গলায় ডাকছে তার নাম ধরে।

কে?

পিসিমা দাঁড়িয়ে আছে খাটের কাছে, ডাকছে, ছবি! কী যেন বলতে চায় পিসিমা।

ঠোঁট শক্ত করে থেকেও কথাটা কেমন করে যেন বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে তার। জানি।

কী জানে? কে এসেছে সে জানে। পিসিমা কী বলবে তাও সে জানে। অনেক কিছু জেনেছে সে— অনেক অজানা জিনিস।

সুকুমারী বলে, ছোটো ছিলি যখন ভুলিয়ে-ভালিয়ে রেখেছি— মায়ের মেয়েকে মায়ের কাছে যেতে দিইনি। এখন বড়ো হয়েছিস— আর তো তোর ওপর আমার জোর নেই— সাহস নেই রাখবার। এখন আমি কী করে থাকব ছবি?

হঠাৎ পিলু হাউমাউ করে তারস্বরে কাঁদতে কাঁদতে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে দু-হাতে পিসিমাকে জড়িয়ে ধরে। ছোটো দু-বছরের ভাইটাকেও সে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে এসেছে। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে পিলু বলে, মা মরে গেছে। মা ঝুলে মরে গেছে।

মরে গেছে? শক লাগার মতো চমকে উঠে সুকুমারী বলে, মরে গেছে কিরে? চল তো।

পিলুর কান্নায় সুকুমারীর চোখের জল শুকিয়ে যায়, অবিনাশ আসেন, সুখদা

আসেন। ছবি দূর থেকে বড়কাকে দেখে, তার কেমন লজ্জা হতে থাকে হঠাৎ— বড়ো হয়ে যাবার লজ্জা, অনেকদিন না দেখতে পাবার লজ্জা। আর তার সঙ্গে মিশে থাকে আগ্রহ মেশানো এক জিজ্ঞাসার লজ্জা। সবকিছু একনিঃশ্বাসে জেনে নেবার আগ্রহ।

সুখদা ছবিকে আরও লজ্জা পাইয়ে দেন। খুশি আর বিস্ময় মেশানো মুখে প্রণাম করা হলে মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরে বলেন, কত বড়ো হয়ে গেছিস রে ছবি, এ্যাঁ! এ যে চেনাই যায় না রে। এত ফরসা হয়েছিস— বেশ বেশ।

তার বেশি কথা বলবার সময় পাওয়া যায় না। ও-বাড়ি থেকে সুকুমারী প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, ও বিধু, ও ছবি। শিগগির দা, বঁটি যা পাস নিয়ে আয়। একটা টুল আন, সর্বনাশ হয়েছ. . .!

অন্ধকার ছোট্ট ঘরে যেখানে নিলুর মায়ের ঠাকুর থাকত তারই কড়িকাঠে শরীরটা ঝুলছে। বিকট, বীভৎস। সুকুমারী ঠকঠক করে কাঁপছে— ছবিকে, পিলুকে পাগলের মতো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে থাকে। যা, বেরিয়ে যা। কী দেখবি তোরা, পোড়াকপাল!

কিন্তু ছবি বেরিয়ে যায় না। সেই জিভ বার করা, সারা মুখ নীল হয়ে যাওয়া গলার কাছে মোটা দড়ির মতো শিরা ফুলে ওঠা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে কয়েকদিন আগের কথা। সে গল্প করেছিল তার চলে যাবার কথা, পিসিমাদের চলে যাবার কথা। পিসেমশাইয়ের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে— ব্যাবসা চলছে না। যারা অংশীদার ছিল তারা যার যার অংশ বুঝে নিয়ে কেউ গেছে— কেউ যায়নি। শহরে যদি লোক না থাকে তবে ব্যাবসা চলবে কী করে? কেমন করেই বা মানুষ থাকবে শহরে? —বলে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলেছিল। সেইদিনই এসেছিল পিলুর মা সুকুমারীর কাছে, খানিক চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ একসময় বলেছিল, আপনিও নাকি চলে যাবেন দিদি? আমার কী হবে? আমার! —বলে কিন্তু পিসিমার মুখের দিকে তাকায়নি, অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছিল।

তোমার কি কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই যাদের কাছে গিয়ে থাকা যায়? এ শহরে তো থাকা উচিত নয়। সব চলে যাচ্ছে। নেই কেউ তোমার? —সুকুমারী জিজ্ঞেস করেছিল।

সুকুমারীর প্রশ্নটা যেন নিলুর মা'র কানেই ঢুকল না। তেমনি হতভম্বের মতোই আবার উঠে চলে গিয়েছিল সে।

তার সেই বোকা বোকা, হাসি হাসি মুখখানা দেখে, তার চোখের দিকে তাকিয়ে সেইদিনই প্রথম হঠাৎ ছবির মনে হয়েছিল, নিলুর মা পাগল হয়ে যাচ্ছে।

কেন মনে হয়েছিল সে জানে না। পাগল সে কখনও দেখেনি— তবু মনে হয়েছিল।

এখনও সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর পিলু তার ঝুলে থাকা হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে ফ্যাশফ্যাশে গলায় জানতে চায়— মা কি মরে গেছে ছবিদি? মা কি মরে গেছে?

দড়ি কেটে নামানো শরীরটার ওপর ঝুঁকে পড়ে সুকুমারী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে, হারামজাদি! হারামজাদি কি কম চালাক? সব দায় যন্ত্রণা চুকিয়ে চলে গেল— এখন মরুক ছেলেমেয়ে দুটো।

হতভম্ব পিলুকে, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মা মা বলে চেঁচানো ছেলেটাকে দু-হাতে বুকের ওপর সাপটে নিয়ে, নিলুর মায়ের বুকের ওপর কাপড়টা টেনে দিতে দিতেও কান্না তার থামে না। জানে যে একেবারে ফেলে দিতে পারবে না, তাই মরে পথ করে দিয়ে গেল।

সারাদিন ধরে কেঁদে কেঁদে পিসিমা চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। পিলু আর তার ভাইকে নিয়ে গিয়ে ভালো করে সাবান মাখিয়ে স্নান করাতে করাতেও কেঁদেছে। স্নান করিয়ে, চুল আঁচড়ে জামা পরিয়ে এমন সুন্দর দেখায় দুজনকে। সুকুমারী মুগ্ধ চোখে ওদের মুখ তুলে ধরে দেখে আর কাঁদে। হতভাগাগুলো! আত্মীয়-স্বজন কোথাও তো তিনকুলে কেউ নেই। সারাজীবন এখন এই বোঝা আমাকে টানতে হবে।

কিন্তু ছবির মনে হয় পিসিমা মনে মনে খুশি হয়েছে ওদের পেয়ে। খুশি না হলে কেউ অমন করে পুতুলের মতো বারে বারে ছেলেমেয়ে দুটোকে নাড়াচাড়া করে দেখে— মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। খুশি হয়েছে পিসিমা— যেমন কতদিন আগে পিসেমশাইয়ের এনে দেওয়া সুন্দর পুতুল পেলে সে খুশি হত। ওমনি বারেবারে নাড়াচাড়া করে দেখত, ওঠাত, বসাত, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত। পিসিমার খুশি দেখে তার আনন্দ হয়। একটা কী যেন বোঝা নেমে যায় মন থেকে। সেটা সে আগে বুঝত না কিন্তু স্পষ্ট করে বুঝেছে বড়কা আসার দিন, যেদিন পিসিমা তার হতাশা আর কান্নভরা চোখ মুখের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করেছে, এখন আমি কেমন করে থাকব ছবি?— কারুর কষ্ট দেখলে, কেউ কাঁদলে, কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর দিতে না পারলে সবকিছুতেই তার এক এক সময়ে, এক এক রকম কষ্ট হয়। পিসিমার জন্যও তার তেমনি উত্তর দিতে না পারার কষ্টটা হচ্ছিল— এখন তাই বোধ হয় মনটা হালকা লাগে। আর পিসিমা জিজ্ঞেস করবে না, আমি কেমন করে থাকব ছবি? আর জিজ্ঞেস করছে না। এখন পিসিমা একেবারে নিজের জিনিস পেয়ে গেছে— ছবিকে আর দরকার নেই।

বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা অভিমানের মেঘ জমা হয়ে আছে, একটা চেপে রাখা হিংসে— কী যেন? কিন্তু তা খুব মৃদু। সেটা সে মাঝে মাঝে অনুভব

করতে পর্যন্ত ভুলে যায় পিলুর মুখের দিকে তাকালে।

পিলু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। এ-কোণে ও-কোণে কেঁদে বেড়ায়, যেমন করে সেও একদিন কেঁদে বেড়াত। ছবি ওর পেছন পেছন বেড়ায়, চোখে চোখে রাখে। তার সবখানিই যে স্নেহ তা নয়, একটা কৌতূহল তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। নিজের ছোটোবেলাটা যেন পিলুকে দেখে দেখে সে বুঝে নিতে চায়।

যখন-তখন পিলু চলে যায় ওদের বাড়ির দরজায়, বন্ধ দরজার ওপর মাথা রেখে কাঁদে। ছবি আস্তে আস্তে পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, কাঁদিসনে পিলু, কাঁদিসনে।

পিলু জানতে চায়, মা তো মরে গেল, দিদিও কি আর আসবে না ছবিদি?

এ-কথা শুনে কান্না পায়। ভরসা-হারা গলার ওমনি আর একটা জিজ্ঞাসার উত্তর তো ছবি দিতে পারেনি। রাস্তায় যাওয়া বারণ তবু সেদিন পিসিমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। সাধন এসেছিল, হাসবার চেষ্টা করে বলেছিল, তুমি বুঝি চলে যাবে ছবি? আর আসবে না?

তার দু-চোখে কী যেন ছিল! তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিতে হয়েছিল কথা বলতে গিয়ে, একবার গেলে কি আর আসা যায়? পিসিমারা-ই তো চলে যাচ্ছেন বাড়ি-টাড়ি বিক্রি করে দিয়ে। আপনারা কোথাও যাবেন না?

হয়তো যাব। কে জানে, বাবা তো হাঁটা-চলা করতে পারেন না, সবকিছু তো আমাকেই করতে হবে। বাবার জন্যে আমার পড়াটা পর্যন্ত হল না ছবি— জান? কী-ই বা হল আমার? কী-ই বা হবে পালিয়ে গিয়ে? এখানেই বোমা পড়ে মরে যাব। বিমর্ষ গলায় জবাব দিয়েছিল ছেলেটা।

ওর বিমর্ষ ভাবটা ছবিকে পর্যন্ত বিমর্ষ করে তুলেছিল। তা সরিয়ে দেবার জন্য ছবি অন্য কথা বলেছিল হাসি হাসি মুখ নিয়ে, জানেন সাধনদা, আগে আপনাকে দেখে কত কী ভাবতাম। রাগ হত...।

আর এখন? এক অদ্ভুত গলায় জানতে চেয়েছিল ছেলেটা তার প্রশ্নের উত্তর।

এখন? ছবি সে-কথারও উত্তর দেয়নি। আবার তুলেছে অন্য কথা, আপনি আর গান করেন না কেন?

ভালো লাগে না। ম্লান নিস্তেজ গলায় সে বলেছিল, গান আর গাইব না। মন খারাপ।

না না, গাইবেন। এই পাড়াটায় আপনার গান শুনলে তবু মনে হয় যেন বেঁচে আছি। আপনি গান বন্ধ করবেন না।

তারপর যে কদিন ছিল ছবি গান আবার গেয়েছে ছেলেটা, কিন্তু কেমন বেসুরো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে উলটো-পালটা লাইন ধরে গেয়েছে, অর্থহীনভাবে, আর ছবি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে জানলা ধরে। আর

কোনওদিন হয়তো দেখা হবে না ছেলেটার সঙ্গে। বখাটে, ভ্যাগাবন্ড ছেলেটাকে কতদিনই বা মনে রাখা যাবে— সারা জীবনেও আর যদি দেখা না হয়?

একটা অস্পষ্ট অনুভূতি আর বেদনা— কী যেন! কী যেন! তাকে বোঝা যায়, কিন্তু বোঝানো যায় না। ছবি সে-বোধটাকে ভুলে থাকতে চায় জোর করে।

কিন্তু একটা কথা ভোলা যায় না— একটা বেদনাবোধ চাপা নয়— প্রত্যক্ষ। মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন উড়ছে, রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে মিলিটারি লরি— মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে সাইরেনের আওয়াজ সেই কথাটাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে— যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ!

এখন কোথায় সুধাদি যে 'জোয়ান অফ্ আর্ক' পড়াতে পড়াতে একদিন উঠে গেল— আর এল না। থাকলে সব কথা বলতে বলতে একটু কেঁদে নেওয়া যেত।

চলে আসবার সময় যখন কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল তখনও সেই মনটাই তেজী ঘাড় বাঁকানো ঘোড়ার মতো আবার একদিন ফিরে যাবার স্বপ্নও দেখত। মনে মনে তার একটা স্বপ্ন ছিল, কল্পনা করত হাসতে হাসতে সে ফিরে যাচ্ছে। জোর করে নিয়ে আসা পিসিমা কত কাঁদছে তাকে রাখবার জন্য, কত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে তার চোখে একটু জল দেখবে বলে, কিন্তু ছবি একটুও কাঁদছে না। কাঁদবে কেন সে? যার কান্না পায় সে কাঁদুক।

সে-কথা ভেবে সে নিজের মনে মনেই খুশি হত।

কিন্তু এ কী হল? কী যে হল? পিসিমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে পিসিমার চেয়ে ছবিই যে বেশি কাঁদছে। কাঁদছে তো কাঁদছেই, সে-কান্নার শেষ নেই।

তার মাথাটা কোলে থেকে ওঠানোর চেষ্টা করে সুকুমারী বলে, কত কী তো ভেবেছিলাম তোকে নিয়ে। ভেবেছিলাম একটা অনেক লেখাপড়া জানা মেয়ে হবে আমাদের বাড়িতে। দেখতাম অনেক বিদ্যে দিয়ে সেই মেয়ের বিন্তির মতো, আমার মতো কপালকে ঠেকাতে পারে কিনা। কিন্তু হল না যে।

সে-কথা শুনে ছবি কোলের মধ্যে আরও জোর চেপে ধরে তার মুখ, আরও কাঁদে।

অনেকদিন আগে একদিন এমনি করে কেঁদে ছটফট করে বারেবারে ছিটকে সরে গিয়েছিল সুকুমারীর টেনে নেওয়া কোলের মধ্য থেকে। আজ সে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতে চায়।

কান্নার মধ্যে মধ্যে তার হাত-পা এক অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় ঠাণ্ডা হয়ে আসতে চায়। কাল পর্যন্তও এত কথা মনে হয়নি তার। আজ মনে হচ্ছে, কিছু হল না তার, সব শেষ হয়ে গেল। কী যেন হল না।

সুকুমারীও বলে, আমি তো চেয়েছিলামই— কিন্তু কপাল তোর। হল না।

তবু চেষ্টা করিস তুই।

পিসেমশাইয়ের অংশীদাররা সবাই চলে গেছে। অনেক টাকা লোকসান দিয়ে গরিব হয়ে গেছেন পিসেমশাই— দিশেহারা হয়ে গেছেন। বাড়ি দুটো বিক্রি করবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন— ছবি তা জানে।

তবু পিসিমা তাকে বাক্স ভরে কাপড় দিয়েছে, জামা দিয়েছে। যা ছবি চায়নি— যা চেয়েছে সব। অনেক দিয়েছে ওরা।

কিন্তু জিনিস দিয়ে কী হয়। টাকার কোনও মূল্য তার কাছে নেই। ও-সবে তার দরকার নেই— সে তার পুরোনো জীবনটাই ফিরে চায়।

ইস্কুল থাক। মিনু চলে গিয়ে কষ্ট হলেও অন্য বন্ধুরা ছিল। নিলু চলে গিয়েছে কিন্তু সাধনকে দেখলে তার আনন্দ হয়। যা নেই, যা গেছে তাকেও তো সে চায় না। কেবল যা আছে তাই থাক।

কিন্তু থাকা গেল না। এই বিপজ্জনক শহরটা সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। কেউ থাকবে না এখানে।

অবিনাশও কেঁদেছেন গোপনে, চোখদুটো লাল হয়ে আছে। পিসেমশাই স্টেশনে যাবেন না। আজকাল বাড়িতে একা মেয়েদের রাখা যায় না। মিলিটারির লোকেরা যখন-তখন ঢুকে পড়ছে অনেক বাড়িতে। সবাই যে খারাপ তাও নয়। কেউ হয়তো বাঙালি পরিবার দেখবার লোভে ঢুকেছে— কেউ ঢুকেছে বেহদ্দ মাতাল হয়ে ভয় পাওয়াতে।

কান্নায় ঝাপসা চোখ নিয়ে না তাকালেও চলত— তাকানো চলত পিসিমার মুখের দিকে যে কিছুতেই ছবির হাত ছাড়তে চায় না, পিলুকে, তার ভাইকে একেবারে আপনার করে পেয়েও।

তবু চোখ যায় সাধনদের বাড়ির দিকে। গেট ধরে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবির দিকে তাকিয়ে সে একবার হাসবার চেষ্টা করে, ছবিও চেষ্টা করে কিন্তু চোখের জল ঠেকানো যায় না।

যতক্ষণ গাড়িটা দেখা যায় সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেদিকে— বিন্দু হয়ে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। এ-বাড়ির গেট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সুকুমারী কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠা শরীর নিয়ে।

ও-বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে থাকে বখাটে, ভ্যাগাবন্ড দিনরাত গান গাওয়া একটা ছেলে।

একদিন খুব ভোরে যে মেয়েটা এই ধুলো ধুলো বিষণ্ণ শহরটাকে দেখে ভুরু কুঁচকেছিল— খুশি হতে পারেনি— আজ সে জলভরা চোখ নিয়ে সেই ফেলে আসা শহরটাকে একান্ত আগ্রহে দেখতে চায়।

পাহাড়ের মাঝখানের পথ দিয়ে গাড়ি চলে, পথের ওপরের দুটো-একটা বুনো পাহাড়ি গাছে আগুন-জ্বলা লাল ফুল ফুটেছে। পাহাড়ের গা থেকে দুটো-একটা বুনো লতা ঝুঁকে পড়েছে নীচের দিকে, মাথায় ফোটা ফুল নিয়ে— ঝুঁকে পড়ে যেন ছবিকে চলে যেতে বারণ করছে। চওড়া বাঁধানো রাস্তাটায় পড়লে সেসব আর দেখা যায় না— সে-রাস্তা অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়ার শব্দে মুখর। সব মানুষ শহর ছেড়ে পালাচ্ছে।

ভীষণ ভিড় স্টেশনে— গাড়িতে। সবাই ব্যস্ত, কোনওমতে পালাতে পারলে বাঁচে। এতটুকু জায়গা চাই— এতটুকু। বসতে চায় না, শুতে চায় না— পা দুটো রেখে দাঁড়িয়ে যেতে পারলেই হয়। অনুরোধ— ঝগড়া— গালাগালি— মারামারির শব্দে সমস্ত প্ল্যাটফর্মটা মুখর। সেখানে তেমনি সব পাখাগুলো ঘুরছে— ঢাকনা পরানো আলোগুলো সব জ্বলছে কিন্তু তাতে আলো কোথায়? যা সব অন্ধকারকে দূর করে দেয়, যা দেখলে মন খুশি হয়ে ওঠে। জানলায় মাথা রেখে সেদিকে ছবি তাকিয়ে থাকে চুপ করে।

যাত্রীরা কথা বলে— নিশ্চিন্ততার কথা।

ওদের কি কোনও কষ্ট হচ্ছে না? ওরা কি কিছু হারায়নি? কে জানে। কিন্তু ছবি যেন কী হারিয়ে এসেছে।

কী? নিজেও তা বুঝতে পারছে না ঠিক করে, কিন্তু একটা কথা বুঝছে— এই শেষ। আর কোনেওদিন এখানে আসতে পাবে না সে।

চলন্ত গাড়ির চাকার ঘষায় ঘষায় যেন তার কথারই প্রতিধ্বনি হতে থাকে, আর কোনওদিন! আর কোনওদিন না! কোনওদিন! কোনওদিন না! না— না— না!



একুশ

এসে গেছে— ছবি এসেছে— কে যেন কাকে ডেকে বলে কথাটা। ছেলেমেয়েরা কলরব করে দৌড়য় সে-কথা শুনে। কাকিমা, সরস্বতী দৌড়য় না কিন্তু কাজ ফেলে দ্রুতপায়ে সেও উঠে যায়।

কেবল ওঠেন না মমতা। তাঁর খুন্তিধরা হাতখানা আড়ষ্ট শক্ত হয়ে থাকে, ইচ্ছে করলেও যেন তাকে নাড়ানো যায় না। কিন্তু সে একটা মুহূর্ত। তারপরেই আগ্রহ-ব্যাকুলতায় বুকেব মধ্যে দাপাদাপি করতে থাকে, দু-চোখ হঠাৎ কখন ঝাপসা হয়ে ওঠে জলে।

এসেছে। রুক্ষ চুল দোলানো, মাঠ-ঘাটে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘুরে বেড়ানো, কারণে-অকারণে গালাগালি আর মারধোর খেয়েও চোখের জল মুছে ফেলে হেসে ওঠা, তাঁর সেই ছবি!

কিন্তু সত্যিই কি এসেছে? নাকি অনেক না ঘুমোনো রাতের চোখের জলে মেশা ভাবনার মতোই ছায়া ছায়া হয়ে মিলিয়ে যাবে তার চেহারাটা?

সরস্বতী দরজার কাছে এসে ভেতরে তাকিয়ে বলে, ওমা, কেমন ধারা মা আপনি? এতদিন পরে মেয়েটা এল— আপনি রইলেন রান্না নিয়ে!

অনেকদিন পরে এল। কতদিন সেটা? সেই যে কবে যেতে না চাওয়া মেয়ের কান্নাভরা মুখখানাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ফিশফিশ করে বলেছিলেন, তুই আমার বড়ো আশার জিনিস রে ছবু! সে-কথা ভুলে গিয়েছিলেন। কীসের আশায় জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন দূরে তা তিনিও জানেননি ভালো করে সেদিন, ভাবেননিও।

তারপর কত দিন— কত রাত কেঁদেছেন। প্রদীপ রাগ করে নিঃসম্বল হয়ে

বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বুক-ভাঙা কান্না কেঁদেছেন লুকিয়ে লুকিয়ে। গোপন করে রাখা যন্ত্রণা চোখের জলে হালকা হয়ে গেছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি কেঁদেছেন তিনি ছবির জন্য, সে যত্নে আছে, সুখে আছে জেনেও। সে কান্নার জল বাইরে পড়েনি— জমা হয়েছে। দেখতে না পাওয়ার দুঃখে কেঁদেছেন— কাছে পাবার আকুলতায় ছটফট করে ভেবেছেন বাজপাখি হয়ে মেয়েকে ছিনিয়ে আনবেন সুকুমারীর হাত থেকে। কিন্তু সেই আশাটা— সেই না বোঝা, না জানা আশাটা আবার থমকে থামিয়ে দিয়েছে মাঝপথে। না দেখে দেখে ওর চেহারাটাকেও যেন আর স্পষ্ট করে মনে করা ভুলে গিয়েছিলেন কিছুদিন থেকে। কেবল অনুভব করতেন— কোথায় যেন একটা কিছু তাঁর জমা করা আছে। একদিন সেটা সম্পদ হয়ে দেখা দেবে। কেমন করে তা তিনি জানেন না, জানতেও চাননি।

সেই তো এসেছে। কিন্তু তবু তাকে দেখতে ছুটে যেতে পারছেন না। কী এক অলক্ষ্য আশঙ্কা যেন মনটার ওপর চেপে বসে আছে সকাল থেকে, আসবে শোনার প্রথম আনন্দটা থিতিয়ে যাবার পরেই। সে আশঙ্কা যেন মাঝে মাঝে তাঁর হৃৎপিণ্ডটারও চলা বন্ধ করে দিতে চাইছে। ভয় পাইয়ে দিচ্ছে তাকে, চমকে দিচ্ছে। কেন তাও বুঝে উঠতে পারছেন না মমতা।

রান্নাঘরের দরজার কাছে বড়ো-ছোটো গলায় কারা যেন একসঙ্গে কলরব করে ওঠে, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কে যেন বলে, জেঠিমা, ও জেঠিমা, এই যে ছবু!

স্পষ্ট গলায়, মৃদুস্বরে কে যেন ডাকে, মা!

কে! এতক্ষণের সব ভাবনা ভুলে, বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো চমকে তাকান মমতা। দু-চোখ তাঁর মুখের ওপর রেখে এক কিশোরী এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

ছবু! আমার ছবু! —একটা মুহূর্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মেয়ের দিকে, তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে ছোটো শিশুকে বুকে নেবার মতো দু-হাত বাড়িয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন। ঠোঁট দুখানা থরথর করে কেঁপে ওঠে একবার, তারপরেই হঠাৎ কেঁদে ফেলেন ঝরঝর করে।

একটুখানি স্তব্ধ হয়ে থেকে, মায়ের বুক থেকে মুখ তুলে জলে ভেজা চোখে মেয়ে হাসে, তোমাকে এখনও প্রণাম করিনি যে মা। দাঁড়াও আগে প্রণাম করি।

সরস্বতী বলে, যান দিদি! কতদিন পরে এল মেয়েটা— কাছে নিয়ে একটু বসুন গে। রান্না আমি দেখব।

ওপরে গিয়ে, কাছে বসিয়েও মমতার বিহ্বল ভাবটা যেন কাটতে চায় না। একদৃষ্টিতে তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে কী যেন বোঝবার চেষ্টা করেন। এত বড়ো হয়ে গেছে তাঁর ছবি। শহরে থেকে রংটা ফরসা হয়েছে, শহরের কায়দায় শাড়ি পরেছে, দুটো বিনুনি ঝুলিয়ে দিয়েছে কাঁধের দু-পাশ দিয়ে। সারা মুখে এক নতুন শ্রী।

এ তো তাঁর সেই ছবি নয়— যাকে তিনি মেরেছেন, বকেছেন, ভালোবেসেছেন। এই নতুন বয়সটাকে তিনি যেন চিনে উঠতে পারছেন না। তাঁর জীবনে কি আসেনি এমন বয়েস! এমন শ্রী, এমন নতুন কিছু। এত অচেনা লাগছে কেন তবে?

হঠাৎ সারা শরীর কাঁপিয়ে মনে পড়ে যায় পুরোনো কথা। এসেছিল! ছবির চেয়ে অনেক সুন্দর ছিলেন তিনি— অনেক কোমল। কিন্তু সব ঢাকা পড়েছিল ঘোমটার আড়ালে, দুটো ভীরু ভীরু চোখ সেই যে মাটির দিকে নিবদ্ধ করেছিল দৃষ্টি— চোখ ফিরিয়ে প্রথমেই দেখেছিল রান্নাঘরটাকে, সেখানেই সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, কোমলতাকে বিসর্জন দিয়েছেন তিনি। কেউ তাঁকে ডেকে বলেনি তাঁর সৌন্দর্যের কথা। মুগ্ধ চোখে কেউ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে চায়নি তাঁর নতুন পাওয়া বয়েসকে, বেড়ে ওঠাকে। ছবির দিকে তাকিয়ে তাই মুগ্ধ হয়ে থাকতে হয়। যেন ও মেয়ে নয় তাঁর, যেন নিজের অতীতটাকেই দেখছেন তিনি অবাক হয়ে।

মেয়ে বলে, কথা বল মা। কতদিন পরে এলাম— তুমি একটা কথাও বলছ না।

কথা বলছ না! —এতক্ষণে চমকে সোজা হয়ে বসেন মমতা, সহজ হবার চেষ্টা করে বলেন, ঠাকুমাকে প্রণাম করে এসেছো তো? দাদুকে?

সব। সব্বাইকে। ঠাকমা বড়ো কাঁদছেন মা পিসিমার জন্যে। বোমা পড়ার কথাটা না বললেই হত। কতদিনে যে পিসেমশায়ের বাড়ি বিক্রি হবে কে জানে! সবাই চলে গেছে কিন্তু পিসেমশাই কিছুতেই যাবেন না বাড়ি ফেলে। আর... —ছবি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। সে এখন ভাবতে শিখেছে— মমতার কাছে এটাও যেন নতুন লাগে। প্রদীপও বড়ো হয়েছিল, কিন্তু চোখের সামনে দিয়ে। সেজন্যেই যেন নতুন লাগেনি তাকে। অন্য ছেলেমেয়েরা বেঁচে থাকলেও বড়ো হত। কিন্তু ছবির বড়ো হওয়াটা, তার ভাবতে শেখা, তার গাম্ভীর্য মমতাকে যেন অবাক করে দিচ্ছে বারেবারে। নিজের ছেলেমেয়ের মধ্যেই এত বিস্ময় লুকোনো থাকে মা হয়েও আগে জানতেন না তিনি।

চাকর বাক্স-বিছানা ওপরে দিয়ে গেলে ছবি তার রুমাল থেকে চাবি খুলে মমতার হাতে দেয়, ওই ছোটো বাক্সটায় আমার জামা-কাপড় আছে মা, বড়োটায় আছে বই।

বই! মমতা যেন চমকে সজাগ হয়ে ওঠেন, বই কেন রে?

উঃ মাগো! কিচ্ছু জানো না তুমি? আমি যে আসছে বছর ম্যাট্রিক দেব তাও জানো না তুমি? শহরটা মিলিটারি নিয়ে নিয়েছে, আমাদের ইস্কুলটা উঠে গেল, পড়াশোনা বন্ধ। তাই তো চলে এলাম। কেন যে যুদ্ধ করে মানুষ! শহরের এক মাইল বাইরে একটা বোমা পড়েছিল, সেদিন কতদূর থেকেও তার আলো আর ধোঁয়া দেখা গেল। রেঙ্গুন, বার্মা থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে এসেছে ওখানে—

ওখান থেকে পালাচ্ছে অন্য জায়গায়। কী যে বিচ্ছিরি জিনিস এ-সব। তুমি কিছু জানো না মা?

তোর ভয় করত না?

ভয় না। আমার খুব রাগ হয় মা— দুঃখ হয়।

ভয় নেই। প্রদীপও যাবার আগে বলেছিল, ভয় দেখিয়ে আমাকে ধরে রাখবেন ওঁরা। ভয় আমি করিনে— কাউকেই না, কিছুকেই না। অথচ মমতা তো ভয় করেন— যুদ্ধের খবর শুনে তাঁর ভয়, এ-বাড়ির সবাইকে ভয়, কেউ ভয় না পেলেও তাঁর ভয়। ছেলেমেয়ে দুটো কি তবে তাঁর নয়?

ছবি দেখে মমতা তাকিয়ে আছেন অন্যদিকে অন্যমনস্ক হয়ে, যেখানে দেয়ালের গায়ে তার আর প্রদীপের একসঙ্গে তোলা একটা অস্পষ্ট, বিবর্ণ ছবি টাঙানো আছে। শহর থেকে গ্রামে বেড়াতে আসা কে যেন একদিন তুলে দিয়েছিল ওদের দু-ভাইবোনকে দাঁড় করিয়ে। ভালো হয়নি ছবিটা, অস্পষ্ট। তবু মমতা ওটাকে টাঙিয়ে রেখেছিলেন ওখানে।

দেখে সেই মুহূর্তেই হঠাৎ প্রদীপের কথা মনে পড়ে যায় তার, আগ্রহ ব্যাকুলতা ভরা ফিশফিশে গলায় মেয়ে বলে, মণিদার কথা তুমি তো কিছু লেখোনি আমাকে? পল্টুর কাছে শুনলাম মা— সত্যি?

সত্যি! ম্লান হাসি হেসে মমতা বলেন, মিথ্যে হবে কেন? ছোটোবেলায় প্রদীপকে দেখে ভাবতাম না ও এত কষ্ট দিতে পারে আমাকে— ভাবতাম—।

মমতার কথা শেষ করতে না পারা কাঁপা ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে ছবি বলে, মণিদা কি অন্যায় কিছু করেছে? কাঁদছো কেন মা?

কথাটা কি ছবি বলছে! সেদিনকার ছবি! মমতা হঠাৎ সোজা হয়ে বসেন।

অন্যায় কিনা জানিনে, কিন্তু জেদ যে আছে এটা ঠিক। ম্যাট্রিকের ফল বেরুলে ছেলে বলল আমি ছবি আঁকা শিখব আর কলেজে পড়ব। তোমার বাবা বললেন, টাকা কোথায় যে তোমাকে শহরে রেখে পড়াব? ঠাকুরদা বললেন, বাপ্ যা বলবে তাই করবে। ছেলে ঘাড় শক্ত করে রইল, ব্যাবসা সে করতে পারবে না, সে ছবি আঁকবে, সে পড়বে। শেষে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। কে জানে এখন কেমন হচ্ছে তার ছবি আঁকা, তার পড়া।

ছবি সব শুনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, মণিদার কিন্তু খুব সাহস মা।

সাহস! কিন্তু আমার জন্যে কি একটু মায়া হল না তার? কাঁদবার পর্যন্ত জো নেই আমার। বেশি অসহ্য হলে লুকিয়ে অধীরের ঘরে গিয়ে কাঁদি, —বলে মমতা চোখ ছাপিয়ে আসা জল মুছে ফেলেন আঁচলে।

অধীরকা! কাকা তবে ফিরে এসেছে? কই বলনি তো তুমি? কবে ফিরেছে অধীরকা? আগে দেখা করে আসি।

দাঁড়া, —প্রায় ছুটে-যাওয়া মেয়ের হাত চেপে ধরেন মমতা, অমন করিসনে। যাবি যেন কেউ দেখতে না পায়। নতুন দিদিমা ছাড়া কেউ প্রায় ঢোকেই না ও-ঘরে আর আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে যাই। বেশি যেতে নেই।

দু-চোখে ভীতি-বিহ্বলতা নিয়ে মেয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে, কেন মা?

মরবার ইচ্ছে হলে মানুষ যা করে। জেল থেকেই ফিরেছিল কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে। তাই নিয়েই গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে শুরু করল ছেলেটা। খাওয়ার ঠিক নেই, ঘুমোনোর ঠিক নেই— কৃষক সমিতি করছে। ওর মা কত কাঁদত, কত বলেছে সবাই। শুনে হাসত। ঘোরা আর পড়া— এ-দুটোকেই ওরা বলে কাজ। সারাদিন ঘুরে আবার প্রায় সারারাত পড়ত। কোনোদিন রাত তিনটের আগে আমি ওর চিলেকোঠার ঘরের আলো নিভতে দেখিনি। অত অত্যাচার সয় কখনও। আজ কিছুদিন হল একেবারে শয্যাশায়ী, মাঝে মাঝেই গলা দিয়ে রক্ত পড়ে। ও বলে, সব ওর জেলের পুঁজি করা জিনিস। ধীরেন ডাক্তার কখনও, কখনও গোপাল কবিরাজ চিকিৎসা করে। ওতে কি হবে! অনেক টাকা ঢালতে পারলে হয়তো বাঁচানো যেত, কিন্তু কোত্থেকে আসবে? খাওয়াই জোটে না দু-বেলা— জমি যা ছিল একটার পর একটা বিক্রি হয়ে গেছে। এখন তোমার হরিদাদুও কেমন আধপাগল হয়ে আছেন— শুধু চুপচাপ বসে থাকেন। যত জ্বালা হয়েছে নতুন দিদিমার। ওই তো একটামাত্র ছেলে। ঘাড়ের ওপর আছে আবার লতুটা। কপাল কেমন! বিয়ে-থা দিয়েও কি শান্তি আছে? হাবা-বোকা বলে শেষ পর্যন্ত জামাই ওকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার একটা বিয়ে করেছে সেদিন।

একটা পুরো সংসারের ধ্বংসের কাহিনি শুনিয়ে মমতা চুপ করলেন। শেকল বাঁধা অধীরকার বিরাট দেহটার পাশে পাশে চলা টুপি-পরা দারোগাকে পর্যন্ত কতটুকু মনে হয়েছিল সেদিন ছবির। আজ যেন তা স্বপ্নের মতো লাগে— ভাবাও যায় না। কেমন করে সে দেখতে যাবে কাকাকে। শুনেই যে কান্না পাচ্ছে— কথা বলবে সে কেমন করে।

চোখ-ভরা জল নিয়ে ছবি বলে, ধ্যেৎ, ভালো লাগছে না কিছু। মণিদা নেই, অধীরকার ওই অবস্থা। মনটা বড্ড খারাপ লাগছে মা, কেন যে যুদ্ধটা বাধল! নইলে তো সুধাদিও জেলে যেত না— নিলুটাও...। কথা শেষ না করেই মায়ের দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জিত মুখে হেসে মেয়ে বলে দু-হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে, তোমার জন্যেই বড্ড মনটা কেমন করত— নইলে আর কি! অনেক লেখাপড়া শিখে একদিন হঠাৎ এসে তোমাকে অবাক করে দিতাম। কিন্তু সব আমার উলটো হয়ে গেল। এসেও কিছু মিলছে না ছোটোবেলার সঙ্গে। বাবাকে দেখতেই পেলাম না, গঞ্জে আছেন শুনলাম। জুতো-মোজা পরে ঢুকতে দেখে দাদু বকলেন মেমসাহেব সেজেছিস? আর তুমি? —তুমিও যেন বুড়ো হয়ে গেছ এই কটা

বছরেই, সামনের চুল সাদা হয়ে গেছে কতগুলো। কেমন যেন লাগছে আমার, ভয় করছে, কান্না পাচ্ছে! কেন বল তো?

কেন তা কে জানে! মমতা তার উত্তরও দেন না। কেবল মেয়ের বিনুনি খুলতে খুলতে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কী মনে করে চমকে ওঠেন মা—

কালীর কথা মনে আছে তোর?

পণ্ডিতমশাই? খুব মনে আছে। আজও পাঠশালা তেমনি চলছে মা?

চলছে। কিন্তু কালী আর নেই রে। ওই আর একটা মানুষ। যা তার পুঁজি ছিল মেরে-ধরে সারাজীবন ধরে শিখিয়ে গেছে সব্বাইকে অথচ মানুষটা মরে গেল বিনা চিকিৎসায়। কী পেয়েছে জীবনে। না পয়সা-কড়ি, না শ্রদ্ধা-সম্মান। কতদিন এসে এসে তোর খোঁজ নিয়েছে— বেঁচে থাকতে...। আহা! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা চুপ করে রইলেন।

চোখের সামনে ভেসে উঠল কতদিনের পুরোনো ছবি— শীর্ণ, খোঁড়া চেহারার মাস্টারমশাই— সেই টেবিলের টানা ড্রয়ারে রেখে দেওয়া বেতখানা। ছবিকে কিন্তু কখনো মারতেন না কালী পণ্ডিত। সেই কতদূর থেকে এখনও যেন গলা ভেসে আসছে— যা, খেয়ে আয়। এসে কিন্তু ভূগোল আর শ্রুতিলিখন দিবি। কত স্মৃতি সেই ভাঙা পাঠশালাটার— অল্পশিক্ষিত মানুষটার। সেসব কথা কেইবা মনে করে, কেইবা মনে রাখবে— ছবি নিজেও তো ভুলে যাবে একদিন। ওরা তো সিঁড়িতে ওঠার প্রথম ধাপ— ওপরে উঠে ভুলে যায় সবাই।

ছবি বলে, পিসিমা আসবার সময় কয়েকটা টাকা দিয়েছেন— আজই গিয়ে আমি পণ্ডিতমশাইয়ের বউকে দিয়ে আসব, নেবেন না মা?

থাকলে কি আর নিত না— নিত। কিন্তু দিবি কাকে তুই? বউটা দিনকয়েক কষ্টে-সৃষ্টে কাটিয়ে দিনকয়েক হল তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপেব বাড়ি চলে গেছে। তারপর কী আছে ভাগ্যে কে জানে!

ভালো লাগছে না কিছু। এ কোথায় যে এল ছবি।



বাইশ

দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হয়, সেই ছোটোবেলার মতো করে আর যেন ঢোকা চলে না দরজাটা ধরে একটু দাঁড়িয়ে ছবি আগে ঘরেব ভেতরের অবস্থাটা বুঝে নিতে চায়। বইয়ের আড়ালে অধীরকা এখনও দেখতে পায়নি তাকে কিংবা সে দেখতে পাচ্ছে তার শুকনো, সরু সরু আঙুলগুলো, তার রুগ্ন মুখের একটা পাশ।

আশ্চর্য সজাগ কান অধীরের। পায়ের শব্দ সে ঠিক শুনতে পেয়ে বলে, কে রে? কে ওখানে? ঘরের মধ্যে আয় তো দেখি।

ছবিকে দেখে সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না, চিনতেও পারে না হয়তো প্রথমে। হাতের বই নামিয়ে রেখে সে উঠে বসে বিছানায়, খুশি মুখে বলে, তুই ছবি না? সেই ছোট্ট ছবি! কত বড়ো হয়ে গেছিস রে? প্রথমে যে চিনতেই পারিনি।

কাছ ঘেঁসে বসতে গেলে সে হাত ধবে পাশের টুলখানার ওপর বসিয়ে দিয়ে বলে, শুনিসনি আমার কথা? কাছে বসতে নেই।

সে-কথা শুনে কেবল কান্না পায়, কথা বলা যায় না। কাকা তো কালো ছিল, কবে আবাব এমন সাদা ধবধবে রং হয়ে গেল তার! মস্ত বড়ো ফোলানো চওড়া বুকে তো ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজত এই চিলেকোঠারই ছাদে সকালে-বিকালে। কোথায় গেল সে বুকখানা! সেই লোহাব মতো শক্ত চওড়া হাত-পা!

ছবির অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা মুখখানাকে নিজের দিকে ফিরিয়ে অধীর তার সেই শান্ত হাসি হাসে, আমার জন্যে তোর কষ্ট হচ্ছে, ছবি? চোখে জল কেন তবে? আচ্ছা বোকা মেয়ে তো!

ছবি জল মুছে ফেলে বলে, জেল থেকে অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেই কেন অমন করে খাটতে গেলে অধীরকা? একটু বিশ্রাম নিলে না কেন? —তারপরই তার মনে হয় সুধাদির কথা। সুধাদিকেও কি ওরা ওমনি করে ছেড়ে দিয়েছে? কে জানে!

অধীর জোরে হেসে বলে, নিলে হয়তো হত। কিন্তু তাতে আমি বাঁচতাম, কাজ বাঁচত না। তোর কী ধারণা ছবি, এখনও তোর অধীরকা সেই পিস্তলের রাজনীতিই করে?

তবে কী? লজ্জিত মুখে ছবি জানতে চায়।

সুধাদিকে অবশ্য গল্প করেছিল অধীরকার কথা। সুধাদি বলেছিল, সে-দিন চলে গেছে ছবি। দু-দশটা ইংরেজ মেরে কিছু হবে না, দেশের জন্যে রক্ত দিতে হবে, ইংরেজকে তাড়াতে হবে দেশ থেকে— নিজের শক্তিতে না হয় অন্যভাবে...। গভীরভাবে সে-কথায় বিশ্বাস করতে করতে জেলে চলে গিয়েছিল সুধাদি। অধীরকাও কি ওমনি একটা কিছু বলবে!

কিন্তু অধীরকা বলে অন্য কথা, অন্যমনস্ক হয়ে আপনমনে। সে-কথাও ছবি ভালো বুঝতে পারে না, কিন্তু শুনতে চায়।

অধীর বলে, বুঝতে পেরেছিলাম ভুলটা, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। জেলখানাটা আমার শাপে বর হয়েছে ছবি। নইলে কি যে হত...। উঃ! একটা ভাঙাচোরা মন নিয়ে ফিরে এসে কেমন হয়ে যেতাম কে জানে। ফিরে এসে অরুণ, প্রসন্ন, ধীরেনকে দেখলাম কিন্তু চিনতে পারলাম না। কেমন যেন হয়ে গেছে সবাই। কিছু একটা করতে চায়— জানতে চায় কিন্তু পারছে না। আর কি বসে থাকা যায়? অত খেটেছিলাম বলেই সবায়ের চেষ্টায় কত বড়ো সমিতি গড়েছি জানিস? এখন আর আমার কোনো ভয় নেই, একটা সত্যিকার বিশ্বাসকে এতদিন বুঝিনি কেন ভাবলেই বরং অবাক হয়ে যাই।

কী সে-বিশ্বাস কে জানে— যার জন্যে প্রাণটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলে। ছবি অত কথা ভাবতে পারবে না। অধীরকার জন্যে বড় জোর সে কাঁদতে পারবে— লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে যাবে। আর কী করবে? তার নিজেরও কী কম ভাবনা।

সে-ভাবনাটা সুধাদিকে বোঝানো যায়নি। সুধাদি থাকত আপনমনে— মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলত যা ছবির মতো কিশোরী মেয়ের মনটা ছুঁয়ে যেত মাত্র, কিছু ভাবতে পারত না। ছবি আবার মেতে যেত লুকিয়ে উপন্যাস পড়ায়, নয়তো ভাবত সব অদ্ভুত কথা। সুধাদির জন্যে দুঃখ ছিল, ভাবনা ছিল কিন্তু তার বেশি নয়। সুধাদি তাকে শেখাতে চায়নি, শোনাতে চেয়েছিল— তা ছবির মন স্পর্শ করেনি। তাই উল্কার মতো জ্বলজ্বলে সুধাদি 'জোয়ান অব আর্ক' পড়াতে পড়াতে নিজে জ্বলে উঠত, ছবিকে জ্বালাতে পারেনি— শেষে একদিন উল্কার মতোই ছিটকে চলে গেল কোথায়।

অধীরকাও আর একজন। চিন্তা করতে গেলেই ছবির মনে ভেসে উঠত এক বিশাল চেহারা। সত্যি অধীরকা যা নয় তাই ভাবত ছবি। একটা অসম্ভব কিছু করবে একদিন অধীরকারা ছবি জানত। কিন্তু সে-অসম্ভবটা কেমন তা সে ভাবতে পারত না— এমন অদ্ভুত ছিল তার ধারণা। সেই কাকারাই যখন ফুরিয়ে গেছে— একটা বিশাল দৈত্য যখন বন্দি হয়ে গেছে এতটুকু গণ্ডিতে— তখন আর আসা

কীসের? তার ভাবনাটা সে আর তাই কাউকে বলতে চায় না— কেউ বুঝবে না। দু-চোখে টলটলে জল নিয়ে সে শক্ত হয়ে বসে থাকে।

অধীর বলে, চলে তো এলি, এখন কী করবি? যেন প্রশ্নটা ছবি বলে একটা হতাশ হওয়া, ভয় পাওয়া মেয়েকে করা হচ্ছে না, হচ্ছে এ বাড়ির কোনো ছেলেকে। যেন ইচ্ছে হলেই কী করবে সে ভেবে বলতে পারে।

প্রায় কেঁদে ফেলে ছবি বলে, এলাম কী সাধে? এই যুদ্ধই যে সব শেষ করে দিল আমার। এখন বিন্তি পিসির মতো আমারও একটা বিয়ে দিয়ে দাও তোমরা, আর কী হবে!

ছবি! অধীর তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কাঁদছিস তুই? কাঁদবি কেন? মনে জোর নেই?

মনের জোর দিয়ে আমি কী করব বল? লতু পিসি নয়তো বিন্তি পিসি ছাড়া আমার ভাগ্য কি অন্যরকম হবে তাতে?

মেনে নিবি কেন তুই? জানিস ছবি, আগে আমারও কেমন মনে হত এই বোধ হয় ওদের ভাগ্য। ওই সুকুমারী, লতু, বিন্তিদের দেখতাম আর কী অবজ্ঞার ভাবই না ছিল মনে। আসলে আমাদের সমাজের মেয়েরা সবাই এক একটা অত্যাচার বইবার যন্ত্র— এই কথাটা বোঝা চাই, বোঝানো চাই। তা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা চাই। ওদের অবজ্ঞা করলে মাথা হেঁট হবে তোমারই, ওদের ফেলে গেলেও তোমার এগুনো হবে না।

ছবি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মুখের দিকে।

অধীর বলে, বুঝলিনে? জাপানি যুদ্ধের ভয়ে তো পালিয়ে এলি, কিন্তু কোথায় সেটা ভেবে দেখেছিস? এরি মাঝে পথ চিনে দিতে হবে পাড়ি। ভয় পেলেও চলবে না, চোখের জল ফেললেও কিছু হবে না। বুঝতে পারছিস?

ছবি বলে, সবটা নয় কাকা, কিছুটা।

কিছুটা বুঝেছিস তো— আচ্ছা তাতেই হবে। আস্তে আস্তে বোঝাই ভালো। এখন অন্য কথা বলি। শহরে তো ছিলি— গান গাইতে পারিস?

লজ্জায় মাথা নামিয়ে বসে থাকে ছবি। গান সে একটু একটু জানে, কিন্তু কাউকে শোনানো যায় নাকি তা আবার?

কিন্তু অধীর ছাড়ে না। তার কোটরে বসা চোখদুটো জ্বলজ্বল করে, বলে, যদি জানিস তবে একটা গান শোনা ছবি। কী যে ভালো লাগে আমার গান। লোক ভাবে হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর ছেলে আমরা। আমাদের বুঝি সুখ-দুঃখের অনুভূতি নেই। যদি দেশটা অন্যরকম হত তবে দেখতাম জীবনটাকে কেমন করে সুন্দর করতে হয়— কেমন করে বাঁচতে হয়। গা ছবি।

সেই উৎসুক আকুল জ্বলজ্বলে চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে ছবি না গেয়ে পারে না। সে খুব আস্তে আস্তে গায়, মনের গহনে তোমার মুরতিখানি ভেঙে ভেঙে

যায়, মুছে যায় বারে বারে। বাহির বিশ্বে তাই তো তোমারে টানি... ওগো সুন্দর।

গান শেষ হলে অধীর চোখ খোলে, আরও জানিস? আমাকে মাঝে মাঝে শুনিয়ে যাবি ছবি? জানিস, আমার যদি টাকা থাকত আমি একটা গ্রামোফোন রাখতাম— যদি টাকা থাকত তাহলে গান শুনবার জন্যেই বেঁচে উঠতাম।

ছবি বলে, আমি কিছু পারিনে কাকা। একটা ছেলে ছিল— সাধন তার নাম— সে জানত। খুব ভালো গাইতে পারত। ওটা ওর গাওয়া গান— আসবার আগে কেন যে আর গাইল না, কত বলতাম।

ছবির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অধীর বলে, ও কি তোকে ভালোবাসত ছবি?

এই প্রথম কথাটা এমন করে শুনতে পেয়েছে ছবি— তার মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে ওঠে, সে সজোরে মাথা নেড়ে বলে, যাঃ, তুমি যেন কী কাকা!

অধীর হো হো করে হেসে উঠে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে দু-হাতে ছবির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়, লজ্জা পেয়েছিস? লজ্জা কীসের? হয়তো তুই তা জানিসনে— যেমন মায়া ভাবে আমি বুঝি কিছুই বুঝিনে। কিন্তু তুই যে বড়ো ছোটো ছবি। একটু তাড়াতাড়ি বুঝে নে। মরবার আগে অন্তত একটা মেয়েকেও দেখে যেতে পারি, যে ভয় পায় না, মুখ থুবড়ে পড়ে না যন্ত্রণায়। —কী এক আবেগ চাপতে চাইছে অধীর কিন্তু পারা যাচ্ছে না। সেদিনকার দেখা ছোট্ট ছবির সামনেও থেকে থেকে নানাভাবে তা বেরিয়ে পড়ছে— ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়।

বাইরে একটু আগে কার পায়ের শব্দ পাওযা গিয়েছিল কিন্তু সে-শব্দ ঘরে ঢোকেনি। দরজার বাইরে তা থমকে থেমে আছে। অধীর ডাকে, এসো মায়া, আমি ছবির সঙ্গে কথা বলছি।

রোদের ঝাঁঝে লাল হয়ে যাওয়া মুখ, থান-পরা মায়াদি। আরও রোগা হয়ে গেছে, আরও করুণ। ছবি খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে পুরোনো সেই দিনগুলোকে ভাববার চেষ্টা করে। সেই যে কান্না চাপতে চাপতে বিত্তি পিসিকে না দেখেই অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিল মায়াদি তারপরে এই তাদের প্রথম দেখা। তখন মায়াদি কুমারী ছিল, আজ দেখেই বোঝা যায় সে বিধবা হয়েছে কিন্তু অধীরকার ঘরে এসেছে, কেন? তাও চোরের মতো চুপি চুপি— ঠিক দুপুরবেলায়। কেন এসেছে মায়াদি?

মায়া বলে, তুই এসেছিস আমি জানি ছবু। কত বড়ো হয়ে গেছিস রে?

অধীর হাসে, কতগুলো বছর গেল সে খেয়াল আছে? তুমি এর মধ্যে স্বামীর ঘরে গেলে, স্বামীকে খেয়ে আবার ফিরেও এলে আমাকে জ্বালাতে, আর ছবুর বড়ো হওয়া আশ্চর্য? ও কেবল বড়োই হয়নি— শহরে থেকে লেখাপড়াও শিখেছে খানিকটা। তোমাদের মতো মুখ্যু নাকি?

মায়া হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, বেশ। মুখ্যু কি আমি ইচ্ছে করে? চিরকাল

তো পরের গলগ্রহ হয়ে রইলাম— কত তো দেশোদ্ধার করা ছেলেরা ছিল, আমাকে উদ্ধার করে বিদুষী করে নিলেই পারত।

তার কান্না দেখে অধীর হাসে, রেগো না মায়া, কিন্তু একটা সত্যি কথা বল— একজন তো বাপু তোমাকে গলগ্রহ ভাবেনি, গলার মালা করেই নিয়ে গিয়েছিল। তাকে কী করে খতম করলে? সত্যি কথা বল তো, খাবারে বিষ-টিস মেশাওনি তো?

মায়া শক্ত হয়ে মেঝেতে বসে আঙুল দিয়ে আঁচড় কাটে। কথা বলে না, কিন্তু বোঝা যায় রেগে গেছে। তবু অধীর ছাড়ে না, বিধবা যুবতী মেয়ে, ঠিক দুপুরে একটা ছেলের ঘরে পালিয়ে আসে কেন শুনি। ছবি দেখে রাখ, মামির কাছে হরদম মার খাচ্ছে অতবড় মেয়ে, লোকজন যা-তা বলে, তবু আমার কাছে আসা বন্ধ হবে না ওর। তাও এমন ছেলে— যাব সাধ্য নেই এতটুকু। যে আজ বাদে কাল মরবে!

দীর্ঘনিঃশ্বাসটা কখন আপনা থেকেই বেরিয়ে গেছে অধীর তা টের পায়নি, কিন্তু আর একটা কথাও বলে না সে। ছবিরও বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে ওঠে কান্নায়। কাকার হাসি-ভরা চোখের পেছনে কোথায় যেন কান্নার পাহাড় লুকোনো আছে, কিন্তু তাকে দেখতে দেবে না অধীর, তার সামনে কাউকে সে কাঁদতেও দেবে না।

তবু মায়া কাঁদে। চৌকির ওপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে ভারি গলায় বলে, সবসময় এক কথা আমার ভালো লাগে না। পায়ে পড়ছি আপনার, আমি না হয় চলে যাচ্ছি।

কিন্তু মায়া উঠবার আগে ছবি ওঠে। তার এখানে থাকতে লজ্জা করছে, হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেমন করছে। যন্ত্রণা-ভরা এই দৃশ্যটা থেকে সে সরে থাকতে চায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেও কিন্তু একেবারে চলে যেতে পারে না। চোরের মতো চুপি চুপি সে ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকে। অধীরকা হাত ধরে মায়াদিকে কাছে বসিয়ে দু-হাতে তার মুখ তুলে ধরেছে উঁচু করে। ছবির বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ওঠে। কাকা বলছে, অত কাঁদ কেন মায়া?

তোমার কথা ভেবেই— তুমি জান না আমাকে? দশ বছর ধরেও চিনলে না?

তোমার যে ক্ষতি হবে মায়া।

কাকার বুকের মধ্যে মুখ রেখে কি যেন বলছে মায়াদি— কী? ছবি তা শুনতে পায় না, কিন্তু পরমুহূর্তেই শক্-খাওয়া মানুষের মতো সে চমকে ওঠে। ও কী! মায়াদির মাথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে তার জলে ভেজা চোখে, ঠোঁটে কাকা তার রক্তহীন, ফ্যাকাশে ঠোঁট চেপে ধরছে বারবার। মায়াদি কাঁপছে থরথর করে। এখান থেকে ছবি তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু পালিয়ে আসছে না কেন মায়াদি তবু। কেউ যদি দেখে ফেলে ওদের। যদি কেউ...। মুখে আঁচল দিয়ে ছবিই ছুটে পালায় সেখান থেকে— সেই মুহূর্তে। নতুন এক অনুভূতিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার সমস্ত শরীর। এখানে আর থাকলে চিৎকার করে উঠতে হবে তাকে।



তেইশ

অন্ধকার কেবল সারা বাড়িটা জুড়েই নয়— সারা গ্রাম জুড়ে। অন্ধকার ছবিরও মনে।

ছাদের কার্নিশে ভর দিয়ে সে একদৃষ্টে ওপরের তারা-ভরা আকাশের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি ফেরায়। মস্ত বড়ো জীর্ণ কঙ্কালের মতো বিরাট ভাঙাচোরা বাড়িখানা তাদের। তার প্রতিটি জীর্ণ রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্ধকারের বাসা। তার ভাঙা ছাদে বসে দুটো ভূতুম পেঁচা ঝগড়া করছে— তুই থুলি, মুই থুলি। ছাদের ওপাশের নারকেল গাছটার পাতায় বাতাসে ঝরঝর শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে।

এত অন্ধকারের সঙ্গে পরিচয় অনেকদিন পরে এই প্রথম। হয়তো এত ভাবনার সঙ্গেও। শহরটা তার মনে ছাপ ফেলেছে— সেখানে আলোর সমারোহে সে ভুলে গিয়েছিল অন্ধকারের কথা। সেখানেও অবাক হয়েছে মিনুকে দেখে, পরিবানু তাকে নাড়া দিয়েছে, নিলু তাকে স্তম্ভিত করেছে, সাধন তাকে কী বলতে চেয়েছিল না বুঝেই সে এসেছে। পিসিমার অজ্ঞতা আর কুসংস্কার ছবির মনে রেখাপাতও করেনি। কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড মুক্তির স্বাদ ছিল— কেমন একটা আনন্দ ছিল অন্য জগতের। যেখানে সমস্যার রূপ ছিল আলাদা।

এখানে!

মাকে সে চিনেও চিনতে পারছে না, কিছু বোঝাতে পর্যন্ত পারছে না। এখানে নতুন কিছু বলতে যাওয়া বৃথা। কেউ তার কথা শুনবে না। কেউ বুঝবে না, ছবি ওদের ভাবনার মধ্যে ধরা দেবে না। ছবি তা পারে না। এখানে সে-কথা বলা নিষেধ, ভাবা নিষেধ। সেফু তার প্রমাণ।

তার চেয়ে মাত্র একবছরের ছোটো সেফু এখনই যেন কেমন হয়ে গেছে।

সারা চোখেমুখে এরই মধ্যে কেমন বিষাদ আর ক্লান্তি নেমে এসেছে।

ছবি বলেছিল, পড়িস নে সেফু?

পড়ব বড়দি? এ-বাড়িতে ও-কথা তোলা বারণ। শুনতে পেলে ঠাক্মা কী বলে দেখো না। তোমার জন্যে জেঠিমাকে কি কম কথা শুনতে হয়েছে?—বলে সেফু আবার নিজের কাজে লাগে। বিরক্ত-মুখে ভাই-বোনগুলোকে মারে, বকে, খাওয়ায়। ঠাকুমার ফরমাশ খাটে, ছোটো ভাই-বোনগুলোর জামাকাপড় কাঁথা পরিষ্কার করে আর কাকিমার সঙ্গে থেকে থেকে ঝগড়া করে বলে, পারব না—কিছু করতে পারব না।

শুনে ঠাকুমা বলে, বড়ো তেজ মেয়ের। ঘর-সংসারের কাজ করবি না তো কী করবি শুনি?

সেফু তার উত্তর দিতে পারে না কিন্তু ছবির বুকের ভেতরটা জ্বলে জ্বলে যায়। তার অবশ্য সেফুর মতো ছোটো ভাই-বোন নেই কিন্তু আরও তো কত কাজ আছে সংসারের—তাকে যে-কোনও মুহূর্তে সেইসব কাজে বসিয়ে দেবে হয়তো। বিন্তি পিসির মতো লণ্ঠন মুছে, পান সেজে, কাকিমার মতো ভয়ে ভয়ে থেকে, মা'র মতো রান্নাঘরের হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে একদিন চোখ মুছতে মুছতে সে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে।

সে তো যাবে না। কিন্তু কী করবে সে? সেদিন অধীরকার ঘর থেকে লজ্জায় পালিয়ে আসার পরে আবার কাকার কাছে যেতে হয়েছে তাকে। কাকাই ইচ্ছে করে তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে মায়াদির কথা। ছবি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেনি মায়দিকে। তার চোদ্দ বছরের কিশোরী মন হাতের মুঠো শক্ত করে শুনেছে কথাগুলো— ভালোবাসাই আসল। সেখানে জাত নেই, ধর্ম নেই, কুমারী-বিধবার প্রশ্ন নেই। আন্তরিক ভালোবাসা একজন ছাড়া দুজনকে দেওয়া যায় না। মায়া যে অধীরকে ভালোবাসে তাতে বাধা তার বৈধব্য— তার কোনো মূল্য নেই। এমন কথা অধীরদের বিশ্বাস তাদের শেখায়নি। অধীর ছবির মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে, ছবি তুই অন্তত বুঝতে শেখ জিনিসগুলো। তোর কাছে আশা আছে আমার— সে-কথা শুনতে শুনতে ছবির হাতের মুঠো ক্রমে শিথিল হয়ে গেছে। ক্রমে সে নিজের ইচ্ছেটাও খুলে বলেছে কাকার কাছে, সে এ বাড়ির কোনো মেয়ের মতো হয়ে থাকতে চায় না।

অধীর তাকে আশ্বাস দেয়নি, সান্ত্বনাও দেয়নি— খানিক চুপ করে থেকে বলেছে, তোর ছোটোবেলার বন্ধুদের খোঁজ-খবর নিয়েছিস ছবি? যা আগে ওদের দেখে আয়, ভালো করে দেখে নে আগে। তারপর আবার আসিস্। মন খারাপ করলে চলবে না। শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে।

ছবি তাই তার ছোটোবেলার বন্ধুদের খোঁজ করতে গিয়েছিল। বাসন্তী ওদের বাড়ির চাকরের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল বছর দুই আগে, এখন সে শহরে থাকে।

তার নাম বাড়িতে কেউ করে না। উমার বিয়ে হয়ে গেছে, ছবি পিসিমার সঙ্গে যাবার বছর দুই পরে—ষোল বছরের উমা এখন তিনটে ছেলে-মেয়ের মা। সে ছবিকে দেখে চিনতে প্যারেনি—ছবিও পারেনি কঙ্কালসার রক্তশূন্য চেহারার যুবতী মেয়েটাকে চিনতে। চিনতে পারার পরে ছবি ভেবেছিল উমা হয়তো কাঁদবে তার কাছে, নিজের কথা বলে। সে তার ধার কাছ দিয়েও যায় না—বরং ছবির কবে বিয়ে হবে এইটাই তাকে ভাবিয়ে তোলে।

শুধু দুর্গা ছবির হাত ধরে কেঁদেছে। পাঠশালার সবচেয়ে সরল আর সুন্দর মেয়েটা। ওর বিয়েটা ভালোই হয়েছিল—স্বামী চাকরি করতো বিদেশে। অনেক স্বপ্ন দেখেছিল দুর্গা, স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যাবার—ঘর বাঁধবার। কিন্তু তারপরই তার সব শেষ হয়ে গেছে।

জানিস ছবি, মরে যাবার একমিনিট আগে ঘরে কেউ ছিল না—ও আমার হাত ধরে কী বলে গেছে? তুমি আবার বিয়ে কোরো দুর্গা—কথাটা বলতে বলতে দুর্গা হাঁফায়, শেষ করে চোখের জল মোছে আর শিউরে ওঠে।

খুব ভালো লোক তো, ছবি বলে।

ভালো, হ্যাঁ খুব ভালো ছিল। কিন্তু তা কি হয়? বল্ ছবি—তা কি হয়?

কী হয় না?

ওই যে বলে গেল? কিন্তু আমারই বা কী হবে বল ছবি? এ বাড়িতে আমাকে ওরা একাদশী করায়, ঠাকুর পুজো না করে জল খাইনে। মা'র যখন কষ্ট হয় কাঁদে আর রাগ হলে বলে, মর্ মর্। আমার ঠাকুমা এখনও সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে মাছ খায়, আমি হবিষ্যি করি। এরকম করে আমি কদিন বাঁচব বল? বিয়ে তো আমার মাত্র দশমাস হয়েছিল—স্বামীর সঙ্গে থেকেছি দশদিন। আমার সব ফুরিয়ে গেল কেন?

ছবি বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থেকেছে। সবচেয়ে সরল মেয়ে দুর্গা কিন্তু সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন তার। তাও আবার নিজের ভাবনায় হাবুডুবু খাওয়া ছবির কাছে।

দুর্গা বলে, এরকম করে আমি কখনও থাকব না, ছবি দেখিস। আমি কিছু একটা করতে চাই কিন্তু বিদ্যে নেই— বুদ্ধি নেই আমার। ছবি, তুই তো অনেক লেখা-পড়া শিখবি, বড়ো হবি, তুই আমাকে একটা পথ করে দিতে পারবিনে?

ছবি ম্লান হেসে বলে, আমি অনেক বড়ো হব কে বলেছে তোকে?

স্থির বিশ্বাসে মাথা নেড়ে দুর্গা বলে, আমি জানি।

দুর্গার ছটফটানিটা যেন এতদিন মধ্যরাত্রির কান্নায় চাপা ছিল—ছবির কাছে সেটা জ্বালা হয়ে ঝরে পড়ে কখনও— কখনও জল হয়ে। ছবির এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। সেও কাঁদে।

এখনও তার চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে কার্নিশের ওপর মিশে যাচ্ছে। দুর্গার মতো থান পরিয়ে কেউ তাকে একাদশী করাচ্ছে না এ বাড়িতে, কিন্তু

নিঃশব্দ একটা নিষেধের দেওয়াল তুলে তার সব ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর কে যেন ব্যবধান সৃষ্ট করে দিয়েছে। সে দেওয়ালটা ধরে নাড়া দেওয়া হয়নি এখনও— অভিমান করে চুপ করে আছে বলে।

তার বইগুলো সেই যে বাক্সে বন্ধ পড়ে আছে, আজ পর্যন্তও তা বার করা হয়নি। কেউ সে-কথা একবার বলেও না। বলে না যে ছবি পড়তে বোস। ছবিরও সামনের বছর পরীক্ষা দিতে হবে— তৈরি হতে হবে।

ঠাকুমা পল্টুকে তাড়া দেন, দাদু বলেন, পড়তে বসগে যা, ইয়ারকি মেরে বেড়ানো হচ্ছে।

সেফু পড়ে না। পড়া তার কাজ নয়— বাড়ির কাজ করা তার কাজ। তাকেও সেফুর দলে ফেলছে সবাই, পড়াটা তারও কাজ নয়।

সবচেয়ে অভিমান হয় তার মা'র ওপর। পড়শোনার কথা বললে মা এমন করুণ চোখে তাকায়, এমন ভীতু হয়ে পড়ে যে সে ভয়টা সঞ্চারিত হয় ছবির মধ্যেও।

নীচে রোয়াকে সেফু সুর করে ছোটো বোনটাকে ঘুম পাড়াচ্ছে। ঠাকুমা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে নাছোড়বান্দা দুই নাতিকে রূপকথা শোনাচ্ছেন।

সন্ধেবেলা মা'র পেছন পেছন সে রান্নাঘরে ঢুকতে গেলে মা বলেছিল, বড়ো গরম ওখানে। তার চেয়ে ঠাকুমার কাছে গিয়ে বোস্ গে।

কাকিমাও সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, রান্নাঘর তো সারা জীবনের। যে কদিন পারো বাইরে বাইরে থাকো!

এর বেশি কী কিছু বলা যেত না। আবার কান্না পাবার আগেই হঠাৎ কানে আসে বড়োকাকার গলা। নীচের ঘরে বসে বড়োকাকা তাঁর দুই ছেলেকে পড়াচ্ছেন। পল্টুকে বোধহয় 'যোয়ান অব আর্ক' পড়াচ্ছেন। মানে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ওই গল্পটা খানিকটা পড়িয়ে সুধাদি চলে গিয়েছিল আর আসেনি। দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়া কিশোরী যোয়ানের গল্প।

ছাদ থেকে ছবি ঘরে এসে ঢোকে। কমানো লণ্ঠনটা বাড়িয়ে বাক্স খুলে বইগুলো বার করে, আঁচল দিয়ে মুছে মুছে সেগুলো মেঝেতে গুছিয়ে রাখে। তারপর কান পেতে শোনে নীচে থেকে ভেসে আসা বড়োকাকার উচ্চকণ্ঠ— She startled France and England too; she struck dismay to the nearts of kings and lifted up the hearts of common people, she led armies into battle and gained great victories; she raised her country up from misery and gave it hope and confidence and as a reward they took this matchless girl and put her in the fire, and sat round her while she burned–, শুনতে শুনতে চোখ ভরে জল আসে। সেও বার করে জায়গাটা। মাথা নিচু করে লণ্ঠনের আলোয় বিড়বিড় করে পড়তে থাকে—

Nothing could keep Joan back– she saw her path and fol-

lowed it. Her father would rather down her in the Mense, he said, than see her riding with soldiers, and when she went to the captain of the town... the captain told her friend to box her ears and send her home–

পড়তে পড়তে তার বুকের মধ্যে শিরশির করে হাতের মুঠো শক্ত হয়ে আসে অদ্ভুত এক আনন্দ মাখা বিশ্বাসে। তার সব ভাবনা-যন্ত্রণা যেন কমে যেতে থাকে এক অনির্বচনীয় আনন্দে। শুধু পড়তে চাওয়া নয়— শুধু মাথা কোটা নয়, নিষ্ফল হতাশাও নয়, আরও একটা বিরাট আনন্দ যেন কোথায় লুকিয়ে আছে। মরে যাওয়ার ভয়টা সেখানে কিছু নয়।

সেই আনন্দ কি অধীরকারও? শুধু কী মায়াদি, তাকে অত ভালোবাসে বলেই অত কষ্টের মধ্যে শান্ত হাসি হাসতে পারে কাকা? নাকি আরও একটা কিছু আছে যেখানে পৌঁছোলে মৃত্যুও মানুষের আনন্দ হয়ে যায়? কী সেটা! কী?

...She must have thought of her home at Domremy and the great days at Orleans and Troye and Rheims. She must have thought with tears of the common people who wept with joy to welcome her...

The fire was lit. Joan looked out through her tears for the last time on a world she had filled for ever with glory and pride, and the heart that failed at the thought of all this, was lifted again by powers beyond this world.

ছবি!

চমকে বই বন্ধ করে পেছন ফিরে দেখে মমতা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন! তার নাম ধরে ডেকেছিলেন কিন্তু যে কথা বলতে এসেছিলেন তা যেন ভুলে গেছেন হঠাৎ।

খানিক চুপ করে থেকে বলেন, নীচে তোমার বাবা এসেছেন, দেখা করে এসো।

খুশি মুখেই উঠে দাঁড়ায় ছবি, বাবা এসেছেন? কই আমাকে তো ডাকেননি?

ম্লান গলায় মমতা বলেন, ব্যাবসা ছাড়া আর কী চিন্তাই বা আছে আজকাল? ...বই-পত্তর তুলে রেখে যাও মা, কে কোথায় দেখবে আবার!

ছবি বলে, তুমি একটু তুলে রাখো মা, আমি আগে বাবাকে প্রণাম করে আসি।

মমতা পাতা উলটে ইংরিজি বইখানা দেখেন, অন্য বইগুলোকেও নেড়েচেড়ে দেখে সেগুলোকে আবার বাক্সটায় তুলে রাখেন একখানা একখানা করে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়ে হঠাৎ।

কতদিন যে ছবি দেখেনি তার বাবাকে! শান্ত মুখের স্নিগ্ধ হাসি হেসে বাবা তাকে আড়াল করে রাখতেন মমতার উদ্যত প্রহার থেকে, গালাগালি থেকে। ঠাকুমার ঝাঁঝ মেশানো কথায় মা রেগে যেতেন কিন্তু বাবা হাসতেন।

বাড়িতে থাকলে, দুপুরবেলায় শুতে গিয়ে ডাকতেন, ছবু মা কোথায়?

জানা ছিল ছবির। মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার, পাকাচুল বাছবার ডাক এটা। ছবি বসত পাশে কিন্তু তখনই উঠে পালিয়ে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করত অন্য প্রলোভনে। কুঠিবাড়ির কাছের একসার নারকেল গাছের তলায় বসে কাঁচা আম খাওয়ার ডাক থাকত, মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানোর লোভ থাকত। তাকে জয় করা কঠিন। বাবাকে চোখ বুজে থাকতে দেখে ঘুমিয়েছেন মনে করে নিঃশব্দে উঠতে গিয়ে হঠাৎ দেখত তার দিকে তাকিয়ে বাবা মৃদু হাসছেন। ওমনি অপ্রতিভ হয়ে বসে পড়ত সে।

বাবা হাসতে হাসতে বলতেন, পালাবার মতলব তো? আচ্ছা যাও আজকের মতো, কিন্তু বেশি রোদে ঘুরো না।

তখন খুব খারাপ ছিল সংসারের অবস্থা— ক্রমশই খারাপ হচ্ছিল। বাবাকে খুব খাটতে হত। একদিন রাগতে দেখা গিয়েছিল বাবাকে, দাদুর মুখের ওপর বলেছিলেন, শেষ চেষ্টা করে তো দেখলেন জমিদারি দিয়ে। লাভের মধ্যে কেবল মামলা-মোকদ্দমাই সার হল। এবার আমি চেষ্টা করি। গঞ্জে দোকান দিই একটা। নইলে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে গুষ্টিশুদ্ধ।

দক্ষিণারঞ্জন বলেছিলেন থমকে দাঁড়িয়ে, কী বললে? চৌধুরী বংশের ছেলে দোকান করবে? কী বললে তুমি?

তারপরের খবর ছবির জানা ছিল না। দোকান কিন্তু হয়েছিল। টাকা ছিল না। পূর্ণশশী তাই যত্নে তুলে-রাখা শাশুড়ির অনন্তজোড়া বার করে দিয়েছিলেন, দেখাদেখি মমতা দিলেন তাঁর গয়না, সরস্বতীও।

দোকান আরম্ভ হবার দিন কী একটা পুজোও হয়েছিল বাড়িতে। পুজোর শেষে ঠাকুর ঘরে মাথা ঠুকে ঠুকে পূর্ণশশী বলেছিলেন, মুখ রেখো ঠাকুর।

দেখাদেখি মাও গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করেছিলেন, কাকিমাও।

মমতা বলেছিলেন, সর্বস্ব গেল তো, এখন কী হবে কে জানে?

রায় কত্তা নাকি হেসেছিলেন ব্যাবসা করার কথা শুনে— ব্যঙ্গের হাসি। তার ছেলে অনিলও। আর দক্ষিণারঞ্জন সেই যে রাগে কথা বন্ধ করেছিলেন, অনেকদিন পর্যন্ত কথা বলেননি বড় ছেলের সঙ্গে, বৈঠকখানায় যাননি রায়দাদুর হাসির ভয়ে।

তারপর আবার কেমন করে সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল কে জানে। জমিদারি থেকে ব্যবসায়ে নেমে গিয়েছিল দক্ষিণারঞ্জনের এই বংশটা।

পূর্ণশশীর ঘরের মেঝেয় বসে কুলদারঞ্জন হাত-পা নেড়ে উত্তেজিত মুখে কি যেন বোঝাচ্ছেন। দক্ষিণারঞ্জন আর সুখদা পাশে বসে শুনছেন। একটু দূরে দরজার কাছে পূর্ণশশী বসে আছেন গালে হাত দিয়ে।

গায়ের জামা খুলে পাশে রেখেছেন বাবা। রোগা হয়ে গেছেন আগের চেয়ে অনেক। আগের মতো মাথা থেকে পাকা চুল আর বেছে বেছে তুলতে হবে না, চুলের রং ধূসর হয়ে এসেছে। এত বুড়ো হয়ে গেছেন বাবা। এত তাড়াতাড়ি এত বুড়ো!

কথা বলতে বলতেই কুলদা একবার চোখ তুলে তাকান। প্রণাম করা ছবির মাথার ওপর নিজের হাতখানা একবার ছুঁইয়ে এক মুহূর্তের জন্যে থামেন। সেই একটা মুহূর্তকেই কেবল স্পর্শ করে নেয় ছবি। তারপরেই বাবা ডুবে যান অন্য কথায়। আর সেই মুখখানার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হয়— কেন তা সে নিজেও বোঝে না— টাকা হয়েছে, ভালো হয়েছে সংসারের অবস্থা কিন্তু শান্তি নেই, আনন্দ নেই! কেন কে বলবে!

তাই বলছিলাম— আগের কথার জের টেনে কুলদা বলে চলেন, এখন থেকেই স্টক করতে পারি যদি তাহলে দ্বিগুণ লাভ তো হবেই। বার্মা থেকে আসা তো কবেই বন্ধ হয়েছে, গভর্নমেন্ট তো এরই মধ্যে স্টক করছে। ব্যবসায়ীদের সবায়েরই এক কথা, অন্তত তিন-চার গুণ নাকি হয়ে যাবে দাম। চাষি-গেরস্থের কাছে যে লোকে কিনবে—পাবে কোথায়? গভর্নমেন্ট আইন করে আদায় করে নিচ্ছে দেখে লোকে আগে ভাগেই বেশি দামের লোভে দিচ্ছে বেচে, —কথা শেষ করে কুলদা তাকান সুখদার দিকে, তারপর দক্ষিণারঞ্জনের দিকে; তখনও বলে চলেছেন, শুধু কী তাই? লোহার জিনিস, বিলিতি জিনিস-পত্তর, ওষুধ-বিসুধ তো বাজারে নেই-ই। তারপর আছে কাপড়,—আমি সবদিক সামলাই কী করে। একটু ভালোমতো সাহায্য দরকার। আমি বলি কী সুখো-ও আসুক আমার সঙ্গে। এতদিন তো ডাকিনি, মাস্টারি করছে করুক। কিন্তু সত্যিই যদি করতে হয়তো এই বেলা। ও তিরিশ টাকার মাস্টারি গেলেও কিছু এসে যাবে না। আরে, রায়বাড়ির অনিল পর্যন্ত গঞ্জে গুদাম করেছে জান, সময়মতো নেমে পড়বার ভরসায়। অথচ হেসেছিল ওরাই বেশি, ব্যাবসাই তো এখন ভরসা—সময়মতো করেছিলাম বলে এ বাজারে দুবেলা দুমুঠো জুটছে যা হোক। কথা শেষ করে বাবা তাকান দাদুর দিকে, দাদু মাথা নিচু করে আছেন। বোঝা যায়, বাবার শেষের কথাগুলোকে আজ আর তিনি অস্বীকার করতে পারছেন না। বাধা দিয়েছিলেন বলেই হয়তো লজ্জা পাচ্ছেন আজ বেশি করে।

কিন্তু বড়োকাকা মাথা নিচু করেননি। মুখটা কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে লণ্ঠনের অত কম আলোতেও। মা, বাবা আর ভাই-এর জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি পড়েছে সুখদারঞ্জনের মুখের ওপর, তিনি যেন লজ্জার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন, বলবার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। নখ দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটেন খানিক তারপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলেন থেমে থেমে, আমি

পারব না দাদা। ব্যাবসা জিনিসটা বড়ো খারাপ— টাকার লোভে নেশা ধরে যায়, তখন আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, আর তা ছাড়া ব্ল্যাক মার্কেট, —কথা শেষ করে তখনি উঠে চলে গেলেন—সবাইকে অবাক করে দিয়ে।

দক্ষিণারঞ্জন বিপন্নমুখে তাকিয়ে আছেন অন্যদিকে। কুলদার মুখ থমথমে হয়ে উঠেছে, হু, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না! সে জ্ঞান থাকলে এ বাজারে আর গুষ্টিশুদ্ধুর মুখে যে ভাত উঠত না। ব্যাবসা করতে পারবে না— খারাপ জিনিস। কিন্তু এত বড়ো সংসার চলে কী করে সেটা ভেবেছো? তোমার ছেলের পড়া আছে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে দুদিন পরে। মাস্টারির আয়ে তো এ সংসারের তেলের খরচটাও ওঠে না।

বড়োকাকা বোধহয় একেবারে চলে যাননি, বোধহয় পূর্ণশশী তাকে দেখতে পাচ্ছিলেন তখনও দরজার বাইরে। তাড়াতাড়ি উঠে এসে এবার তিনি বড়োছেলের পিঠে হাত রেখে ভাঙা কাঁপা গলায় বলেন, ও কী কথা রে কুলদা? অমন করে বলছিস—ও যদি বউ ছেলে-মেয়ের হাত ধরে চলে যায় বাড়ি ছেড়ে? একটু ভেবে কথা বলিস! তুই না হয় রোজগার বেশি করিস কিন্তু ও— ও তো ছেলে-মেয়ের বাপ হয়েছে—মানসম্মান আছে।

কুলদা অস্থির গলায় বলেন, যায় যাবে। তোমার কাছ থেকে শুনে তবে কথা বলব নাকি? ঠ্যালা সামলাতে হলে বুঝতে মা।

বিরক্তমুখে দক্ষিণারঞ্জনও বলেন পূর্ণশশীকে. সব তাতেই তোমার কথা বলা চাই। মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষের মতো থাকলেই হয়। তা পারবে কেন—!

পূর্ণশশীর কুঞ্চিত মুখে এক যন্ত্রণার আলোড়ন খেলে যায় হঠাৎ, ক্ষুব্ধ কান্না ভরা গলায় চেঁচাতে থাকেন, কী বললে! বলছো কী তোমরা বাপ-ছেলেতে? সবাই আমার কাছে সমান। দশটা ছেলে-মেয়ের মধ্যে চারটেতে এসে ঠেকেছে, কারুর কষ্ট আমি সইতে পারিনে। কুলদার কষ্ট আমি বুঝি কিন্তু ওর মনে আজকাল ওসব কী ঢুকেছে—এ্যাঁ?

দক্ষিণারঞ্জন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগেও বিড়বিড় করে বলে যান, জ্বালা না বাড়ালেই হয়। এসব গুরুতর ব্যাপারে তোমারই বা কথা বলা কেন।

এবার পূর্ণশশী একেবারে হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠেন, তা ঠিক, তা তো বলবেই। আমি যে এ বাড়ির দাসী-বাঁদী ছাড়া কিছু না। ন' বছরে এ সংসারে ঢুকেছিলাম, আজ চৌষট্টি বছরেও আমাব কথা বলার সময় হল না।

টস্ টস্ করে ঠাকুরমার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে গাল বেয়ে। কান্নায় বেঁকে যাওয়া কুঞ্চিত মুখ, কাঁদলে আরও বেশি খাঁজ পড়ে যায় সে মুখে।

কান্না-চেঁচামেচি শুনে মা এসেছিলেন, হাত ধরে সরিয়ে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন। কাকিমাও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে অপরাধীর মতো।

পূর্ণশশী এবার চোখভরা জল নিয়ে হঠাৎ সরস্বতীর দিকে তাকিয়েছেন তীব্র গলায় বলে ওঠেন, তোর জন্যেই তো যত কিছু। বাপ-মা-খাগি, বছর-বিয়োনি বউ। বলবেই তো কুলদা। তার কী? দুটো মাত্তর ছেলেমেয়ে তার, সে এত খাটবেই বা কেন এক গুষ্টির জন্যে। ...অমন পেটে আগুন জ্বালিয়ে দিই...।

কাকিমা সে-কথা শুনে থরথর করে কেঁপে উঠে কেঁদে ফেলে, প্রায় ছুটে পালিয়ে যান সেখান থেকে।

মমতা লজ্জিত মুখে বলতে থাকেন, ছি ছি মা, ছি ছি! অমন করে বলে? ছেলেমেয়েদের মা, তার পেটে আগুন জ্বালাচ্ছেন। বালাই ষাট! ওর কী দোষ? ...ছিঃ, স্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে কি সুখ-শান্তিও বিসর্জন যায় সংসারের। ...এই যুদ্ধ লাগার পর থেকে ওঁর মাথাটাও যেন কেমন... ছিঃ।

পূর্ণশশীর চোখ দিয়ে আরও জল গড়ায়। সমস্ত মুখখানাই ভাসতে থাকে চোখের জলে।

সেফু এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে, এবার, সে হঠাৎ ছুটে ঠাকুমার সামনে গিয়ে কান্নাভরা চাপা চাপা গলায় বলে, ইস্—বুড়ি কোথাকার। কেন তুমি আমার মাকে বলবে অমন করে!

মমতা গম্ভীর মুখে তাকে ধমক দেন, সেফু—তুমি কেন সব কথায়? যাও এখান থেকে।

সে গ্রাহ্যও করে না, তেমনি ফুলতে ফুলতে বলে, ইস্, কেন যাব? ও কেন আমার মাকে যা-তা বলবে! কেন?



চব্বিশ

কে যেন কথা বলছে অধীরকার সঙ্গে। অরুণকা, প্রসন্নকা, ধীরেনকাদের মধ্যে কেউ নয়—নতুন কেউ। ছবি তাই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। সে বলছে, মেদিনীপুর আমি দেখিনি অধীরদা কিন্তু কলকাতা তো দেখেছি আর যা দেখেছি তাবও কোনো তুলনা খুঁজে পাইনি। এতটুকু ছেলেগুলো বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিয়ে বলে, মারো। গুলি করো। তাদের কথা কি ভোলা যায়?

অধীরকা বলছে, তাদের নিখাদ ভালোবাসা, বীরত্বকে কোনোদিন দেশ ভুলবে না, তমাল!

সেই প্রাণ দেওয়া দেখে এসে এখন আর মন বসানো যায়, কোনোমতে প্রাণগুলোকে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টায়?

তবু করতে হয়, তমাল।

ছেলেটা এবার আবার জিজ্ঞাসু হয়ে উঠেছে, লোকে বলে গোলায় ধান থাকতেও কাড়া হবে না কেন, দোকানে কাপড় থাকতেও লোকে বিবস্ত্র হয়ে বেড়াবে কেন? কেন আমরা এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে সব লুটপাট করে নিই না—কেন আমরা ভেতর থেকে প্রচণ্ড জোর দিয়ে ওই পশুগুলোকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দেব না?

পারলে এত ভালো হত তমাল, যে আমার মতো মরমর একটা রোগীও হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ত সেই মুহূর্তে। কিন্তু পারছি কি আমরা? ঝাঁপিয়ে একদিন তো পড়তেই হবে কিন্তু তারও সময় আছে রে! এলোপাতাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে রাগের মাথায় খুঁচিয়ে দিলে সেখানে খানিকটা ক্ষত হতে পারে কিন্তু হিংস্র জন্তুটা মরে না তাতে। আসল ঘা দেবার একটা পথ আছে, তার জন্যে অনেক ভাবতে হয়, প্রস্তুত

হতে হয়—হঠাৎ হয় না।

কাজ করতে এসেছি অধীরদা—করবও। কিন্তু গ্রুয়েল কিচেন করে মানুষগুলোকে বাঁচাতে হবে? ওই সরকারের হাত থেকেই নিয়ে? গঞ্জে চাল ব্যবসায়ীদের ঘরে জমা হবে অথচ তার জন্যে কাজ হবে আইন করে বার করে আনার—লুট করার নয়?

অধীর বলে, যদি নিয়ম মানিস, দৈবে বিশ্বাস না করিস তবে এ ও সহ্য করতে হবে, তমাল। জানিসনে, কতবড় অপবাদের যন্ত্রণা সহ্য করে আমরা চলি—? তার চেয়েও কি বেশি জ্বালা আছে? শুধু কী শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অপবাদ? নিজের দেশ ছেড়ে আরও একটা দেশের দিকে তাকিয়ে থাকার অপবাদ নেই?

অধীরের ঘরের দেওয়ালে একখানা পৃথিবীর ম্যাপ টাঙানো আছে—তার জায়গায় জায়গায় লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া। সেখানকার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে যেন স্বপ্ন দেখে ওঠে, আমি গাঁয়ের মানুষ, আমার সমস্ত চিন্তাটাও এই গাঁয়ের মতো। চাষা-ভুসোর সঙ্গে আমার কথা, চিন্তাও তাদের মতো। তোদের শহরের চিন্তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হয়তো পারিনে—তেমন করে বোঝাতেও হয়তো পারিনে কিন্তু একটা কথা বুঝি তমাল। মানুষের গতি বদলে দিয়েছে সারা পৃথিবীতে ওই একটা মাত্র দেশ—তার হারা-জেতাব ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। আধমরা মানুষের চোখের মণির মতো একটা আদর্শ তার অস্তিত্বের একটা পরীক্ষা হতে চলেছে—আমরা তাকিয়ে থাকব না সেদিকে? সেই বিবাট আদর্শটা সামনে আছে বলেই তো ছোটো ছোটো কাজগুলোকেও হাসিমুখে করা যায়—ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

ছবি আর দাঁড়িয়ে·থাকতে পারে না, পায়ের তলাটা রোদে ঝলসে যাচ্ছে। এগিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়ায় সে।

তখনও ছেলেটা বলছে, বেশ, যতদিন আছি কাজ করব আমি। সে গোলা থেকে আইন করে ধান-চাল বের করাই হোক, রিলিফ কিচেন-ই হোক আর গান গেয়েই হোক। দুর্ভিক্ষটাকে যদি তাতে ঠেকানো যায়— রাজি আছি। বলে হেসে ফেলে, দিন কাজ অধীরদা।

হঠাৎ অধীরের চোখ যায় বাইরে অপেক্ষমান ছবির দিকে। চেঁচিয়ে ডাকে, ওরে, তুই বাইরে কেন রে চোরের মতো? ঘরে আয় না।

ছবি ঘরে ঢুকলে সে এবার হেসে ছেলেটার কথার উত্তর দেয়, দিন কাজ বলে হাত পাতলে কি কাজ পাওয়া যায় পাগল। তোরা শহুরে মানুষ—এখানকার কাজ সেখানকার মতো তো নয়। এখানে তোমার ওই লুটোনো কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে কাদা ভাঙতে হবে। দরকার হলে সাঁতার কেটে এ গ্রাম ও গ্রাম করতে হবে, মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে পাড়ি মারতে হবে, তাদের সঙ্গে খেতে হবে মোটা

চালের ভাত আর লঙ্কাপোড়া— তাও যদি ওদের জোটে তবেই। কী বলিস ছবি— এ্যাঁ? শহুরে বাবু এসেছেন গ্রামে কাজ করতে— ও তো পালাল বলে।

জড়ানো সংকুচিত পায়ে ঘরে ঢুকে ছবি একপাশে দাঁড়িয়েছিল, এবার সে চোখ তুলে ছেলেটাকে একবার দেখে নেয়—কালো আর লম্বা একহারা চেহারার একটা সাধারণ ছেলে, চশমার ফাঁকে দুটো সাধারণ চোখ, মাথায় কোঁকড়ানো চুলগুলো পেছনে টেনে আঁচড়ানো। ছেলেটা এতক্ষণ উত্তেজিত হয়ে গরম গলায় তর্ক করছিল কিন্তু ছবিকে দেখে সেও কী ভেবে চুপ করে থাকে। ছবি বারে বারে এ-কোণ ও-কোণ থেকে ওর শহুরে-পনাটাকে আন্দাজ করবার চেষ্টা করে, কিন্তু অদ্ভুত লাগে না কিছু। বরং সাধন ওর চেয়ে অনেক বেশি শহুরে ছিল— চলায়-ফেরায়, পোশাকে।

অধীর বলে, ওকে চিনিস, তমাল? আমাদের কুলদাদার মেয়ে ছবি। দেখিসনি আগে?

তমাল খানিক ভেবে মাথা নাড়ে—সে মনে করতে পারছে না কোথায় ছবিকে দেখেছে। হয়তো খুব ছোটোবেলায় দেখে থাকবে যখন তারা গ্রাম ছেড়ে যায় কিংবা হয়তো একেবারেই নয়। কে ছবি? একশো গণ্ডা গ্রামের মেয়ের মতোই আরও একটা নাম। সহজভাবে সে বলে, হবে। আমি চিনি না।

চেনে না বেশ, তার জন্যে কিছু না। কিন্তু অমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছাড়া কী সেটা বলা যায় না। শহর কি ছবি দেখেনি—নাকি সে শহরটার শহুরে-পনার কোনো দাম নেই? কলকাতাটাই সত্যিকার শহর?

অধীর বলছে, ওকে জানিসনে তমাল, ও একবারে খাস বোমা-পড়া শহর থেকে ফেরা মেয়ে—সামনের বছর ম্যাট্রিক দেবে। তোর চেয়ে অনেক ভালো রাজনীতির সঙ্গে ওর পরিচয় আছে, ওকে জিজ্ঞেস কর। ও তোকে আরও ভালো করে বুঝিয়ে দেবে বাঁচতে চাওয়া কাকে বলে।

যাঃ,—ছবি একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে যায়, কী যে করে কাকাটা। দেখ তো কাণ্ড! সে কী বোঝে ছাই—তাও আবার ওই ছেলেটার সামনে অমন করে বলা, যে চোখ তুলে তাকায়নি পর্যন্ত তার দিকে।

অধীর এবার হাসে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে, তমালকেও আবার তাই বলে যা-তা ভাবিসনে ছবি। কলকাতার কলেজে ও বি.এস.সি পড়ে।

সে-কথা শুনে ছবি এবার ভালো করে তাকায় তার দিকে। বি.এস.সি পড়ে। সেটা যে স্বপ্ন ছবির কাছে—তার কল্পনার স্বপ্ন, কত আর বড়ো হবে তার চেয়ে, না হয় চার বছর, না হয় পাঁচ বছর—এর মধ্যেই বি.এস.সি পড়ে!

দুবার উঠে চলে যেতে গিয়ে অধীরের বাধায় ওঠা হয়নি—কিন্তু এবার তমাল আর শোনে না। সত্যি সত্যি উঠে যায়।

ছবি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে একটা মুহূর্ত তারপর হঠাৎ চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখে অধীর তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে এবার রাগ করে। ধপ করে অধীরের পাশে বসে বলে, উঃ কী লজ্জাটাই তুমি দিতে পার কাকা? বললে, আমি নাকি কত কী বুঝি! কী বুঝি? ছাই!

অধীর বলে, বুঝবি, বুঝবি।

ছাই! চাইনে বুঝতে। আমি চেয়েছিলাম লেখাপড়া শিখতে। বাড়ির সামনে দিয়ে কলেজের ছেলে-মেয়েদের যেতে দেখে ভাবতাম আমিও তো যাব একদিন ওমনি করে। এম.এ, বি.এ পাস করব, চাকরি করব। কী হল? কিছু না।

শুধু কী তোর? মানুষের যে সবই শেষ হতে চলেছে ছবি—ঘর-সংসার, আশা-ভরসা—সেটাও বোঝ।

কিন্তু বুঝে আমার কী হবে তাই বল না? আমি তো আর পড়তে পাব না, আমি তো যা হতে চাই, হতে পারব না।

কী হতে চাস বল?

কী চাই! —ছবির খানিকটা সময় লাগে ভাবতে, সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, কাকা আমি বাসন্তী, দুর্গাদের দেখে এসেছি, অন্য মেয়েদের দেখলাম, সেফুটাকে, লতুপিসিকে দেখছি আর আমার কান্না পাচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে আমি তো ওদের কারুর মতো হতে চাইনে—কিন্তু কী যে কবব তাও তো বুঝতে পারছিনে।

সে-কথা শুনে পরম স্নেহে অধীর তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলে, কাঁদিসনে ছবি, কেঁদে তো কিছু হয় না। যন্ত্রণার ভেতর দিয়েই তো পথ করে নিতে হয়—নিজের শক্তিতে বিশ্বাস রাখতে হয়, বিশ্বাস নিতে হয়। দ্যাখ তো আমাকে, উঠতে পারিনে, হাঁটতে পারিনে কিন্তু তবু বিশ্বাসের জোরে বেঁচে আছি। জানি তার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক আর যা বিজ্ঞান তার মৃত্যু নেই।

সেই বিশ্বাসটা আমি পাব না—যা থাকলে সব কষ্ট সহ্য করা যায়।

অধীর হেসে বলে, পাবিই তো, কিন্তু তাকে অর্জন করতে হবে—চেতনা দিয়ে, চিন্তা দিয়ে। যেমন দেখ, তোর ঠাকুমা। ন-বছর বয়সে বিয়ে হয়ে এসে এখন বুড়ো হয়ে গেছে—কিন্তু কী করেছে সারাজীবন? কিছু না। ছেলে-মেয়ে মানুষ করেছে, রান্না করেছে, চোখের জল ফেলেছে। কিংবা তোর মা, কী আমার মা। জিজ্ঞেস কর—কী পেলে? বলতে পারবে না। কী আবার পায় মেয়েমানুষ—এ ছাড়া? এইভাবে ওরাই যে জন্ম জন্ম ধরে মানুষ হয়ে এসেছে—প্রশ্ন জাগেনি, করেওনি। সেইজন্যে রে ব্যতিক্রমটাও ওদের কাছে অদ্ভুত। তোকে সেটা বুঝতে হবে বোঝাতে হবে।

অধৈর্য হয়ে ওঠে ছবি, কিন্তু কেমন করে সেটা বলো না।

লেখা-পড়া কর—জানতে শেখ, নিজেকে গুটিয়ে রাখিসনে। তোর বাবা তোকে বেঁধে রাখতে চাইবেন, দাদু হুংকার ছাড়বেন, মা-ঠাকুমার চোখের জল তোকে ভাসিয়ে দেবে কিন্তু ভয় পাসনে, ছবি। ভয় পেলে তো চলবে না। ভাবছিস লেখা-পড়া শিখলেই বুঝি মুক্তি? চাকরি করলেই বুঝি সম্মান? কিন্তু এ-দেশে তার কোনওটা নেই। তবু ছবি, তোকে আমি ভয় দেখাব না। ক্রমশ আসল গলদটা যেদিন ধরতে পারবি সেদিন পৃথিবীতে ভয় পাবার আর কিছু থাকবে না। অনেক দুর্দিন পার হতে হবে, হয়তো প্রাণটাও দিতে হবে সে মুক্তি আনবার জন্যে, কিন্তু তবু আনন্দ তাতে। সেই মুক্তির আনন্দেই হাসতে হাসতে প্রাণ দিচ্ছে আজ অনেক দেশের মেয়েরা...।

অনেকক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে অধীর চোখ বুজে চুপ করে থাকে এবার। ঘর থেকে বেরোতে পারে না, ভালো করে হেঁটে চলে বেড়াতে পারে না বলেই বোধ হয় অধীরের মধ্যে এত যন্ত্রণা। ও কেবল বলতে চায়, নানা ধরনের কথা আর খাঁচায় পোরা একটা ছটফটে পাখির মতো মাঝে মাঝে দূরের গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওদের সে চেনে, ওদের কথা শুনেছে, ভাষা বুঝেছে—বুঝি প্রাণের মধ্যে নতুন অলোও সে-ই জ্বালিয়ে দিয়েছিল একদিন। কিন্তু আজ আর সে ওদের মধ্যে যেতে পর্যন্ত পারে না। এখন তার মনে হয় আগে জানলে আরও বেশি করে সে খাটত, ঘুরত, একটুও বিশ্রাম না নিলে কী হত তার? না হয় বড়ো বেশি তাড়াতাড়ি মরতে হত, হয়তো কোন গ্রাম থেকে ফেরবার পথে মুখ থুবরে! কিন্তু এমন পঙ্গু হয়ে তো থাকতে হত না তাকে, দিনে দিনে যন্ত্রণা সহ্য করতে হত না।

অরুণ, প্রসন্ন আছে। ওরা খাটে, মানুষগুলোকে এক করতে তারা জানে, বোঝাতে জানে, কিন্তু তাতে কী! তাকে ওরা টাকা তুলে ভালো করে চিকিৎসা করাতে চায় কিন্তু পারছে না মাঝে মাঝে সেটা বোঝা যায় নতুন কোনো শহর থেকে আসা ডাক্তারকে দেখে, ওষুধের রং বদল দেখে, খাবার ব্যবস্থায় সুখাদ্য দেখে, শহর থেকে ফিরবার পথে হঠাৎ কারোর এনে রাখা কিছু ফল এসে মাথার কাছে জড়ো হলে। ওরা চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না সেটা জানাতে চায় না কিন্তু অধীর তা জানে। মাঝে মাঝে সে আবেগে হাত চেপে ধরে অরুণের, নয়তো বীরেনের, নয়তো প্রসন্নের। ওরা তখন মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে চোখের জল গোপন করে—অধীর তাও বোঝে।

কিন্তু আবেগ যখন থাকে না— তখন? তখন মনে হয় আর কত দিন সে এমন করে দূরের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে মায়ের কান্না দেখবে, মায়ার কান্না দেখবে, লতুকে চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখবে! সামনে যে করাল ছায়াটা নেমে আসছে দুর্ভিক্ষের—কেমন করে তার হাত থেকে বাঁচবে গাঁগুলো—মানুষগুলো।

অরুণরা বলে তারা নাকি একটা মানুষকেও শহরে গিয়ে মরতে দেবে না, না খেয়ে মরতে দেবে না কিন্তু সে কেমন করে? কেমন করে!

অসহ্য চিন্তায় যখন মাথাটা ফেটে যেতে চায়, অবরুদ্ধ শক্তিটা যখন তাকে ভেতর থেকে খুঁচিয়ে মারে তখন সে সব ভুলে গিয়ে হঠাৎ হাত-পাগুলোকে জোরে নাড়া দিয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে চায় কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আবার যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ে বিছানায়।

ছবির হাতখানা তখনও অধীরের হাতের মুঠোয় ধরা ছিল, এবার সে ছেড়ে দেয়। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছবির কান্না পায়, আস্তে আস্তে বলে, গান শুনবে কাকা? গান শুনতে তুমি যে ভালোবাস।

গান? —চোখ খুলে অধীর বলে, গান ভালোবাসি ছবি কিন্তু এক এক সময় তাও ভালো লাগে না। জানিস, তিনটে রাত পরপর আমি ঘুমোতে পারিনি, এই অসুখে একে তো ঘুম হয়ই না তারপর এমন সব চিন্তা। তুই সব হয়তো বুঝবিনে কিন্তু কেউ যদি বুঝত—কেউ। কেউ যদি তেমন করে লিখতে পারত আমাদের কথা! তুই গোর্কির 'মা' পড়েছিস ছবি?

ছবি মাথা নাড়ে—সে পড়েনি। অধীর আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়, বলে, পড়, জানতে শেখ, বুঝতে শেখ। কেবল কেঁদে, কেবল ভেবে কিচ্ছু হয় না! জেনে বুঝে বড় হ। তোরা যদি বাঁচিস নতুন করে, আমাদের মরাও সুখের হবে।

ছলছলে চোখে ছবি বলে, অমন করে বোলো না কাকা। ও কথা শুনলে আমার বড়ো মন কেমন করে। আমার যদি টাকা থাকত আমি তোমাকে ভালো করে তুলতাম।

তমালও তাই বলে .গেল। ও নাকি এবার কলকাতায় ফিরেই আমাকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেই যেমন করে হোক। পাগল আর কী! যা ছবি, অনেকক্ষণ এসেছিস। রোগীর ঘরে বেশি থাকতে নেই।

তারপর তার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায়, একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলে, প্রদীপটা নাকি অ্যারেস্ট হয়ে গেছে—শাস্তিও হয়েছে বছর খানেকের। কিছু জানতাম না এতদিন, বিমলের চিঠিতে জানলাম।

মণিদা? মণিদা জেল খাটছে? —ছবির চোখ ছাপিয়ে জল আসতে চায়।

মন খারাপ হল তো? ওই আর এক ছেলে, তোর মতোই ছটফটে স্বভাব। পড়বে, আঁকা শিখবে অথচ বাড়িতে কেউ রাজি না। শেষে আমাব কাছে এসে হাজির, কাকা তোমার কোনো চেনা লোকের কাছে চিঠি দাও যেন অন্তত গিয়ে উঠতে পারি। কে ঠেকাবে তাকে? বিমলের কাছে চিঠি দিয়ে দিলাম বাধ্য হয়ে।

ছবিকে যেতে দেখে অধীর ডাকে, শোন ছবি, তোর মাকে বলিসনে এখুনি। একে তো বাড়িতে যন্ত্রণার শেষ নেই তারপর হয়তো শুনে কান্নাকাটি করবেন।

—না! মাকে বলা যাবে না। প্রদীপের কথা উঠলেই মমতার চোখ ছলছল করে। মানুষ যাকে বেশি ভালোবাসে তার নামটা যেমন বেশিবার বলে না, সেটাকে সযত্নে লুকিয়ে রাখে, নিজের মনে মনে উচ্চারণ করে, মমতাও তেমনি করে যেন ছেলের নামটাকে লুকিয়ে বেড়ান। বাড়িতে তার প্রসঙ্গ উঠলেই সরে যান সামনে থেকে। তাই মাকে বলা যাবে না।

বইগুলোকে আঁচলের তলায় ঢেকে নিঃশব্দ পায়ে নেমে এসে কোনওমতে নিজেদের রোয়াকের ওপর গিয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত যে ভয়টা থাকে মনে মনে, আজ হঠাৎ সেটাই ঘটে যায়। একেবারে বড়োকাকা সুখদার মুখোমুখি পড়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। সুখদা নিঃশব্দে কঠিন দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপরেই দৃষ্টিটা বদলে যায়। কাছে সরে এসে মৃদু গলায় জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় গিয়েছিলি রে ছবি?

উত্তর দেবে কী! বই-ধরা হাতখানা তার আঁচলের তলায় আড়ষ্ট হয়ে থাকে। সে যে লুকিয়ে প্রায়ই অধীরের ঘরে যায় এটা মমতা ছাড়া বাড়িতে কেউ জানে না। এ বাড়ির প্রতিটি ছেলে-মেয়ের ওপর নিষেধের বেড়া আছে, সে বেড়া ডিঙোতে পারা কঠিন। ছবি দুদিন শহর থেকে এসেই যে সে বেড়া ভাঙবে এটা দাদু, বাবা, বড়োকাকা কেউ সহ্য করবেন না। সে তাই চুপ করে থাকে।

সুখদা নিজেই তার হাত থেকে বই-গুলো টেনে নেন, উলটে-পালটে দেখেন তারপর হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো বলেন, বলব কোথায় গিয়েছিলি? অধীরের ওখানে—তাই না? ও ঘরে বেশি যেতে নেই ছবি, রোগটা যে বড়ো খারাপ।

বড়োকাকা রাগ করেননি, রাগ করলে মানুষ অমন করে কথা বলে না। ছবির হঠাৎ ছোটোবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়—তার চারপাশে ভিড় করে আসে আরও অনেক স্মৃতি। কিন্তু বড়োকাকা তাদের মারছেন এমন একটা ঘটনাও মনে করতে পারে না। আসলে বড়োকাকাকে ছবি ভালো করে চেনেই না—আজ পর্যন্ত না। আজ কথা বলতে গিয়ে সে প্রথমে অধীরের কথা বলে, অধীরকা কি আর বাঁচবে না বড়কা? তোমরা কেউ একটু দেখ না, কাকার তাই ভালো করে চিকিৎসা পর্যন্ত হয় না। কাকা তো নিজের জন্য জেল খেটে অসুখ করেনি, কাজ করেছে দেশের জন্যে। কেন সবাই এখন বাঁচাবে না অধীরকাকে?

কোনওদিন অধীরের কথা সুখদা ভালো করে ভেবেছেন কিনা কে জানে কিন্তু এই মুহূর্তটায়, ছবির ছলছলে, চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁরও বুকের কোন্‌খানটায় যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। লজ্জিত মুখে হাসবার চেষ্টা করে সুখদা উত্তর দেন, আমার কি টাকা আছে রে পাগলি? জানিস মাস্টারির মাইনে কত? অধীরটাকে আর বাঁচানো গেল না রে ছবি, আমিও তাই মাঝে মাঝে ভাবি। এতটুকু

বেলা থেকে ওকে দেখে আসছি। আমি যেবার প্রথম জেলে গেলাম আইন অমান্য আন্দোলনে —ও তখনও স্কুলে পড়ে কিন্তু জেল খাটছে তখন থেকেই। গ্রামের আর সব ছেলেগুলোকেও তো ও-ই নামিয়েছে স্বদেশেতে।

ছবি বলে, তুমিও জেলে গিয়েছিলে বড়কা? কই বলনি তো কোনোদিন?

বলব কী? বলবার মতো আছে কিছু? সেই একবার জেল খেটেই সব শেষ। কিন্তু অধীরের কথা আলাদা। বড়ো ভালো ছেলে ওরা। লোকে বলে, বাউণ্ডুলে, মা বাপকে দেখে না। তা হয়তো সত্যি, তাকে আমিও মানি না কিন্তু মন ওদের খাঁটি। ওদের নাকি পথ বদলেছে—ওরা নাকি ইংরেজের টাকা খেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে দেশের সঙ্গে। কিন্তু আমার কী মনে হয়, ছবি জানিস?

কী?—ছবি আগ্রহ নিয়ে সুখদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমার মনে হয় কথাটা মিথ্যে— একদিন না একদিন সেটা প্রমাণিত হবে। সোনাকে ছাই দিয়ে ঢাকা যায় না।

ছবিরও কী মনে হয়, নিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলে, তাই কাকা। নিশ্চয়ই মিথ্যে। দেশকে কী ভীষণ ভালোবাসে অধীরকা জান? আর কী ভীষণ বিশ্বাস করে মানুষকে। এত যে অসুখ, তবু এতটুকু দুঃখ নেই কাকার—এখনও হাসে, কত কথা বলে।

সে-কথা শুনে সুখদা হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যান। নিজের মনে বিড় বিড় করেন পারে, ওরাই তা পারে কারণ যাহোক একটা বিশ্বাসকে পেয়েছে ওরা। কিন্তু আমি কী করেছি এতকাল! কী-ই বা করলাম। এখন সবাই বলে চোরাকারবার করতে—তাতে টাকা আছে, তাতে—!

ছবি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সুখদা নিজেকে সামলে নেন, ফিরে আসেন সম্পূর্ণ অন্য কথায়, বউদি বলছিল, তোর নাকি খুব পড়বার ইচ্ছে, ছবি? কিন্তু এ বাড়িতে—। যদি সত্যিই ইচ্ছে থাকে আমার কাছে আসিস। সকালে আমি পন্টুদের নিয়ে তো বসি-ই, তুইও পড়বি। আসিস—অন্যমনস্কের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে বড়োকাকা চলে যান।

এমনিতে খুব স্বল্পভাষী বড়োকাকা। মাস্টারি করতে করতে ভাবনা-চিন্তাগুলোও তাঁর ছাত্রদের কেন্দ্র করেই। যে ছেলেকে যখন দেখেন গ্রামার আর ট্রানস্লেশনের প্রশ্ন করেন, অন্য কথা বলবার আগে। কারুর ভুল ইংরিজি বলা, ভুল লেখা সহ্য করতে পারেন না। পড়াশোনা বলতেও স্কুলের বইগুলোই নাড়াচাড়া করেন আর বাকি সময়টুকু চুপ করে থাকেন।

বাড়িতে ঠাকুরদাকে মাঝে মাঝে বলতে শোনা যায়, রায়বংশের হল ভালো— এক ছেলে গোরু ঠেঙায়, এক ছেলে তেল নুন মাপে।

তবু কুলদার যেন মর্যাদা আছে, কথার মূল্য আছে,। ঠাকুরদা তার কথা মন

দিয়ে শোনেন, কিন্তু বড়োকাকার সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা মেশানো থাকে তাঁর ব্যবহারে, কথায়।

নিঃশব্দ বাড়িটায় সবাই এখনও ঘুমোচ্ছে হয়তো, নয় শুয়ে আছে চুপ করে। উঠোনের ওপর বিকেলের ছায়া পড়ে আসছে। সেই ছায়া-ছায়া জায়গাটায় গোটাকয়েক শালিক কিচিরমিচির করে ঝগড়া করছে। বড়ো দিদিমাদের ভাঙা ঘরের মাথার ওপর থেকে একটা কাক কর্কশ স্বরে ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে। মাথার ওপর রোদে ঝলসানো আকাশে গোটাকয়েক চিল ঘুরপাক খাচ্ছে— তারও ছায়া পড়েছে, উঠোনে।

এমনি পরিপূর্ণ নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে বড়োকাকার কথাটাই কেবল ভাবতে থাকে ছবি। বড়োকাকার সেই 'ব্যাবসা করতে পারব না' বলে উঠে যাওয়া, ক্লান্ত ম্লান মুখে অসুখী মানুষের মতো ঘুরে বেড়ানো, সব যেন ভেসে ওঠে চোখের সামনে। বড়োকাকারই তো ছেলে-মেয়ে বেশি। তাঁর মাস্টারীর আয়ে এ বাড়ির তেলের খরচটাও নাকি ওঠে না—বাড়িতে অনেক লোক, বাবা তাই রাগ করেন, ব্যঙ্গ করেন।

বড়োকাকা বোঝেন সব। তাই কিছুই তাঁর ভালো লাগে না। এসব কিছু চানও না—কী যে চান তিনি। কিছু একটা। যেন যা চেয়েছিলেন তা পাননি—পাবার উপায় নেই। তাই অসুখী আত্মার মতো অনেক ছেলেমেয়ের বাবা, এক গেঁয়ো স্কুলের গেঁয়ো মাস্টার বড়োকাকা ঘুরে ঘুরে বেড়ান। মা, দুর্গা, মায়াদির মতো বড়োকাকাও যেন মাথা ঠুকছেন না-বোঝা একটা কষ্টের দেওয়ালে!



পঁচিশ

কী কাজে একবার সকালেই ওপরে উঠে আসছেন, হঠাৎ সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াতে হয় মমতাকে একরাশ বই-খাতা নিয়ে ছবিকে নেমে আসতে দেখে, কোথায় যাচ্ছিস? ঠাকুমা তখন থেকে যে নাড়ু পাকানোর জন্যে ডাকাডাকি করছেন তোকে।

সে-কথায় কানও দেয় না মেয়ে, বলে, পড়তে যাচ্ছি মা বড়কার কাছে বৈঠকখানায়। পন্টুর সঙ্গে দেখো আমিও কেমন পাশ করি। —কথা শেষ করে উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় মেয়ে।

ফ্যাকাসে মুখে, আতঙ্কিত গলায় পেছন থেকে নাম ধরে ডেকে ফেরাতে গিয়েও আবার থেমে যেতে হয় মমতাকে—মেয়ে চলে গেছে। অসহায়ের মতো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাঘরে ঢোকেন।

পন্টু ছাড়া রোজ সকালে আরও যে দুজন ছাত্র পড়তে আসে সুখদার কাছে তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ছবির দিকে। পন্টু খুশিমুখে বলে, বাবা, ছবি পড়তে এসেছে।

আঃ! মেলানো বন্ধ রেখে সুখদাও খানিকটা অবাক হয়ে তাকান, চলে এলি তাহলে? আয়, বোস্।

বই খুলে ইংরিজি একটা প্যাসেজ দেখিয়ে বলেন, এটার বাংলা কর তো।

ছবি করে ফেলে। দেখে বলেন, বা বেশ।

বই খুলে এবার তিনি ইংরিজি কবিতা বুঝিয়ে দিতে থাকেন। ছবি অবাক হয়ে শোনে। সুধাদি চলে যাবার পর থেকে নতুন পড়াগুলোর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ ছিল না, কতদিন যে শোনেনি এমন করে পড়া। কতদিন সে পড়তে পায়নি।

বড়োকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দে মনটা পূর্ণ হয়ে যায়। পড়তে পাওয়ারও যে একটা আনন্দ আছে এটা সে নতুন করে বুঝতে পারে।

উঠোন পেরিয়ে কাকে আসতে দেখে পড়াতে পড়াতেই চশমাটা চোখে দিয়ে সুখদা ভালো করে দেখে খুশি মুখে বলেন, যাক, তমাল এসে গেছে। পল্টু, অঙ্কগুলো তোমরা তমালের কাছ থেকে বুঝে নাও আমি ততক্ষণ হরেনদার দোকান থেকে কাগজখানা পড়ে আসি। কবিতার বাকি অংশটুকু রাত্তিরে হবে।

তমাল হাসিতে মুখ ভরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। হাতে তার খানকয়েক বই। ছবি একবার তাকিয়েই বুঝতে পারে বইগুলো সে অধীরকাকে ফেরত দিতে যাচ্ছে।

সুখদা বলেন, তমাল, তুমি অঙ্ক ক'টা একবার দেখিয়ে দাও বাবা, আমি এই ফাঁকে একটু ঘুরে আসি। ছবি, কই, বসে আছিস কেন, খাতা-পেন্সিল নিয়ে বোস্, তমাল যা করায় করে ফ্যাল।

ছবির মাথায় অঙ্ক ঢোকে না এটা তার মতো ভালো আর কেউ জানে না। তাও বড়োকাকা হলে লজ্জা ছিল না, বারে বারে বুঝে নেওয়া যেত, ভুল হলেও লজ্জার কিছু থাকত না কিন্তু নতুন লোকের কাছে করতে তার ইচ্ছে করে না। তাও আবার কালকের দেখা সেই ছেলেটা—যে শহুরে কায়াদায় ঠোঁট উলটে বলেছিল, হবে, আমি দেখিনি।

মাথা নিচু করে সে শক্ত হয়ে বসে থাকে। ছেলেরা অঙ্ক কষতে শুরু করলে পল্টু বলে, তুই করবিনে ছবি?

না।

কেন রে? তমালদা করাচ্ছে বলে? জানিস তমালদা বি.এস.সি পড়ে কলকাতার কলেজে?

ছবি মাথা নেড়ে জানায় যে সে জানে তা।

তমাল এবার হো হো করে হেসে ওঠে হঠাৎ, বলে, আমি বুঝেছি পল্টু, আসলে ছবি অঙ্ক পারে না—তাই অমন করছে। এই নিয়মটা বুঝি জান না ছবি—না?

এতক্ষণে ছবি মাথা তোলে। লজ্জায়, অপমানে তার চোখ ছল ছল হয়ে উঠেছে। সে ইতিহাস পারে, ভূগোল পারে, বাংলা, ইংরিজি তার প্রিয় জিনিস কিন্তু অঙ্ক দেখলেই কেন যে তার কান্না পায়।

তাতে কী, আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখবে কিচ্ছু কঠিন না,—তার হাত থেকে পেন্সিলটা টেনে নেয় তমাল, আরও একটু কাছে সরে এসে বুঝিয়ে দেয় কিন্তু ছবি শক্ত হয়ে বসে থাকে।

তমালের হাতে একবার তার হাতখানার ছোঁয়া লাগতেই ছবি আরও শক্ত হয়ে যায়। কয়েকটা চুল এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে তমালের কপালের ওপর,

তার নিচু হয়ে থাকা মুখখানা ছবির মুখের পাশে কিন্তু তমালের বোঝানো তার মাথায় ঢুকছে না। নিয়মটা বোঝানো শেষ করে সে ছবির হাতখানা টেনে খাতার ওপর রাখে, কই এবার কর।

উঠোনে চটির শব্দ করতে করতে কে যেন এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। তারপর সেই থমকে দাঁড়ানো মানুষটাই আবার বৈঠকখানার ঘরে ঢুকে পড়ে।

পল্টু বলে, ওই এলেন। গোঁফ এলেন আমাদের। জানিস ছবি, তুই তো ছিলিনে, এর মধ্যে আবার মার খেয়েছে অনিলকাকা। এবার আর কাছারি থেকে ফেরা নয়, রাত্তিরের অন্ধকারে বাসুদেবপুরের কোন প্রজার ঘরে গিয়েছিলেন তার কোন বোনের কাছে—মাথা কামিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে গিয়েছিল কুঠিবাড়ির জঙ্গলে। হি হি, সে এক দেখবার জিনিস তিনমাস আর ঘর থেকেই বেরোয়নি অনিলকাকা। এখন বাসুদেবপুর দিয়ে আর কাছারিতে যেতে দেয় না রায়কত্তা তার ছেলেকে, নিজেই যায় ঘোড়ায় চেপে। অনিলকাকা নাকি গঞ্জে ধান-চালের আড়ৎ করেছে। অথচ জ্যাঠামশাই যখন প্রথম দোকান করলেন—ওই অনিলকাকাই তখন কত কী বলে বেড়াত। আবার যদি কেউ তেমনি করে মাথা কামিয়ে হি হি —মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসে পল্টু, তার দেখাদেখি অন্য ছেলে দুটোও। কেবল তমাল গম্ভীর হয়ে ধমক দেয়, পল্টু কী হচ্ছে ওসব? মাস্টারমশাই না অঙ্ক কষতে বলে গেলেন?

পল্টু মিনতি করে, তুমিও আর বোকো না তমালদা। ইস্কুলে মাস্টারমশাইদের কাছে, বাড়িতে মাস্টার-বাবার কাছে পড়ার জন্যে বকুনি তো লেগেই আছে—তারপর তুমিও যদি—। আমার ভালো লাগে না পড়তে—সত্যি বলছি। বলি তো পড়াশোনায় ইতি দিয়ে আমাকে জ্যাঠামশাইয়ের ব্যাবসাতে লাগিয়ে দিক, দেখবে কী করি। ওই রায়কত্তা এখন খুব দাদুর সঙ্গে ভাব করতে আসেন—আমি কীবুঝিনে ভেবেছ। আমি গেলে ওদের ব্যাবসা দুদিনে দেখতে তুলে দিতাম। পড়ে কী হয় বল তো? টাকা! টাকাটাই আসল...।

দুজোড়া জুতোর শব্দ কখন যেন ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এসেছে। দুজন মানুষ। একজন দক্ষিণারঞ্জন, আর একজন রায়দাদু। রায়দাদু পেছনে আসছেন।

কাছে এসে দক্ষিণা থামেন। ক্রুদ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার তাকান। ছেলেগুলোর দিকে, তমালের দিকে, তারপর সে দৃষ্টি গিয়ে আটকে যায় ছবির মুখে। মিনিটখানেক নিস্তব্ধ হয়ে থেকে হঠাৎ চাপা গলায় গর্জন করে ওঠেন দক্ষিণা, তুমি এখানে যে?

ছবি মাথা তোলে, আস্তে আস্তে বলে, বড়োকাকা বলেছিলেন আসতে।

সুখদা।—ব্যঙ্গের হাসি হেসে দক্ষিণা বলেন, সে তো বলবেই। কিন্তু ও সব মেমসাহেবি শহরে যা করেছ করেছ, এখানে চলবে না। সংসারের কাজ করগে

যাও। মেয়েমানুষের পড়া! পড়ে কি জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবে?

দক্ষিণার গলার স্বর বাড়তে থাকে, জোরে বলেন, যাও, উঠে যাও।

তাঁর চড়ানো গলার আদেশের সুরটা থমথম করে নির্জন নাটমণ্ডপের দেওয়ালে যেন প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে। পেন্সিল ধরা হাতখানা আগেই আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল ছবির। তমালের একখানা হাতও তার একটু দূরে শিথিল হয়ে পড়ে আছে।

ও কেন উঠে যাচ্ছে না—কেন? ওই শহুরে ছেলেটা কী মনে করে এখনও বসে আছে। —ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে ছবিও বসে থাকে। এবার সহ্য করা কঠিন, রাগে দক্ষিণারঞ্জনের সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে, এবার প্রায় ছুটে আসেন চিৎকার করে, গেলে না এখনও। এ বাড়িতে ছেলেরা আজ পর্যন্ত আমাকে অগ্রাহ্য করতে পারেনি—তুমি...। ভালো চাও তো উঠে যাও।

লজ্জার গ্লানিতে মাথা মুখ তোলে ছবি, তমালের চোখের দিকে তাকায় একবার। সে চোখে তো হাসি নেই, মজা নেই! সে দৃষ্টি কী যেন একটা বলতে চাইছে—কী?

ততক্ষণে উঠোনের ওপর লোক জমে গেছে। কি যেন ফিশফিশ করে বলাবলি করে। অবাক হয়ে, এদিকেই তাকিয়ে আছে তারা।

বই-খাতা গুছিয়ে নিয়ে ছবি এতক্ষণে উঠে দাঁড়ায়। অদম্য কান্নার বেগটা লজ্জার পাহাড়ে ঢাকা পড়ে গিয়ে সারা মনটায় একটা জ্বালাভরা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। হাতে-পায়ে, সমস্ত শরীরে যেন চেতনা নেই তার, সে যেন একটা স্প্রিং-এর পুতুল, দম দিয়ে কেউ তাকে চালাচ্ছে।

সদর দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে যখন ঢোকে, কাকিমা সরস্বতী একেবারে অবাক হয়ে বলে, ও কী রে ছবি? চোখ-মুখের অমন ভাব করে কোথা থেকে এলি? শাড়িটা মাটিতে লুটোচ্ছে কেমন করে দেখ, হ্যাঁরে, পড়ে-টড়ে গিয়েছিলি?

ছবি নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। সে মাথা-নাড়া দেখে সরস্বতী দ্রুতপায়ে মমতাকে ডাকতে যান।

সেফু এসে ছবির হাত ধরে, দিদি, কালকের সেই গানটা? আজ আর একবার দেখিয়ে দেবে না?

সেফু রাগে, কাঁদে, ঝগড়া করে। বুড়োদের মতো পাকা পাকা কথা বলে ওইটুকু মেয়ে। পড়াশোনার কথা ভুলেও বলে না, হয়তো তার স্বাদ জানে না বলেই কিন্তু আশ্চর্য সুরেলা গলা ওর। ছবিই সেটা আবিষ্কার করেছে। তার নিজের গলা ভাল না—গাইতে ইচ্ছে করার চেয়ে শুনতে তার ভালো লাগে। সে গান ভাবে বেশি, তার মনের মধ্যে গান ঘুরে বেড়ায়। দুঃখের গান তার ভালো লাগে। সে সবটুকু উজাড় করে সেফুকে শেখায়। কাকিমা বলে, শিখিয়ে দে মা, অন্তত দেখতে

আসলে যেন গাইতে পারে।

ছবি বলে, তোকে আমি রবিঠাকুরের গান শেখাব সেফু—বুঝেছিস?

সেফু হাঁ করে থাকে।

ছবি তাকে সাধনের গাওয়া গান শিখিয়ে দিয়েছে—আমি রূপসায়রে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি...।

সেফুর খুব ভালো লেগেছে সেটা। ঘরের দরজা বন্ধ করে সে গান করে। হারমোনিয়ামের শব্দ শুনতে পেলে ঠাকুরদা রাগ করেন। তেড়ে এসে বলেন, এটা কি বেশ্যালয়? বলি নাট্যশালা নাকি এটা?

হারমোনিয়াম একটা কেনা হয়েছিল যেন কবে, কিন্তু সেটা তোলা থাকে। তাতে মাকড়শার জাল আর আরশোলার বাসা বোঝাই।

যেদিন প্রথম তমালকে দেখল ছবি, সেদিন এসে সে সেফুকে নতুন আর একটা গান শিখিয়েছে—তোমার মোহনরূপে কে রয় ভুলে...। —কেন শিখিয়েছে, কেন ও গানটা গাইতে ইচ্ছে হোল সে তা নিজেও জানে না কিন্তু বড়ো কঠিন তারসুর আর কঠিন বলেই বোধহয় ওটার কথা মনে হয়েছিল।

সেই গানটার কথাই বলতে এসেছিল সেফু কিন্তু ছবি মাথা নেড়ে তাকে ফিরিয়ে দেয়।

ওপরের ঘরে গিয়ে শক্ত হয়ে বসে থাকে। একটা সময় যেন অনন্তকাল। বুকের মধ্যে পাথরের মতো যন্ত্রণাটা কমছে না কিছুতেই। যন্ত্রণায়, আত্মগ্লানিতে মনটা যে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে তার। কী হবে! কী হবে!

দরজার কাছে ক্ষীণ নিঃশব্দ পায়ে ছায়ার মতো কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে।

মা!—আর্তকণ্ঠে উচ্চারণ করে ছুটে গিয়ে সে দুহাতে শক্ত করে মমতাকে জড়িয়ে ধবে বুকের মধ্যে মাথা রেখে ফোঁপায়, আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে মা। পড়াটা আমার কাজ নয়!

জানি— শান্ত গলায় মমতা বলেন, পন্টু বলেছে।

তারপর ছবির মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরেন, ছেলেদের সঙ্গে পড়তে গিয়েছিলি সে তো আছেই, বোসদের তমালও নাকি সেখানে ছিল...। কেনই বা গিয়েছিলি তুই! আমি বুঝিনে...আমার ছেলেকে-মেয়েকে— বুঝিনে আমি... কেন যে যায়। কেন যাস!

কেন যায়! —ছবিও তা জানে না। কিন্তু যাবে সে, আবারও যাবে। তাকে যে যেতেই হবে...।



ছাব্বিশ

ছবি যেন অসাধ্য সাধনায় মেতেছে। যেদিন সকাল বেলায় দক্ষিণারঞ্জন ওকে মণ্ডপের পড়ার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়েছিলেন তারপর থেকে ওর চোখ জ্বলছে, ছটফট করে বেড়াচ্ছে। ওর ছোটোবেলার সেই ঘাড় বাঁকানো স্বভাব যেন আবার ফিরে এসেছে। মাঝখানের ক'টা বছর সেই উদ্ধত স্বভাবের আর খানিকটা পালিশ দিয়েছে কিন্তু মুছে দিতে পারেনি।

ঘরের একটা কোণে পড়ার ব্যবস্থা ও নিজেই করে নিয়েছেন দক্ষিণা ঠাকুরঘরে পুজো করতে যাবার সময়ে ছবির পড়াব শব্দ তাঁর খড়মের আওয়াজকে পর্যন্ত ডুবিয়ে দেয়। হয়তো একবার থমকে দাঁড়ান দক্ষিণা— কী যেন বলবেন মনে করে এগিয়েও আসেন কিন্তু ঠিক আবার তেমনি করে ফিরে চলে যান।

কোনোদিন জানতে পেরে মমতা এসে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকেন নাকি? একটা শঙ্কায় তাঁব বুকটা কাঁপতে থাকে গরদের কাপড় আর নামাবলি গায়ে দেওয়া খড়মের শব্দ করে চলা শ্বশুরকে দেখে। ঠিক এই মুহূর্তটাতে সমস্ত নিঃশব্দ ঔদ্ধত্য ভুলে গিয়ে তিনি ভীতু হয়ে যান।

কিন্তু মেয়েটা ভয় পায় না। বরং দরজা আগলে দাঁড়াতে দেখলে রেগে ওঠে, সর মা, বলছি সরে যাও। আমি তো অন্যায় কিছু করছিনে।

অত চেঁচাস কেন? না শোনালে কি চলে না যে পড়াশোনা করিস তুই?

চেঁচিয়ে পড়া তো আমার অভ্যেস নেই, আমি তো ইচ্ছে করে এই সময়টা চেঁচাই—পড়ি নাকি?—মেয়ে হাসে। মমতা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন।

পূর্ণশশী ডাকেন, ও ছবি, আমসত্বের গোলাটা হাতে হাতে করে দেন দিদি। ওমনি মমতা আসেন তাড়াতাড়ি, আমাকে দিন মা, আমি করে দিচ্ছি।

ছবির পড়ার শব্দটা কান পেতে শুনে পূর্ণশশী বলেন, মেয়ে পড়ছে বলে তুমি ছুটে এসেছো? ও! কিন্তু ও তো ভালো না বউমা, ও কি ভালো?

কী ভালো না সে-কথা মমতাও বোঝেন না, পূর্ণশশীও বলেন না।

আজকাল সুখদা ডাকেন না কিন্তু বেপরোয়ার মতো ছবি নিজেই বৈঠকখানার বারান্দায় পড়তে যায় বই-খাতা নিয়ে।

পল্টুকে একা পড়তে দেখে বলে, বড়কা কোথায় রে?

বাবা আজ পড়াবেন না বলেছেন, কাজ আছে।

এদিক-ওদিক তাকায় ছবি, তমালদা আর আসে না, নারে?

আসে মাঝে মাঝে। দেখা হলেই তোর কথা জিজ্ঞেস করে, বলে, ছবিকে বলিস পড়া যেন বন্ধ না করে।

আহা! আমার জন্যে তমালদার না ভাবলেও চলবে বলে দিস। আচ্ছা যা, দেখা হলে আমিই বলে দেব।

অধীরের ওখানে দেখা হলে কিন্তু মাথা তুলে কথাই বলা যায় না। সেই কতদিন আগের ঘটনাই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠে মাথা নিচু করে দেয় তার।

অরুণ, প্রসন্ন, ধীরেন, আরও কারা সব অধীরের কাছে এসেছে খবর শোনাতে কথা বলতে। তমালও এসেছিল ওদের সঙ্গে, হঠাৎ ছবিকে বসে থাকতে দেখে সে চুপ করে যায়। একটা কথাও বলতে পারে না, মাঝে মাঝে ছবির মুখের দিকে তাকায়। ছবি একমনে সবায়ের কথা শুনছে, বোঝার চেষ্টা করছে।

সবাই চলে যাবার পরেও তমাল ওঠে না। কি যেন সে বলতে চায় মেয়েটাকে কিন্তু অধীরের রুগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়, ব্যক্তিগত কথা বলার জায়গা নেই এখানে। এই মুহূর্তে ওই রোগ-পাণ্ডুর মুখটা চিন্তিত হয়ে ভাবছে অনেক কথা। সে ভাবনা বাড়ির নয়, ঘরের নয়, মায়ের চোখের জলের কথা নয়, এমনকী মায়ার কথাও নয়।

ছবির হঠাৎ মনে হয়—মায়াদি কিন্তু আর আসে না। সেই হঠাৎ একদিন সে দেখেছিল মাত্র, তারপর আর একদিনও দেখেনি। কেন আসে না? সে বলে, কী ভাবছ কাকা?

ভাবছি।—অধীর যেন চমকে ওঠে ঘোর ভাঙে, বড়ো ভাবনার কথা ছবি। দুর্যোগ শুরু হয়ে গেছে, মস্ত বড়ো দায়িত্ব এখন। এই সময়টায় একবার যদি উঠে দাঁড়াতে পারতাম ছবি—আঃ।

আপশোশের সুরটা তমালের কানে লাগে কিন্তু আজ আর সে কোনো আলোচনায় মন দিতে পারছে না, তর্ক করতে মন চাচ্ছে না। আজ অন্য কথা বলতে ইচ্ছে করছে, শুনতে ইচ্ছে করছে।

একটা নতুন কিছু আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তাকে, সে শহরে-থাকা ছেলে। কত মেয়েকে দেখেছে। কলেজে পড়া মেয়ে, না পড়া মেয়েদের দেখেছে। মিশেছে, দুর থেকেও দেখেছে। কিন্তু ছবিকে সে বুঝতে পারেনি। ফর্সা রঙের রুক্ষ চেহারার সাধারণ একটা গেঁয়ো মেয়ে তাকে হঠাৎ অবাক করে দিয়েছে।

সে ইচ্ছে করে পণ্টুদের পড়াতে আসে ছবিকে দেখবে বলে। অধীরের এখানে এসে বসে থাকে, তর্ক করে আর বারেবারে দরজার দিকে তাকায়। রাস্তা-ঘাটে চলতে চলতে তমাল আশা করে থাকে হয়তো দেখা হয়ে যাবে হঠাৎ।

তাই ছবি বেরিয়ে এলে, অধীরের কী একটা বলা-কথার মাঝখানেই সে হঠাৎ উঠে যায়।

সিঁড়িতে নামবার আগে দুজনেই দাঁড়ায় একটু। একটা মুহূর্ত মাত্র। মাথার ওপর জ্বলতে থাকে রোদে ঝলসান একখণ্ড আকাশ—কোথাও তাতে মেঘের করুণা নেই।

তোমার জন্যে আমার যাওয়াও বন্ধ হল ছবি, জান?—তমাল বলে।

ছবি এদিক-ওদিক তাকায়। বুকের মধ্যেকার রক্ত চলাচল যেন এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। আরক্ত মুখে বলে, আমার জন্যে কেন?

থাকব বলে এলেও চলেই যাচ্ছিলাম কিন্তু তুমি...। পড়াশোনা করছ তো? পণ্টুর কাছে প্রশ্নের উত্তর আর খাতা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—পেয়েছ?

ছবি মাথা নেড়ে জানায় সে পেয়েছে।

তুমি পাস কববেই ছবি—যেমন করে হোক। নইলে আমারও ভালো লাগবে না।

কেন?

কেন। —তমাল অদ্ভুত একটুখানি হাসে কোনো কথা না বলে, তারপর তরতর করে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে।

আশ্চর্য, অভিভূত হয়ে খানিকক্ষণ কাঠের মতো সেই আগুন-ঝরা রোদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে ছবি। তামাল তার জন্য যাওয়া বন্ধ করেছে, সে পাস না করলে তমালের ভালো লাগবে না! কেন?

এই 'কেন' তাকে যেন পাগলের মতো ভাবায়। অসহ্য দাহ নিয়ে সে ছটফট করে বেড়ায়। পড়ার বই খুলে আবার বন্ধ করে দেয়, সঞ্চয়িতা খুলে দুটো একটা কবিতা পড়ে—আবার রেখে দেয়। গুনগুন করে গান গায় নিজের মনে আর ভাবে, কেন!

এক অব্যক্ত যন্ত্রণা তাকে থেকে থেকে কষ্ট দিচ্ছে কেন? নিজেকে বড়ো ছোটো মনে হয় তার, কিছু জানে না সে, কিছু বোঝে না। মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, বাইরে-দূরে-চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে, ছেলেমানুষের

মতো মনের খুশিতে, আনন্দে, চঞ্চলতায় ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু তখনই যেন উমার পান খাওয়া মুখখানা মনে পড়ে যায়, তোরও বিয়ে হবে রে, হবে—ফ্যাকাশে মুখ নেড়ে হাসবার চেষ্টা-করে-বলা কথাগুলো।

দুর্গা যেন এসে দাঁড়ায়, তা আর হয় না ছবি, নারে?

কী হয় না? বিয়ে! বিয়ে!

সেফুর ওই ম্লান মুখ করে ঘুরে বেড়ানো কেবল একটা মাত্র প্রতীক্ষায়, লতু পিসির চোরের মতো ঘুরে বেড়ান সেই জীবনের ব্যর্থতায়। মা! কাকিমা! দিদিমা! —কে নয়! সুকুমারী পিসিমা, বিন্তি পিসিমার চোখের জল কি ছবি দেখেনি?

ছবি মানতে পারবে না ওই ভবিষ্যতকে!

কিন্তু কী করবে সে? কী করবে।

জ্ঞান হবার পর থেকে সে শুনছে সে ছেলে নয়, মানুষও নয়—সে মেয়ে। মেয়েদের জোরে কথা বলতে নেই, হাসতে নেই, পড়তে নেই। আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই!

নেই! সত্যিই কি নেই? কিন্তু এসব যে কিছুই মানছে না তার মন। অধীরকা তাকে অন্য কথা শিখিয়েছে, অন্য ভাবনা ভাবতে দিয়েছে।

পড়ার বই, সঞ্চয়িতা একপাশে সরিয়ে রেখে সে খুলে বসে আর এক কাহিনি। আশ্চর্য মুক্তি পাওয়া এক দেশের মেয়েদের কথা আছে তাতে। সেই মুক্তির আনন্দে তারা প্রাণ দিচ্ছে, প্রাণ নিচ্ছে।

আমাদের অমন হয় না? কবে হবে? কেন হয় না?

চুপ করে থাকলে অনেক পুরোনো কথা মনে হয়। একবার ছাদে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে সে উঠোনের রোদ দেখে। ইস্—এখনও মা, কাকিমার খাওয়াই হয়নি। দুপুরে বাড়িশুদ্ধ লোক খেয়ে যায় তবু রান্নাঘর ছেড়ে আসতেই পারে না মা আর কাকিমা। কতদিন ভাত কম পড়ে গেলে আবার রেঁধে নিতে হয়, তরকারি-ঝোল কিছু থাকে না। ঝোলের থালায় ভাত মেখে খেতে হয়।

ছোটোবেলায় যা দেখেছে, এখনও তাই। মাকে দেখত বান্নাঘর থেকে ক্লান্ত মুখে বেরিয়ে এসে উনুনে হাওয়া দেবার ভাঙা পাখাখানা নিয়ে হাওয়া খেতে, কাছে দাঁড়ালেই বলত, সরে যা ছবু, হাওয়া ছাড়। —নয়তো বলত, ক'টা ঘামাচি মেরে দিবি?

সে মা'র ঘামাচি-ভরা পিঠ দেখে শিউরে উঠলে মমতা বলতেন, কী করব? সারাদিন রান্নাঘরে আগুনের আঁচে থাকি—দেখিসনে?

কেন থাক সারাদিন?

মমতা, তখন হাসতেন, ঘরে ঘরেই তো এই মেয়েদের বিধিলিপি—বড়ো হ বুঝবি। ...তোর ঠাকুমার কথা জানিস? ন'বছরের গৌরীদান করা মেয়ে।

শ্বশুরবাড়িতে অতটুকু মেয়েকে বড়ো বড়ো হাঁড়ি-কড়াই নিয়ে রান্না করতে হত। কতদিন নাকি ভাতের হাঁড়ি পায়ের ওপর পড়েছে, জোরে কাঁদবার পর্যন্ত উপায় ছিল না—বউ যে। স্বামী দাবা খেলে, তাস-পাশা খেলে রাত দুটোর আগে বাইরে থেকে ফিরতেন না। বউকে তো খেতে নেই স্বামীর আগে, মেয়েটা বসে বসে ঢুলত, তারপর হয়তো একসময় ঘুমিয়ে পড়ত। অতটুকু মেয়ে! সারাদিন খেটেছে। তোর ঠাকুরদা এসে ডাকাডাকি করেছেন, ঘুম ভাঙেনি। শেষে শাশুড়ি পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে বউ-এর ছোটো ছোটো ঝাঁকড়া চুল ধরে, প্রদীপের আলোয় সে চুলের গোছা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তার চেয়েও করুণ ইতিহাস ছিল বাবার পিসিমা ফুলমণি দিদিমার ইতিহাস। ছবি জ্ঞান হয়ে তাঁকে দেখেছে, থুত্থুরি বুড়ি। ঠাকুমার ঘরের একপাশে দিনরাত শুয়ে থাকতেন, মাথাটা ঠকঠক করে কাঁপত। বিয়ের দুবছর পরেই বিধবা হলে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে—। তাবপর সারাজীবন ভাই-এর গলগ্রহ হয়ে কেটেছে বুড়ি দিদিমার।

এবার ফিরে এসে আর ছবি দেখতে পায়নি সেই অসহায় মানুষটাকে। জানতে চাইলে মমতা বলেছিলেন, বুড়ি মরে বেঁচেছে। শেষের ক'টা দিন যা কাণ্ড—কথা বন্ধ, হাত-পা অসাড়। তবু প্রাণটা কী সহজে যায়!

যেন মবার জন্যেই দীর্ঘ জীবনটা প্রতীক্ষা করে থাকা!

গল্প শেষ করে মমতা বলতেন, এ কাল তো তবু ভালো রে।

তবু ভালো! কীসে ভালো? সেকালে ফুলমণি দিদিমারা ছিল। একালে আছে উমা, দুর্গা, বিন্তিপিসি, লতুপিসি... সুকুমারী পিসিমার সব থেকেও কিছু নেই। কাকিমা ঘোমটাটা উঠিয়ে দেখতেও ভয় পায়, ঠাকুরমার তোবড়ান গাল বেয়ে জল গড়ায়, অধীরকার মা নতুন দিদিমা নির্বাক হয়ে থাকে। আর তার মা মমতা!

কাল রাতে ঘুম ভেঙে সে মা আর বাবার কথা শুনতে পেয়েছিল।

মা বলছে, তুমি কি আর সে মানুষ আছ—ব্যাবসা ব্যাবসা করে সব ভুলেছ। একটা বেলাও থাক কী থাক না—তোমার আর কী। রাগ, মেজাজ এই হয়েছে সম্বল।

বাবা বলছেন, কিন্তু শুধু শুধুই কী অমনি কবি বড়ো বউ? কত যে কষ্ট কবি সে তোমরা কী বুঝবে? দিনরাত খাটি বলেই এই প্রতিযোগিতার বাজাবে দুটো খেয়ে সুখে আছ তোমরা।

সুখ! দুটো খেতে পরতে পেয়ে সুখী হওয়া দাসী-বাঁদীই তো আমরা। তুমি কি বুঝবে... থাক।

তীব্র ঝাঁজ মেশানো গলায় বাবা বলেন, না, বড়ো দুঃখ তোমার। কিন্তু আমার কথা ভেবে দেখেছ কখনও? ভাই বলেন তিনি ব্যাবসা করবেন না, ছেলে গেলেন

শহরে—সেখানে গিয়ে জেল খাটছেন স্বদেশি করে—সে খবর রাখ?

জানি। —স্থির গলায় মমতা বলেন।

জান তো বোঝ না কেন? ব্যাবসা করতে নেমে কী বিপদ ঘাড়ে নিয়েছি জান? ...যন্ত্রণা কী আমারই কম!

না! যন্ত্রণা কারুর কম না। বাবার না, মা'র না। ছবির আশেপাশের মানুষগুলোর, চেনা-জানা কারুর যন্ত্রণা কম নয়। বাবা-মা'র মতোই, বলতে না-পারা—হয়তো বুঝতে না পারাও। কিন্তু তা সবায়ের।

মা আর কাকীমা মৃদুস্বরে কথা বলছিলেন ভাত মাখতে মাখতে। ছবিকে দেখে মমতা ডাকেন, আয়, ছবি। খাবি নাকি আমাদের সঙ্গে দুটো।

ছবির যেন অনেকদিন আগের দিনগুলোয় আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে—মা'র সঙ্গে পাঠশালা থেকে এসে দুপুরে একসঙ্গে খাবার স্মৃতিটা মনে পড়ে যায়। সে ধপ করে বসে মায়ের পাশে, হেসে হাঁ করে, তুমি খাইয়ে দাও।

কাকিমা ভাতের গ্রাসটা গিলে ফেলে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলে, যাক বাবা, এতদিন পরে মেয়ের মুখে হাসি দেখলাম! এখনকার মেয়েরা সব বদলে যাচ্ছে।...আমাদের সময়—!

দিনরাত বুঝি হাসতেই কেবল?

তা জানিনে, কিন্তু তোরা! —কেমন অন্যমনস্ক হয়ে কাকিমা ঘাড় নাড়তে থাকেন, তোরা তাই বলে অমন হয়ে যাবি কেন? সেফুটা দিনরাত বিরক্ত হয়ে থাকে, তুই দিনরাত চুপ করে থাকিস। কী অত ভাবিস রে? ...কী জানি, আমরা হয়তো বুঝিনে।

কে জানে কী ভাবে ছবি। কিন্তু মাকড়শার জালবোনার মতো দিনরাত কোনো একটা সঞ্চরমান জিনিস তার মাথার মধ্যে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। সেটা যদি দুঃখ হয় ছবি তবে অসুখী, সেটা যদি ভাবনা হয় ছবির তাই সহচর। কিন্তু সে-কথা কাকিমাকে এখুনি বোঝান যাবে না—ছবির ক্ষমতা নেই।

হঠাৎ নাকী স্বরে উঠোনের ওপর থেকে কার যেন ডাক ভেসে ভেসে এল একবার—মাঁ। সেই ডাকটাই একেবারে দরজার কাছে এসে ছায়া ফেলেছে।

সেদিকে তাকিয়ে কাকিমা বলেন, ওই দেখুন, মেয়েটা আজ আবার আরও গোটা দুইকে সঙ্গে করে এনেছে। বোস, বোস ওখানে।

তাকিয়ে ছবি যেন সাপ দেখার মতো চমকে ওঠে— একি! একি! মানুষ নয় নাকি ওরা! ও কারা শীর্ণ কঙ্কালের মতো হাত বাড়িয়ে কাকিমার দেওয়া ভাত আর ফ্যান নিচ্ছে? দু'চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি ঠিকরে পড়ছে!

হাতের গ্রাস পাতে আছড়ে ফেলে ছবি উঠে আসে। কাকিমা ফিশফিশ করে বলছেন, যা, পালা সব পেছন দরজা দিয়ে। কেউ দেখলে দেখবি মজা!

ছবির ব্যাকুল মুখের দিকে তাকিয়ে মমতা বলেন, এখনও মান-লজ্জার ভয়ে চাষি-গেরস্থরা কেউ ভিক্ষেয় বেরুতে পারছে না কিন্তু একেবারে যাদের কিছু নেই...। পশ্চিমপাড়ার পাঁচু পালের পাশের ছেলে-মেয়ে ওরা, স্বামী-স্ত্রীতে ছেলে-মেয়ে দুটোকে যে কদিন পেরেছে খুদ-সেদ্ধ, শেষ চাল কটা সেদ্ধ করে খাইয়ে নিজেরা বুঝি কদিন কেবল কাঁচা কুমড়ো সেদ্ধ খেয়েছিল। গেল তো দুটোই একসঙ্গে। ...এখন ছেলে-মেয়েগুলো ভিক্ষে করছে।

ক্ষুধার প্রেতমূর্তি ছবি দেখেনি কখনও। পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েটা—ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়ানো শরীরের কঙ্কালের মতো হাত বাড়িয়ে ফেন খাচ্ছে—যেন তা পাঁচু পালের মেয়েটা নয়, ছবি নিজে।

কাকিমা কী যেন বলছেন! কী বলছেন কাকিমা বিড়বিড় করে, শুরু হয়ে গেছে!

সেই শুরুটা আজকাল সানুনাসিক স্বরে যখন তখন চেঁচায়—চাড্ডি দেও গো, ফ্যান দেও মা।

রাযদাদুদের উঠোনে আজ একদল ভিড় করেছে। ওদের হিন্দুস্থানী চাকরটা চেঁচাচ্ছে, লাঠি তুলে ভয় দেখাচ্ছে তবু যাবে না—ওদের রাঁধুনি ঠাকুর এক গামলা ফেন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে ওদের দৃষ্টি।

কয়েকজনকে দিতে গিয়ে সেটুকুও ফুরিয়ে গেছে—গামলা উলটে দেখিয়ে ঠাকুর হাসতে শুরু করলেও ওরা সে-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। দুটো মেয়ে কাড়াকাড়ি করছে একটা মাটির পাত্র নিয়ে। একজন আর একজনের গায়ে ঢিল ছুঁড়ছে, আঁচড়ে কামড়ে একে অন্যের কাপড় ছিঁড়ে দিচ্ছে, রুক্ষ চুলের গোছা টেনে ধরেছে। চাকরটা লাঠি হাতে মারতে এলে দুজনেই কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। একজন আর একজনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে হা হা করে কেঁদে ওঠে, ও-যে আমার মেয়ে! আমারে মার তোমরা, মার!

ভাঙা পাত্র দুটোর দিকে তাকিয়ে মা মেয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিল। চলে গেল হাত ধরে।

উদ্যত চোখের জল গোপন করে ছবি সরে আসে জানলা ছেড়ে কিন্তু তার পড়া হয় না, ভাবা হয় না। দু'কান ভরে কেবল ঝমঝম করে বাজতে থাকে সানুনাসিক স্বরগুলো।

অধীরকার অসুখ আজ ক'দিন খুব বেড়েছে, সেখানে ঢোকা বারণ। আর কারুর বারণ হলে ছবি তা মানত না কিন্তু বারণটা অসুস্থ মানুষটার নিজেরই। দরজার বাইরে তাকে দেখেই হাত নেড়ে অধীর আসতে বারণ করেছে।

অরুণকা, ধীরেনকা, প্রসন্নদের কাছে গেলে হয় কিন্তু কোথায় ওদের পাওয়া

যায়? সেও তো গ্রাম পেরিয়ে, সবায়ের চোখের সামনে দিয়ে জানতে যাওয়া। সে অধিকার তো তার নেই। কিন্তু তার যে জানতে হবেই। কী করছে কাকারা! বড় যে বলেছিল, একটা লোককেও মরতে দেবে না, গ্রাম ছাড়তে দেবে না! সব কি বাজে কথা—আসলে মানুষ মরবে মানুষের হাতে তৈরি করা বিপর্যয়ে!

একটা কিছু তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, বুঝে মনটাকে শান্ত করতে হবে। নইলে মানুষগুলো সব এমন করে বেড়াবে!

কখন দিশেহারার মতো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে ছবি। কাকিমা কেবল একবার পেছন থেকে ডেকেছিলেন, ও ছবি, কোথায় যাচ্ছিস—ছবি, দাদু দেখতে পেলে কিন্তু বকুনি খাবি!

সে সে-কথায় কান দেয়নি। আমবাগানের পথ ধরে পুকুরের পাড়ের ওপর এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। চোখ মেললেই তো দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। মাঠ—রুক্ষ, ধুধু করা! প্রচণ্ড আক্রোশ নিয়ে যেন হাঁ করে আছে। আর তার বুকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষ। ঘুরছে, ফিরছে, একবার মাথা নিচু করছে, আবার তুলছে মাথা—কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা। বুঝি যন্ত্রণায় ফেটে যাওয়া মাটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, জননী ধরিত্রীর পায়ে মাথা কুটছে, চোখের জলে অভিষিক্ত করছে? পরমুহূর্তেই মনে পড়ে গেল শালুক খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা, জলের ধারে ধারে কলমি শাক তুলছে, গুগলি-কাঁকড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে।

খোলা মাঠের বাতাস এসে ছবির চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। নেমে এসে সে ঘাটে পাতা কাঠখানার ওপর পা ডুবিয়ে অনেক দূর দূর গ্রামগুলোর অস্পষ্ট হয়ে আসা গাছপালাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের দিকে, প্রেতকঙ্কাল মানুষগুলোর দিকে—আর কতদিন আগের একটা ছবি ভেসে উঠতে থাকে চোখের সামনে। একটা মেয়ে ফ্যানেলের ছেঁড়া ফ্রক বাতাসে উড়িয়ে, রুক্ষ চুল দুলিয়ে ছুটেছিল একদিন শিশুমনের ক্ষোভ নিয়ে। আট বছর পরে আজ যেন আবার সে অনুভব করতে পারছে সেই মুহূর্তগুলোকে। চোখ বুঁজে সেও যেন অনুভব করতে পারছে একটা ধাবমান জীবনকে। সে ছুটেছে প্রশ্নের পেছনে—জীবনের সঙ্গে সঙ্গে। কে সে! সে কে? বুকের মধ্যে থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কে যেন বলে উঠছে ও-কথা—ওমনি চমকে উঠে চোখ খুলে তাকায় ছবি। ঘাটের ধারে পাতা যে কাঠখানায় সে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, জলের গতিব সঙ্গে মনে হচ্ছিল কাঠখানার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা তার পা দুখানাও বুঝি ওমনি অস্থির হয়ে ছুটছে। কেন যে এমন হয়!

হঠাৎ সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে গিয়ে ছবি অবাক হয়ে দেখতে থাকে অজস্র মানুষের এগিয়ে আসা লাইনটাকে! মৃদু একটা গুঞ্জন উঠছে মানুষগুলোর মধ্যে থেকে। ওদের মধ্যে থেকেই একজন তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে সামনে দাঁড়ায়

তার—তমাল!

ছবি তুমি? এখানে একা দাঁড়িয়ে আছ, বকুনি খাবে না?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে ছবি জানতে চায়, কোথায় যাচ্ছে ওরা—অত মানুষ!

ওরা রিলিফ কিচেনের দাবি নিযে চলেছে এস.ডি.ও.'র কাছে! সামনে যে ভীষণ বর্ষা, একটা কিছু তো করতে হবে।

শুধু তাইতে বাঁচবে মানুষ?

বিমর্ষ মুখে তমাল হাসে, আপাতত তো বাঁচুক, তার মধ্যে দিয়ে অনেক কাজ করানো যাবে। গঞ্জে ব্যবসায়ীদের ঘরে মজুত করা ধান-চাল আছে—আইন করে সেগুলোকে আদায় করা না যায় অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

ছবির ঠোঁট কাঁপতে থাকে, কিন্তু এ কি সহ্য করা যায়, তমালদা? আমি ওদের ভিক্ষে চাওয়ার কান্না একেবারে সইতে পারিনে।

তমাল বলে, সমিতির কৃষকবা মরে গেলেও ভিক্ষেয় বেরুবে না।—ও যাদেব দেখেছ তারা অন্য গাঁয়ের, সমিতিব বাইরের। চেষ্টা আমরাও করছি কিন্তু এরই মধ্যে পুবপাড়ার গোপাল মাঝি, নটবর, দিনু গলায় দড়ি দিয়েছে ভিক্ষে করাব লজ্জায়। মিছিল করতেও চায়নি প্রথমে, বলে, যদি না শোনে। বলে, ভিক্ষের খাওয়া খেতে পারব না। মেয়েদের বিপদ—কাপড় নেই, ঘর থেকে বেরুতে পারে না। অথচ গঞ্জে দেখ গে চোরাই ব্যাবসা কেমন ফেঁপে উঠেছে। রায়কত্তারা পর্যন্ত জমিদারি ছেড়ে চালের ব্যবসা ধরেছে—কাপড়ের, ওষুধের—যেসব জিনিস ছাড়া মানুষের চলে না।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও তমাল আবার থমকে দাঁড়ায়, অধীরদাকে খবরটা দিতে যাচ্ছিলাম, ভালোই হল। আমি এদের সঙ্গে যাচ্ছি, ছবি তুমি একটু খবরটা দিয়ে দেবে—বলবে যে মোটামুটি সব লোককেই আমরা বের করেছি মিছিলে। বলবে একটু?

ছবি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েও চুপ করে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়া দলটাকে দেখতে থাকে। তাকে কেউ ডাকেনি যাবার জন্যে—কেবল পৌঁছে দেবার কাজ তার।

মাথার ওপর দিয়ে শব্দ করে উড়ে যাচ্ছে অনেকগুলো এরোপ্লেন। অন্যমনস্কের মতো একবার চোখ তুলে তাকায় সে কিন্তু অন্যদিনের মতো গোনে না। অনেকগুলো—কী হবে গুনে?

মাথার ওপর শব্দ করে এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে, আর নীচে নিরুদ্ধ যন্ত্রণার একটা চাপা শ্বাস উঠছে এদিক থেকে—ওদিক থেকে। যে মানুষগুলো থেকে, বুকের মধ্যে থেকে।

কী যে মনে হয় কে জানে! বাড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়েও ছবি হঠাৎ ফিরে দাঁড়ায়—সামনে চোখ রেখে হেঁটে চলে, ছোটোবেলার মতো দৌড়তে পারে না কিন্তু পারলে ভালোই হত।

রায়কর্তাদের বৈঠকখানার ওপর দিয়ে চলে গেছে অত বড়ো মিছিলটা, কাজেই সেটা ছোটোখাটো ব্যাপার নয় যে চোখে পড়বে না। ঘোমটা-টানা বউদের পাশে পাশে নিজেকে লুকিয়ে গেলে হবে কী—ছবিকে দেখতে কারুর ভুল হয়নি।

তবু কথাটা যেন বিশ্বাস করা যায় না। সারা বাড়ি তোলপাড় করে দক্ষিণারঞ্জন ঘুরপাক খেতে থাকেন। কুলদা অবিশ্রান্ত পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন উঠোনের ওপর—তাঁর আজ গঞ্জে যাওয়া বন্ধ হয়েছে ছবির জন্যে।

পূর্ণশশী নিজের মনে বক বক করে চলেছেন, কত বলি, বউমা, মেয়েকে ঘর-সংসারের কাজে লাগাও। না! মেয়ে পড়বে, জেদ ধরেছে! মেয়েমানুষের আবার জেদ কি? হাঁড়ি-হাতা ধরলেই কোথায় যাবে লেখাপড়া—কোথায় থাকবে জেদ!

কুলদা একখানা সরু কঞ্চি হাতে করে সামনে বসে আছেন কিন্তু ছবি যখন ফিরে আসে তখন বেলা দুপুর। তার মুখে ক্লান্তির ছাপ, মুখের দু'পাশ একরাশ রুক্ষ-চুল উড়ে বেড়াচ্ছে, পা ভরা ধুলো কিন্তু দু'চোখ উজ্জ্বল।

ওদের সঙ্গে সেও যখন চেঁচাতে চেঁচাতে গিয়েছিল তখন পাড়ার মানুষদের অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতে দেখে, মেয়েদের ফিশফিশ করতে দেখেও কিছু মনে পড়েনি তার।

কিন্তু এখন ঠিক দুপুরবেলায় তার জন্যে অসহ্য রাগ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকা অস্নাত, অভুক্ত বাবা, ঠাকুর্দার দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে হঠাৎ হাতুড়ির ঘা পড়ার মতো মনে হয়—কিছু একটা অদ্ভুত কাজ বুঝি সে করে ফেলেছে।

কুলদা গর্জন করে কী যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে কেবল হাতের কঞ্চিখানাকেই সজোরে আছড়ে ফেলেন উঠোনে। দক্ষিণা ব্যঙ্গের হাসি হাসতে থাকেন, পূর্ণশশী অবাক হয়ে ছবির খুশি খুশি মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

মমতা এতক্ষণ দরজার আড়ালে অপেক্ষা করছিলেন মেয়ের শাস্তিটা দেখবার আশায়। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে হিড় হিড় করে টেনে ছবিকে সুখদার ঘরের মধ্যে টেনে আনেন, কী ভেবেছিস তুই বল?—

মা কাঁদছে!

মেয়ে তাকায় মায়ের মুখের দিকে। এ মুখের সঙ্গে সেই সাত-আট বছর আগের দেখা মুখের খুব মিল, একটু শীর্ণ হয়েছে, একটু কুঁচকে গেছে কিন্তু যন্ত্রণার ছাপটা তেমনি আছে। তখনও মমতা তাকে মারতেন, বকতেন আর নিজেই কেঁদে

ফেলতেন।

চোখের জল মুছে ফেলে মমতা বলতে থাকেন, তোর পড়ার জন্যে কম কথা শুনতে হয় আমাকে? তবু যা হোক পড়াটাকে মেনে নিয়েছে সবাই, এখন আবার এসব কী? কী বলে তুই অত বড়ো মেয়ে চাষা-ভুসোদের সঙ্গে ছুটলি? শুনলাম প্রসন্ন, ধীরেন—আরও নাকি ছেলেরা সব ছিল। কী ভেবেছিস তুই? আমি যে স্বপ্নেও এ-কথা ভাবতে পারিনি ছবি, এত সাহস তোর হবে।

থাকতে পারলাম না মা! —অনেক চেষ্টায় ছবি এটুকুর বেশি বলতে পারে না।

মমতা তার কথায় কানও দেন না, বলে চলেন, এই করে করে অধীর প্রাণটা শেষ করেছে। ছেলে কোথায় লড়াই না কী করে জেল খাটছে। না হয় মানলাম তারা ছেলে—বাধা দিলে মানে না। কিন্তু তুই!... ভেবেছিলাম পাসটা করলে তোর খুব ভালো বিয়ে দেব ছবি... আমার জীবনে যে ইচ্ছে পূর্ণ হল না, তোর হবে। সব মিথ্যে করে দিবি?

কী ইচ্ছে মা'র জীবনে? কে জানে মিথ্যে হবে কিনা। ছবি ব্যথিত মুখে চুপ করে থাকে, মমতাও আবার কী বলতে গিয়ে চমকে থেমে গিয়ে বাইরে আসেন।

কার কান্না বোঝা যায় বাইরে এসে—লতু পিসিব আর অধীরকার মা নতুন দিদিমা।

এ বাড়ির আর ও বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে শান্ত, কম কথা বলা মানুষটা আজ সবচেয়ে সরব হয়ে উঠেছে।

কী হয়েছে? কী?

অজস্র-কান্নায় ভেঙে পড়ে কথা বলতে পারছেন না নতুন দিদিমা। ঠকঠক করে রোয়াকে মাথা কুটছেন। কি হয়েছে কি! ও কাকিমা—মমতা দু'হাতে জোরে নাড়া দিতে থাকেন।

লতু! লতু!

কী? কী হয়েছে তার?

নতুন দিদিমা কেবল হাত দিয়ে খিড়কির পুকুরের দিকটা দেখিয়ে দিতে ছবি আর সেফু ছোটে সেদিকে।

খিড়কি পুকুরের উত্তর দিকে নতুন দিদিমাদের একটা ঢেঁকি ঘর আছে। তার উঁচু বাঁশের সঙ্গে দড়ি বেঁধে একটা কোণে লতু পিসি ঝুলছে।

সেই পরিচিত দৃশ্য! সভয়ে চোখ বুঁজে ছবি থরথর করে কাঁপে।

হায়রে কপাল। আজ কি সকাল থেকে কেউ আসেনি এদিকটায়— কেউ দেখতে পায়নি আগে-ভাগে। তাহলেও হয়তো বাঁচানো যেত মেয়েটাকে।

কিন্তু কী হবে বাঁচিয়ে? একটা বোকা, কালো-কুচ্ছিত মেয়ে! বুদ্ধি কম বলে

যাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তাকে নতুন দিদিমাই বা কত আর রেখে ঢেকে চলতে পারেন! যখন জীবনটা তাঁরও যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে—মৃত্যুপথযাত্রী ছেলেটাকে সময়মতো একটু পথ্য দিতে না পেরে। যখন বুড়ো স্বামী কাঁপতে কাঁপতে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছেন—তখন মেয়েটাকে বিষের মতো লাগে। অত বড়ো মেয়ে খিদে পেলে কাঁদে, তাঁর ছেলের চিরকালের শত্রু ওই রায়কত্তার বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে আসে পেটের জ্বালায়।

নতুন দিদিমা তাই ওকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন, মর মর, গলায় দড়ি দিয়ে মর।

মরেছে মরেছে, কিন্তু চুপ! চুপ! এ যে কলঙ্ক!

অর্ধমূর্ছিত নতুন দিদিমাকে ধরাধরি করে ঘরে তুলে দিয়ে আসা হয়। কাঁদবে কিন্তু আস্তে!

থানা-পুলিশ হবেই কিন্তু তাকে গড়াতে দেওয়া হবে না বেশি দূর।

আজ বাবা, দাদু, হরিদাদু সবাই এক জায়গায়— একসঙ্গে পরামর্শ করছেন। এ সময় দূরে দূরে থাকলে চলে না।

বারান্দায় খেতে দেওয়া হয়েছে তিনজনকেই। হরিদাদুর হাত কাঁপছে থরথর করে—ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে পারছেন না। বাবা আব দাদু খুব গম্ভীর। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। এখন ছবির ব্যাপারটা ভুলে গেছে সবাই।

কেবল নতুন দিদিমার চাপা-চাপা কান্নার একটা রেশ থেকে থেকে ভেসে আসছে।

এ বাড়ির একটা মেয়ে মরেছে। হাবা, বোকা, কালো-কুচ্ছিত শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া একটা মেয়ে!

তার অন্য কোন অনুভূতি ছিল না কিন্তু একটা কিছু ছিল—ক্ষুধা! সে জ্বালায় জ্বলে যাওয়া মানুষগুলোর পেছনেই তো আজ ছুটেছিল ছবিও।



সাতাশ

শুরুতে যাকে ছেলেমানুষি বলে উপেক্ষা করা গিয়েছিল—একটু বকুনি, দু-একবার গর্জন আর খানিকটা ভয় দেখানর পরই যে ইচ্ছেটা চলে যাবার কথা, সেটাই এখন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সে প্রসন্ন, ধীরেনদের সঙ্গে দু'একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে চলে যায়।

যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেছে কিংবা না খেয়ে মরেছে তাদের হাঁ-করা খালি বাড়িগুলো দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। বলে, ছাই সমিতি আপনাদের, ধীরেনদা। চলে যাওয়া ঠেকাতে পারেননি!

যেখানে অনেকগুলো মাথা গোল হয়ে বলে, মানুষ জমে, সেখানেই ঠেলে-ঠুলে জায়গা করে নিয়ে ছবিও হাঁ করে শোনে।

চেঁচামেচি, হইচই করেন দক্ষিণারঞ্জন। ছবির সম্পর্কে নিত্যনতুন এক একটা খবর জোগাড় হয়ে তার কানে আসছে কিন্তু কী করা যায় কেউ ভেবে পায় না।

সরস্বতীর বড় ভয় সবাইকে। সে ফিশফিশ করে ভয়ে ভয়ে বলে , তালা দিয়ে রাখলে হয় না দিদি?

হয়! কিন্তু রাখবে কে?

যা বলা যায় তা সব সময় করা যায় না।

ছবি! ছবি! —ছবি বাড়িতে নেই। কখন কোন্ এক ফাঁকে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে, আর হয়তো ফিরবে সন্ধের অন্ধকারে।

গালাগাল দাও—ভয় দেখাও—মেয়েটা হাসতে শিখে গেছে।

এ কী সাহস! এ দুঃসাহস পেল কোথায়? ঝুলে পড়া ভুরুর নীচে এখনও

চোখ জ্বলে ওঠে মাঝে মাঝে দক্ষিণারঞ্জনের। মনে পড়ে আগের দিনগুলোর কথা। বাইরে থেকে ভেতরে আসতেন তিনি, তাঁর চটির শব্দ পেয়ে মেয়ে-বৌরা যে যেখানে পারত ছুটে পালাত, ছোটো ছেলেরা কান্না থামিয়ে চুপ করে যেত। প্রৌঢ়া পূর্ণশশী পর্যন্ত ভালো করে গায়ের কাপড় আর ঘোমটা টেনে দিতেন।

সেই তিনিই তো এখনও আছেন। এখনও গর্জন করে উঠলে বাড়িশুদ্ধ সবাই ভয় পায়—কেবল কুলদার মেয়েটা।

সবাইকে শুনিয়ে বলেন, কেউ পারবে না তো, আমিই ও মেয়েকে শায়েস্তা করব।

কিন্তু শায়েস্তা করা যায় না।

ভিটেখাকির মাঠের পশ্চিমদিকের যে পোড়ো দালানটা এতদিন শেয়াল-খাটাশের রাজত্ব হয়ে ছিল তা সরিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করেছে ছেলেবা।

সমিতির দাবি অনুসারে রিলিফ কিচেন খুলতে একজন সরকারি কর্মচারী এসেছেন। তাঁকে ওই বাড়ির ভাল ঘরখানা ছেড়ে দিতে হবে।

প্রসন্ন বলে, ঘর দেওয়া যাবে না। আমরা দুটো ঘরে হাসপাতালের বেড পাতব, একটাতে করব স্কুল, আর একটাতে ওদের হাতের কাজ থাকবে, বাকিটাতে রান্না হবে। ...সরকারি টাকা বরাদ্দ আছে—তাঁবু খাটিয়ে থাকুন গে আপনি, মস্ত বড়ো উঠোন তো আছেই। ...কিন্তু এইসব লোকজনকে আপনার ফাই-ফরমাশ খাটাবেন না কখনও।

সরকারি কর্মচারী চটে যান খুব, তিনিও বলেন, ওসব সমিতি-টমিতি বুঝিনে। আপনাদের কাজ তো লোক খেপানো—খাওয়াবেন সরকারের, উসকাবেন আবার তার বিরুদ্ধেই।

ধীরেন, প্রসন্নর বয়স বেশি, তারা সেসব কথা শুনে রাগে না, হাসে। রাগে তমাল। তমালের বয়সি ছেলেরা। বলে, বাজে কথা বলবেন না। কাজ করতে এসেছেন করে যান। সরকারি খাওয়া খাওয়াচ্ছেন কিন্তু ধান-চাল কি সরকার ফলায়? যাদের জিনিস তাদেরই দান করে বদান্যতা। যত চোট-পাট তো এই আধমরা মানুষগুলোর ওপর—বড়ো বড়ো মজুতদারের কাছে তো জোড়হাত...।

চেঁচামেচি, হইচই। রিলিফ কিচেন প্রায় বন্ধ হয়। সরকারি কর্মচারী ওপরে লিখে পাঠান—এইসব কর্মীদের হাতে তিনি কাজ ছেড়ে দিতে পারবেন না।

তখনও ছুটোছুটি করতে হয় ধীরেনদেরই। গাঁয়ের গণ্য-মান্য লোকদের নিয়ে কমিটি তৈরি হয়েছে, সুখদাকে তার সভাপতি হতে হবে।

সুখদা বলেন, আমি? ...হতে পারি... কাজ তো ভালোই কিন্তু আমাকে কেন? ...আমি?

ছবি হাসিমুখে বলে, হ্যাঁ কাকা, তুমিই। অধীরকা তোমার কথাই বলেছে—

হতেই হবে তোমাকে।

শুনে দক্ষিণা খানিক অবাক হয়ে থাকেন তারপর বিড় বিড় করেন পাগলের মতো এবার কেঁচো খুঁড়তো সাপ বেরুবে... দেখো। ঠিক বেরুবে।

সাপ বেরোয় না কিন্তু একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। ছবির ওপর ভার ছিল রিলিফ কিচেনটার, মায়া এসে জুটেছে কবে যেন। সেও কাজ করবে। আজকাল সে আর অধীরের ঘরে.ঢুকতে পায় না, নতুন দিদিমা একদিন দেখতে পেয়ে যা-তা বলেছেন। এখানে আসে বলে বাড়িতে তার শাস্তির সীমা নেই, মামীদের মারধরও চলে কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করে না মায়া।

ছবি জানতে চাইলে চোখের জল মুছে ফেলে হাসে, বলুক গে, মারধর কিছুই আমার গায়ে লাগে না। নতুন কাকিমা বলেছেন—বিধবার নিঃশ্বাসে নাকি অধীরদার ক্ষতি হবে... বলুক। না হয় যাব না, শুধু কেমন থাকে তুই মাঝে মাঝে জেনে এসে জানাস।

মায়াদির মুখের দিকে তাকিয়ে দুর্গার কথা মনে পড়ে যায়। দুজনেরই কষ্ট কিন্তু দুটো দু'রকমের কষ্ট। দুর্গাকে সবাই প্রশংসা করে, তার কৃচ্ছ্রসাধন, তার নিয়ম-ব্রত দেখে লোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু ছবি তো জানে, দুর্গা কী চায়? মায়াদিকে কেউ দেখতে পারে না অধীরকাকার সঙ্গে তার ভাবের কথা সবাই জানে, কোথাও তাই স্থান নেই মায়াদির। মামীমা তাকে দিনে তিনবার করে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। মায়া বলে, ওই মামার জন্যে, জানিস ছবি, কোথাও যে চলে যাব তার উপায় নেই। মামা বড্ড ভালোবাসে।

হয়তো লতুপিসির মতো একদিন মায়াদিও গলায় দড়ি দেবে নয়তো জলে ঝাঁপ দেবে। এর বেশি আর কী করবার আছে— কী করতে পারে?

কিন্তু ঘরে-বাইরে-মনে এত যন্ত্রণা সহ্য করেও মায়া আত্মহত্যা করে না। করে অন্য কাজ। কোমর বেঁধে অফিসারের সঙ্গে ঝগড়া করে বসে একদিন।

মায়ার ওপর ভার ছিল মেয়েদের কাগজ পড়িয়ে শোনানোর—লেখাপড়া শেখানোর। সেই পড়ে শোনানো কাগজখানা হঠাৎ হাত থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে অফিসার বলে, ওসব কথা এখানে বসে বলা চলবে না। এটা সরকারের খয়রাতি খাওয়ানোর জায়গা—তার পক্ষে কথা না বলতে পারেন, বিপক্ষেও বলতে পারবেন না।

একশোবার বলব, —মায়া রুখে উঠে বলে, দিন কাগজ। কাগজটা আগে বেআইনি হোক তারপর আপনার বারণ শুনব।

শুধু কাগজ নয়, ওসব গান-ফানও এখানে গাওয়ানো চলবে না। ওই যে— বিদেশী সরকার ঘরে, দুয়ারে দুশমন..., ওই সব।

মায়া বলে, একশোবার গাইব। বিদেশি সরকারকে কি স্বদেশি বলতে হবে

নাকি?

না বলতে পারেন, এখানে কাজ করবেন না। আপনাদের কে ডেকেছে? রিলিফ কিচেনের নামে কাগজ পড়ানো, গান শেখানো, সরকারের বিরুদ্ধে উসকানি—এই তো করেন আপনারা।

চেঁচামেচি, হইহল্লা শুনে ছেলেরা এসে হাজির। ছবি আসে। ফুলমণি, বাতাসী, হরিদাসী চেঁচায় অফিসারের উদ্দেশ্যে। তিনি নাকি মাঝে-মাঝেই কেউ না থাকলে ওদের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করেন, মাঝে মাঝে ফাই-ফরমাশ খাটান, অল্পবয়সি মেয়েদের সঙ্গে রসালাপ করেন।

প্রসন্ন বলে, দেখুন সরকার তো ইংরেজ কিন্তু দেশটা তো আমাদের। মনে-প্রাণে অত ইংরেজ ভক্তি শেখার কি আলাদা কলেজ আছে নাকি?

অফিসার চুপ করে থাকে।

তমাল বলে, দেখুন, এরা সাময়িকভাবে রিলিফ কিচেনে খাটছে বটে কিন্তু মনে রাখবেন ওরা ভিখারি নয়। ওদের পড়ানো, বোঝানো, শেখানো সব আমরা করবই।

এখানে মিটিং হতে পারবে না।

তাও হবে—মায়া বলে।

অফিসারের একটা মতলব ছিল সেটা পরে বোঝা যায়। তার পরোক্ষ চাপটা রায়কত্তার ওপর কী করে কাজ করে কে জানে কিন্তু রায়কত্তার বাঁধা পুরোহিত মায়ার মামা হারাণ ভট্টাচার্যের জীবিকার উপায়টুকু বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

মায়ার আসা বন্ধ হয়—এবার হারাণ ঠাকুর নিজে তাকে ঘরে বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছেন। প্রসন্ন, ধীরেনের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারীকে কাজে বাধা দেবার অভিযোগ আসে, তাদের মাঝে মাঝে থানায় হাজিরা দিতে হয়।

কেবল বাদ পড়ে যায় তমাল আর ছবি। অফিসার তমালকে বলেন, ওরা না হয় গেঁয়ো কর্মী, লেখা-পড়া জানা নেই, মাথায় আছে কেবল কতগুলো বুলি—চাষা-ভুসো নিয়ে কারবার, কিন্তু আপনি তো মশাই শিক্ষিত ছেলে, কলকাতায় থাকেন। আপনি কেন ওদের সঙ্গে। ...আর উনিও... মিস রায়ের কথা বলছি আমি। এত বড়ো বংশের মেয়ে, ওঁর কী এভাবে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ানো উচিত।

গম্ভীর হয়ে তমাল বলে, হুঁ, রায়বাবুদের বৈঠকখানার মজলিশটা তাহলে বৃথা যায়নি।

ছবির মুখে সব শুনে অধীর বলে, মায়াটা তাহলে সাহস দেখিয়েছে তো। যতটা ভীতু ভাবি তা নয়। আসলে ওর নিজের অবস্থাটা ও বুঝে নিতে শিখছে...কিন্তু ওর কী হবে বলতে পারিস, ছবি?

অধীরকাকাই যখন বলতে পারে না ছবি কী বলবে? তবে তার মনে একটা

দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, মায়াদি কখনও অমন আটকে থাকবে না। যতই ওরা তালাবন্ধ করে রাখুক। যেমন ছটফট করতে করতে এসে কাজে নেমেছিল, তেমনি ছটফট করতে করতেই বেরিয়ে আসবে একদিন।

অধীর বলে, তোর তবু ভবিষ্যতের পথ খোলা আছে—কিন্তু ওর কী হবে। এইসব মেয়েদেরই জ্বালা বেশি—যন্ত্রণার উপলব্ধি আছে কিন্তু উপশম নেই। যদি পারিস ওদের জন্যে কিছু ভাবিস, ছবি।

কিন্তু ছবিরই বা কী আছে?

তার কাজের নেশা আছে, বাড়ির বাধা না-মানার একটা জেদ আছে। আর মনের মধ্যে লুকনো একটা যন্ত্রণা আছে। লেখাপড়া সে ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে-কথা ভাববার সময় নেই।

শৈল আজকাল বানান করে নাম লিখতে শিখে কাজ ফেলে দিনরাত এখানে-ওখানে তার নাম লিখে বেড়াচ্ছে। শিশুর মতো কৌতূহলে সে নিজের লেখা নামটা দেখে আর বলে, আমি দেব দিদি সগলরে শেখায়ে-পড়ায়ে। এ-দিন যখন চলে যাবি, গেরামে ফিরে আমরা ইস্কুল খোলবো—আমি হব তার মাস্টার—কি কও?

বর্ষার জলে ঘেরা দ্বীপের মতো এই রিলিফ কিচেনটায় আসে বটে ওরা খেতে, বসে পাত পেতে, কিন্তু সমস্ত মন ওদের পড়ে থাকে গ্রামের দিকে। হৃৎপিণ্ডটা যেন উপড়ে রেখে এসেছে সেখানে—সেই ভাঙা ঘরের দাওয়ায়, তেলের অভাবে আলো না জ্বালা অন্ধকার ঘরের কোণগুলোয়।

দু'বেলার খাওয়া একবেলা সেরে যায় রিলিফ কিচেনে। ওদের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরাও জানে বাড়ি ফিরে উনুন জ্বলবে না কারোর ঘরে। ভূতের মতো, প্রেতের মতো মানুষগুলো বসে থাকবে, নিঃশ্বাস ফেলবে, কথা বলবে, তারপর ঘরে গিয়ে এককোণে ছেড়ে রাখবে পরনের গামছাখানা কিংবা শতছিদ্র ধুতি। এই পরেই তো আবার বেরুতে হবে কাল—তার পরের দিন—অনেক—অনেক দিন। যতদিন না থাকে এই পোড়াকপালে যুদ্ধ। যতদিন না এই মরা শরীরগুলো নিয়ে মরতে মরতেও লাঙলের আগা চেপে ধরে পুরুষেরা—জোয়ান-মদ্দ ছেলেগুলো। সেই আশা আছে বলেই এখন আর বাজরা-গমের খিচুড়ি খেতে গিয়ে কেঁদে কেউ উঠে আসে না। শক্তি সঞ্চয় করে।

একবার মেয়েদের দলের মধ্যে, একবার হাসপাতালের ঘরগুলোয়—এখানে-ওখানে-সেখানে ছটফট করে ঘুরে বেড়ায় ছবি। সবায়ের মুখের দিকে তাকায়। লাঙল-ধরা হাতে গম পিষছে জাঁতায়, মাটিতে সার দেবার বদলে ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চাল করতে বসেছে ও কারা? লজ্জায় যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে জোয়ান-মদ্দ ফসল ফলানো মানুষগুলো। ওরা হাসে না, গল্প করে না। কাজ থাকলে কাজ করে নয়তো চুপচাপ বসে থাকে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

ছবির প্রথম প্রথম ওমনি লজ্জা হয়েছিল রিলিফের নামে। এই নাকি কাজ! কোনও মতে প্রাণগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা! খিচুড়ি খাওয়ানো, কাপড় বিলি করা—ওতো সেবাশ্রমের কাজ। তার জন্যে পড়াশোনার দরকার কেন? কেন মিটিং-মিছিল করতে হয়? ভবিষ্যতের কোন আশা রাখা যায় সামনে?

ধীরেন, প্রসন্নদের একটা সম্মিলিত চেষ্টা ছিল ছবিকে বোঝানোর। প্রশ্নের উত্তর না পেলে, ভালো করে কিছু না বুঝলে এই ছটফটে মেয়েটা কিছুতেই কাজে মন দিতে পারে না তা ওরা দেখেছে। নানা তুলনা-উপমার মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে প্রৌঢ় প্রসন্ন, গ্রামে সারাজীবন কাটানো সাদাসিধে সরল চেহারার মানুষটা এমন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে হেসেছে যে ছবির তখন বোঝার অস্থিরতাটা বেড়ে গিয়ে চোখে জল এসে গেছে। যদি ভালো করে বোঝাই না হল, যদি জানতেই না পারলে ভবিষ্যতের কোন প্রেরণা তাকে বাড়ির বাধা, বংশের বাধা ভেঙে টেনে বার করেছে—তবে কী হবে এসব করে। থাক পড়ে এসব। এখুনি সে মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে পালাবে। খিদের জ্বালায় হতাশ্বাস মানুষগুলোর যন্ত্রণা তাকে না হয় একটু ব্যথিত করবে কিন্তু তার বেশি হবে কেন?

প্রসন্ন, ধীরেনদের কথার চেয়েও বেশি কাজ হয়েছে তমালের অভিজ্ঞতায়। বিয়াল্লিশের প্রাণ দেওয়া-নেওয়া এখনও তার চোখের সামনে টাটকা হয়ে আছে। বলতে গিয়ে এখনও তার চোখ জ্বলে, সে বোঝালে ছবি অনেকখানি জোর পায়।

জোর পেয়েছে প্রদীপের চিঠিতেও জেল থেকে অধীরের কাছে লেখা চিঠি—তাতে নতুন উপলব্ধির কথা আছে।

আজকাল তাই আর শক্ত হয়ে থাকে না, রান্নাঘরে কাঁচা কাঠের বোঝা সে উপুড় হয়ে ফুঁ দিয়ে জ্বালানোর চেষ্টা করে। সকাল থেকে সারাদিনে মানুষগুলোর বরাদ্দ একবার খাওয়ার এই চাল-ডাল আর বাজরা-গম মেশানো খিচুড়ি—তাও দিতে দেরি হচ্ছে। বাইরে ওরা পাতা পেতে বসে আছে।

পেছন থেকে তমাল তাকে সরিয়ে দেয়, বলে, খিচুড়ি খাইয়ে বাঁচিয়ে কী হবে বলে তো খুব চেঁচামেচি করে বেড়ালে কদিন। এখন আবার উনুনের ধারে কেন? চোখ দিয়ে কেমন জল গড়াচ্ছে দেখ। সর শিগ্গির।

অরুণ বলে, সত্যি ছবি, রাত্তিরে ঘুমোতে পারবিনে শেষে। চোখে এমন বিঁধবে সূচের মতো।

সেকি নতুন নাকি? পর পর কয়েক রাত তো সত্যিই ঘুমোতে পারে না ছবি চোখের জ্বালায়। সে-কথা আবার বলাও যায় না কাউকে। ঘুরে ঘুরে, খেটে খেটে, তার চেহারাও হয়েছে এক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের মতো।

খাবার পাবার আশায় যে কলরব উঠেছিল, খেতে পেয়ে মানুষগুলো হঠাৎ থেমে যায়, নিস্তব্ধ হয়ে থাকে সমস্ত উঠোনটা।

ছবি বলে, ওকি— তুমি খাচ্ছ না যে তারক?

হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে মাঝবয়সি তারক মণ্ডল, তারপর ছুট দেয়। ঘাটে বাঁধা কার না কার ডিঙি নৌকো খুলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অশ্লীল গালাগালি দিতে দিতে।

কে যেন বলে, ওর মাথাডা খারাপ হয়ে গেছে। জোয়ান নাতিটার মরার শোক ভুলতি পারে নাই, কয়দিন আগে ম্যায়্যেডারেও কেডা বুঝি টাকার লোভ দেখায়ে শহরে নিয়ে গেছে।

তারপর আর কেউ কোনও কথা বলে না, নিস্তব্ধ হয়ে যায়— গামছায় চোখ মোছে।

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেও একটা অঘটন ঘটে যায়।

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে আজ দক্ষিণারঞ্জন নিজে চলে এসেছেন ছবিকে নিয়ে যেতে। রায়কত্তার চাকর মানিক নৌকো বেয়ে এনেছে তাঁকে—রায়কত্তার অনুমতি নিয়ে।

একখানা লিকলিকে বেত হাতে ছিল, কিন্তু শান্ত গলায় বলেন, চল, বাড়ি চল। ছোটোলোকগুলোকে নিয়ে মাতামাতি তো অনেক করলে—আর না। গ্রামের কোন ভদ্দরলোকেব মেয়েটা আসে এখানে যে তুমি এসেছ?

ছবি বলে, কেউ আসে না বলে যে আমিও আসব না—তার তো মানে নেই।

মেয়েমানুষের এসব করতে নেই। তা ছাড়া পরিবারের সম্মান অছে, আমাদের বংশে এসব কখনও হয়নি, ওসব শহরে চলে।

শহরে থেকে তো লেখা-পড়া শিখেছি, তাও তো আপনি করতে দেবেন না।

দক্ষিণা ভেবেছিলেন মিষ্টি কথা বলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, সহজে রাগতে তিনি চাননি। বলেছিলেন ছবিকে একপাশে ডাকিয়ে এনে—কথাও হচ্ছিল চাপা চাপা গলায়। কিন্তু আর ধৈর্য থাকে না তাঁর, উষ্ণ গলায় বলেন, মেয়েমানুষের কাজ ঘর-সংসার করা, বিদুষী হওয়াও নয়, স্বদেশি করাও নয়। তোমার জন্যে গ্রামে কত অখ্যাতি রটেছে আমাদের জানো? তোমার বাবার ব্যাবসার ক্ষতি হতে পারে তা জানো?

জানে ছবি সবই—সে চুপ করে থাকে।

দক্ষিণা বলেন, কি যাবে না?

হঠাৎ কী মনে হয়, ছবি বলে, যাব না। এখনও অনেক কাজ আছে আমার।

এবার রাগে দিশেহারা হতে হয়, বেতখানা উঁচিয়ে বারকয়েক বাতাসে নাচান দক্ষিণা, মানসম্মানের কথা তুমি যখন ভুলেছো তখন...।

মারবেন নাকি ছবিকে? কাঠের পুতুলের মতো শক্ত আর আড়ষ্ট হয়ে থাকে ছবি—তার মাথা টলছে, পা কাঁপছে। এতগুলো লোকের সামনে...!

হঠাৎ সেই আন্দোলিত বেতখানাকে কেড়ে নেয় পেছন থেকে শশী মাঝি, রাখেন বুড়ো কত্তা, এ কামড়া আমাগারে সামনে আর করতি দেব না। বরং আমারে দুই ঘা জুতোর বাড়ি মারেন...ওতে লজ্জা নেই।

তার কথাগুলো বিনীত কিন্তু দক্ষিণার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে অপমানে। মনে পড়ে যায়—কয়েক বছর আগে এই শশীকেই তিনি বিনাকারণে বিদ্যাসাগরি চটি দিয়ে মেরেছিলেন। সেদিনও এমনি একটা ভিড় ছিল—সেদিনও ওই মেয়েটা সেখানে ছিল।

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি নৌকোয় গিয়ে বসেন। মাণিককেও যেতে হয় কিন্তু যাবার আগে সে দাঁত বার করে হাসে, বলে, বেশ করেছ শশী। যায়ে না দিদিঠাইরেন! বললিই যাতি হবি? সগ্‌গলেই কি মানিক নাকি?

রান্নাঘরে দাউ দাউ করে উনুন জ্বলছে, তাকানো যায় না। তবু তার মধ্যেই একসময় মৃদু ভৎর্সনা করে তমাল বলে, কেন গেলে না ছবি? এমন করে বারেবারে কত সহ্য করবে?

ছবি অবাক হয়ে তাকায়। তার মুখে চিন্তা আছে কিন্তু অপমানের গ্লানি নেই, বলে, একেবারে নতুন কথা শোনাচ্ছেন তমালদা। এইটুকুতেই ভয় পেয়ে যাব? বিশ্বাসের জন্যে লোকে প্রাণ দেয় না?

তমাল বলে, আমি তোমাকে আসলে পরীক্ষা করছিলাম ছবি। তাতে দেখছি ফুলমার্ক কিন্তু..., হঠাৎ কী হয়, তমাল ছবির হাত ধরে, একটা কথা রাখবে ছবি? পড়াশোনাটাও করো, বছরটা নষ্ট করো না?

হেসে ফেলে সে বলে, আমার জন্যে বড্ড আপনার মাথা-ব্যথা তমালদা। কেন বলুন তো?

আগুনের তাপে কালো মুখ লাল দেখাচ্ছিল, আবার কালো হয় যায়। তমাল মাথা নিচু করে থাকে একটুখানি সময়। দুটো উনুনের একটা হঠাৎ নিভে গেছে, সেটা ধরাতে যাবার আগে তমাল গভীর স্বরে ডাকে, ছবি!

মাথা তুলে তাকাতেই দুজনের দৃষ্টি মিলে যায়। তার মুখ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। বলে, একদিন বুঝবে তুমিই। সেদিন আর ও-কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হবে না— বুঝেছ?

বুঝবে ছবি! কেন ও-কথা বলল তমাল? ছবি কিছু বুঝতে চায় না, কিছু শুনতে চায় না!

সে লুকিয়ে থাকবে, পালিয়ে থাকবে—তবু বুঝে তার দরকার নেই। কেন এমন হল তার? কেন?

দক্ষিণারঞ্জন সেদিন তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি, সেজন্যে বাড়িতে কেউ তাকে একটা কথা বলল না, এত বড়ো অসম্ভব ব্যাপারটাও যেন আর ভেবে

দেখবার ক্ষমতা নেই তার।

দিনরাত সেই কথাটা তাকে ভাবাচ্ছে, বুঝবে ছবি!

ছবি কি বোঝেনি তা? তাহলে সে মাঝে মাঝে ফিশফিশ করে কেন নিজের মনেই, আর ভাবব না আমি, আর যাব না। চলে যাক... তারপর।

কিন্তু তা হয় না। না গেলে ভালো লাগে না, না দেখলে ভালো লাগে না— এ ছবির কী হল? মাঝে মাঝে মনের যন্ত্রণায় সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। মাঝে মাঝে মাথা নাড়ে, নিজের মনের সঙ্গে কথা বলে, এসব কথা ভাবতে নেই ছিঃ। যা অসম্ভব তাকে ভাবতে নেই—। এ যে লজ্জা—মনে মনে ভাবাও লজ্জা!

কী রকম লজ্জা! শহরে থাকতে বন্ধু মিনু যখন বলেছিল, তোরা হিন্দু তাই, নইলে আমার দাদার সঙ্গে তোর বেশ বিয়ে হত..., অতটুকু মেয়ে সে, সেদিনও লজ্জা পেয়েছিল।

এ কি সেই লজ্জা?

লজ্জা নয়—কষ্ট। একটা ভয়ংকর যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে মারছে—মুখের দিকে সহজ করে না তাকাতে পারার, গলার স্বর শুনে চমকে ওঠার কষ্ট।

কেন যে এমন হল তার?

বুঝেছে ছবি! সেই বোঝাটা তার চোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ওপাশের বিছানায় মমতা ঘুমোচ্ছেন পাশ ফিরে, জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বিছানায়। শ্রাবণ পূর্ণিমা বুঝি আজ! চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেলে জলের মধ্যে ডুবে যাওয়া দ্বীপের মতো গ্রামটা জেগে থাকে তার শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ নিয়ে।

এর আগেও ঘুম ভেঙে বিছানায় জেগে বসে থেকেছে সে কতদিন—কান পেতে শুনেছে জলের ওপর দিয়ে নৌকো বেয়ে যাবার ছপ্‌ছপ্ শব্দ, নয়তো অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কোনো নৌকোর মাঝির ভাটিয়ালি সুর। বাইরে রাতজাগা পাখি ডেকেছে, জ্যোৎস্নার আলো-কে সকাল ভেবে পাখির বাসায় ঘুম ভাঙা পাখিরাও কলরব করে উঠেছে।

শুনেছে সে। শুনতে শুনতে ভেবেছে রিলিফ কিচেনের কথা, দুর্ভিক্ষ, দেশ, তার কাজের কথা। সব মেলানো একটা চিন্তা। তাতে উদ্বেগ ছিল কিন্তু কষ্ট ছিল না। শান্তি হয়তো ছিল না কিন্তু যন্ত্রণাও তো ছিল না।

সে এ বাড়ির একটা অবাধ্য মেয়ে! তার ঘাড় বাঁকানো জেদ আছে—সেজন্যে সে সব সহ্য করতে পারে।

কিন্তু একটা কষ্ট আছে সেটা আজ তাকে কাঁদাচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল পড়ে তার বালিশ ভিজে যাচ্ছে। কেন কাঁদছে সে, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা ভারী সুন্দর বাঁশির শব্দ তাকে কষ্ট দিচ্ছে বলে?

নিঃশব্দে দরজা খুলে ছবি ছাদে আসে। মেঘে ঢাকা জ্যোৎস্নায় সারা বাড়িটা যেন স্নান করছে। পশ্চিম দিকের ভাঙা দালানের মাথায় যে বটগাছটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এখন আস্তে আস্তে শাখা-পল্লবে বড়ো হয়ে উঠেছে তার মাথা দোলানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—নারকেল পাতার শিরশিরানি শোনা যাচ্ছে, কানে আসছে নিশাচর পাখির ডাক। বাঁশিটা হঠাৎ একসময় থেমে গেছে, কারা যেন হেসে উঠল হো হো করে। কে? বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো হঠাৎ সারা শরীরটা কেঁপে ওঠে।

জলের ওপর দিয়ে ভেসে আসা বৈঠার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। কে যেন বলছে, বাঁশি তো শুনলে, এবার তুমি একটা গান গাও তমাল।

ছাদের কার্নিশে ভর দিয়ে ছবি কান পেতে থাকে—সারাদিনের কাজের ব্যস্ততার মধ্যে যাদের সত্যিকার স্বরূপটাকে ধরা যায় না, মনে হয় বুঝি ওরা অকরুণ, রুক্ষ্ম-কঠোর, বুঝি গেঁয়ো-মনটা ওদের চাপা পড়ে আছে শুধু কাজের কথায়—আর কিছু নয়।

সত্যি তা নয়, জ্যোৎস্না রাতে ওরা নৌকোয় বেড়াতে বেরিয়েছে। প্রসন্নর গলা পাওয়া যাচ্ছে, ধীরেন আছে—হাসছে, কথা বলছে। আর আছে সেই ছেলেটা—যাকে ছবি ভুলে থাকতে চায়। যার কথা ভাবলে কান্না ছাড়া কোনো পথ থাকে না।

তমাল বলে, আমি তো গাইতে জানিনে অরুণদা কিন্তু কবিতা শোনাতে পারি—শুনবেন? অন্য কিছু নয়—রবিঠাকুরের শুনবেন?

শুনব শুনব, —অরুণ উচ্চকণ্ঠে বলে।

দেশপ্রেমের কবিতা কিছু জান না তমাল? তোমরা তো শহুরে ছেলে।

আঃ প্রসন্নদা—বড়ো ঘ্যানঘ্যান করেন আপনি—শুনুন না, অরুণ ধমক দেয়।

কে যেন হেসে ওঠে হো হো করে, প্রসন্নদা একেবারে গেছেন—কবিতা শুনবেন তাও এমন কিছু যাতে সময় নষ্ট না হয়। অধীরদাকে দেখেছেন তো? রবিঠাকুর বলতে অজ্ঞান। যত সব গেঁয়ো নিয়ে কারবার। বল তুমি তমাল।

অরুণ বলে, নৌকোটা খালে নিয়ে যাই দাঁড়ান, ওখানে বাঁধা যাবে।

না না, এখানেই থাকি,—তমাল বলছে। কার্নিশের ওপর ছবি মুখটা চেপে ধরে, ঠান্ডা ভিজে ভিজে। তার উত্তপ্ত মুখ জুড়িয়ে যায়।...

হে কুমার হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান।

ঝনন রনন...

চলে যাচ্ছে ওরা...দাঁড়ের ছপছপ আওয়াজটা দূরে চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ দূর থেকে ভেসে আসা একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, টুকরো টুকরো শব্দ—ভাসা-ভাসা। চিৎকার করতে ইচ্ছে করে ছবির—চিৎকার করে যদি ওদের ফেরানো যেত!

ছাদের ওপর থেকে সদর দরজাটা দেখা যাচ্ছে ছায়া ছায়া অস্পষ্ট—ওটা খুলতে কতক্ষণ লাগে? তারপর ঘাটে গিয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে ছবি—শুধু দেখবে একটা নৌকোর দূর থেকে দূরে চলে যাওয়া, শুধু শুনবে একটা কাঁপা কাঁপা রবিঠাকুরের কবিতা বলা ছেলের গলা। তাতে কি কোনো দোষ হয়?

আর যদি ছেলেটা তাকে দেখতে পায়—যদি এগিয়ে এসে সে বলে, এসো ছবি, তুমিও এসো। তাহলে?

না, ছবির কিছু নেই। সে যেতে পারে না, তার মন বলে, এ অসম্ভব! অসম্ভব!

...শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি,...

আর শোনা যাচ্ছে না। জল ভরে আসা ঝাপসা চোখ নিয়ে তবু কান পেতে থাকে,

...সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

ছবি পারছে না সহ্য করতে। সে তা প্রমাণ করেছে তার চলায়-ফেরায় অবাধ্যতায়।

কিন্তু যারা সে-কথা জানতে পারছে না—তারা? তারাও কি পারছে? মায়াদি? কোন ঘরে মায়াদি আছে তালা-বন্ধ হয়ে ছবি তা জানে না কিন্তু এটা জানে সে মানে না এসব।

দুর্গা? সে কেন কাঁদে?

মা কেন ঝড়ের আগের থমথমে মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? ঠাকুমার তোবড়ানো গাল বেয়ে কেন জল গড়ায়?

সবাইকে বুঝেছে ছবি। বুঝতে পেরেছে বলেই তার এত যন্ত্রণা—নিজেকে বোঝার যন্ত্রণার চেয়েও বেশি।

আর শোনা যাচ্ছে না—অনেক দূরে চলে গেছে ওরা, ছবির শ্রবণের বাইরে। এমনি করে চলেও যাবে ছেলেটা, ছবির দেখার বাইরে, তার চোখের সামনে থেকে। কী হবে তখন!

কয়েকটা বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে-মাথায় পড়ে কিন্তু নড়তে ইচ্ছে করে না। বরং এক অদ্ভুত ইচ্ছে হয়, আঁচল বিছিয়ে সেই স্যাঁতস্যাঁতে ছাদের ওপর ছবি শুয়ে পড়ে। একখণ্ড মেঘ এসে চাঁদকে আড়াল করেছে, জ্যোৎস্নার আলো কেমন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। আরও দু-একফোঁটা জল পড়ে কপালে, ঠোঁটে। মাথার ওপর দিয়ে কী একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে... প্রায় মেঘের কাছাকাছি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার একটানা টি-টি-টি ডাকটাই কেবল সব নিস্তব্ধতাকে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে।

...হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রনন—
বক্ষের
পঞ্জর ভেদি
অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কুমার...।

মমতা ডাকছেন ব্যাকুল গলায়, এই ছবি, ছবি...দ্যাখ মেয়ের কাণ্ড! সারারাত এই ভিজে ছাদে শুয়ে...তোর কি সবই অদ্ভুত?

তখনও সকাল হয়নি ভালো করে। ফুটি-ফাটা করা আলোয় ছবি সেই ঝুঁকে পড়া মুখখানার দিকে ঘুম ভাঙা চোখ নিয়ে একটা মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

মা কি জানে কথাগুলো...
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়?

মমতা বলেন, তবু শুয়ে থাকবি? ওঠ শিগ্‌গির—যা খুশি তাই তো করো, এখন অসুখ একটা না বাধালে চলবে কেন? আমারও তো সহ্যের সীমা আছে, ছবি।

উঠে বসে ছোটোবেলার মতো হঠাৎ সে মা'র বুকের মধ্যে মাথা রাখে, মা গো, আমার জন্য তোমাকে অনেক সহ্য করতে হয় না?

বড়ো ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ জড়িয়ে ধরলে মায়ের একটা লজ্জা আসে। মমতা সেই লজ্জার হাসি হাসেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে যায় মুখ, না! সহ্য করতে হবে কেন? তুমি যা খুশি তাই করে বেড়াবে আর আমাকে সবাই পুজো করবে বাড়িতে?

সে-কথা ছবি জানে। কদিন আগে সেফু এসেছিল তার কাছে গান শিখতে। ছবি বলেছিল, তোকে এবার আমি নতুন ধরনের গান শিখিয়ে দেব সেফু, দেখিস!

—রবিঠাকুরের?

—নারে, প্রতিরোধের গান। শেখাতে পারবিনে অন্যদের?

—না বড়দি, আমি তা পারব না। তোমার মতো সাহস আমার নেই। ...তোমার জন্যে জানো জেঠিমাকে দিনরাত সবায়ের কাছে কথা শুনতে হয়। সেদিন দুপুরে কেবল খেতে বসেছেন, কোথা থেকে দাদু এলেন হাঁফাতে হাঁফাতে, কত কী যাচ্ছেতাই বলে অপমান করলেন। জেঠিমাকে বললেন, অহংকারী নাস্তিক। জেঠিমার ইচ্ছেমতোই তুমি এসব করে বেড়াও। ...খাওয়া হল না, আঁচলে চোখ

মুছে উঠে চলে গেলেন।

সোজা হয়ে বসে মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছবি বলে, কী করব তুমি বল তবে?

কী করে সব মেয়েরা? লক্ষ্মী স্বভাব নিয়ে ঘর-সংসারের কাজকর্ম করা ছাড়া?

শুধু এই? পারব না আমি তা। সজোরে মাথা নাড়ে ছবি।

গম্ভীর হয়ে যান মমতা, আচ্ছা, তা না হয় না পারলে—তবে লেখাপড়া কর ঘরে বসে। পল্টু কেমন পড়ছে জানো? তোমার বইগুলোয় তো ধুলো পড়ে আছে, পোকায় কাটছে। ...সবই যেন নেশা। পড়তে গেলে তো পাগল হলে, এখন ঘোরার নেশা ধরেছে। আমিই বা আর কত সহ্য করব ছবি?

আঙুলে গুণে হিসেব করে দেখে ছবি বলে, পরীক্ষাটা দিয়েই দি মা। এখনও পড়লে পারব দিতে, দেব?—তার দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ছটফট করে ওঠে হঠাৎ। যেন এক বিস্মৃত স্মৃতির কপাট খুলে গেছে। হাসিমুখে বলে, পরীক্ষা দেব—আজ থেকেই আবার পড়তে শুরু করছি আমি দেখ। কদিন আর কোনো কাজ নয়।

তমালও বলেছিল, পড়াশোনাটা ছেড়ো না ছবি, লেখাপড়া করলে একটা বৃহত্তর জগৎ...।

ছেলে-মানুষের মতো ছবি বলে, আমি পাস করলে কী দেবে বল? সোজা কথা নাকি? এ বাড়িতে কোন মেয়েটা পাস করেছে বল? কি দেবে?

মমতা হেসে ফেলেন, কী দেব বল? আমার যে ক'খানা গয়না আছে দিয়ে দেব।

গয়না! ধ্যেৎ! গয়না আমি কী করব?

বিয়ের সময় লাগবে না? পাস করলে খু-উ-ব ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দেব, ছবি! এ বংশের প্রথম পাস করা মেয়ে তুই... যদি পারিস!

বিয়ে! শুধু এই! বিয়ের জন্যে লেখাপড়া! সেই স্কুলে দেখা মালতীদের মতো। ছিঃ! আর কিছু—আর অন্য কিছু ভাবতে পারো না মা! কী যেন বলেছিল সেই ছেলেটা—! বৃহত্তর জগৎ!

অধীরকাকা বলে, লড়াই করতে হবে ছবি।

কীসের লড়াই? লড়াই করে সেই জগৎটাকে তৈরি করতে হয়, নাকি সেই জগৎটার সঙ্গেই লড়াই করতে হয়!

দেখবে সে একবার!

ছবি ছোটে প্রসন্নর কাছে, আমার পরীক্ষা প্রসন্নকা, এখন কিছুদিন আমার ছুটি। পাস আমাকে করতেই হবে।

প্রসন্ন বলে, পরীক্ষা দিবি? কিন্তু এদিকের কাজ—থাক, তাই বলে..., দে তুই

পরীক্ষা। তমালের তাহলে কিন্তু যাওয়া হবে না—আরও কিছুদিন থেকে যেতে হবে বুঝেছ?

তমাল বলে, আমার তো এ বছরটা মাটি হলই এমনিতে কিন্তু তাই বলে আরও থাকতে হবে? আচ্ছা...না হয় একজনের খাতিরে—।

ছবি মাথা নিচু করে থাকে। রেগে গেছে ভেবে ধীরেন, অরুণ উৎসাহ দেয় তাকে। কেবল তমাল মিটি মিটি হাসে, শুধু ছবি শুনতে পায় এমন করে বলে, সেই কাজই করছো ছবি কিন্তু বড়ো দেরিতে। পাস যদি করো তো কী বলেছি—।

রেগে চটে কী করবে ছবি ভেবে পায় না। বলে, পাস আমি করবই বলে দিলাম।

রাগে, কিন্তু তমালের মুখের দিকে তাকিয়েই কান্না পায়——ওকে ভুলতে হবে। ভুলে থাকবার এও একটা উপায়। অনেকদিন না এলে, না দেখলে আস্তে আস্তে যদি সরে যায় ছবির মন থেকে——তবে বাঁচবে সে।

বেঁচেছেন মমতাও। ছবিকে একমনে পড়তে দেখে পূর্ণশশীও খুশি পড়তে চায় না হয় পড়ুক—মেয়ে-মানুষের লেখা-পড়া তো পদ্মপাতার জল। ধিঙ্গি নাচ তো থেমেছে।

সেফু বলে, তুমি কি জজ্-ম্যাজিস্টর হবে দিদি পড়ে? দাদা তো বলে ব্যাবসা করবে—পুরুষমানুষের খানিকটা লেখা-পড়া শিখতে হয় তাই। তুমি?

আমি!—ছবি অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে থাকে।

চুপি চুপি সেফুই বলে, দাদু আর জ্যাঠামশাই তোমাব বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন জানো? পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই।

তবু অন্যমনস্ক হয়ে থাকে ছবি।



আটাশ

পরীক্ষাটা যেন একটা দায়—ভবিষ্যতের দায়। আসলে বই-এর অড়ালে মুখ লুকিয়ে ভুলে থাকতে চেয়েছিল সে একটা নাম। বুকের মধ্যে ছলকে ছলকে ওঠা একটা হিমহিমে আবেশকে সে চাপা দিতে চেয়েছিল পড়ার গুনগুনানি দিয়ে। তমাল! তমাল!

অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বেলে জ্বেলে পড়ে সে, আর মমতা মশারির ভেতর দিয়ে যতক্ষণ পারেন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন মাথা নিচু করে গুনগুন করা ছবিকে। তাঁর নিজের মনের মধ্যেকার একটা না-ফোটা স্বপ্ন যেন ভেসে ওঠে, একটা মিলিয়ে যাওয়া ভাবনা যেন বসে বসে পড়ে। অনেক—অনেক দিন আগে, ন'বছর বয়সে মা-বাপ হারানো ভায়েদের সংসারে মানুষ হওয়া মেয়েটা বোধহয় সেই স্বপ্নটা দেখত। তার গলা ছিল গানের কিন্তু কেউ শেখাত না—শুনে শিখতে হত। তার পড়াশোনার ইচ্ছে ছিল—উপায় ছিল না, দেখে শিখতে হত। তার আর কী ইচ্ছে ছিল! আর...! আর কিছু না!

এ সংসারে, ও সংসারে ফেলনা মানুষের মতো ঘুরে বেড়ানো ন'বছর থেকে বড়ো হয়ে পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েটার অদ্ভুত ইচ্ছে আর কি থাকতে পারে? কেবল গান শিখতে চেয়ে না শিখতে পেরে, পড়াশোনার ইচ্ছেটা মনের মধ্যেই থেকে যাবার পরে সেই ষোলো বছরের মেয়ে শেষ ইচ্ছেটা মনের মধ্যে লুকিয়ে বেড়াত। একটা ভীরু ভীরু ইচ্ছে—একটা ভালো বর, বিয়ে। কেবল তাতেই রোমাঞ্চ হত।

ছবিকে পড়তে দেখলে তাই মমতা তাকিয়ে থাকেন—যেন মুখ দেখে ওব মনের ইচ্ছেটা ধরতে পারবেন। কী ভাবছে ওই মেয়েটা পড়তে পড়তে? কী চায় মমতার চেয়ে বেশি? তাঁর হয়নি, কিন্তু ওর যেন হয়—একটা ভালো বর, খুব

সুখ! হয় যেন।

ক্লান্ত শরীরে ঘুম পায়, ছবিকে ডেকে বলেন, খাটের নীচে চায়ের লিকার আছে ছবি—ঘুম পেলে কাগজ জ্বেলে গরম করে নিস।

উত্তর দেয় না! একমনে কি যেন লিখছে মাথা নিচু করে! এই সময়টা বাড়ির কোনো ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের তফাৎটা কোথায়—দেখিয়ে দিক না কেউ তাঁকে! ওর যেন সুখ হয়—ভগবান! কপালে হাত ঠেকান মমতা বারেবারে—কীসের সুখে তারও স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই তাঁর নিজের মনেই।

ছবি পড়ছে না। মমতা এখন কাছে এসে দাঁড়ালে দেখতে পেতেন, পরীক্ষার কোনো কাজ সে করছে না। একটা খাতার পাতা সে আজে-বাজে লেখায় ভরিয়েছে, কতগুলো অক্ষর মিলে একটা নাম তমাল। লিখছে, কাটছে, কাটাকুটির ওপর দিয়ে আবার লিখছে। লিখতে লিখতে আঙুল টনটন করছে। মা যেন কি বলল, যদি ঘুম পায়!

ঘুম তার পায় না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে তার ভাল লাগে।—পড়ার জন্যে নয়। কে জানে সে কতটুকু পড়ে! কে জানে সে পাসই করবে কিনা! সে জেগে থাকে অন্য কারণে—নিস্তব্ধ রাতটাকে অনুভব করবে বলে।

মমতা জানেন না, তিনি ঘুমিয়ে পড়লে ছবি চুপিচুপি ছাদে আসে। চুপিচুপি কার্নিশে তার গালটা চেপে কান পেতে থাকে—।

এখন আর জ্যোৎস্নায় সারা পৃথিবী ভেসে যায় না—এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। ছবি জানে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে নৌকোয় বেড়াতে ধীরেনদের মতো লোকেরা যাবে না—কেউ বেড়ায় না। তারা হয়তো অফিস ঘরে বসে লণ্ঠনের আলোয় নামের লিস্ট মেলাচ্ছে নয়তো প্রচারপত্র লিখছে, নয়তো কোনো সহজ রাজনীতির বই পড়ছে। আর সেই ছেলেটা—? কে জানে, সেও হয়তো ওমনি একটা কী কাজেই মেতে আছে।

জানে ছবি। জেনেও তার আশা যায় না। তবু যদি আসে—যদি! যদি সেই নিস্তব্ধ রাতের বুক চিরে কাঁপা কাঁপা গলায় কেউ বলে ওঠে,

চাব না পশ্চাতে মোরা,
মানিব না বন্ধন ক্রন্দন, হেরিব না দিক্—
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক-বিচার উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা উপকণ্ঠ ভরি—
...শত-লক্ষ জীবনের ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি...!

কিন্তু কেউ বলে না। কেউ হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবি ছাদে থাকে, কান পেতে শোনে রাতজাগা পাখির কর্কশ ডাক নয়তো আচমকা ঘুমভাঙা কোনো শিশুর কান্না। তারপর মৃদু পায়ে ঘরে

ঢোকে—লণ্ঠনের আলো স্তিমিত করে দেয়। বালিশে মাথা রেখে হঠাৎ কখন কাঁদতে শুরু করে নিঃশব্দে—ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল ঠোঁটে ঝরে পড়ে, গলার কাছে জমে থাকে, আর দাঁতে দাঁত চেপে সে ফিশফিশ করে, পাস করব না ছাই! বৃহত্তর জগৎ! —এমন মনটা হয়েছে! কিছু হবে না আমার!

তবু কেমন করে যেন হয়ে যায় পরীক্ষাটা।

মহকুমা শহরে গিয়ে পরীক্ষা দিতে দেবেন না দক্ষিণা, এসব কী? এসব! কোন মেয়েটা যাচ্ছে দেখাও।

আর এ-বাড়িতে সেই প্রথম বোধহয় সুখদার উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়, যাবে ও আমি নিয়ে যাবই। এসব পড়াশোনার ব্যাপার—এসব কি বুঝবেন? অন্যায় একটা জেদ ধরলেই হল।

মমতা বলেন, বাবা, এক মেয়ে হয়েছ বটে তুমি, বড়োকাকাকে পর্যন্ত নামিয়েছ।

ছবি লজ্জিত মুখে হাসে, তা আমি কী করব বলো? আমি তো পরীক্ষা না দিতে পারলে বেঁচে যাই, কিন্তু—।

পূর্ণশশী পল্টুর কপালে দই-এর ফোঁটা দিয়ে ডাকেন, ছবি, কই—এদিকে আয়, ঠিক খুশি হয়তো নয় কিন্তু কেমন অবাক অবাক ভাব ঠাকুমার। তোবড়ানো মুখ নিয়ে ছবির মুখটার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে দই-এর ফোঁটা দিয়ে দেন কাঁপা কাঁপা হাতে, চামড়া ঝুলে পড়া হাতখানা কপালের সামনে স্থির হয়ে থাকে একটা মুহূর্ত।

এইরকম সময়টাতেই কেমন ভালো লাগে, ভালোবাসতে ইচ্ছে করে সবাইকে— খুশি করতে ইচ্ছে করে, যেন ওমনি আকাঙ্ক্ষা মেশানো শুভার্থীর মুখ বদলে না যায় কখনও। এইরকম পরিবেশে ছবি অভিভূত হয়ে যায়। ভালো লাগে কিন্তু ভয়ও করে কারণ ছবি জানে এ মুখগুলো এরকম থাকবে না। শান্ত মেয়ে, ভালো মেয়ে হলে ওরাও আবার মুখের ভাব বদলে ফেলবে। মা, ঠাকুমা, কাকিমা সবাই—সবাই।

মুখগুলো বদলে গেল কিন্তু অবাক হল না কেউ রাগল না।

এবার আর রাগ নয়, বকাবকি-গালাগালি কিছু নয়, এবার অন্য কিছু। অন্য পথে এবার সম্মান বাঁচাতে হবে।

রান্নাঘরের দরজায় চটির শব্দ পেয়ে মমতা মাথার কাপড় তুলে দিয়ে তাকালেন দক্ষিণার ডাকে, বউমা, কুলদা এই চিঠি লিখেছে দেখ।

ঘটির জলে হাত ধুয়ে, আঁচলে হাত মুছে চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে পড়েন মমতা।

যতক্ষণ পড়েন, দক্ষিণা তাকিয়ে থাকেন মুখের দিকে। কোনোদিন ওভাবে তিনি পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকান না কিন্তু আজ লক্ষ করছেন মমতার মুখের পেশির নড়াচড়া, গম্ভীর বিষণ্ন মুখের স্থৈর্যকে।

পড়া শেষ হলে শান্ত গলায় বলেন মমতা, আমি কী বলব বলুন? আপনারা ঠিক করছেন,

বেশ! —আবার চটির শব্দ করে চলে যান দক্ষিণারঞ্জন। মতামত নিতে তিনি আসেননি, এসেছিলেন ঘটনাটা সম্বন্ধে মমতাকে সজাগ রাখতে। কুলদা তাঁকে কত বিনয় করে চিঠি লিখেছে, ছেলে এখনও তাঁর অবাধ্য হয়নি সেটা দেখাতে।

সরস্বতী বলে, কী দিদি—কিসের চিঠি?

মমতা ম্লান হাসেন একটু উত্তর দেবার আগে, ছবির বিয়ের ঠিক করতে উনি শহরে গেছেন—সেই চিঠি।

ভালোই হবে দিদি! এবার ওকে একটু শান্ত হতে বলুন।

শান্ত হতেই চেয়েছিল ছবি। মনটাকে শান্ত করে ফিরে আসবার প্রতিজ্ঞা ছিল তার কিন্তু হল না যে!

নৌকো থেকে প্রথম মাটিতে পা দিতেই যে প্রথম হেসে অভ্যর্থনা জানায় তার ভয়েই তো পালিয়েছিল সে এতদিন। ভেবেছিল বুঝি ভুলে যাওয়া যায়। কিন্তু সত্যি যে যায় না। কী করবে ছবি এখন!

তমাল হেসে বলে, কেমন হল পরীক্ষা?

সে হাসিতে ছবির শরীরের মধ্যে শিউরে ওঠে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে তার খুশিটা লুকোবার চেষ্টা করে বলে, জানিনে যান! আপনার তো জানাই আছে ফেল করব।

তমাল এবার উলটো কথা বলে, কখনও ফেল করবে না তুমি। আমার ভুল হতেই পারে না।

তবে যে সেদিন বলেছিলেন?

সেদিন! —হাসবার চেষ্টা করে তমাল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, সেদিন নাকি ছবি? সে যে কতকাল! উঃ কতদিন যে তুমি আস না ছবি—কতদিন!

কতদিন কি? জিজ্ঞেস করা হয় না ছবিরও। আমগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভেঙে পড়া সূর্যের আলো বাঁকা হয়ে তমালের মুখে-চোখে পড়েছে, সে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছবির মুখের দিকে। অদ্ভুত! সে দৃষ্টি সহ্য করা যায় না। হঠাৎ কান্না পায়, দ্রুতপায় সরে গিয়ে মেয়েদের মধ্যে বসে পড়ে ছবি। মানুষগুলো চেনা, শব্দগুলো চেনা এখানকার। ভুলে থাকবার অনেক উপকরণ আছে এখানে—একবার কাজে লেগে যেতে পারলেই হল।

যার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে এদিক-ওদিক চোখ তুলে তাকাবার পর্যন্ত সাহস হারিয়েছে ছবি সেই ছেলেটা আজ নাকি চলে যাবে!

আবার সেই পুরনো দিনের মতো কষ্ট, অনেকদিন আগে মিনুরা চলে গেলে স্টেশনে তার যেমন কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এ যে তার চেয়েও বেশি। চলে যাবার দিন এত তাড়াতাড়ি আসে কেন মানুষের। কেন চিরকাল ধরে থাকে না—থাকতে

পারে না!

কালকের পল্টুর হাতে পাওয়া চিঠিখানা আজ আবার বার করে সে, হাতে কাঁপে থরথর করে, আমি চলে যাচ্ছি... কিন্তু তোমাকে যে আমার অনেক কথা বলবার আছে ছবি!

এতদিন সময় হয়নি? কী বলবে তমাল তাকে? কেন ছবিকে সে-কথা শুনতেই হবে? সে যদি না যায়? না—সে যাবে না।

সে-কথা ভেবেও বেশিক্ষণ শক্ত রাখা যায় না মনটাকে। রিলিফ কিচেনে গেলে অরুণ বলে, তমালের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর? এইমাত্র গেল এখান থেকে। আজ দুপুরের গাড়িতে চলে যাবে—দেখা হয়নি?

দেখা তো করতে ছবি চায় না। কী হবে দেখা করে! তমাল কি দুদিন পরে তাকে মনে রাখবে শহরে গিয়ে ?

সে বলে, আমার ঘাড়ে কত কাজ তো দিয়েছেন চাপিয়ে—আমার সময় কোথায়!

কিন্তু কাজ করতে গিয়ে ভুলে যায় বারেবারে। বিরক্ত হয়ে শেষে সে উঠে আসে। আজকের দিনটার জন্যে ছুটি চাই তার—শুধু আজকের দিনটা! তারপর কাল থেকে আবার কাজে লাগবে ছবি, অনন্তকাল ধরে এই হতাশ্বাস মানুষগুলোর সুখ-দুঃখের ভাগ নেবে। বোঝাবে, শোনাবে, এক করবে। আজকের দুঃখটা শুধু তার একার, কোথাও বসে চুপিচুপি সে একটু কাঁদতে চায়।

জাল বুনতে বুনতে বসুদেব জেলে রাধার বিরহ-গাথা গাইছে। যুবক সে। তার গলায় সুর আছে, খুব শীর্ণ হয়ে যায়নি সে আর সবায়ের মতো। তার চোখদুটো এখনও আশায় জ্বল জ্বল করে। থেকে থেকেই ছুটে আসে তাদের কাছে; বলে, কী কন্ দিদি? এই দিনই তো আর সব না! কী কন্? দিন আবার ফিরবি আমাগারে না কি?

তার গান ছবি কান পেতে শোনে,

কৃষ্ণ কালো তমাল কালো
তাইতে তমাল ভালোবাসি।

ছবির বুকের মধ্যে যেন কান্নার তুফান ওঠে, ভালোবেসেছে যে ছবিও। তার গলা শুনলে বুকের মধ্যে চমক লাগে, তার হাসি দেখলে কান্না পায় এ যে যন্ত্রণার ভালোবাসা।

যখন ছোটো ছিল বেশ ছিল সে! এখন আর ফেরা যায় না সে দিনগুলোতে?

ছবি কয়েকবার কাগজ-পত্র রেখে উঠে পড়ে, দুবার ঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, আবার ফিরে আসে। দুপুরেই চলে যাবে তমাল। যাক চলে! কেন সে এসেছিল! এল যদি তো কেন আগেই চলে যায়নি। খাঁচার পাখিকে সে বনের স্বাদ দেখাতে চায় কেন!

অনেকক্ষণ ছটফট করে ছবি শেষে বলে, বসুদেব, নৌকোয় করে আমাকে একটু ওই পাড়ায় দিয়ে আসবে? খানিকক্ষণ পরে আবার নিয়ে আসতে হবে—পারবে না?

তমালদের বাড়িটা অনেক দিনের পুরনো, ধসে যাওয়া দালান। গ্রামের একেবারে আর এক প্রান্তে। ওর বাবা কলকাতায় চাকরি নিয়ে গ্রাম ছেড়েছিলেন ছোট্ট তমালের হাত ধরে। আসতেন কখনও—দু'এক দিনের জন্যে—থাকতে নয়। ওরা শহুরে হয়ে গেছে তারপর থেকেই। শহুরে ছেলে তমাল! লম্বা বারান্দা বেরিয়ে যেতে যেতে ছবি ভাবে, গ্রামে এসে এতদিন ছিল কী করে! ওই জল-কাদা ভাঙা, মশা—অন্ধকার—কত কষ্ট হয়েছে। এতদিন কেউ শুধু শুধু থাকে কেন—সত্যি সত্যি কাজের জন্যে নাকি...?

অত বড়ো বাড়িখানায় কেউ থাকে না। ঘরগুলোয় তালা দেওয়া, কতগুলো ভেঙে পড়েছে। খুঁজে খুঁজে তমালের ঘরখানাকে বের করতে হয়—খোলা দরজার দিকে পেছন ফিরে কী যেন লিখছে তমাল।

ছবির বুকের ভেতরটা কাঁপছে—কেন তা সে নিজেও জানে না। লুকিয়ে এসেছে বলে?

নিঃশব্দ পায়ে সে ঘরে ঢোকে, থমকে দাঁড়ায় একবার দরজার কাছে। এখনও চলে যাওয়া যায়। এখনও কেউ দেখতে পাবে না তাকে যদি সে পালায়।

কিন্তু পায়ের শব্দ কানে গেছে। পেছন ফিরে তাকে দেখে তমাল খুশি মুখে হাসে, এলে? ভেবেছিলাম বুঝি আসবে না।

ছবি চুপ করে থাকে। তার মুখের রং ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। কেন আবার এল সে! কেন আবার দেখল ওকে! কাল থেকে যখন থাকবে না, সারা গ্রামটার কোথাও খুঁজলে পাওয়া যাবে না তখন কেমন করে দিন কাটবে ছবির!

তুমি কি আমার চিঠি পেয়ে রাগ করেছ, ছবি? —তমাল জানতে চায়?

—না। মাথা নেড়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে ছবি।

হাসার চেষ্টা করে তমাল বলে, যেতে ইচ্ছে করছে না ছবি—বড়ো মায়া পড়ে গেছে... সেই কোন ছোটোবেলায় চলে গেছি... এলাম ভালোই হল, অনেককিছু দেখে গেলাম, শিখে গেলাম... কিন্তু একজনকে কেবল রাগিয়ে গেলাম—হাসতে থাকে তমাল কথা শেষ করে।

তারপর আস্তে আস্তে কখন তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায় সে নিজেও বুঝি তা জানে না, বলে, যাবার দিন ঠিক করে করেও যাইনি—কিন্তু আর থাকা যায় না। সুশোভন কাকা বড্ড কড়া চিঠি লিখেছেন। তাঁর ছেলে-মেয়েদের পড়ার ক্ষতি হচ্ছে, আমার বছরটা এমন করে নষ্ট করলাম কেন জানতে চেয়েছেন।

ছবি বলে, ঠিকই তো, এমন করে নষ্টই বা করলেন কেন বছরটা? শুধু শুধু...?

শুধু শুধু। জোর করে হাসে তমাল, আসলে পরীক্ষা দিলে এবার পাস করতে পারতাম না ছবি। গত বছরটা কি পড়েছি নাকি! মিটিং-মিছিল-গুলি—আন্দোলন নিয়ে কেটেছে না? এবার এখানকার শিক্ষা নিলাম। কিন্তু...চলে গেলে তুমি কি খুশি হতে?

খুশি! এবার আর ধরে রাখা যায় না নিজেকে। ছবি কেঁদে ফেলে মুখ ঢাকে লজ্জায়, তার দু'হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ফোঁটায় ফোঁটায়।

তার হাতটা জোর করে নামিয়ে দিতে দিতে তমাল বলে, হে সবিতা, তোমার সত্যের মুখ আচ্ছন্ন, দূর কর সেই আবরণ—কেঁদো না ছবি, কাঁদলে আমার বড়ো কষ্ট হয়।

তারপর ছবিব আঁচল দিয়েই চোখ মুছিয়ে দিয়ে তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে হাসিমুখে তমাল বলে, তোমাকে যদি একেবারে নতুন এক নামে ডাকি রাজি আছ? সে নাম কিন্তু আর কেউ জানবে না।

কী?

সবিতা।

জল-ভবা চোখে ছবি বলে, ধ্যেৎ, সবিতা তো পুরুষের, সূর্যদেবের নাম। জানেন, ছোটোবেলায় সূর্যদেবের রথ দেখব বলে অন্ধকার থাকতে উঠে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর ...হারান ঠাকুরের সেই ছড়াটা—ওঁ জবাকুসুমসংকাশং..., ছবি অন্যমনস্ক হয়ে যেন পুরনো দিনগুলোয় ফিরে যায়।

তমাল তাকে আর একটু কাছে টেনে নেয়, তার মুখ উঁচু করে তুলে ধরে বলে, হোক পুরুষের নাম, তোমাকে আমি ওই নামেই ডাকব ছবি—শুধু আমার নাম হয়ে থাকবে ওটা। ছবি, তুমিও আমার...তমাল ছবির মুখটা নিজের গালের সঙ্গে চেপে রাখে। মেয়েটা কাঁপে থরথর করে, তার চোখের জলে তমালের গাল ভিজে যায়, তার মুখের দিকে তাকিয়ে তমালেরও চোখ কখন ভিজে উঠেছে। লজ্জিত হয়ে মুছে ফেলে তমাল বলে, তুমি তো আমার কথা কিছু জান না ছবি, একটু বলি। সুশোভন কাকা আমার বাবার বন্ধু, বাবা আমাকে আর মাকে খুব নিঃসহায় রেখে মারা গেলে উনিই আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, এখনও পড়াচ্ছেন। ওঁর অনেক বড় ইচ্ছে আছে, আমাকে অনেক বড়ো করে ওঁর মেয়ে অরুণার সঙ্গে বিয়ে দেবেন।

নতুন নামটা শুনে ছবির হঠাৎ মন খারাপ হয়ে যায়, জ্বালাকরা অনুভূতি ভরা মনে হঠাৎ একমুহূর্তে তার সমস্ত কেমন বিস্বাদ লাগে। চোখের জল মুছে ফেলে আড়ষ্ট হয়ে যায়, সরে বসে তমালের কাছ থেকে। এখানে এসেছে কেন তবে ছিঃ হ্যাংলার মতন, —নিজের মনের সঙ্গেই যেন কথা বলতে থাকে সে।

তমাল ছবির মুখের নতুন ভাবটা ধরতে পারে। সে করুণ একটু হাসে, জান ছবি, গরিব হওয়া বড়ো কষ্টের, বুদ্ধিমানরা তার সুযোগ নেয়। এবার কলকাতায়

গিয়েই আমি যেমন করে হোক ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ব, একটা চাকরির চেষ্টা করব—পড়া আমার না হয় নাই হবে!

ছবি এবার শাসনের সুরে বলে, না, পড়া বন্ধ করলে চলবে না। এখনই কী চাকরি?

তমাল আবার ছবিকে কাছে টেনে নেয়, তার মুখটা দু'হাতের মধ্যে উঁচু করে বলে, তোমার শাসন সব মেনে নেব—যা বলবে, কিন্তু একটা শর্তে বল তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে? —ব্যাগ্র দুই চোখ মেলে ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তমাল।

কী উত্তর দেবে ছবি? তমাল কি তা জানে না যে কেন বারেবারে ছবির চোখ ছাপিয়ে এত জল নামছে! উঃ এত কষ্ট হয় ছেড়ে দিতে!

ছোটোবেলায়ও তার কান্না এসেছিল মিনুরা যেদিন চলে গেল। কেঁদেছিল নিলু নিখোঁজ হয়ে গেলে—কেঁদেছে সুধাদির কথা মনে করে; বখাটে একটা ছেলের জন্যেও কবে যেন তার চোখ জলে ভরে উঠত থেকে থেকে। কিন্তু আজকের কান্না! এ যেন ছবির বুকের মধ্যে আর কোথায় জমানো ছিল—সেখানে থেকে অবিরল ধারায় বেরিয়ে আসছে। ছবির সাধ্য নেই রোধ করার।

তাকে দু'হাতে নাড়া দিতে দিতে তমাল বলে, কিছুই কি বলবে না, ছবি?

এবার নিজেই চোখের জল মুছে ফেলে ছবি বলে, কী বলব আমি? তুমি কি জান না কিছুই?

জানে তা তমাল, আর জানে এর জন্যে ছবিকে সহ্যও করতে হবে অনেক কিছু। বলে, জানি সে কত কষ্টের! তোমার সে কষ্টের কথা ভেবে আমারও মন ছটফট করবে কিন্তু এটাই সব নয় ছবি। তারপরেও দিন আছে—পৃথিবী আছে। তোমার আমার সমান অধিকারে এক নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে—সেসব দিন আমাদের, ছবি।

বলে, তোমাকে সবিতা বলেছি, সূর্যের আলোর মতো জীবনে ওমনি উজ্জ্বল যেন হতে পার।...পাস করলে পর যেমন করে পার কলকাতায় এসো ছবি... গ্রামের শিক্ষাও মস্ত বড়ো কিন্তু ওখানে না গেলে পৃথিবীটাকে ধরতে পারবে না তুমি। বাঁচতে হলে সে জগৎটার সঙ্গে লড়াই করতে হবে তবু তাকে ছাড়া চলে না।

ছবি বলে, আমি কি পারব? যদি দুর্বল হয়ে পড়ি—যদি বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারি।

পারবে ছবি। তমাল উৎসাহ-ভরা গলায় বলে, আমি জানি তুমি পারবে।

বাইরে বসুদেবের গলা শুনে দুজনেই চমকে উঠে চোখের জল মুছে একটু হাসবার চেষ্টা করে চোখে চোখে তাকিয়ে। এই নির্জন দুপুরে গ্রামের একটা ছেলের ঘরে, একটা মেয়ে লুকিয়ে এসেছে দেখা করতে, এমন লজ্জার কথাটা এই প্রথম মনে পড়ে যায় তাদের।

তমাল নিজেই হাত ছেড়ে দেয়, বলে, যাও এবার, আর থেকো না।

ছবি নড়ে না। একদৃষ্টিতে সে তমালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বারে বারে কান্না দমন করবার চেষ্টা করে কিন্তু শেষে আর পারা যায় না। কান্নায় ভেঙে পড়ে সে, তমালের কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে যন্ত্রণাভরা ভয়ার্ত গলায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, তুমি চলে যাবে! আর যদি দেখা না হয়? যদি...।

তার মুখ জোর করে তুলে চোখের ওপর চোখ রেখে তমাল অতি কষ্টে হাসবার চেষ্টা করে বলে, ও কী কথা ছবি? কী বলছ?

কী জানি! আমার ভয় করছে। আমি বুঝতে পারছিনে!

এবারও তমাল দাঁতে দাঁত চেপে নিজের চোখের জলকে সংযত করে রাখে, বলে, কেঁদো না। চোখের জল দেখলে আমার বড়ো কষ্ট হয়। ...কেন ভয় পাচ্ছ? আমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না, সবিতা। যদি তোমার আশঙ্কা সত্যি হয় সে আমার জীবনের দুর্দিন—তোমারও। সে একমাত্র মৃত্যুতেই সম্ভব।

ছবি শিউরে উঠেছে বুঝতে পেরে তমাল তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, এত মনের জোর আমার কেমন করে হল জান? তোমাকে দেখে। তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়ো ছবি—কত বড়ো তা তুমিও জান না।

ছবির কাছে ওসব কথার এখন আর কোনো মানে নেই, সে জলভরা চোখে কেবল তমালকেই দেখে। আর একটু পরে আর তো দেখতে পাবে না...হয়তো আর কোনোদিন... কিন্তু বারেবারে এ-কথা মনে হচ্ছে কেন? তমালের এত প্রতিশ্রুতির পরেও?

কিন্তু আর থাকাও যায় না—বাইরে বসুদেব অধীর হয়ে উঠেছে—ছবিকে এবার যেতে হবে। এবার সে চোখ মুছে ফেলে উঠে দাঁড়ায়, তমালের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, যাই।

তমাল বলে, কাঁদতে পাবে না—হেসে যাও। তারপর হাসার চেষ্টা করে দুজনেই কিন্তু সে হাসি কান্নার চেয়েও করুণ, ম্লান।

দরজা পর্যন্ত তমাল তাকে এগিয়ে দেয়। ছবি নৌকোয় গিয়ে বসলেও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বন-জঙ্গলের আড়ালে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত।

ছবি ভেবেছিল কেউ তাকে দেখেনি। অনেকটা চলে আসবার পর বুঝতে পারে তার ধারণা ভুল। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে তার বয়সি, তার চেয়ে ছোটো, চেনা-অচেনা কয়েকটা ছেলে সমস্বরে চিৎকার করে গান ধরেছে, সখী! মরিলে বাঁধিয়া রেখো তমালেরই ডালে...।

হয়তো আরও অনেক লোকই দেখেছে তাকে। এইবার নিন্দে রটবে সারা গ্রামে।

ওদের সমস্বর সুরটা খানিক দূরে চলে এসেও কানে বাজতে থাকে, সখিগো-ও-ও...।

সকালে বসুদেব গাইছিল মনের খেয়ালে, অন্তর দিয়ে। ওরা গাইছে, কুৎসিত করে, মনের পাঁক মিশিয়ে। নিন্দে হবে গাঁয়ে! হোক! ছবি যে তমালের জন্যে প্রাণও দিতে পারে। তমাল। আবার কখন নামটা উচ্চারণের সঙ্গে দু'গাল বেয়ে জল গড়ায়, নামবার আগে ছবি তাড়াতাড়ি তা মুছে ফেলে।

মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন এসে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে।, কে?

মায়া সামনে দাঁড়িয়ে হাসে, বলে, পালিয়ে এলাম রে! কতদিন আর ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখবে—ওদের সংসারই যে অচল হয়ে পড়বে তাহলে? দুপুরে সবাই ঘুমোচ্ছে, ঘাটে মামার ডিঙি ছিল—বেয়ে চলে এলাম।

ছবির মুছে-ফেলা চোখের জল কিন্তু মায়ার চোখকে ফাঁকি দিতে পাবে না, বলে, কেঁদেছিস্ কেন রে ছবি? বাড়িতে বুঝি কেবল গালাগালিতে কুলোয়নি—অন্য কিছু...?

না, তা নয়, ছবি মাথা নেড়ে চুপ করে থাকে।

তবে?

ছবি লজ্জিত মুখে বলে, তমালদা আজ চলে গেল মায়াদি—!

ও তাই, তাই...ছবি! —মায়া তার হাতখানা নিজের হাতেব মধ্যে তুলে নেয়, আমি আগেই জানতাম—বুঝেছিলাম! চলে গেল...হ্যাঁরে ও যে বলছিল অধীরদার জন্যে কী ব্যবস্থা করবে? কিছু বলেছে?

ও, স্যানাটোরিয়াম? গিয়েই প্রাণপণ চেষ্টা করবে বলে গেছে।

মায়া কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। ছবির ইচ্ছে ছিল তমালের কথা আর একটু মায়াদির কাছে বলবে কিন্তু অধীরের নামে তার মুখের ওপর যে বিষাদ করুণ ছায়া নামে তারপরে আর কিছু বলতে ইচ্ছে করে না।

মায়া তখনও অন্যমনস্কের মতো একদিকে তাকিয়ে আছে—তেমনি ভাবেই বলে, ছবি, আমি তোদের মতো লেখাপড়া জানিনে, বুদ্ধি-বিদ্যে নেই কিন্তু ওই একটা মানুষের নামে আমি কী যে জোর পাই! —কিছু ভয় থাকে না। ও যদি কোনওদিন না থাকে... ছবি, সেদিন আমি কী করব? ...কী হবে ছবি!

কিন্তু ওটা কাজের জায়গা। অরুণ একটা নোটিস হাতে করে এসেছে। বলে, রিলিফ কিচেন আর থাকছে না ছবি—পয়লা থেকে ওয়ার্কহাউস হয়ে যাবে, সার্কুলার এসেছে। এসো আমরাও কাজকর্মের একটা প্ল্যান করে ফেলি।

ছবি এগিয়ে যায়, মায়াও যায় তার সঙ্গে। কাজ আছে... অনেক কাজ। বসে থাকলে চলবে না। হৃদয়াবেগকে এখানে কেউ প্রশ্রয় দেয় না।



উনত্রিশ

কুলদা এসেছেন সে খবরটা রান্নাঘরে বসেই মমতা পেয়েছেন কিন্তু উঠে আসেননি। কেবল রান্না করতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে, হোক্—যা হবার হোক্। আব ভাববেন না তিনি। আর ভাবতে পারবেন না...।

সরস্বতী বলে, কী হবে দিদি?

দেখ তো, মেয়ে চলে গেছে নাকি?

ফিরে এসে সে বলে, না, এখনও যায়নি! ডেকে আনব?

মমতা করুণ চোখে তাকালেন আসন্নগর্ভা শঙ্কিত-মুখী বউটার দিকে। ছবির জন্যে ওর যেন দুশ্চিন্তার শেষ নেই। সবায়ের সঙ্গে সায় দিয়ে সেও বলে সত্যি বড়ো জেদী মেয়ে—কী যে হবে...।

কিন্তু মমতা জানেন ওটা ওর মনের কথা নয়। ছবিকে মনে মনে সবায়ের চেয়ে· বেশি ভালোবাসে সে, প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, যেমন করে মা তাকায় তার সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলেটার দিকে।

এ সংসারে এসেও যেন এক ভয়ের রাজ্যে এসে পড়েছে। প্রত্যেক বছর ছেলেমেয়ের মা হতে হতে মনের কোণে বিরক্তি জমা করা থাকে কিন্তু প্রকাশ করবার সাহস ওর নেই।

সরস্বতীর অসহায় ভীত মুখখানার দিকে তাকিয়ে মমতা হাসবার চেষ্টা করে বলেন, তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন? ও মেয়ের একটু শাস্তি হওয়া ভালো, বড্ড বাড় বেড়েছে,—কিন্তু কথাটা বলে মমতাও স্বস্তি পাচ্ছেন না। তাঁর মুখে ও কীসের ছায়া নামে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন, এ যন্ত্রণা আমার আর সহ্য হয় না সরস্বতী। দুটো মেয়ে হয়ে বাঁচেনি, প্রদীপটা যখন হল তখনও খুশি হতে পারিনি, সেই মেয়েগুলোর জন্যে কেঁদেছি। ভগবান শেষে আমাকে এমন মেয়ে দিলেন! ওর জ্বালায়... কতদিন

ভেবেছি কী জানিস? মরে গিয়ে জ্বালা জুড়োই।

সরস্বতী চমকে উঠে দুহাতে মমতাকে জড়িয়ে ধরে বলে, ছি ছি, ওসব কথা মনে করতে হয় কখনও? আপনি এত ভাবছেন? এমনিতে একটু ছটফটে ছবু কিন্তু বিয়ের নামে দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

কী বলবেন মমতা? কেন ছটফট করছেন কাকে তিনি বোঝাবেন? ছবিকে লেখা তমালের চিঠি তিনি মা হয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছেন। পড়ে ছুটে গিয়েছিলেন অধীরের কাছে—সেদিন দুপুরবেলা। খুব রাগ ছিল, অনেক গালাগালি করেছেন তিনি ওদের আদর্শকে, নীতি-নিয়মকে। শেষে চোখের জল ফেলেছেন, সবকিছুর জন্যে দায়ি করেছেন অধীরকে, ছেলেটাকে ঘর-ছাড়া করার মূলে তুমি! মেয়েটাকে পর্যন্ত এক সর্বনাশা পথ ধরিয়েছ, শুধু বাড়ির বাইরেই টেনে নাওনি, ঘর-ভাঙাচ্ছ ওকে দিযে!

তাঁর অভিযোগ শুনে, রাগ দেখে হেসেছে মৃত্যুপথ-যাত্রী মানুষটা। বলেছে, অনেক তো দেখলেন বৌদি। জীবনভোর একটা নিয়মই দেখে এলেন। এবার ওরা জারি করুক না আর একটা নিয়ম। সুখটা তো আপনার নয় —সমাজেরও নয়, সুখটা ওদের।

জাতের কথা আমি না হয় ভুললাম মেয়ের সুখের আশায়, কিন্তু সবাই মানবে কেন? কত বড়ো একটা সংস্কার... ওটা কি কিছু না?

অধীর বলেছে, আপনিও যেমন? ওটা আবার একটা সমস্যা নাকি? সত্যিকার সমস্যা মানুষের অজস্র—। দুঃখ-যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করা আছে, মরণ-বাঁচনের কত প্রশ্ন আছে। ওসব কী সমস্যা নাকি! ভাবলেই বেশি। অত ভাববেন না।

কিন্তু তোমার দাদা যে ওর পাত্র ঠিক করেছেন। আমরা তো আর অসুখী করব না, ওর লেখাপড়ায় বাধা পড়বে না, তুমি একটু বুঝিয়ে বলো অধীর।

অধীর অস্বীকার করে বলেছে, ওকে জোর করে কিছু করানো যাবে না বৌদি। নিজেরা তো মনের টুঁটি টিপে মেরেছেন, ছবিকে দিয়ে ওটা আর নাই বা করালেন। আর তা ছাড়া... ওর যদি মনের জোর থাকে ওর পথ ও নিজেই বেছে নেবে...।

মাঝরাতে ঘুমন্ত ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে মমতা সেই আসন্ন আশঙ্কার কথা ভেবেছেন, এত অবাধ্য হবে ছবি। ছবি...এত কষ্ট দিবি তুই আমাকে... নিঃশব্দে চোখের জলও ফেলেছেন বিনিদ্র চোখে।

কেন তিনি ভয় পাচ্ছেন সে-কথা তিনি জানেন, সরস্বতী তা বুঝবে না। বুঝবে না এ বাড়ির একটা মানুষও

সরস্বতী কখন যেন ডেকে এনেছে ছবিকে। সে বলে, আমাকে ডেকেছ মা?

মমতা তাকে কাছে ডাকেন, আদর করে তার মুখের ওপরকার চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে মিনতি ভরা চোখে তাকান, আমার একটা কথা রাখবি ছবু? লক্ষ্মী, সোনা। আর আমাকে কষ্ট দিসনে রে। আমি আর সহ্য করতে পারিনে।

ছবির ঠোঁট কাঁপে, সেও শুনছে খবরটা। বুকের ভেতরটা কেমন শিরশির করে উঠছে থেকে থেকে। তমালের শেষ চিঠিখানা সে বুকের মধ্যে রেখেছে।

মমতা বলেন, ছেলে খুব ভালো, লেখাপড়া জানা হৃদয়বান ছেলে, ভালো চাকরিও করে। ওদের ওখানেও কলেজ আছে, বলেছে পাস করলে তোকে পড়াবে... ওরা।

ছবি হেসে ফেলে হঠাৎ, অত বিজ্ঞাপন দিচ্ছ কেন? আসল কথাটা বল না, মা?

কিছু করতে হবে না তোকে। ওরা তো গেঁয়ো নয় যে সাত-পাঁচ জিগ্‌গেস করবে। ছেলের বাপের সামনে গিয়ে একবার কেবল দাঁড়াবি।

তারপর?

উনি তো দেখেছেন ছেলেকে, রাজপুত্রের মতো চেহারা। অবস্থা ভালো, বিয়েটা হলে কত সুখে থাকবি তুই, ওই একমাত্র ছেলে!

তমালের চিঠিটা বুকের মধ্যে একবার স্পর্শ করে ছবি। রাজপুত্রের মতো চেহারা তার নয়—সে কালো। সে ভালো চাকরি করে না—পরের বাড়ি ছেলে পড়ায়। সে গরিব—তাই সুযোগ নেয় বড়োলোকেরা। তবু তমাল! তার সেই স্নিগ্ধ হাসি ভুলে যাবে ছবি! তার কাছে করা প্রতিজ্ঞা—প্রতীক্ষা করে থাকার, সহ্য করার! এখনও যে একমাসও হয়নি।

না, মমতার চোখের জল দেখলে ছবির সব গোলমাল হয়ে যায়। সে শক্ত হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর বলে কত বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখেছ? ওয়ার্কহাউস যেতে হবে না? তোমাদের যা কাণ্ড! —হেসে সবকিছুকে তুচ্ছ করে দিয়ে সে পা বাড়ায় বাইরের দিকে।

ছবি! —কুলদা ডাকেন।

দক্ষিণা বলেন, দাঁড়াও —তাঁদের পেছনে পূর্ণশশীও আছেন।

ছবি জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকায় বাবার মুখের দিকে। কুলদা কোমল গলায় বলেন, কথাবার্তা সব বলাই আছে। একটু কেবল দেখে যাবেন ওঁরা তোমাকে।

আমি তো যেতে পারব না বাবা।

কী বললে? —দক্ষিণা হঠাৎ ছুটে আসেন সামনে। ছেলের দিকে তাকিযে চাপা গলায় বলেন, তুমি কি শুনতে পাওনি কুলদা? আমি তো যেতে 'পারব না বাবা, —বিকৃতমুখে ছবির কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে বলেন, খুব ভালো লাগছে মেয়ের কথা শুনতে? মেয়েকে যে মেমসায়েব বানিয়েছ, ফল দেখেছ? কুলাঙ্গার ছেলে কোথাকার...।

বাবা! —কুলদা যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠেন, রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ছবির হাত ধরে টেনে আনেন সামনে। ছবি অবাক হয়ে একবার কুলদার মুখের দিকে তাকায় তারপর চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবার হাতের মধ্যে ধরা হাতখানা কাঁপছে অল্প অল্প—সেটা বাবার না তার নিজের,

বুঝে উঠতে পারে না সে।

দক্ষিণা খানিক শান্ত হয়েছেন ততক্ষণে, স্থির গলায় বলেন, ঘরে তালা বন্ধ করে রাখোগে মেয়েকে, যদি ভালো চাও। কত বড়ো আস্পর্ধা! বলে যাব না সামনে!

পূর্ণশশী কাছে এসে ছবির গায়ের ওপর সস্নেহে হাত রাখেন, কথা শোন দিদি! যা বলে কর। ওরা তো তোর ভালোর জন্যেই করছে, লেখা-পড়াই শিখিস আর যাই করিস...মেয়েমানুষের কি বিয়ে ছাড়া গতি আছে?

কুলদা বলেন, আনেক তো চুন-কালি মাখিয়েছ মুখে—গ্রামে তোমার জন্যে আমার কান পাতা দায়। ওদিকে আমার মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল—দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা। তারপর আবার তোমার অবাধ্যতা—আর সহ্য করবো না। যাবে কিনা বলো?

না—একটামাত্র কথা বলে তেমনি চুপ করে থাকে মেয়ে।

কুলদার মাথায় এবার আগুন জ্বলে। দক্ষিণা পাশে দাঁড়িয়ে টেনে টেনে ব্যঙ্গের হাসি হাসছেন। কুলদা ছবির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সুখদার ঘরের পাশের অন্ধকার ঘরখানায় ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেন। তাঁকে বাধা দেবে এমন সাহস এ বাড়িতে কারুর নেই। কেবল পূর্ণশশীর করুণ কণ্ঠ শোনা যায়, করিস কী, ও কুলদা। ওতে যে মেয়ে আরও বেঁকে বসবে। ভালো কথা বল, মিষ্টি করে বোঝা।

যারা দরজার কাছে এসেছিল দক্ষিণারঞ্জন ধমক দিয়ে তাদের সরিয়ে দেন। কুলদার উচ্চকণ্ঠ অনেকটা আর্তনাদের মতো শোনায়, কেউ কিছু বলো না আমাকে, আমি আজ দেখে নেব। কুলাঙ্গার ছেলে শোনার যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না।

অন্ধকার ঘরে পায়া ভাঙা তক্তপোশখানার ওপর বসে অনেকক্ষণ পরে ছবি হাসে একটু নিজের মনে। বাড়ির ভাঁড়ার ঘর এটা। ভ্যাপসা গন্ধ বার হওয়া প্রায়ান্ধকার ঘর একটা, ছোট্ট একটা জানলার ফাঁকে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় চিঠিখানাকে সে বার করে আর একবার পড়ে, একবার উচ্চারণ করে মৃদু অস্ফুট গলায়, তমাল! —তারপর আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকে চুপ করে।

তারপর কতক্ষণ কেটেছে কে জানে। ছবি ঘুমিয়ে পড়েছিল, গাঁয়ের ওপর দিয়ে ইঁদুরের মতো ছোটো কিছু একটা লাফিয়ে উঠে বসে। ওয়ার্কহাউসের কথা মনে পড়ে অসুবিধে হয়, তারও ভালো লাগে না। আজ ওরা ষড়যন্ত্র করে যেতে দিল না তাকে। না দিল। কিন্তু এভাবে বন্দি হয়ে থাকা এ বাড়িতে এই বোধহয় শেষ—আর কোনওদিন কারও ভাগ্যে যেন না ঘটে। আর ঘটবে না ছবি তা জানে। সেখানে একটা সান্ত্বনা আছে।

দরজার শেকলে মৃদু শব্দ ওঠে। কে যেন সন্তর্পণে শেকল খুলে ঢুকেছে ভেতরে, তার মাথায় হাত রেখেছে, নাম ধরে ডাকছে।

ছবি দু'হাতে মাকে আঁকড়ে ধরে চুপ করে থাকে। মমতা কাঁদছেন, তাঁর চোখের জল ঝরে পড়ে ছবির মাথায়, কী কেলেঙ্কারি করলি, ছবি! আর যে সহ্য করতে পারিনে আমি! একটু কেবল গিয়ে সামনে দাঁড়া, নইলে তোর বাবা যে আরও কী করবেন!

নিস্তব্ধ হয়ে থাকে মেয়ে। পুরনো দিনের মতো মমতা আবাব ডাকেন, ছবু!

ছবি মায়ের মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, বলে, হয়তো যেতাম মা, আগে হলে। কিন্তু তুমি তো জান, মন আমি ঠিক করে ফেলেছি। এখন তো আর উপায় নেই...।

ভূত দেখার মতো মমতা চমকে আর্তনাদ করে ওঠেন চাপা গলায়, উপায় নেই তোর? মন ঠিক করে ফেলেছিস? হায় ভগবান, আমার কেন মরণ হয় না।

ছবি বলে, ছোটোবেলায় তুমিই আমাকে লেখাপড়ার শেখার জন্যে কত উৎসাহ দিয়েছ—সাহস দিয়েছ। আমাকে দিয়ে কি বড়ো কিছু ভাবতে পার না মা—বিয়ে ছাড়া?

বিয়ে হয়ে তুই শান্তিতে থাকবি, সুখে থাকবি, এর চেয়ে বেশি কি ভাবে—মা তার মেয়ের জন্যে?

সে সুখ-শান্তি কি জোর করে হয়? আরও বড় কিছু ভাব, মা। ভাব যে একদিন তোমার ছবু একটা মস্ত বড়ো আদর্শের জন্যে প্রাণটাই দেবে।

ওসব কথা বলিসনে ছবি, —মমতা যেন আর্তনাদ করে ওঠেন। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, যা ইচ্ছে তোর তাই কর। আর আমি ভাবব না—তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে শেকল তুলে চলে যান।

উঠে বসেছিল, বসেই আছে ছবি। পূর্ণশশী একবার এসে হাত ধরে সেধেছেন ভাত খাবার জন্যে—যায়নি। বসে বসে সে সবায়ের পায়ের শব্দ পাচ্ছে।

বেলা ক্রমশ বেড়ে বেড়ে বিকেলের দিকে চলেছে। কারা দু-একবার দরজার কাছ দিয়ে ঘুরে গেল। শেকলে দু-একবার নাড়া পড়ে থেমে গেল একসময়!

হঠাৎ এক ঝলক আলো ঘুরে ঢুকতে ছবি সোজা হয়ে বসে। অনেকক্ষণ পরে চোখে আলো লেগে জ্বালা করে চোখ।

দাদু এসেছেন, বাবা এসেছেন, ঠাকুমা আছেন সঙ্গে—নেই কেবল বড়োকাকা। হয়তো ইচ্ছে করেই নেই।

কুলদা কোথা থেকে লিকলিকে একটা বেত জোগাড় করে এনেছেন— গম্ভীর গলায় বলেন, যাও, খেয়ে তৈরি হওগে। সাজ-পোশাক নয়— কেবল কাপড়টা বদলে নেবে।

পূর্ণশশী তার মুখের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছেন দক্ষিণারঞ্জন বলেন, যাও, যা বলা হচ্ছে শোন।

ছবি এবার জ্বলে ওঠে, যাব না। কী করবেন আপনি?

কী বললে? —দক্ষিণা কাঁপতে থাকেন রাগে, তা যাবে কেন? যত চাষাভুশো, জেলে-কুমোর তোমার সঙ্গী। দেখ কুলদা, ওরই মধ্যে কাকে বুঝি বিয়ে করতে চান মেয়ে, ডেকে আন তাকে।...সব গেল আমার—এত বড়ো বংশের মুখে চুনকালি পড়ল...।

কুলদা এগিয়ে এসে হঠাৎ চেপে ধরেন ছবির চুলের গোছা, যাবিনে?

না, না—

এবার বাতাসে কীসের একটা শব্দ হয় সপাং করে। সুখদার সবচেয়ে ছোটো ছেলেটা হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ছুটে পালায় সেখান থেকে। শব্দ হয় আরও একটা। কুলদা চেঁচিয়ে বলেন, যাও, সেফুকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দাও গে। ও পাত্র আমি হাতছাড়া করবো না। ওরা যা টাকা চায় আমি দেব সেফুর জন্যে—যাও!

তারপর চুল ছেড়ে দিয়ে ধাক্কা দেন সামনের দিকে, যা, চলে যা এবাড়ি থেকে। লজ্জায় গাঁয়ে আমার মুখ দেখানোর জো নেই তোর জন্যে!

পূর্ণশশী আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে সরে গেছেন। কিন্তু সরস্বতী মমতাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, না দিদি, আমি তা দেব না। ছবি মার খাবে আর সেফুকে ওরা দেখবে, সে আমার সহ্য হবে না।

মমতাকেই আবার বুঝিয়ে শান্ত করতে হয় তাকে।

ছবি তবু বসে থাকে ঘাড় বাঁকানো ঘোড়ার মতো। লজ্জা-অপমান কিছুই তার গায়ে লাগছে না, কেবল একটা নিঃশব্দ হাসি তার সারা মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে আর হাতের যেখানটায় বেতের দাগ বসে গেছে সেখানটা জ্বালা করছে থেকে থেকে।

সব একে একে চলে গেছে। দক্ষিণা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেফুকে বার করে এনেছেন আর মমতা সেফুকে সাজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ছবির সামনে এসে সেফু একবার থমকে দাঁড়ায়, কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে তার শরীর। তার মুখ দেখলে বোঝা যায় সে চায় না তবু যেতে হচ্ছে তাকে। মমতা বলেন, চোখের জল মুছে ফেল সেফু, ওকি। ওদের সামনে গিয়েও কাঁদবি নাকি? ছিঃ...।

কেউ নেই, কেবল সিঁড়ির ওপর আধো অন্ধকারে ভূতের মতো ছবি বসে থাকে। সে যেন আলাদা হয়ে গেছে এ-বাড়ির হৃৎপিণ্ড থেকে। তার জাত আলাদা, চিন্তা আলাদা।

আরও একজন আছে। সে ছায়ার মতো পাশে এসে দাঁড়ায়, মৃদু গলায় ডাকে, ছবি।

বড়োকাকা!

সুখদা আলগোছে তার মাথার ওপর হাত রেখে ডাকছেন, ছবু।

অনেকক্ষণ ধরে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা এতক্ষণে ছবির বুক থেকে সশব্দে বেরিয়ে আসে। চোখ তুলে সে সব গ্লানিভোলা হাসি হাসে, বড়কা?

সুখদা ব্যথিত গলায় বলেন, অমন করলি কেন রে? একবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হত?

তাতো পারিনে বড়কা।

কেন রে? এত জোর করছিস! কাউকে কি কথা দিয়েছিস?

অপ্রত্যাশিত উত্তরের অপেক্ষায় চুপ করে থাকেন সুখদা—ছবি উত্তর দেয় না। অধীরের মতো সুখদার কাছে সে সহজ হতে পারছে না।

বল না, লজ্জা কী? এত কাজ করে বেড়াস, লেখাপড়া শিখছিস—লজ্জা কী?

ফিশফিশ করে ছবি নামটা বলে।

একমুহূর্তে সুখদার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় সে-কথা শুনে, তারপর সামলে নেন তিনি। খুশির হাসি হাসবার চেষ্টা করে বলেন, আমিও কিছুটা জানতাম। ছেলেটা ভালো কিন্তু ছবি—বড়ো কঠিন কাজ...। একটা কিন্তু ভালো দেখিয়েছিস তুই... অদ্ভুত। কোথায় রইল দুজনে দুদিকে কিন্তু মনের জোর! ...এটা খুব ভালো। এরকম সবায়ের থাকে না... বেশ।

ঠাকুমার ঘর থেকে সেফুকে দেখানো শেষ কবে আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। অনেকগুলো গলার শব্দ শুনে সুখদা নিঃশব্দ পায়ে সরে যান সেখান থেকে।

ঘরে ঢুকেই সেফু তার সিল্কের কাপড় খুলে ফেলে ছবিকে দুহাতে ধরে কাঁদে—লজ্জা আর আনন্দ মেশানো কান্না।

ছবি তার মুখটা তোলার চেষ্টা করে বলে, ওঠ না, কাঁদছিস কেন শুধু শুধু। রাজপুত্রের মতো বর হবে তোর। দেখবি বিয়ের দিন কী সুন্দর করে সাজিয়ে দেব তোকে।

অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহেই সেফুর বিয়ে হয়ে গেল। সাজানো সেফুকে বারে বারে দেখে ছবি অতৃপ্ত চোখে। মানুষের আর একটা সুন্দর রূপকে উপেক্ষা করা যায় না। সেফুর এই আশঙ্কা-লজ্জা মেশানো থরোথরো চোখ, কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের সলজ্জ ভঙ্গি—এমন কখনও দেখেনি ছবি। কবে বিন্তিপিসিকে দেখেছিল বিয়ের কনে হিসেবে—তার কোথাও সুখ ছিল না, আনন্দ ছিল না।

সেই বিন্তিপিসিও এসেছে বিয়েতে। তার স্বামীর আগের দুটি ছেলে-মেয়ে ছাড়াও এই কবছরে বিন্তিপিসির নিজেরও হয়েছে আরও তিনটি। কঙ্কালের মতো রোগা হয়ে গেছে পিসি। একটা হাতকাটা সেমিজ আর আধময়লা শাড়ি পরনে। মাথার সামনের দিকের চুলগুলো সব গেছে উঠে—সেই চওড়া সিঁথিতে খুব টকটকে লাল, তেল-গোলা সিঁদুর পরা—কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তা। শুকনো হাড়সার মুখ, ঘামাচিভরা কপালে মস্ত এক সিঁদুরের ফোঁটা। পাঁচটা ছেলেমেয়ে পিসির পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল।

কোলের ছোটো ছেলেটার গা-ভরা ঘা—ন্যাড়ামাথা। সব ছেলেমেয়েগুলো রোগা রোগা—হাড় জিরজিরে চেহারা। সব মিলে যেন আর এক দুর্ভিক্ষের প্রতিমূর্তি হয়ে নামল পিসি।

ছবি মমতাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বিন্তিপিসির বয়স কত, মা?

কত আর, —ভেবে জবাব দিয়েছিলেন মমতা, সুকুমারীর চেয়ে ও অনেক ছোটো—পঁচিশও হয়নি এখনও। কী হয়েছে মেয়েটার দশা দেখেছিস? কালো

মেয়ের বিয়ে হয় না, বয়স বেড়ে যাচ্ছে বলে পাগলের মতো এক দোজবরের গলায় দিল ঝুলিয়ে—দেখেছিস শাস্তি? অবস্থাও শুনছি খারাপ—ওরা সত্যি কথা বলেনি। সুকুমারীটাকে তবু যা হোক...সুখী হয়নি সে ওর ভাগ্য...যাক্‌গে। কিন্তু, —হঠাৎ মমতার বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছিল, কিন্তু তোকে তো আমি সেরকম! ...দেখে শুনে খুঁজে-পেতে...তুই সুখী হবি বলেই তো...তাও নিলিনে তুই! ছবি! মা হয়ে বলতে আমার বুক ফাটে কিন্তু তোর জীবন খুব দুঃখের হবে ছবি...আমার মনে হয়...কেন জানিনে...।

কথা শেষ করে মমতা আঁচলে চোখ মুছেছিলেন আর কেন কে জানে ছবিরও বুকের ভেতরটা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

ছাদনাতলায় দাঁড়িয়েও সেই চেপে রাখা কান্নাটা ছবিকে বারেবারে অভিভূত করে ফেলছিল।

মমতা বলেন ছবিকে শুনিয়ে, কপাল! আমার কপাল! অনেক ভাগ্য করেছিল সেফুটা! যার কপালে যা।

যার কপালে যা আমরা দুজনে দুজনের জন্যে—কে যেন একদিন বলেছিল কথাটা। তমাল! ছবির ঠোঁট কাঁপে থরথর করে, মনটা হাহাকার করে কেন! কতকাল অপেক্ষা করতে হবে তার জন্যে? কত কাল! ছবি পারবে তো? তমাল তো নেই—তাকে চোখে দেখতে পাচ্ছে না—কথা শুনছে না তবুও এক অদ্ভুত শক্তি পাচ্ছে সে মনে!

সে কি শুধুই তমাল! নাকি একটা অদৃশ্য প্রেরণা। ছবিকে টানছে সে আরও বড়োর দিকে—মহতের দিকে। তমাল যদি সে পথ থেকে সরে যায় কোনোদিন! যদি সে দুর্বল হয়ে পড়ে—যদি বলে, ছবি, আর পারছিনে আমি! —তখন কী কববে ছবি?

ছাদনাতলায় মাথার ওপর তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে নিজের মনেই ছবি বলে, তবু চলব।

পথ তো একটাই, পৌঁছাতে পারা নিয়ে কথা। ক্লান্তি আসবে হয়তো কষ্টও অনেক কিন্তু থামবিনে ছবি—অধীরকাকা বলে।

পেছন থেকে এসে ছবির পিঠে হাত রাখে বিন্তি। বলে, একা একা কী করছিস ছবি? সবাই যে ঘরে চলে গেছে।

ছবি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে।

আমি সব শুনেছি ছবি! —বিন্তিপিসি গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর তার দুচোখ জ্বলে ওঠে আগ্রহে, কী চাস রে তুই? এর চেয়ে বেশি কী চায় মেয়েরা—সত্যি ভেবে পাইনে। দেখেছিস সেফুর বর—কী সুন্দর! মেয়েটার কপালে সুখ হবে...নারে?

কিন্তু তোর জীবন খুব দুঃখের হবে ছবি, —মমতার বলা কথাগুলো হঠাৎ কেন যেন মনে পড়ে যায় ছবির, বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে কিন্তু হাসিমুখে সে বলে, চল পিসি, সেফুকে দেখি আগে—দেখেছ কাণ্ড ...আমি একাই কেবল...বিন্তিকে পেছনে ফেলে ছবি দৌড়য়।



ত্রিশ

দক্ষিণারঞ্জন এখনও শিরদাঁড়া শক্ত করে ঘুরে বেড়ানোর চেষ্টা করেন কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনি যে কত দুর্বল হয়ে পড়েছেন সেটা বোঝা গেল সেদিন—যেদিন ছবির বদলে হাতজোড় করে নানা মিথ্যে কথা বলে সেফুকে দেখাতে হল। সবাই চলে গেলে হঠাৎ জ্ঞান হারালেন তিনি।

ওরকম হয়েছিল আরও একটা দিন কিন্তু সে-কথা কেউ জানত না এক মানিক ছাড়া।

রিলিফ কিচেনে ছবিকে ফিরিয়ে আনতে গেলে—যাব না, বলে ঘাড় বাঁকিয়ে থাকল মেয়ে। তাকেও হয়তো শায়েস্তা করতে পারতেন কিন্তু শশী মাঝির অপমান তিনি সহ্য করতে পারেননি, রাগে কাঁপতে কাঁপতে কেবল নৌকোয় উঠেছিলেন তিনি—তারপর কিছু মনে নেই।

মাণিক তাঁর মাথায় জল দিয়ে সুস্থ করে হাত ধরে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। কিন্তু সে-কথা গোপন ছিল, সে লজ্জার কথা পূর্ণশশীকে পর্যন্ত বলেননি তিনি।

দ্বিতীয় দিনটায় সবাই দেখে ফেলেছে। ছেলেরা তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে—বাধা দেবার কিছু নেই।

শরীরের যন্ত্রণাকে সারাবে ওষুধ কিন্তু তাঁর মনের যন্ত্রণা!

সেফুর বিয়েটা পর্যন্ত তবু চেষ্টা করে সুস্থ রাখা গিয়েছিল তাঁকে কিন্তু আর গেল না।

খবরটা গোপন রাখবার যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু কেমন করে যেন কানে পৌছে গেছে দক্ষিণার, কুলদাকে অ্যারেস্ট করেছিল পুলিশ—আজ ছেড়েছে।

কুলদার ধান-চাল সব আটক করেছে কৃষক-সমিতির লোকেরা। ধান-চালের ব্ল্যাকমার্কেটিং সম্প্রতি শুরু করেছিলেন কুলদা, দক্ষিণারই আগ্রহে। সে আগ্রহটা এসেছিল রায়কত্তার কাছ থেকে। রায়কত্তার বড়ো ছেলে অনিলের সঙ্গে ভাগে কারবার—তিনিই ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

কুলদা ছাড়া পাবার পরে সমস্ত বাড়িটা যেন লজ্জার পাথারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কুলদা সন্ধের অন্ধকারে সেই যে মাথা নিচু করে রোয়াকে বসেছিলেন হাজার ডাকাডাকিতেও তিনি ঘরে ওঠেননি।

দক্ষিণা লাঠি ভর দিয়ে উঠে এলেন ছেলেকে সান্ত্বনা দেবেন বলে—গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন অসহায় মানুষের মতো।

কুলদা বলছেন, ছিলাম ভালো, ন্যাও এবার হল আমার ব্যাবসা। অতি লোভ করতে গিয়ে অনিলের চালাকিটাও ধরতে পারিনি আমি।

মমতা আজ শাশুড়ির সামনে মাথায় ঘোমটা টানতেও ভুলে গেছেন। আজ কেন যেন স্বামীর লজ্জিত-অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কান্না পাচ্ছে, কুলদার যন্ত্রণাটা খানিক তিনি অনুভব করতে পারছেন।

মমতা আস্তে আস্তে বলেন, ও ছাই, মুখের খাবার নিয়ে ব্যাবসা তুমি আর কোরো না। ভাত খেতে যাই—ভাতের গ্রাস আমার গলা দিয়ে নামে না। শুনেছি ব্ল্যাক মার্কেট যারা করে তারা অমানুষ—মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে...ছিঃ। তুমি ছোটো ব্যাবসাই কর, ওসব থাক রায়কত্তাদের জন্যে...।

দিশেহারার মতো কুলদা বলে ওঠেন, আমি কি চেয়েছিলাম করতে? অত সাহস আমার নেই—উনি, আমার বাবাই তো ধরালেন এ ব্যাবসা। টাকার লোভে আমিও ভুললাম। ওঁরই জন্যে...।

শুনে কাঁপতে কাঁপতে সেই বিছানায় এসে শুয়েছেন আর ওঠেননি দক্ষিণা। উঠবেন না, তাও যেন বুঝে ফেলেছে সবাই। একটা পঁচাত্তর বছরের দাপট আর অহংকার, একটা যুগ শেষ হতে চলেছে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। বাড়িতে সবাই যেন সেই সম্ভাবনায় স্তব্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ।

কত কী তো বলবার থাকে মৃত্যুপথ-যাত্রী-মানুষের। দক্ষিণার যেন সব ফুরিয়েছে। তিনি নির্বাক।

ছবি কী করবে ভেবে পায় না। সবাই রোগীর ঘরে যায়, সে দরজার বাইরে থেকে দেখে চলে আসে। এবাড়ির বুকে অপমান, অসম্মানের বোঝা খানিকটা সেও চাপিয়ে দিয়েছে—তার নামও তাই নাকি সহ্য করতে পারেন না দক্ষিণা।

চোখ বুজে থাকেন, চোখের কোল বেয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে কখন অজ্ঞাতে। দুর্বল হাতে দক্ষিণা মুছে ফেলেন তা।

কথা বলে না মানুষটা। কুলদা, সুখদা, পূর্ণশশী মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েন,

কিছু বলতে চান? কাউকে লেখাপড়া করে দেবেন কিছু?

নিঃশব্দে মাথা নাড়েন। কী আছে তাঁর যে দেবেন! জমি নেই। মামলা করে, ফন্দি করে, হিসেব খতিয়ান দেখিয়ে ওই বড়ো রায় তা দখল করেছে—জীর্ণ করেছে নিজের উদরে। কখনও গায়ের জোরে—কখনও হাসিমুখে নিয়েছে। নিয়ে আবার দয়া দেখাতে এসেছে—দুর্বলের ওপর সকলের দয়া। আর শেষ চালটাও রায়েরা ভালোই দিয়েছে—টাকার লোভ দেখিয়ে চাল-কাপড়ের কারবার ধরিয়েছিল ভাগে। সেখানেও চালাকি! সেখানেও হেরে গেলেন দক্ষিণা।

এখন আর কিছু নেই তাঁর—জমি নেই, জমা নেই, টাকা-পয়সা নেই। ছিল কেবল একটা জিনিস। কিন্তু সেটাতেও ফাটল ধরেছে। ফাটল ধরেছে এ বংশের দাপটে—দক্ষিণার হুংকারকে অগ্রাহ্য করার সাহস এসেছে এ বংশে।

মাঝে মাঝে বিড়বিড় করেন আপন মনেই। পূর্ণশশী ঝুঁকে পড়ে শোনার চেষ্টা করেন কিন্তু বোঝা যায় না। কোনো ইচ্ছে নয়—শেষের দিনের জন্যে আক্ষেপ নয়। অন্য কথা। ভালো বোঝা যায় না—অসংলগ্ন কথার টুকরো, সব ভেঙে গেল! কিছু রইল না...কিছু না।

অনেক কষ্ট পেয়ে সরস্বতীর এক মেয়ে হয়েছে। পূর্ণশশী এসে বলেন, নাতনি হয়েছে তোমার। সুখদার মেয়ে!

মেয়ে! —বিকৃতমুখে আবার চোখ বোজেন দক্ষিণা। আস্তে আস্তে বলেন, মেরে ফেলগে যাও। বাড়তে দিও না—বুঝলে?

পূর্ণশশী রাগ করেন সে-কথা শুনে, কথা শোন একবার—মেরে ফেলবে কোন দুঃখে? আহা!

ছবি যখন বাড়ি ঢোকে ততক্ষণে নবজাতকের কান্না ছড়িয়ে পড়েছে সারা বাড়িময়। অনেককালের পুরোনো বাড়িটার পাঁজরে পাজরে কচি গলার কান্না যেন নাড়া দিয়ে দিয়ে ফিরছে। ঢুকেই একটু থমকে থেকে হাসিমুখে ছবি ছুটে গেল খড়ের ছোট ঘরখানার কাছে। বাচ্চা হাত-পা ছুঁড়ে কাকিমার কোলের কাছে শুয়ে কাঁদছে। হাসিমুখে ছবি বলে, বোন, কাকিমা?

ছবির খুশি মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত মুখে সরস্বতীও বুঝি একটু হাসবার চেষ্টা করেন, কী দেখছিস রে ছবু, অমন হাঁ করে।

ছবি বলে, দেখছি বোনটাকে— কী দস্যি মেয়ে দেখেছ, এখুনি এত হাত-পা ছুঁড়ছে? ও তোমাকে বড়ো হয়ে আমার মতোই জ্বালাবে কাকিমা—দেখো তুমি,— কথা শেষ করে দুষ্টুমিভরা হাসি হাসতে থাকে ছবি।

কিন্তু সরস্বতী আর হাসে না, কী এক ভাবনায় তার ক্লান্ত মুখ আরও বিষণ্ণ দেখায়। গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে বলে, কোলে নিলে চান করতে হবে তোকে এই অবেলায়, নইলে তোর কোলেই ওকে প্রথম তুলে দিতাম ছবু। ...জ্বালাবে বলছিস।

—গভীর দৃষ্টিতে ছবির মুখের দিকে তাকিয়ে সরস্বতী হঠাৎ এক অদ্ভুত কথা বলে, ও যেন তোর মতোই হয় ছবু... তোকে তো কেউ দেখতে পারে না...কিন্তু তুই জানিসনে ছবু...। —ছলছলে চোখে অসমাপ্ত কথার মাঝেই চুপ করে যায় কখন একসময় সরস্বতী। আর ছবির মুখে ফুটে ওঠে লজ্জার হাসি, যাও, কী যে বলো তুমি? আমি কী... আমাকে নিয়ে তো এবাড়িতে...তুমি যে কী কাকিমা।

কিন্তু সরস্বতীর এও এক নতুন রূপ। মাকে চেনে ছবি—কাকিমাকেও আজ চিনল। তার চোখ ছলছলে হয় ওঠে।

আজকাল জল শুকিয়ে গেছে কিন্তু কাদা শুকোয়নি। সেই একহাঁটু কাদা ভেঙে সুখদার ছোটো ছেলে ওয়ার্কহাউসে এসেছে দৌড়ে, শিগগির চল বড়দি। দাদু যে মরে যাচ্ছে!

মরে যাচ্ছে! সেকি রে! হঠাৎ কী হল?

কাজ ফেলে রেখে ছবি ছোটে প্রাণপণে।

দক্ষিণাকে ততক্ষণে উঠোনে বার করা হয়েছে, ঘরে রাখতে নেই এ সময়। খোলা আকাশের নীচে শান্তি পেতে দিতে হয় মুমূর্ষুকে। কানের কাছে গীতাপাঠ করছে হারাণ ঠাকুর।

চোখ দুটো বিস্ফারিত, ঠোঁট তখনও কাঁপছে মৃদু মৃদু। মা, বাবা, বড়কা সবাই মাথার কাছে বসে নিঃশব্দে কাঁদছেন—কেবল পূর্ণশশী পায়ের কাছে মাথা রেখে পড়ে আছেন। তখনও পাকা চুলের মধ্যে সিঁদুরের জ্বলজ্বলে রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঠাকুমার।

ধীরে ধীরে কখন একসময় ঠোঁটের কম্পনও থেমে এসেছে। চোখের খোলা পাতা দুটো বন্ধ করে দিয়ে কুলদা চোখের জল ফেলতে থাকেন মুখ ফিরিয়ে। দক্ষিণার বন্ধ করা চোখের কোল বেয়ে একরাশ জমানো জল গড়িয়ে পড়ে শুধু।

পূর্ণশশী এবার মুখ তুলে তাকান। খানিক তাকিয়ে থাকেন নিষ্প্রভ, প্রাণের-চিহ্নহীন মুখখানার দিকে—তাকিয়ে দেখে, বুঝেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। কিন্তু সে একটা মুহূর্ত মাত্র—তারপরই অসহ্য চিৎকারে ফেটে পড়ে মাটিতে মাথা কুটতে থাকেন তিনি, ষাট বছর ধরে খুব সুখ দিয়েছিলে আমাকে, আজ সে সুখের ভারা পূর্ণ করে গেলে... তাঁর দীর্ঘ বিলাপ ভরা কান্না সারা বাড়িটায় যেন প্রতিধ্বনি তুলে তুলে ফিরতে থাকে।

বাড়ি ভরে গেছে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীতে। তখনও দক্ষিণার নিষ্প্রভ দীর্ঘ চেহারাটায় ঢাকা দেওয়া হয়নি—অনাবৃত হয়ে পড়ে আছে খোলা আকাশের নীচে। স্তিমিত চোখদুটো দিয়ে যেন শেষ দেখা দেখে নিচ্ছেন আজন্মের আবাসকে। এই তাঁর সাতপুরুষের ভিটে—এবাড়ি ছেড়ে তিনি কোথাও যাননি, এ গ্রাম ছেড়ে অন্য কোনো জীবন চোখেও দেখেননি তাঁর পঁচাত্তর বছরের জীবনে।

জমিদারির দাপটের মধ্যে পঁচাত্তর বছর আগে শঙ্খরবে জন্ম ঘোষণা করেছিল যে প্রাণ—তাকেই আঁকড়ে থাকতে চেয়েছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। হেরে গিয়েও স্বীকার করেননি। ভেঙে যাচ্ছে বুঝতে পেরেও মেনে নেননি।

কে যেন বলে, ঢেকে দাও কুলদা। অমন করে খোলা রাখতে নেই।

এতক্ষণ কাঁদেনি ছবি। আড়ষ্ট সজল চোখে দক্ষিণার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল পুরোনো কথা, এবার ঢাকা দেহটা দেখে হঠাৎ সে কেঁদে ফেলে।

পূর্ণশশীব হাতের শাঁখা ভাঙতে কাউকে লাগে না। তিনি নিজেই তা ভেঙে ফেলেন—একখণ্ড পাথরের ঘা দিয়ে দিয়ে। ঘসে ঘসে সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেন নিজেই, হাত বাড়িয়ে থানখানা টেনে নেন। তবু ঠাকুমার থান-পরা নিরাভরণা মূর্তি যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না চোখে দেখেও।

চৌষট্টি বছর ধরে যে মানুষ একভাবে চলে এসেছে তার শখ-সুখ-ইচ্ছেগুলো এমন করে শেষ হয়ে যায় একটা মুহূর্তের পরেই?

ইচ্ছে থাকলে হোক। কিন্তু ইচ্ছে না থাকলে? দুর্গার তো ইচ্ছে নেই তার যে জীবনের এখনও অনেক সাধ। সে বাঁচতে চায়, সাজতে চায়। স্বামীকে পেয়ে সে খুশি হয়েছিল কিন্তু সে খুশিটুকু তার মাঝপথ থেকে চুরি হয়ে গেছে বলেই কি মনে ওর অত জ্বালা। ঠাকুমার বলি-রেখাঙ্কিত মুখে কি দুর্গার ভবিষ্যৎ আঁকা আছে?

দুর্গা তাকে বলে, তুই ঠিক বড়ো হবি ছবি... আমার মনে হয়...।

কে জানে ছবি বড়ো হবে কি না। কিন্তু দুর্গা যেন পথ পায়, যেন পথ পায় মায়াদি! সেদিন যেন আসে যেদিন এসব দুঃখ-কষ্ট কিছু থাকবে না। ঠাকুমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছবি মনে মনে সেই কামনাই করে।



একত্রিশ

এবার পৌষের ফসল উঠল না কারো ঘরে—ওয়ার্কহাউসের অঙ্গনে বসে সজল চোখে মানুষগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। রিক্ত শূন্য মাঠের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে কখন যেন চোখ মুছে ফেলেছে, আবার প্রস্তুত হচ্ছে নতুন করে।

ওয়ার্কহাউসটা উঠে যাবার নোটিশ এসেছে—ছবি সেটা হাতে করে চুপ করে বসেছিল। ওরা শুনেছে সে খবর, শুনে বিবাদ-ম্লান হাসি হেসেছে। ওরা নিজেরাও উঠে দাঁড়াতে চায় এবার—এ দান নেবার লজ্জা শেষ হলে বাঁচে। গুদামে জমানো হাজার হাজার মন চাল্ ওরা দেখেছে—চেয়ে চেয়ে তার সামনেই কুঁকড়ে মরেছে তবু লুট করেনি—ছিনিয়ে নেয়নি। তারা জানে এ দান নেওয়ার দুঃখ—ঘেন্নার খাওয়া। তবু বাঁচিয়ে রেখেছে প্রাণটাকে। চোখের জল মুছে বাজরার খিচুড়ি খেয়েছে কেবল সামনের দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে। আশা করেছে একদিন আবার হাসবে তারা, লাঙল চালাবে, ফিরে দাঁড়াবে একজোট হয়ে। সে-কথা বলে হামিদ আর নগরবাঁশি, সেইজন্যিই গেরাম ছাড়ি নাই। না খাতি পায়ে বউ-ছেলে-মেয়ে শুকোয়ে গেছে, তবু বাঁচার চেষ্টায় ঘুরিছি—হাত পাতে খিচুড়ি নিছি। সে তো এই দিনের জন্যি। জানতাম, একদিন পথ পাবই।

আরও কটা দিন থাকলে হত এ ব্যবস্থাটা কিন্তু সরকারি নির্দেশ আর সাহায্য আসবে না। দাবি করে করানো গিয়েছিল যা, তাই বলে আবেদন নিবেদন করে সমিতি কিছু করবে না।

ওরা ঘুরছে-ফিরছে কাজ করছে, কেবল ছবির মনটা কেমন করতে থাকে সকাল থেকে—সমস্ত কলরবের মধ্যে সে-ই কেবল নিস্তব্ধ।

খুব মৃদুপায়ে ধীরেন এসে দাঁড়ায় সামনে—তার মুখের দিকে তাকিয়ে এক অনির্দেশ্য আশঙ্কায় ছবির বুকের ভেতরটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে ওঠে, কী হয়েছে ধীরেন কাকা? আবার কী খবর এল?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁপা গলায় ধীরেন বলে, অধীরদাকে আর রাখা গেল না ছবি—শেষ দেখা দেখে এস একবার।

কী! —তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রেতিনীর মতো চিৎকার করে ওঠে ছবি, আমি যে পরশুও দেখে এসেছি—কাকা আমার সঙ্গে কত গল্প করল। তমালের চিঠি আসবে স্যানাটোরিয়ামের ব্যবস্থা করে... ধীরেন কাকা?

তমালের চিঠিও এসেছে ছবি। লিখেছে কোনওমতে কলকাতায় পৌঁছে দিলেই আর সব ব্যবস্থার ভার ওরা নেবে... কিন্তু এ অসুখ... ছবি, কাঁদিসনে।

ছবি বলে আজকাল কাকার কাছে গিয়ে ভালো করে গিয়ে বসতেও পারতাম না—জানতাম আপনারা আছেন। পরশু গেলাম... কত গল্প... আমার পড়াশোনা... ভবিষ্যৎ। কিন্তু কাকার কী হল?

ছবি চোখের জল মুছতে মুছতে ছোটে। দাদুর মরে যাবার খবর শুনে সে দুঃখিত হয়ে ছুটেছিল সেদিন—আজ সে আতঙ্কিত হয়ে ছোটে। কাকা, অধীরকা! ছবির জীবনের শ্রদ্ধা, বিস্ময় আর সাহস আজ মরে যাচ্ছে! নিভে যাচ্ছে একটা আগুন—চলে যাচ্ছে একটা অমূল্য জীবন!

অন্যদিনের নিস্তব্ধ হয়ে থাকা ঘরখানা আজ ভরে উঠেছে লোকজনে। কুলদা এসেছেন, সুখদা এসেছেন, ছবিদের বাড়ির সবাই। নতুন দিদিমাকে কারা যেন ধরে রেখেছে তাঁর মাথা কোটা বন্ধ করবার জন্যে। এর মধ্যেই কপালটা তিনি ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত করে ফেলেছেন।

সবাই কাঁদছে নিঃশব্দে—কেবল কাঁদছে না একজন, সে মায়া। নিস্তব্ধ তৎপরতায় সে অধীরের মুখের উঠে আসা রক্ত মুছিয়ে দিচ্ছে, ঠোঁটের ফাঁকে ওষুধ দিচ্ছে। কখন এসে সে তার জায়গা বেছে নিয়েছে সে নিজেও বুঝি তা জানে না। সবাই বিস্মিত চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে—কিন্তু তার আজ লজ্জা কীসের! মাথার ওপর একটুখানি ঘোমটা টেনে দিয়ে নির্বাক হয়ে কাজ করে যাচ্ছে সে। মাঝে মাঝে কেবল শিউরে উঠে তাকাচ্ছে অধীরের বারে বারে বুজে আসা চোখের দিকে—। যেন ওর শেষ হয়ে আসা প্রাণটাকে শেষ শক্তি দিয়ে আটকে রাখবে সে।

ছবি ঢুকেছে ঝড়ের মতো। সে অধীরের মুখের ওপর অপলক চোখে তাকিয়ে ডাকে, কাকা!

আর একবার রক্ত উঠে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে অধীরের। ছবি তার একখানা হাত সজোরে আঁকড়ে ধরে কাঁদে, এত তাড়াতাড়ি? কাকা? তমাল যে চিঠি দিয়েছে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। আমার কী হবে কাকা?

অধীর হাসবার চেষ্টা করে রক্তাক্ত ঠোঁটে। দম নিয়ে ফিশফিশ করে বলে, তোর সত্যিকার লড়াই এখনও বাকি...ছবি। সে জগতটা কঠিন! ...ওরা কই?

ধীরেন, অরুণ, প্রসন্ন জল-ভরা চোখ নিয়ে ঝুঁকে পড়ে মুখের ওপর।

অধীর বলে মায়াকে দেখিয়ে, এই মেয়েটাকে দেখো ধীরেন— আমার মা, বাবা, সমিতি—তোমাদের। ...দেখো। ভয় পেও না—ভয়, পাসনে ছবি।

ছবি মনে মনে বলে, ভয় পাব না, আমি ভয় পাব না।

আবার রক্ত উঠেছে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে তবু ফিশফিশ করে অধীর বলে বড়ো কষ্ট—জীবনটাই কষ্টের। তোরা কষ্ট পাসনে... তোরা, —মায়ার মুখের দিকে তার দু'চোখ স্থির অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ওষুধ দিতে গিয়ে মায়া হঠাৎ চমকে ওঠে, তারপর তীক্ষ্ণ চিৎকারে সে লুটিয়ে অধীরের বুকের ওপর। আবার সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখতে থাকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তার দু'চোখ—কেবল ঠোঁট দুখানা থরথর করে কাঁপছে, কাঁদতে পারছে না মায়া।

নতুন দিদিমা আর মাথা কুটছেন না, মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছেন। ছবি কাছে যেতে বলেন, ওকে শেষের দিনগুলোয় ভাল করে খেতে পর্যন্ত দিতে পারিনি ছবি। আমার একটা মাত্র ছেলে, খ্যাপা সন্ন্যাসী হয়ে গেল—তাই বলেও দুঃখ করিনি। কিন্তু ও কেন বেঁচে থাকল না?

সব মানুষকে সুখী করার স্বপ্ন দেখতো যে মানুষ, স্বচ্ছল জীবনের কামনা ছিল যার মনে সে মরে গেছে খেটে খেটে, না খেয়ে—বিনা চিকিৎসায়।

বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যায়, ছবি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ছাদের এক কোণে। কান্নার শব্দ সে সহ্য করতে পারছে না—এত দুঃখ অসহ্য।

অরুণ এসে পাশে দাঁড়িয়ে বলে, সব গাঁয়ে গাঁয়ে খবর চলে গেছে এরই মধ্যে—দেখেছিস ছবি?

ছবি দেখছে অজস্র মানুষ। অনেক দূর থেকে, কাছ থেকে দলে দলে মানুষ আসছে।

অরুণ বলে, ওরা অধীরদাকে শেষ সম্মান দেখাতে চায়—কৃষক-সমিতির নিশান নিয়ে আসছে দেখছিসনে? অধীরদার নিজের হাতে গড়া সমিতি।

রায়কর্ত্তা এসেছেন—গ্রামের আরও কয়েকজন প্রৌঢ় আছেন—তাঁরা হরিনন্দনকে ঘিরে বসে আছেন।

তাঁরা প্রস্তাব শুনে বিস্মিত চোখে হরিনন্দনের মুখের দিকে তাকান, বামুনের ছেলে! প্রায়শ্চিত্ত হোক—তারপর কাঁধ দেবে যারা দেয়। ওই ছোটোলোকগুলো নিয়ে যাবে সে কী? মরা মানুষ নিয়ে আবার মিছিল কী?

কিন্তু সে আপত্তি টেকেনি। অসহ্য যন্ত্রণায় হরিনন্দনের বুকের ভেতরটা পুড়ে

যাচ্ছে কিন্তু তিনি চোখের জল ফেলেননি একফোঁটা। কেবল ভাঙা ভাঙা আর্তস্বরে কখন একসময় বলে ফেলেছেন, নিয়ে যাক—ওরাই নিয়ে যাক। ও যাদের—তাদের হাতেই ছেড়ে দেব আমি ওকে। ও তো আমাদের নয়, আমাদের কথা কি ভেবেছে কোনওদিন। —বলে এতক্ষণের উচ্ছ্বসিত কান্না চেপে সেই যে তিনি উঠে গেছেন আর এসে বসেননি এই সমাজপতিদের সভায়। তারপর কোথা দিয়ে কেমন্ করে কারা যেন সব ব্যবস্থা করেছে। ফুল এসেছে, মালা এসেছে, ছোটো ছোটো নিশান এসেছে—পরম যত্নে ওরা দেহটাকে সাজিয়েছে সারাদিন ধরে, নিয়ে চলেছে।

শয়ে শয়ে খালি গা, খালি পায়ের কালো কালো মানুষ—যারা খাজনা মকুবের জন্যে কোনোদিন কেঁদে গেছে রায়কত্তার বৈঠকখানায়, ধানের সব-ভাগ দিতে না চেয়ে পায়ে ধরেছে—সেই মানুষগুলোই অসমসাহসী হয়ে উঠেছে কবে যেন।

রায়কত্তা বিকৃত চোখে তাকিয়ে থাকেন—তাঁদের ঘরের ছেলে, কঠিন অসুখে মরেছে। প্রায়শ্চিত্ত হল না পুরুতে ডেকে, ব্রাহ্মণের আগুনে গতি হল না, ওই ছোটোলোকগুলো নিয়ে চলল ঘাড়ে করে।

মানুষগুলো চলেছে নিঃশব্দে। পুরুষরা গামছার খুঁটে চোখ মুছছে—মেয়েরা অনেক শব্দ করে কাঁদছে। ওদের মধ্যে অনেকে অধীরকে দেখেছে, অনেকে দেখেনি। তবু কাঁদছে। শুনে কাঁদছে, কান্না দেখে কাঁদছে।

মমতা, পূর্ণশশী এসে বসেছিলেন আমতলায়। ওই পথ দিয়ে চলে গেছে মিছিলটা। পূর্ণশশী কিছুদিনের মধ্যে একেবারে বুড়িয়ে গেছেন, সোজা হয়ে হাঁটতে পর্যন্ত পারেন না। চোখের দৃষ্টি কমে গেছে—তবু চোখের ওপর হাত রেখে তাকিয়ে থাকেন তিনি চলে যাওয়া সারিটার দিকে; কত মানুষ হয়েছে দেখেন। ছেলেটাকে কোনোদিন ভালো-চোখে দেখেননি তিনি। হরিনন্দন আর তার বউকে করুণার চোখে দেখেছেন, ভেবেছেন, একটা ছেলে তাও মানুষ হল না—পাগল, বাউণ্ডুলে। কিন্তু আজ আর সে কথা মনে হচ্ছে না। তাঁরও তো বড়ো বড়ো ছেলেরা মারা গিয়েছে—সেদিন স্বামী মারা গেলেন। কই এমন করে মানুষ এসে তো কাঁদেনি—সম্মান দেখায়নি। কেমন করে হল! একটা মানুষের জন্যে এতগুলো মানুষ কাঁদে—কেমন করে!

বেলাশেষের স্তব্ধ শ্মশানটায় কয়েকশো জোড়া চোখ নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে দেহটার দিকে। ফুলে-চন্দনে-নিশানে সাজানো এক কাজ-পাগল মানুষের নিস্তব্ধ দেহ।

তারপরের সেই যন্ত্রণা-ভরা মুহূর্ত এল—কেউ যেতে চায় না এগিয়ে, সবাই কাঁদে।

শেষ হল তাও। একটা শরীরকে ঢেকে দিল আগুনের লকলকে শিখা। ধোঁয়া

কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল আকাশে। আগুনের আভা কালো কালো হাড়-সার মানুষগুলোর মুখে পড়েছে—চোখে পড়েছে—আলো হয়ে উঠেছে আসন্ন সন্ধ্যার বুক।

ছবি ছটফট করে সেখান থেকে চলে আসে। মায়াকে ঘিরে বসে আছে হরিদাসী, ফুলমণি আর বাতাসী। ছবি বলে যন্ত্রণাকাতর গলায়, চল মায়াদি—আর সহ্য করতে পারছিনে।

মায়া বলে, কোথায় যাব, ছবি?

বাড়ি যাবে না?

খুব শান্ত স্বরে মায়া বলে, ওখানে আর ফিরব না, ছবি! আমি হরিদাসীদের গাঁয়ে চলে যাব—ওরা আমাকে থাকবার জায়গা দেবে। ওদের লেখাপড়া শেখাব যতটুকু পারি, ওদের ছেলেমেয়েরা আছে তারপরেও।

ছবি অবাক হয়ে মায়ার মুখের দিকে তাকায়, সে কি তুমি পারবে মায়াদি—ওদের মধ্যে?

মায়া ম্লান হেসে ছবির সব সংশয়কে উড়িয়ে দেয়, হয়তো কষ্ট হবে কিন্তু আমার মামার বাড়ির কষ্টের চেয়ে—অধীরদা ছাড়া জীবনের চেয়েও সে কি বেশি কষ্টের, ছবি?

ছবি ধীরেনের কাছে যায়। ধীরেন বলে, যাচ্ছে বাধা দিস্‌নে ছবি। আমরা রইলাম, ওর ভার নেব। মনে হয় পারবে।

যাবার সময় ছবির হাত ধরে মায়া কাঁদে আবার, ভালোবেসে না-পাওয়া একটা পাপ, ছবি। আমার মতো দুঃখ যেন কেউ না পায় কোনওদিন— দেখিস তোরা।



বত্রিশ

মানুষের জীবনে দুঃখ আসে, দুর্বিপাক আসে কিন্তু স্থায়ী হয় না—সংসারেও নয়, বাইরের জগতেও নয়—এটাই সান্ত্বনা।

দুর্বিপাক শুরু হয়েছিল। ভেঙে তছনছ করে দিয়ে গেছে গ্রামকে-গ্রাম, হাজার হাজার মানুষের সুখ-দুঃখ দিয়ে ঘেরা সংসারগুলোকে, কিন্তু সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি সব। সেই মানুষগুলোই আবার তুলেছে মাথা। ভেজা ভেজা মাটিতে নেমেছে আবার হাড়-সার গোরু আর মরচে পড়া লাঙল নিয়েই। হারিয়ে-যাওয়া, পালিয়ে-যাওয়া মানুষগুলো কতক ফিরেছে—কতক ফেরেনি। তবু তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই। এক হাতে চোখের জল মোছে, আর এক হাতে মাটি গুঁড়ো করে তারা। ঘরে ফিরে এসেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না—একজন আর একজনের গলা জড়িয়ে কাঁদে। এখনও মাথার ওপর দিয়ে শব্দ করে উড়ে যায় এরোপ্লেন—ম্লান হাসি ঠোঁটে ফুটতে গিয়ে আবার মিলিয়ে যায়। যুদ্ধ যে থামেনি এখনও। এখনও শেষ হয়নি এ পোড়াকপালে দিনগুলোর।

তবু মিছিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে গাঁ থেকে গাঁয়ে মানুষের দল। সাহস দেয় এক গাঁয়ের লোক আর এক গাঁয়ের লোককে। ওদের সঙ্গে ঘুরছে ছবিও—সেও হেসেছে, কেঁদেছে। ওরা বলেছে, ভয় নেই ভাই—আর যুদ্ধ বাধাতে দেব না আমরা—আর মরব না।

সেও মনে মনে বলেছে, ভয় নেই—ভয় নেই।

ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় সে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে দূর-দূর গ্রামগুলোর দিকে পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। অস্পষ্ট দেখা যায় ঘুরে-ফিরে বেড়ানো মানুষগুলোকে। মাথায় টোকা-পরা, তামাটে মুখগুলোকে দেখা যায় না—কর্মব্যস্ত

কালো হাত চোখে পড়ে না কিন্তু ওদের নতুন করে বেঁচে ওঠার আনন্দটা যেন অনুভব করা যায়, ওদের গলার নতুন সুরটা কানে লাগে। দুর-দুরান্তর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসে বাতাসে প্রতিরোধের ভাষা, প্রতিজ্ঞার সুর। আবার না-মরবার, বেঁচে থাকবার প্রতিজ্ঞার গান গায় ওরা। ছবি তা কান পেতে শোনে ছাদে দাঁড়িয়ে।

সদর দরজা দিয়ে সুখদা ঢোকেন খুশিমুখে। চেঁচিয়ে বাড়িটা ফাটিয়ে দিতে পারলে যেন শান্তি পান এত জোরে বলে, ছবি পাস করেছে বউদি।

রান্নাঘরের বারান্দা থেকে মমতা প্রায় দৌড়ে এসে রুদ্ধশ্বাসে বলেন, আর পল্টু?

পল্টুও করেছে, ছবি ভালোভাবে পাস করেছে।

আনন্দে ছবির হঠাৎ চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়—তমালের সঙ্গে দেখা হবার আনন্দটা প্রথমেই তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। গত একমাসের মধ্যে তমালের কাছ থেকে কোনো চিঠি পায়নি সে—কেন, কে জানে!

—মানুষের ওপর বিশ্বাস না হারানো পর্যন্ত তোমাকে আমি ভুলব না ছবি। আমরা এক, আমরা অভিন্ন,—তমাল বলেছিল।

তেমনিই আছে তো সে? শহরের রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়ায় গিয়ে, স্বার্থপর বিচিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে যদি সে ভুলে গিয়ে থাকে ছবিকে! ভুলে গিয়ে থাকে তার প্রতিজ্ঞা? তাহলে! ভাবতে গিয়ে ছবি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। ভাঙা বাড়ির আড়াল ছেড়ে যে অগ্নিগোলক সরতে সরতে এসে তার মুখের ওপর আলো ফেলেছে, যাকে দেখবার জন্যে খুব ছোটোবেলায় সে পালিয়ে আসত ছাদে—সেদিকে তাকায়। ওখান থেকেই তো প্রাণরস সঞ্চারিত হয় প্রতিটি লতায়-পাতায়, প্রাণীর প্রাণকোশে ওই তো সবিতা! ওর গতি কি রুদ্ধ হয়! ও কি আলো থেকে বঞ্চিত করে কাউকে!

মনে মনে আবৃত্তি করে সে,

আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন।

ছবি কাউকে বাঁধবে না জোর করে। সে যেন পথের বাধা না হয়, নিজেও যেন মুক্ত থাকে সমস্ত আবিলতা থেকে।

নীচে থেকে সুখদা ডাকেন চেঁচিয়ে, ছবি! ছবি কই?

চোখ মুছে নীচে নেমে আসে ছবি।

কতবার যে পিসিমা আর পিসেমশাই-এর কথা মনে পড়ছে! কোথায় চলে গেছেন আজ পিসেমশাই—আর কোনোদিন ছবি দেখতে পাবে না তাঁকে!

বোমা পড়েছিল—শহর খালি হয়ে গিয়েছিল তবু পিসেমশাই আসতে চাননি—তখনও আশা ফুরোয়নি তাঁর। কিন্তু যেদিন বোমার আগুন দোকানটাকেই

শেষ করে দিল সেদিন হতাশ্বাসে চলে আসতে হয়েছিল তাঁর পৈতৃক ভিটে নবদ্বীপে। ভেঙে পড়া বাড়িটাকে সংস্কার করিয়ে বাস করার ব্যবস্থা করতে করতেই একদিন সামান্য জ্বরে হার্টফেল করলেন হঠাৎ। পিসেমশাই মারা যাবার পর মারা যায় পিলুর ভাইটা—এখন পিসিমা একা আছেন পিলুকে নিয়ে। নবদ্বীপের বাড়িটার ভাড়া আর পিসেমশাই-এর ইনস্যুরেন্সের কিছু টাকা এখন পিসিমার ভরসা।

ছবির পাস করার খবর পেয়ে সুকুমারী লিখেছে— 'আমার ক্ষমতা থাকলে তোকে আমার কাছেই রেখে পড়াতাম কিন্তু তুই তো জানিস কী দশা আমার। এ যুদ্ধ আমার সব শেষ করেছে। শেষ বয়সে আমাকে এখন দাদাদের গলগ্রহ না হতে হয় সেটাই শুধু ভাবনা...।'

শেষ বয়সের কথা বলছে পিসিমা এখনই। তার কৈশোর, তার যৌবন সব মিথ্যে হয়ে গিয়ে শেষ বয়সটাই যেন একমাত্র সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে! আঃ পৃথিবীতে এত দুঃখ কেন জমানো থাকে মানুষের জন্যে। ছবির সাধ্য কী সে যন্ত্রণার পাথরটাকে সরায়। কেবলই কেন যে কান্না পায়। পাস করার খবরটা পাবার পরেও কেন যে উদ্দাম আনন্দ হয় না।

পল্টু পড়বে না—সে ব্যাবসা করবে। শুনে কুলদা তার পিঠ চাপড়ে হাসেন, তুই-ই আমার মুখ রাখবি, পল্টু। আমার কষ্টটা বুঝলি— আরগুলো তো সব...।

কিন্তু ছবির কী হবে?

সে ভার কবে যেন মমতাই নিয়ে রেখেছেন, কেউ জানত না। তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই সন্তোষদা আছেন—তাঁর বাড়িতে থেকে ছবি পড়বে, মমতা চিঠি লিখে ঠিক করে রেখেছেন।

ছবি মাকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে কী করবে ভেবে পায় না, বলে, তুমি যে আমার মা-লক্ষ্মী মা। নইলে আমার পড়াই হত না... থুবড়ি হয়ে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতাম কেবল।

মমতা বলেন, কী করব, দস্যি মেয়ে, জেদি মেয়ে—যেমন করেই হোক তুমিই একটা কিছু করতে যে তা না হলে। যাও, যা থাকে তোমার ভাগ্যে।

কী আছে ছবির ভাগ্যে? কে জানে! ছবি ভাগ্য মানে না, অধীরকা মানত না, হাসত।

যাবার আগে ছবি দুর্গার সঙ্গে দেখা করতে যায়। দুর্গা বলে, তুই যাবি ছবি আমি জানতাম। তুই অনেক বড়ো হ ভাই।

তার জ্বালা-করা চোখের দিকে তাকিয়ে অনেকদিন আগে বলা অধীরকার কথাটা মনে পড়ে ছবির, সেই কথাটাই সে দুর্গাকে বলে, তোর মধ্যে জ্বালা আছে

দুর্গা—দেখিস এমন করে তোর জীবন যাবে না। দেখিস... আমি বললাম।

এর বেশি ছবি আর কিছু বলতে পারে না, বেশিক্ষণ সে তাকিয়েও থাকতে পারে না থান-পরা, রুক্ষ, শীর্ণ এই শৈশব-কৈশোরের বন্ধুর দিকে। তারও চোখ জ্বালা করে।

চোখ জ্বালা করে অধীরকার কথা মনে পড়ে।

ভেবেছিল চুপিচুপি শূন্য ঘরখানায় ঢুকে একটু কেঁদে নেবে কিন্তু ভেজানো দরজাটা খুলেই সে চমকে ওঠে, মেঝের ওপর কাপড়ে শরীর ঢেকে কে যেন চুপ করে পড়ে আছে। ঘর থেকে অধীরকার তক্তপোশখানাকে বার করে নেওয়া হয়েছে, ঘরের এ-কোণে ও-কোণে, দেওয়ালে কোথাও তাঁর এতটুকু চিহ্ন নেই। সারা ঘরটা শূন্য-নিরাভরণ-নিস্তব্ধ; কেবল ওই কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটার কাছ থেকে মৃত্যুকান্নার ধ্বনি উঠে আসছে।

নতুন দিদিমা!

ছবি চুপ করে মাথার কাছে বসে থেকে নিঃশব্দে কাঁদে। কখন একসময় নতুন দিদিমা যেন নতুন একটা কান্নার শব্দে নিজের কান্নাটা থামিয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে বলেন, কাঁদিসনে ছবি, কত কষ্ট পাচ্ছিল বল তো? —শেষের দিকে আমি পর্যন্ত ওর কষ্ট চোখে দেখতে পারতাম না। তুই, তুই তো পাস করেছিস, পড়তে যাবি শুনলাম? আমরাও চলে যাচ্ছি রে... তোর দাদু আর আমি... আমার দাদার কাছে যাচ্ছি। কী করে থাকব বল এখানে? কী নিয়ে থাকব?

চলেই যাক নতুন দিদিমারা। কি নিয়ে থাকবে—কেমন করে কাটবে দুটো নিঃসঙ্গ জীবন। মেয়ে মরেছে, খ্যাপা সন্ন্যাসী ছেলেটাও মরেছে—চলে যাওয়াই ভালো।

বেরিয়ে এসে ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ছবি একবার অন্য শরিকদের পরিত্যক্ত ভাঙা ঘরগুলোর দিকে তাকায়। নতুন দিদিমারা চলে গেলে এ দিকটাও আস্তে আস্তে ওইরকম ভেঙে-চুরে যাবে—মাঝে মাঝে ছাদ ধসবে, মাঝে মাঝে ঝুপঝাপ ইট খসে পড়বে। ঘরের মাথায় বট, অশ্বত্থ গাছ গজাবে। নির্জন হয়ে পড়ে থাকবে একটা অংশ—অধীরকাকার ঘর।

তা হোক। ছবি দূর-দূরান্তের দিকে দৃষ্টি মেলে দেয়। অধীরকাকা বেঁচে থাকবে ওই মাঠে-ঘাটে-প্রান্তরের মানুষের মনে। ভবিষ্যৎ মানুষের মুখে মুখে অধীরকাকা শহিদ।

পূর্ণশশী একসময় ছবিকে ডেকে নিয়ে যান ঘরে। মস্ত বড়ো কাঠের সিন্দুকটার তালা কাঁপা কাঁপা হাতে খুলে বার করেন একজোড়া কানে পরবার লবঙ্গ-ফুল। সে-দুটো ছবির হাতের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলেন, তোর বিয়ের সময় দেব বলে রেখেছিলাম ছবি—তা বিয়ে তো... নে তুই। যদি পড়ার জন্যে কাজে লাগে।

ছবির চোখ ভরে জল আসে। সে যাচ্ছে অনেক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়তে। সেখানে কেমন অভ্যর্থনা সে পাবে কে জানে? কত বিস্ময় আর সংগ্রাম অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে তাও সে জানে না। তবু পূর্ণশশীর চামড়া ঝুলে পড়া নিরাভরণ হাত থেকে ওই লবঙ্গ-ফুল জোড়া নিতে তার মন ওঠে না। সে ঠাকুমার হাতের মধ্যে নিজের হাত রেখে বলে, পড়ার জন্যে নয় ঠাক্‌মা—ও তুমি রেখে দাও।

পূর্ণশশী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলেন, রেখে দিয়ে কী হবে, ছবি? তোর বিয়ে তো আমি দেখে যেতে পারব না... তোর বরকে। কিন্তু যাতে তোর ভালো হয় তাই করিস।

পূর্ণশশীর লোল নগ্ন গায়ে হাত বুলিয়ে ছবি বলে, ও তুমি রেখে দাও ঠাক্‌মা। এমনিই আমাকে আশীর্বাদ করো।

আজও মমতার চোখে জল ভরে ভরে আসছে কিন্তু সেই ছোটোবেলার মতো করে ছবিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদা চলে না—সে এখন বড়ো হয়েছে। এ বংশের সব কিছুকে অগ্রাহ্য করবার মতো বড়ো! পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়বার মতো বড়ো!

তাই তিনি কান্না গোপন করেন। ছবির মুখের দিকে তাকান, ইচ্ছে করে চুলে হাত বুলিয়ে দেন, তাঁর ঠোঁট কাঁপে থরথর করে, মণি ছেলে, তাকে ছেড়ে দিতে ভয় হয় না... কিন্তু তোমাকে একেবারে একা ছেড়ে দিলাম, ছবু।

ছবি বোঝে মা কী জানতে চান, কীসের প্রতিশ্রুতি চান তার কাছ থেকে মমতা। মমতার ঝরে-পড়া চোখের জল সে নিজের হাতে মুছিয়ে দেয়, বলে, যা ন্যায়, যা সত্যি আর মহৎ আমি সেই পথেই থাকব মা। যদি জীবনের বদলেও হয় তা।

মমতা ছবির মাথাটা এবার বুকের মধ্যে চেপে ধরে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ওঠেন, ও-কথা অমন করে বারেবারে বলতে নেই, ছবু!

অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যায় সবাই তাকে—মা, ঠাকুমা, কাকিমা। সে বারে বারে পেছন ফিরে তাকায়, তার চোখ ভরে কেবলই জল আসে।

সবাই চলে গেলে মমতা তখনও দাঁড়িয়ে থাকেন। বাতাসে তাঁর চুল ওড়ে মাথার ঘোমটা পড়ে যায়— তাঁর দৃষ্টি মেয়েকে অনুসরণ করতে করতে হারিয়ে যায় অন্যমনস্কতায়। তিনি যেন ছবির পথের দিকে তাকিয়ে নেই—একটা সফল না হওয়া অতীতের দিকে তাকিয়ে আছেন ঝাপসা চোখে।

বোসপুকুরের পশ্চিম পাড়ের ছাতিম গাছটা এ গ্রামের সীমানা—তারপর থেকে স্টেশনের পথ। ছোটোবেলায় মাঝে মাঝে ছবি এসে দাঁড়িয়ে থাকত এখানটায় আর অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখত স্টেশনের রাস্তাটা। একটা দিগন্তবিস্তৃত জগৎ তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকত—তখন ভেবে পেত না ওই পথ ধরে গেলে কোথায় যাওয়া যায়, কতদূর যাওয়া যায়!

আজ সেই পথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে আছে ফুলমণি, বাতাসীরা। তারা জানতে চায়, শহরে যায় আমাগারে ভোলবানা তো? গেরামরে ভোলবানা তো?

তা কি ভোলা যায়। ছবি যে তার গ্রামের ঘাসের গন্ধ—তার প্রতিটি ঋতুবদলের গন্ধ পায়—। এ গ্রাম তার সব কিছুর সঙ্গে জড়ানো—। এ গ্রামে তার তমালের প্রতিজ্ঞা, অধীরকাকার উৎসাহ। কেমন করে ভুলবে ছবি!

কলকাতায় চাকরি-করা সুখদার বন্ধু উমাপতি ছবিকে কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছেন। প্রদীপ জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে... সে আসবে স্টেশনে সুখদা এসেছিলেন তুলে দিতে।

কুলদার সঙ্গে আসবার কথা ছিল না, কিন্তু তিনিও স্টেশনে চলে এসেছেন। কি একটা কথা তিনি ছবিকে বলতে চান। অনেকবার ছটফটিয়ে বেড়ালেন আশে-পাশে কিন্তু বলেননি।

গার্ডের বাঁশি বাজলে হঠাৎ কুলদা কাছে আসেন, ইতস্তত করেন একটু তারপর বলেন, বলিস... প্রদীপকে বলিস যেন বাড়ি আসে। রাগ করে গেছে... আমি না ডাকলে নাকি আসবে না। ...বলিস ...আমি ডেকেছি।

তারপর এক তাড়া নোট বার করে ছবির হাতে গুঁজে দেন হঠাৎ, নে, ওকে দিস, তুই নিস। যখন যা দরকার লিখবি আমাকে...।

ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসে সবায়ের চেহারা। যতদূর দেখা যায় ছবি তাকিয়ে থাকে, তারপর স্টেশনটা পার হয়ে গেলে হঠাৎ তার চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। জানলার বাইরেই ছবি তা মুছে ফেলে স্থির হয়ে বসে।

তখন অন্য এক ভাবনায় সে অস্থির হয়ে ওঠে, ওখানে না গেলে পৃথিবীটাকে ধরতে পারবে না তুমি, —কে যেন একদিন বলেছিল কথাটা!

কোন পৃথিবী। সেখানে জায়গা হবে তো ছবির। সেই স্বার্থপর জগতের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে টিকে থাকতে পারবে তো সে? যে নতুন ভাবনাটা তাকে চঞ্চল করে তুলেছে সেটা আনন্দের না দুঃখের— নাকি আশঙ্কার। কীসের সঙ্গে তার মিল?

বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় মিলটাকে সে খুঁজে পায় গাড়ির গতির সঙ্গে—চলার তালে।

চলাটাই আসল—চলতে হবে।

ততক্ষণে নতুন আর এক প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠেছে তার মন আর সমস্ত চেতনা।



ছোটোগল্প

অগ্রন্থিত গল্প



লঘু মেঘ

ঝুম্-ঝুম্, ঝুম্-ঝুম্ করে আশ্রমের কম্পাউণ্ডে শালগাছটার শুকনো পাতা খসে পড়ছে আস্তে আস্তে বাতাসে পাক খেতে খেতে। আকাশে যেখানে পড়ন্ত বেলার রোদে আর মেঘে লুকোচুরি খেলা চলছে সেদিক চোখ পেতে চুপ করে বসে থাকে সরমা।

আর একটু পরেই ছুটির ঘণ্টা পড়বে, ছুটি হয়ে যাবে কাজ থেকে আর নিভা বেরিয়ে এসে ধমকাবে, আবার ভাবছিস তুই? আবার?

কেন যে রোজ এই সময়টাতেই ছুটি থাকে তার— কেন এই সময়টাও তাকে কাজে লাগিয়ে দিতে পারে না সুধাদি। তাহলে একা একা বসে থেকে মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ ওই ছোটো শালগাছটার মতো নিজেকেও নিঃসঙ্গ লাগে না— এমন অসহ্য লাগে না।

এরপর সমস্ত বাড়িটাই যাবে খালি হয়ে। ছেলেমেয়েরা কলরব করে বেরিয়ে যাবে, সুধাদি চলে যাবে সব শেষে। কেবল থাকবে সে আর নিভা।

ছাদের ওপরকার ঘরে তাদের আস্তানা।

যদি নিভা না আসত তার সঙ্গে, যদি তাকে একা আসতে হত? সে-কথা ভাবতেও সরমার বুকের মধ্যেটা কেঁপে ওঠে। তাহলে...।

ঘণ্টা বাজলে সবায়ের কলরবের মধ্য থেকে নিভা বেরিয়ে আসে সন্তর্পণে। সরমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার দায়টা তারই যে এটা তাদের শোবার ঘর নয়— এটা আশ্রম। এখানে তারা বাইরে থেকে দরখাস্ত করে চাকরি করতে এসেছে। এখানে কাজ করতে হয়, কাজ না থাকলে অন্য কর্মীদের সঙ্গে মিশতে হয়। ভালো না লাগলেও আজেবাজে পাঁচটা কথা নিয়ে গল্প করতে হয়, অমন করে গালে হাত দিয়ে ভাবতে নেই। ওতে লোকে অনেক কথা বলে, সেগুলো শুনতেও খুব ভালো লাগে না।

হাত ধরে টেনে নিভা বলে, এই, ওঠ, সবাই চলে গেছে যে।

সারাদিন বলি বলি করেও যে কথাটা বলা হয়নি, সিঁড়ি দিয়ে ছাদের ওপরকার ঘরে যাবার সময় সেই কথাটা নিভা বলে, আবার কাল রাত্তিরে কেঁদেছিস তুই?

মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে সরমা।

ছাদের ওপর একটা তেঁতুল গাছের ডাল ঝুঁকে পড়েছে, তার মসৃণ সবুজ চিকন চিকন পাতায় বাতাস নেচে বেড়াচ্ছে ফিসফিস করে। অত বড়ো ছাদটার মধ্যে ঝুঁকে পড়া ডাল ওই একটাই মাত্র। আশ্রম-কম্পাউন্ডের মধ্যে থাকে এই দুটি মেয়ে আর বুড়ি ঝি— সে রাত্রে রান্না করে দেয়, পাহারা দেয়।

সরমা হঠাৎ সেই সবুজ পাতা-ভরা ডালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, জানিস, নিজেকে কেমন মনে হয়? ওইরকম নিঃসঙ্গ।

তবে এলি কেন? এ আশ্রমের চাকরি নিতে তোকে কি কেউ সেধেছিল? এলি তো এলি, আমাকে শুদ্ধ নিয়ে?

দু'হাতে নিভাকে জড়িয়ে ধরে সরমা বলে, ভাগ্যিস তুই এসেছিলি— নইলে আমি কি একদিনও টিকতে পারতাম ভেবেছিস?

ছাদের ওপরকার সেই ঝুঁকে-পড়া ডালটার নিচে বসেই চা খায় ওরা। কী একটা পাখি ডালের ওপর অনেকক্ষণ ডাকাডাকি আর নাচানাচি করে একসময় উড়ে চলে যায়। একসময় কখন সন্ধে হয়, চাঁদ ওঠে।

সরমা বলে, আজও কাঁদব আমি, বকতে পারবিনে কিন্তু... কথা শেষ না করেই হঠাৎ নিভার কোলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে সে চুপ করে থাকে। কাঁদে না, কিন্তু একটা ভীষণ অস্থিরতা তাকেই শুধু কষ্ট দেয় না— নিভারও চোখে জল এনে দেয়।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কানের কাছে মুখ নিয়ে নিভা-ই বলে, ফিরে যাবি রমা? চল— কলকাতায় চলে যাই।

মুখ না তুললেও সরমার প্রবল আপত্তিটা স্পষ্ট বোঝা যায় তার চুপ করে থাকা দেখে।

শেষে কখন যেন একসময় সে মুখ তোলে, অসহায়ের মতো বলে, ওখানে না, অন্য কোথাও। চল এখান থেকেও আমরা অন্য কোথাও চলে যাই নিভা। যাবি? মুখ তুলে সে নিভার মুখের দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকে যে মাথা নাড়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না নিভারও।

কিন্তু সম্মতি দিয়ে পরমুহূর্তেই তার রাগ হয় অন্য কথা মনে করে : তারও তো ঘর আছে, সংসার আছে। সেখানে একটা দাবি করার লোকও আছে। কতকাল সেই বা এমন করে ছেড়ে দিয়ে রাখবে তাকে এক খেয়ালী বন্ধুকে আগলে বেড়ানোর জন্যে। তবু ভাগ্যিস এই আশ্রমে দুটো চাকরি খালি ছিল— হয়ে গেল দুজনেরই— নইলে এই দিশেহারা মেয়েটা যে কী করে বেড়াত। বলে, তোমার মরণ। আনন্দর

মা এসে কেঁদে পড়লেন তো ওমনি গলে গেলে। একবার আনন্দর কথা শুনলিনে, তার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষাটাও করলিনে।

শুকনো উদাস চোখে সরমা তাকায় মেঘে-ঢাকা চাঁদের দিকে, তারপর একসময় নিভার মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি হাসে : মানুষের মনকে লোকে ঠিক বোঝে না নিভা। অত কান্নাকাটি—চোখের জল, আমি সইতে পারিনে। তার চেয়ে মনে হয় নিজেকে কষ্ট দেওয়াই ভালো। ...আর শুধু তো আনন্দর মা নন, সঙ্গে করে মেয়েটাকে পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন। ফুটফুটে, সুন্দর একটা ছোটো মেয়ে।

নিভা বলে, কী বলল সে?

—কিছু না। আনন্দর মায়ের কান্না দেখে সেও কাঁদতে লাগল। তুই-ই বল না নিভা, ছোট্ট ফুটফুটে একটা নির্দোষ মেয়েকে কখনও কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে? তখন মনে হয় ছেড়ে দিই নিজের দাবি— ওরা খুশি হোক।

—কিন্তু মেয়েটি কি জানে যে আনন্দ তোকে ভালোবাসে— বহুদিন থেকে? তুই ছাড়লেও সে তার দাবি ছাড়বে না।

ওর মা জানেন। তিনি বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে দীর্ঘদিন আনন্দ যদি আমাকে না দেখতে পায়। ওই মেয়েকে নিয়েই সুখী হবে সে, তিনি জানেন। বললেন, লেখাপড়াই না হয় তোমার মতো জানে না, কিন্তু ওর রূপ-গুণ? আনন্দ তাকে একদিন না একদিন মর্যাদা দেবেই।

তাঁর দশ বছরের দেওয়া কথা— কোন ছোটো বেলায় বাগদত্তা করে রাখা মেয়ে... বল নিভা?

রেগে নিভা বলে, যত সব সেকেলে কথা শুনলেও হাসি পায়। আনন্দ কখনও এ সব মানবে না দেখিস।

এতক্ষণ পরে সরমাব চোখ ছলছল করে ওঠে, বলে, সে ভার আনন্দর মায়ের, আমার নয়। কিন্তু ও ফিরে এসে হুলুস্থুল বাধাবে এটাও আমি চাইনে নিভা। ...এত করে কাউকে ঠিকানা না দিয়ে পালিয়ে এলাম, এক তুই যদি চুপিচুপি জানিয়ে থাকিস, নইলে .. বল জানিয়েছিস নাকি?

অপরাধীর মতো নিভা তাকায় মুখের দিকে : তোর মতো আমি নিষ্ঠুর নাকি? অসীমকে চিঠি না লিখলে সে আমার মুখ দেখবে ভেবেছিস? ওর চিঠিতে একটা খবর জেনেছি—বলব?

হঠাৎ দপ করে আগুন জ্বলে ওঠার মতো হঠাৎ জ্বলে উঠেই সরমা নিভে যায় : এমন কিছু যা আমি সইতে পারব না? তাহলে থাক ভাই।

—না শোন— তোর শোনা দরকার।

—বল— শক্ত হয়ে বসে সরমা।

—বোম্বে থেকে ফিরেই আনন্দ প্রথম এসেছিল আমার বাড়িতে। ভীষণ রেগেছে

তোর ওপর, রেগে গিয়ে বিয়ের তারিখ ঠিক করে নিমন্ত্রণপত্র বিলি করে বেড়াচ্ছে।

সরমার দু'চোখে জল চিকচিক করে কিন্তু মুছে ফেলে না, হাসি মুখে শান্ত গলায় বলে, এই খবর। ভালোই তো। ...ফিরে যাওয়া যাওয়া করছিস... বিয়ে হয়ে গেছে খবর পেলেই আমরা ফিরে যাব। তোকেই বা আর কতদিন আটকে রাখব ভাই?

—কিন্তু তুই কী করবি— তুই? পোড়ামুখী— উদারতা দেখাতে গিয়ে তিন-তিনটে জীবন মাটি করলি। ওই মেয়েটাই কি কোনোদিন সুখী হবে ভেবেছিস?

এবার কয়েকটা শুকনো তেঁতুলপাতা বাতাসে পাক খেতে খেতে গায়ে পড়ে। সরমা আবার চোখ তোলে আকাশের দিকে— জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হওয়া গাছপালার দিকে, ধোঁয়ার মতো উড়ে উড়ে যাওয়া মেঘের দিকে, অন্যমনস্কের মতো বলে, সত্যি, সে বড়ো দুঃখের নিভা। কিন্তু তার জন্যে আমার আর কী করবার আছে বল... কী? তারপর হঠাৎ ওঠে, ঘরে ঢুকে সুটকেশ থেকে একটা ফোটো বার করে এনে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে শান্ত শক্ত গলায় বলে, দেখিস নিভা, আর থেকে আর কাঁদব না আমি। দেখিস কোনো দুর্বলতাও বাখব না মনে। মনে করব, একদিন খুব একটা বড়ো অসুখ হয়েছিল আমার কিন্তু সেরে গেছে... বুঝলি।

নিভা চুপ করে তাকিয়ে থাকে। কী বলবে সে। কী করবাব আছে তার।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম-ভাঙা চোখে অর্থস্ফুট চেতনার মধ্যে সন্ধেবেলাকার একটা গুনগুনানি ভেসে ভেসে বেড়ায়, কে যেন আবৃত্তি করেছিল কোন সময়—

'প্রেম এসেছিল
চলে গেল সে যে খুলি দ্বার,
আর কভু আসিবে না
বাকি আছে শুধু...।'

অসীম! অসীম! ঘুমের ঘোরে নিভা পাশে হাত বাড়ায়— শূন্য বিছানায় হাতখানা পড়ে তার চমক ভাঙে। অসীম নয়, সেই মেয়েটা পাশে নেই। সেই...।

জেগে উঠে বসে নিভা দেখে দরজা খোলা— ঝি ঘুমোচ্ছে ঘরের মেঝেয় অঘোরে। মস্ত বড়ো কম্পাউন্ডটির ওপাশ থেকে আশ্রমের দারোয়ানের রামায়ণ পড়ার শব্দ ভেসে আসছে।

ছাদের ওপর যেখানটায় তেঁতুলগাছের ডালটা ঝুঁকে পড়েছে তারই নিচে দাঁড়িয়ে আছে সরমা। নিভা গিয়ে হাত চেয়ে ধরে : আবার কাঁদছিস? সন্ধেবেলা যে অত কথা বললি?

কিন্তু কাঁদছে না মেয়েটা, ফ্যাসফেসে যন্ত্রণাভরা গলায় কেবল বলে, পারলাম না ভাই। না পারাটা যে কী কষ্টের কেমন করে বোঝাই তোকে?

ফিরে দাঁড়িয়ে নিভার কাঁধে হাত রেখে সে বলে, আমি পারছিনে নিভা। এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব... এখান থেকে পালাতে হবে আমাকে। তুই বরং চলে যা নিভা, আমার সঙ্গে থাকতে হবে না।

—বেশ আমি না হয় গেলাম কিন্তু তুই? যাচ্ছিস কোথায়?

—কোথায়। সরমা অনেকদূরে তার দৃষ্টি মেলে দেয় : ভাবছি সাঁওতাল পরগণায় চলে যাব পিসতুতো বোন লতিকার কাছে। শুনেছি সেখানকার শালপাতা নাকি কথা বলে— আমি সেসব কাহিনি যোগাড় করব ঘুরে ঘুরে। এখানেই চাকরি নিয়ে থেকে যাব।

সত্যি সত্যিই রাতের বলা কথাটাকেই কাজে পরিণত করবে সরমা, নিভা তা ভাবেনি।

তার মনটাও দুর্বল হয়ে পড়েছে, আর সে এই দিশেহারা খামখেয়ালী মেয়ের পেছনে ঘুরে বেড়াতে পারবে না। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুর মারা মেয়েটা যা-ইচ্ছে-তাই করে বেড়াক এবার থেকে, আর সে আগলে বেড়াবে না।

একই দিনে দুজনের যাবার কথা। সকালেই অসীম এসেছে নিভাকে নিয়ে যাবে বলে, এসেই সে সরমার খোঁজ করেছে। কিন্তু সরমা সারাটা দিন পালিয়ে বেড়িয়েছে সামনে থেকে, যেন মস্ত এক অপরাধ করে সে এখানে এসেছিল। যেন মুখ দেখানো বারণ তার।

আসলে অসীমকে দেখলে মনে পড়ে আর একজনের কথা। যদি জানতে ইচ্ছে করে কেমন আছে আনন্দ? কেমন কাটছে তার জীবন।

নিভার খুশি খুশি মুখটার দিকে চোখ পড়লেই সরমার বুকের মধ্যেটা কেমন করে ওঠে। কেন করে সরমা তা ভেবে পায় না। কেন খুশি হয় মানুষ! কেন হাসে। ভবিষ্যতের কল্পনা করে! ওই শূন্য ঘরটার মতো মনটাও তার শূন্য— সেখানে এখন কয়েকটা ছেঁড়া খাম, খবরের কাগজের টুকরো, ক'টা স্নো-পাউডারের কৌটো গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। দেওয়ালের চার কোণে চারটে মশারির দড়ি তখনও ঝুলছে— একটা ক্যালেন্ডার উলটো হয়ে বাতাসে নড়ছে। এই ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে তাকালে হয়তো কলকাতার ধোঁয়া ধোঁয়া আকাশটাও দেখা যায়।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে দাঁড়ায় সরমা। ঝুলে-পড়া সেই তেঁতুলের ডালটার দিকে চোখ রেখে বলে, কষ্ট হচ্ছে রে নিভা। আশ্রমটা না ছাড়লেই হয়তো হত...।

নিভা বলে, চল, চল সব কিছুর ওপরেই তোর মায়া— ওই জন্যেই তো অত কষ্ট পাস। বেচারা সেই কখন থেকে... বলেই অসীমের ইসারায় জিভ কেটে চুপ করে।

স্টেশনে পৌঁছে অসীম বলে, কলকাতা তো কাছে, নিভা একাই যেতে পারবে।

আমি যাব নাকি আপনার সঙ্গে? সরমা হাসে বিষণ্ণ চোখ তুলে : না না, কাউকে লাগবে না। জানেন না আমি একা, সঙ্গী কেউ নেই।

জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সরমার গালে মৃদু আঘাত করে নিভা বলে, একা একা কী করছিস মুখপুড়ি, দেব গলা টিপে। দেখছিস নে...।

গার্ডের বাঁশি বাজানো শুনেছে সরমা, তার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে জলে, নিভার হাত ছেড়ে গিয়ে কখন যেন ঝাঁকুনি দিয়ে চলতেও শুরু করেছে গাড়িটা। চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে কে বুঝি একজন কামরায় ঢুকেছে সেটাও টের পায়, কিন্তু তাকাতে ইচ্ছে করে না। বুকের ভেতর থেকে একটা বাষ্পোচ্ছ্বাস তার বুক পর্যন্ত উঠে আসছে— সেটাকে আয়ত্ত করতে বেশ কষ্ট যে।

কে যেন তার মাথায় হাত রেখেছে! কে? চমকে সরমা এ-পাশ ফিরে হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। জানলাটা চেপে ধরে নিজেকে সংযত করে।

কামরায় লোক বেশি নেই, যারা আছে তারা দেহাতি কুলি নয়তো সাঁওতাল, সরমার দিকে খুব মনোযোগ নিয়ে তাকায় না তারা। তাই ভালো, নইলে হয়তো তাকে লজ্জা পেতে হত। কেবল পাশে বসা আনন্দ গভীর গলায় বলে, বোসো চুপ করে, লাফ দিয়ে পড়বে নাকি? অমন করলে শেকল টেনে লজ্জা দেব কিন্তু।

ক্ষীণ গলায় সরমা বলে, তুমি? তুমি কেন?

—খুব অন্যায় করেছি নাকি? অসীমের সঙ্গে এসে সেই সকাল থেকে ঠায় বসে আছি স্টেশনে— ভারি অন্যায় আমার না? আর তুমি যে পালাচ্ছিলে? সেইজন্যেই তো চলন্ত গাড়িতে পর্যন্ত লাফিয়ে উঠলাম প্রাণের মায়া ছেড়ে।

শান্ত গলায় সরমা বলে, ভালো আছ? আরও গভীর হয়ে আনন্দ বলে, ভীষণ ভালো। এত যে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না সরমা।

—মাধুরী তোমার বউ?

—বউ কি? হো হো করে হেসে ওঠে আনন্দ, আমার আরও একটা বউ আছে নাকি, জানতাম না তো?

—মাধুরীকে কি বিয়ে করোনি তুমি শেষ পর্যন্ত। মায়ের মনে কষ্ট দিয়েছ তো?

আনন্দ এবার আর হাসে না। গম্ভীর হয়ে বলে, মেয়েরা কি পুতুল নাকি সরমা, যে কেউ তাকে ভালোবাসবে না জানলেও তার সঙ্গেই জীবন কাটাতে চায় উপায় না থাকা সত্ত্বেও। এই নিয়ে না তোমরা কত লড়াই বক্তৃতা কর? তারপর শান্ত গলায় জানতে চায়— কেন পালাচ্ছিলে?

সরমা চুপ করে থাকে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কখন একসময় আনন্দ সরমার হাতখানা টেনে নেয় হাতে, নিচু গলায় বলে, শালপাতার কথা শুনতে তুমি একাই যাচ্ছে? আমাকে নেবে না?



কেবল কাজের ঘণ্টা বেজেছে— অরুণার ডাক পড়ল অফিস ঘরে। বিমল এসে বসে আছে সেখানে। একহাঁটু কাদা মাখা, মুখ শুকনো আর চিন্তাক্লিষ্ট। দেখলে বোঝা যায় বেশ বড়ো রকমের দুঃসংবাদ না থাকলে কলকাতা ছেড়ে হঠাৎ সে এমন করে ভরা বর্ষায় এই গ্রামের তিন মাইল রাস্তা কাদা ভেঙে হেঁটে আসত না। কিন্তু সে দুঃসংবাদটা কতখানি হতে পারে নিঃশব্দে বসে থাকা বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করা গেল না।

বাসায় এসে সে প্রথম বলে, কাপড়-চোপড় গোছাও— আজই যেতে হবে। তোমার ছুটির ব্যবস্থা অফিস থেকে করিয়ে নিয়েছি।

ফ্যাকাশে মুখে অরুণা বলে, কী হয়েছে খুলে বলবি না তবু? তুই কি সুনীলের কোনো দুঃসংবাদ দিবি? আমি যে ক-দিন আগেও ওর চিঠি পেয়েছি— একটা বড়ো ছবিতে হাত দিয়েছে লিখেছে।

অরুণার জল ভরা দু-চোখের ব্যাকুলতা দেখে বিমলেরও এবার চোখ ছলছল করে ওঠে। সত্যি খবরটাই দেয় সে। রেস্টুরেন্টের দোতালায় সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লেগেছে— ভেতরে কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু জ্ঞান হবার পরও সব ভুলে গেছে, কাউকে চিনতে পারছে না— এমনকী ওর মাকেও না।

সে-কথা শুনে একটা আর্ত চিৎকারকে অতি কষ্টে দমন করে কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অরুণা— এখানকার পরিবেশে সে কাঁদতে চাইলেও পারবে না। সবাই তাকে সহানুভূতি জানাতে এসেছে বিপদের খবরে।

ফলে বিমলকেই শেষ পর্যন্ত শক্ত হতে হয়— বাক্স গোছানো থেকে শুরু

করে তিন মাইল কাদা ভেঙে আসা ক্লান্ত দেহ নিয়েই আবার অনেক ভাড়া কবুল করে একটা ভাঙা ঘোড়াগাড়ি পর্যন্ত জোগাড় করে ফেলে সে।

গাড়িতে উঠে সে বলে, 'ছিঃ লেখাপড়া জানা শিক্ষিতা মেয়ে তুই— এমন করে ভেঙে পড়লি? কী করে তাহলে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবি— সহ্য করবি কী করে? অথচ সুনীলের মাকে দেখলাম— একফোঁটা চোখের জল ফেললেন না— শক্ত হয়ে মাথার কাছে বসে আছেন ক'দিন।

বিস্ফারিত চোখ তুলে অরুণা বলে, সত্যি কাউকে চিনতে পারছে না ও? আমাকেও পারবে না? না না, বিমল, দেখিস তুই, আমি দাঁড়ালে ঠিক চিনতে পারবে।

বিমল খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরে— অরুণার যন্ত্রণাকাতর দৃষ্টি সে সহ্য করতে পারছে না।

গাড়ি চলার তালে তালে অরুণার মাথাটা মাঝে মাঝে অসহায়ভাবে গাড়ির দেওয়ালে ঠুকে যাচ্ছে— মাঝে মাঝে কী ভেবে ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে তার কান্নায়। এক সময় খানিকটা শান্ত হয়ে বলে, কেউ শত্রুতা করে ওকে ফেলে দেয়নি তো রে বিমল?

কী জানি। ওর কাছ থেকে তো একটা কথাও বার করা গেল না— সুনীল ছাড়া কে আমাদের সন্দেহ ঘোচাবে বল। বিজয় এসেছিল হাসপাতালে দেখতে, সেও তাই বলছিল।

বিজয়! ও খবর পেল কী করে?

বারে বন্ধুর খবর— পাবে না? কেন ওকে কি তোর সন্দেহ হয় নাকি।

অরুণা চুপ করে থাকে।

বিমল বলে, তাতে বিজয়েরই বা কী লাভ বল? তুই যে ওকে বিয়ে করবি না, তা তো ও জেনেই গেছে— এখন ওর আর কী স্বার্থ?

অরুণার ঠোঁটে মৃদু কান্নার মতো করুণ একটা হাসি ফুটেই মিলিয়ে যায়, তোর মন নিয়ে সে তুই বুঝবিনে বিমল। সুনীলের রূপ নেই, টাকা নেই, কিন্তু যা আছে সেটাই ওর সম্পদ। সেটুকুকে কেড়ে নিতে পারলে অন্তত মনের যন্ত্রণা মেটানো যায়।

বিমল বোধ হয় এতদূর ভেবে দেখেনি, বিরক্ত হয়ে বলে, তা যদি বলো তাহলে বলি, বিজয়ের জন্যে সত্যি আমারও কষ্ট হয়। ওই একদিন সুনীলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তোমাকে, তোমার প্রতিষ্ঠার মূলেও তো বিজয়। বিয়েটা হতে আর কদিনই বা বাকি ছিল— অর্থ, মান, সম্পদ সবই তো তোমার জন্যে সে উৎসর্গ করেছিল— সবই তোমার হত। মাঝখান থেকে গোলমাল হয়ে গেল। লোকে জানল সত্যি-মিথ্যে অনেক কিছু আর জবাবদিহি করতে করতে প্রাণ

গেল আমার।

অরুণা চোখ মুছে বলে, মানছি তোর সব কথা, কিন্তু মনের সঙ্গে আমিও তো কম লড়াই করিনি বিমল— সেও তুই জানিস। বিজয়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমি সারাজীবন, কিন্তু আর কী করতে পারি জানি না। মনকে আর কত চাবুক মাবব বল।

তার অসহায় চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বিমলের মায়া হয় এবার। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কী পরিবর্তন হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারার। একটা ভয়ংকর কষ্ট ওকে ভেতর থেকে খুঁচিয়ে মারছে যেন। ওর পিঠের ওপর একটা হাত রেখে বিমল বলে, আচ্ছা, সুনীলকেই বা এত কষ্ট দিস কেন বল দেখি। তোর নানারকম অস্থিরপনায় ওর মতো ট্যালেন্টেড ছেলেটার কী দশা করেছিস তুই। যখনই তোর কথা জিজ্ঞেস করি— ওর কান্নার মতো মৃদু হাসিটা দেখলে আমারই যেন কান্না পায়। ...সেদিন সন্ধ্যাবেলা জ্ঞান ফিরে এসে যখন তাকাল— মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললাম, সুনীল! আমি অরুণাকে আনতে যাচ্ছি!

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে অরুণার। মুছে ফেলে বলে, কী বলল?

কী বলবে? কী যেন একটা বুঝবার চেষ্টা করেও পারল না— কাউকে যে চিনতেই পারে না। অথচ চিনবার চেষ্টা করছে ভেতরে ভেতরে।

আর্ত চিৎকার করে অরুণা বলে, আর বলিস নে বিমল! আর না। তোদের কাছে কথা বলেনি কিন্তু ওর অরুণাকে কাছে পেলে কথা বলবে। ওকে কথা আমি বলাবোই। ওর বলা প্রত্যেক কথা আমার কাছে মুক্তোর মতো দামি হয়ে জমা আছে জানিস নে তোরা। আমি নিজে কথা বলে ওকেও বলাবো।'

তারপরেব রাস্তাটুকু কেউ আর কথা বলে না, স্টেশনে এসে গাড়ি থেকে নামতে নামতে অরুণা বলে, বিমল।

কী।

সত্যি কথা বল। ও কি বাঁচবে না?

বিমলের কান্না পায় ...মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলে, বাঁচবে।

তবে? কীসের ভয়?

ভয় কিসের সে-কথা অরুণা যদি এখনও না বুঝে থাকে তবে বুঝিয়ে আর মিথ্যে আঘাত দিতে চায় না বিমল, সে চুপ করে থাকে।

কিন্তু সমস্ত বিস্মৃতি কাটিয়ে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো আসল কথাটা মনে পড়ে যেতেই থমকে দাঁড়ায় অরুণা, বিমল!

বিমল চুপ করে থাকে।

বিমল! ও যদি কথা বুঝতে না পারে, বাইরের সবকিছুকে ভুলে গিয়ে থাকে তবে ও আঁকবে কী করে— সুনীল আঁকবে কী করে বিমল!

ঠিক এই কথাটাই আশঙ্কার বিষয় বিমলেরও— এতক্ষণ পরে যেন স্বপ্নভঙ্গের মতো মনে পড়েছে মেয়ের। লোহার গেটের ওপর মাথা রেখে আর পাঁচটা লোকের দ্রষ্টব্য বিষয় হয়ে অরুণা বুঝি নতুন করে আবার কাঁদতে বসবে।

শক্ত হাতে তাকে টেনে একটু নির্জন জায়গায় নিয়ে এসে বিমল বলে, 'অমন করতে নেই অরুণা ...ওই দেখ গাড়ি আসছে।

অরুণা বলে, আমাকে ছেড়ে দে বিমল। এই স্টেশনের ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে আমি একটু প্রাণভরে কেঁদে নিই।

এবার রুক্ষ্ম হয়ে ওঠে বিমল, বলে, দ্যাখ, তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর থেকে তোর কাণ্ডকারখানা দেখে আমি একেবারে জ্বলে-পুড়ে গেলাম। এখন যদি তুমি অমন করো তাহলে এইবার শেষবারের মতো তোমাকে এই স্টেশনে ফেলে রেখে আমি চলে যাব বলে দিচ্ছি— একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম তোকে নিয়ে, বলে আর অরুণার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। ট্রেন এলে উঠিয়ে জায়গা করে বসিয়ে দেয়— মালপত্র ঠিক করে রাখে।

হাওড়া স্টেশনে নেমে বিমল বলে, এখনও তো দেরি আছে ঘণ্টা খানেক, আগে চল আমার মেসে, হাত মুখ ধুয়ে একটু সুস্থ হয়ে আসবি। এ চেহারায় বোগী দেখতে গেলে লোকে চমকাবে।

কেন? ও কেবিনে থাকে না? ওখানে যেতে সময়-অসময় লাগে নাকি?

টাকা কোথায় কেবিনের। প্রথম দিন তিনেক ইমারজেন্ট বলে রেখেছিলাম--- তারপর ডাক্তার মুখার্জীই বারণ করলেন। দুই-তিনদিনের মধ্যে ছেড়েও দেবেন শুনছি। আমার অবস্থা তো জানিস— মাইনে পেতে না পেতেই কোথায় মিলিয়ে যায়, মাসের শেষদিকে যা মুশকিলে পড়েছিলাম ওকে নিয়ে।

অত কথা অরুণার বোধ হয় কানেও যায় না— ছলছলে চোখ মেলে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হয়তো বিমলের মেসে যেতে ওর আপত্তি ছিল না প্রথমে, কিন্তু মেডিকেল কলেজের রাস্তাটা পার হতে গিয়ে বিপদ হল। প্রায় কেঁদে ফেলে অরুণা বলে, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে এখানে নামিয়ে দে বিমল। সময় না হয়ে থাক আমি সিঁড়ির ওপর গিয়ে বসে থাকি। এমন আতঙ্কিত তার চোখ-মুখ, দেখলে মনে হবে বিমল বুঝি ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

অগত্যা ওকে নামিয়ে দিয়ে যেতে হয়। বেড-নম্বারটা বারেবারে মনে করিয়ে ইতস্তত করে বিমল। অবশেষে ফিরেই যায়। যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে থাকে। টলতে টলতে ঢোকা অরুণার দিকে— কী পাগলামো করে বসবে মেয়েটা কে জানে!

পরিচিত এতক্ষণের আশ্রয়টা থেকে হঠাৎ কেউ যেন ওকে অচেনা এক

ভিড়ে ঠেলে দিয়েছে— এতদিনের এত ভালোলাগা কলকাতাকে তেমনি মনে হতে থাকে অরুণার। কিন্তু শিক্ষিতা মেয়ে সে— বুকের মধ্যেটা জ্বলে-পুড়ে গেলেও হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারবে না। নিজেকে অসহায় মনে হলেও বুদ্ধি ঠিক রেখে চলতে হবে, পাগলামো করা চলবে না। এ-কথাকটা অরুণার মনে আছে।

পাগলামো তাই সে করে না, কেবল বেড-নম্বরটা ভুলে না যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যাগটা বুকের কাছে চেপে ধরে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির কাছে পাতা বেঞ্চিখানার ওপর বসে থাকে চুপ করে। সামনে ওয়ালক্লকটায় ঢং ঢং করে তিনটে বাজার শব্দে চোখ তুলে তাকায়— সময়ের হিসাব করে একবার বিড়বিড় করে তারপর আবার তেমনি মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বসে থাকে।

কোনো ঘর থেকে একটা ঝাঁঝালো ওষুধের গন্ধ ভেসে আসছে। অনেকগুলো জুতোর শব্দ পাওয়া গেল— কারা যেন দ্রুতপায়ে চলাফেরা করে বেরাচ্ছে পাশের ঘরটায়। দুবার দুজন সাদা অ্যাপ্রন বাঁধা নার্স খুট খুট করে চলে গেল সামনে দিয়ে। তাদের দিকে তাকাতে গিয়ে অরুণার চোখ দুটো আটকে রইল সাদা চুনকাম করা দেওয়ালের গায়ে।

আবার একজন নার্স এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। হয়তো ঘড়ি পরা ব্যাগ ঝোলানো মেয়েটাকে একঘণ্টা আগে হতভম্বের মতো বসে থাকতে দেখে, নয়তো কর্তব্যবোধে, বলে, শুনুন, আপনার কি কোনো পেসেন্ট?

কী যে বলে অরুণা নিজেও তা জানে না।

সে তো চারটের সময়। মফস্‌সলে থাকেন বুঝি? আচ্ছা, আচ্ছা বসুন।

এখানে বোধ হয় বসার নিয়ম নেই, হয়তো ময়লা কাপড় পরা গেঁয়ো বোকা কোনো বউ কী মা হলে এখানে বসতে দিতই না ওরা।

বাইরে একটা অ্যাম্বুলেন্স-কার এসে থেমেছে— স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে চলেছে আর যন্ত্রণায় চিৎকার করছে রোগী। সুনীলকে ওরা হয়তো এমনি করেই নিয়ে এসেছিল।

হাসপাতাল হলে কী হবে, কী গোলমাল চারিপাশে। কোথা থেকে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে আসছে— বুকের মধ্যে কেমন করে উঠছে সে তীক্ষ্ণতায়। মাঠটার মধ্য দিয়ে ছুটোছুটি, চলাফেরার বিরাম নেই। থামিয়ে রাখা উচিত জেনেও যেন থামিয়ে রাখা যাচ্ছে না গোলমালকে— প্রচেষ্টা হয়তো আছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না।

মাঝখানে পাশে খসখস করে কীসের একটু শব্দ হয়েছিল— অরুণা ঘাড় ফিরিয়েও দেখেনি। এবার হঠাৎ চোখে পড়ে— নিঃশব্দে বসে আছেন সাদা থান পড়া এক মহিলা। কী এক ভাবনায় তিনিও স্থির, পাথরের মতো দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন এতক্ষণ, এবার মৃদু কণ্ঠে জানতে চান— তোমার ঘড়িতে কটা

বেজেছে মা?

সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

একটু লজ্জিত মুখে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালেন তিনি, এটা তো ঠিকই আছে তবে। আমি ভাবছিলাম বুঝি দেরি হয়ে গেল। আসলে হাসপাতালের ঘড়িকে আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না— মনে হয় চারটে বাজায় ওরা দেরি করে, আর ছটা বাজায় তাড়াতাড়ি। কথা শেষ করে ম্লান একটু হাসেন তিনি, 'তুমিও দেখছি আমার মতো আগে এসে বসে আছ, কে আছেন তোমার? —সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অরুণার সিঁথির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলেন, নিকট আত্মীয় কেউ বুঝি?

অরুণা মাথা নাড়ে।

কী যেন বোঝবার চেষ্টা করে, চুপ করে থাকেন একটু সময়, তারপর আবার কথা বলেন, হাসপাতাল এক হৃদয়হীন জায়গা মা— এখানে সবাই যেন যন্ত্র হয়ে গেছে। পরশু রাত পর্যন্তও ছেলের কাছে থাকবার অনুমতি পেয়েছিলাম ভয় ছিল বলে— কাল থেকে আর থাকতে দিল না, বলে ভালো আছে— কাছে থাকবার দরকার নেই। কিন্তু ভালো যে কত... হঠাৎ সেই মুহূর্তে জুতোর শব্দ করে বিমল এসে হাজির, আরে মাসিমা যে, অরুণার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে তাহলে— যাক।

বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো দুজনেই দুজনের দিকে ফিরে তাকায় এই মুহূর্তে। মহেশ্বরী বলেন, তুমি অরুণা? অরুণা অস্ফুটে বলে, মা। তারপর এক মুহূর্ত আর কথা নেই। মহেশ্বরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে— কী যেন একটা আন্দাজ করে নেবার চেষ্টা করছেন। একটা বিরক্তি আর বিস্ময়, সন্দেহ আর অবিশ্বাস দু-চোখে ছড়ানো— দুটো ঠোঁট কুঞ্চিত হয়ে রয়েছে। অরুণার সাড়া শরীরে সে-দৃষ্টি কী যেন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ও বুঝতে পারছে মহেশ্বরী ওকে দেখে খুশি হননি— খুশি হতে পারছেন না।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজার শব্দে মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠেছে এখানে-ওখানে জমে থাকা আগ্রহী মানুষগুলো। ঘড়ির শব্দটা তাদের যেন ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। মহেশ্বরীও উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু একবারও আর পেছনে ফিরে তাকালেন না, ডাকলেন না অরুণাকে। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে গেলেন।

বিমলের মুখটা কালো হয়ে গেছে লজ্জায় মহেশ্বরীর ব্যবহারে। কিন্তু অরুণার মুখ দেখে ধরা যাচ্ছে না— ও যেন সব অনুভূতির বাইরে স্থির পাথরের একটা অনড় মূর্তি।

বিমল বলে, যাবি না?

যন্ত্রচালিতের মতো অরুণা তার পিছনে চলে, যেন এখানে আসার আসল উদ্দেশ্যটাই ওর মনে নেই। ক্লান্ত দুই বসা চোখ, এলোমেলো চুলে ঘেরা মুখ আর ফোলা চোখ দেখলে প্রকৃতিস্থ মনে হয় না মেয়েটাকে।

দোতলায় উঠতেই কার যেন একটা আর্ত কান্না ফেটে পড়েই চাপা পড়ে গেল— কোনো প্রৌঢ়ার বুক-ফাটা কান্না। অরুণা হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় মাঝরাস্তায়।

বিমল বলে, দাঁড়ালি যে? ওই তো সুনীলের বেড।

সু-নী-ল! হঠাৎ ধনুক থেকে ছিটকে বেরুনো তিরের মতো এ-বেড ও-বেডের মধ্য দিয়ে ছুট লাগায় অরুণা। হয়তো বুকের ওপর আছড়ে পড়ত, কিন্তু শুয়ে থাকা স্থির-শান্ত মূর্তিটার সামনে গিয়ে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। মহেশ্বরী বসে আছেন পাশের টুলের ওপর। নিচু হয়ে দুই জল-ভরা চোখ সুনীলের বোজা চোখের উপর রেখে অরুণা এতক্ষণ পরে ক্লান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে— সুনীল। তার দু-চোখ ছাপিয়ে অনেকক্ষণের থামিয়ে রাখা জল গড়িয়ে পড়ছে— ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে।

বিমল পাশে বসে বলে, সুনীল! অরুণা এসেছে, সুনীল!

বোজা চোখ দুটো আস্তে আস্তে খুলে সুনীল একবার শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়। বিমল আবার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে— অরুণাকে দেখেছ? চিনতে পারছ না? তোমার মা এসেছেন।

বারকয়েক খুব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে সুনীল, মা! মা! —তারপর অর্থহীন একটা হাসি হেসে একটু চুপ করে থাকে।

অরুণা হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে, আমি যে ওকে কথা বলাবো বলেছিলাম, বিমল। এ কী হল?

বিমল বলে, দেখ, মুখ্যু মেয়েদের মতো কাঁদিসনে বলছি। প্রচণ্ড একটা শক পেয়েছে ব্রেনে— এত সহজেই তার এফেক্ট যাবে ভেবেছিস? কাঁদবেন না মাসিমা— আমি একবার ডাক্তার মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে— যেন কথা বলবার সব প্রসঙ্গ চিরকালের মতো ফুরিয়ে গেছে। মাঝখানে সুনীল চোখ বুজে পড়ে আছে— দুপাশে দু-জোড়া চোখ উদ্‌বেগ কাতর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সে-মুখের দিকে। হঠাৎ চোখ উঠিয়ে অরুণার দিকে তাকিয়ে মহেশ্বরী আবার মাথা নিচু করেন। হাত দুখানা কোলের ওপর জড়ো করেন একবার— আবার কোল থেকে নামিয়ে রাখেন। কিছুতেই যেন তাঁর শান্তি নেই।

সুনীল এবার চোখ খুলে তাঁর দিকে তাকিয়েছে— মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মহেশ্বরী তার অস্ফুট বলা কথাগুলো শুনবার চেষ্টা করেন— ভালো বোঝা যায় না।

সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে এই প্রথম মহেশ্বরী অরুণার সঙ্গে কথা বলেন, 'শোনো তো, কিছু বুঝতে পারো নাকি।

অরুণা মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, কিছু বলবে, কিছু বলছো সুনীল। —

কথা শোনবার আগ্রহে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠেছিল— এবার সেখানে জল টল টল করে।

বিমল ফিরে এসেছে। সে চিন্তিত মুখে বলে, 'ডাক্তার মুখার্জী তো কালকেই ওকে রিলিজ করে দেবেন বলছেন। বলছেন হাসপাতালের চিকিৎসা ওর হয়ে গেছে, এখন ওর অন্য ট্রিটমেন্ট দরকার। বলছেন, জ্ঞান ওর ফিরবেই, তবে তাড়াতাড়ি হতে পারে— দেরিও হতে পারে। সেটা সম্পূর্ণ ট্রিটমেন্টের উপর নির্ভর করছে। মেন্টাল হসপিটাল...

বিমল মুখের কথা শেষ হবার আগেই, মহেশ্বরীর কথা বলবার আগেই ফুঁপিয়ে উঠে অরুণা নির্লজ্জের মতো, মেন্টাল হসপিটাল কেন বিমল, ও কি পাগল হয়ে গেছে যে সেখানে দিতে হবে?

বিমল বলে, কিন্তু মাসিমার পক্ষে ওকে সামলানো সম্ভব কিনা...

বিমলের সে-কথাও শেষ করতে দেয় না অরুণা, চোখ মুছে জেদী গলায় বলে, কেন, আমি নেই? আমি কি এসেছি ওকে ফেলে চলে যাব বলে, বলে কিন্তু বিমলের নিরাশ মুখের দিকে তাকিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখ পাংশু হয়ে ওঠে অরুণারও মহেশ্বরীর রুক্ষ, কুঞ্চিত দৃষ্টির কথা মনে করে। যত পাগলামোই করুক, তার যে এখনও এতখানি দাবি করবার অধিকার হয়নি মহেশ্বরী নিঃশব্দ, তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েই সেটা যেন বুঝিয়ে দিতে চাইছেন তাকে।

ওদের হঠাৎ টেনে নামানো নিস্তব্ধতার সামনে আস্তে আস্তে মহেশ্বরীর ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে— আস্তে আস্তেই বলেন, সুনীল বাড়িতেই থাকবে বিমল।

কখন ছটার ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে বুকের মধ্যে কাঁপিয়ে। সেই একটানা ঘণ্টা শুনতে শুনতে.আরও জোরে সুনীলের খাটের পাশ চেপে ধরতে থাকে অরুণা— আরও বেশি মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকে সুনীলের মুখের ওপর।

মহেশ্বরীর অনিচ্ছুক পা তবু এগিয়ে যায় বাইরের দিকে কিন্তু অরুণাকে কিছুতেই ওঠানো যায় না। শেষ পর্যন্ত বিমলকেই হাত ধরে টেনে আনতে হয়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে অরুণা— সুনীল বোধ হয় ডাকছে রে!

কোথায়? তোরও কি মাথা খারাপ হল অরুণা?

অরুণা বলে, না রে, তোরা শুনতে পাচ্ছিস না, ওই তো ডাকছে।

এই অস্বাভাবিক পাগলামো করা মেয়েটাকে নিয়ে যে কী করবে বিমল ভেবে পায় না। ওর আশা ছিল, মহেশ্বরী ওকে হয়তো কাছে টেনে নেবেন। কিন্তু সেই যে তিনি রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন— তারপর থেকেই কুঞ্চিত চোখে কী এক ভাবনায় ডুবে আছেন।

শক্ত করে অরুণার হাত ধরে গেটের বাইরে এনে দেখে— মহেশ্বরী রাস্তা

পার হবার উদ্যোগ করছেন।

বিমল বলে, ট্রামে যাবেন বুঝি? —নিঃশব্দে তিনি মাথা নাড়েন। ট্রামে কেন? আসুন না আমাদের সঙ্গে। নামিয়ে দিয়ে যাব। এ মেয়েকে নিয়ে তো ট্রামে-বাসে ওঠা যাবে না।

এতক্ষণ পরে অরুণার মুখের দিকে চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক করে তাকান মহেশ্বরী, তারপর সরে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ স্বরে বলেন, চল তাই।

বাসার দরজার সামনে ট্যাক্সির দরজা খুলে মহেশ্বরী নামলেন— সঙ্গে সঙ্গে অরুণাও।

বিমল বলে, ও কিরে। তুই নামলি কেন? যেতে হবে না?

মহেশ্বরী এই প্রথম অরুণার সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করলেন, তুমি তো শুনেছি মেসে থাকো বিমল, ওরও তো নিকট আত্মীয় কেউ নেই কলকাতায়— কোথায় রাখবে ওকে?

এতক্ষণ যা হয়নি— এবার হল। বিমল একটু অভিমান মেশানো বিরক্তি প্রকাশ করে ঠোঁট উল্টে বলে, দেখি। আমার এক বোন থাকে হরিশ মুখার্জী রোডের মেয়ে হোস্টেলে— ওখানে ওকে দিন কয়েকের জন্যে গেস্ট করে রাখা যায় যদি। ওঠ অরুণা— যা চেহারা করেছিস, কোথাও তুলতেও আমার লজ্জা হচ্ছে।

মিটারে শুধু শুধু ভাড়া উঠছে, কিন্তু অরুণার সে খেয়ালও নেই, সে তেমনি স্থির হয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিমল বলে, দিন তো মাসিমা, ওর হাত ধরে উঠিয়ে। কী মুশকিলেই যে পড়েছি আমি।

এতক্ষণে অরুণা কথা বলে, তুই চলে যা বিমল। আমি এখানেই থাকব।

এবার মহেশ্বরীও চমকে ওঠেন, রুক্ষ দৃষ্টি মিলিয়ে গিয়ে তাঁর চোখ হঠাৎ ছলছল করে ওঠে ভেতরকার দুর্বোধ্য এক আবেগে। কাছে সরে এসে পিঠে হাত রেখে এতক্ষণের মধ্যে ওই প্রথম নাম ধরে ডেকে কথা বলেন তিনি, থাকবে তুমি এখানে অরুণা?

এতক্ষণের চাপা দুঃখের স্রোত যেন বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো বেরিয়ে আসে। দু-হাতে মহেশ্বরীকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মুখ লুকিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে অত বড়ো মেয়েটা— থাকব মা, এখান থেকে আমি কোথাও যাব না। আপনি যে সুনীলের মা, আপনি বুঝবেন আমাকে। আমার নিজের মা আমাকে বোঝে না, বলে সুনীলের মধ্যে তুই কী দেখলি? আমি বোঝাতে পারিনে, চেনাতে পারিনে। কিন্তু আপনি তো চেনেন তাকে, আপনারই তো রক্ত দিয়ে গড়া সে, কী পেলে রূপ-ঐশ্বর্য কিছুই চায় না মানুষ— সুনীলকে দেখে আপনি তো বোঝেন।

কান্নায় মহেশ্বরীরও গলা বুজে আসে, রুদ্ধ আবেগ তাঁকে কথা বলতে দেয় না, কেবল নিঃশব্দে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। তারপর একসময় চোখ মুছে বলেন, তুমি যাও বিমল। ও থাকল আমার কাছেই।

ঘরে গিয়েও মহেশ্বরীর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদে অরুণা, এমন সমব্যথীর কান্না বিমলের কাছেও কাঁদতে পারেনি।

একসময় উঠে বসে চোখ মুছে বলে, ওর ঘরটা কি বন্ধ পড়ে আছে?

মহেশ্বরী বলেন, সে ঘরে এখন নয়— সে যা হয়ে আছে। সারা ঘরময় তার আঁকার সরঞ্জাম ছড়ানো, জামা-কাপড়, বইপত্তর ছিটানো-ছড়ানো, এক হাঁটু ধুলো। সেখানে ঢুকলেই মনে হবে পরিষ্কার করি।

তাই তো যাব।

সে কি? তোমার এমনি অবস্থা, আগে নিজে বিশ্রাম করো— এখন ওসব পাগলামো করো না অরুণা।

জলভরা চোখ তুলে অরুণা জানতে চায়, আমাকে লিখেছিল একখানা বড়ো ছবি আঁকছে— সেখানা?

সে তো আধখানা ক্যানভাসে পড়ে আছে, ধুলো পড়ছে দেখে আমি ঢেকে রেখেছি। এসে অবধি ও-ঘরে আমি একদিন একটু ঢুকেই চলে এসেছি— ওখানে গেলে আমার কান্না পায়।

ধুলো ভরা সেই ঘরের মেঝেয় চুপ করে বসে থাকে অরুণা, আধখানা আঁকা ছবিটার ঢাকনা খুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু-চোখ ছাপিয়ে কখন তার জল নামে আর অস্ফুটে বিড়বিড় করে, তুমি কি সত্যিই আর আঁকতে পারবে না সুনীল— আমার হার হয়ে যাবে।

তারপর কী মনে করে নিজেই আবার চোখের জল মুছে ফেলে কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঘর ঝাঁট দেয়। মহেশ্বরীর ঘরের বাক্স খুলে চাদর বার করে আনে— দরজা জানলার পর্দাগুলোকে খুলে ঘরের কোণে ফেলে দেয়। মাস চারেক আগে সে-ই নিজের হাতে ওগুলো লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে মহেশ্বরী উঠবার আগেই বেরিয়ে পড়েছে অরুণা— ফিরে আসে অনেক বেলায় একরাশ মালপত্তর নিয়ে। রিক্সা থেকে নামে নানারকম রঙের কৌটো, তুলির বাক্স আর আঁকবার সরঞ্জাম— কাপড়— চাদরে বোঝাই বোঝা। বোঝাখানেক রজনীগন্ধা— অনেকগুলো ভালো ছবি।

মহেশ্বরী উদ্বিগ্ন মুখে বসেছিলেন— বকতে থাকেন ওর কাণ্ড দেখে।

অরুণা হাসে, বারে, এগুলো কি কাজে লাগবে না? ওর রংগুলো দেখেছেন— কম দামি বাজে।

তার বাঁ হাতখানার দিকে চোখ পড়তেই মহেশ্বরী বলেন, দেখি, এদিকে এসো

তো, ঘড়ি কই তোমার? ছিল না? উঁহু— ছিল তো। আমি স্পষ্ট দেখেছি। এ কি সরু সোনার চুড়ি ডান হাতে একটা কেন? এ কি কাণ্ড তোমার অরুণা?

অরুণা সে-কথা কেবলই চাপা দেবার চেষ্টা করে, টাকা ছিল না যে হাতে। আপনি ভাবছেন কেন অত? চাকরিতে আমার অনেক টাকা পাওনা হয়ে আছে। আগে সুনীল না আগে ঘড়ি? ও কেমন আছে আগে বলুন। বিমল আসেনি?

আজ ছেড়ে দেবে— চারটের সময় বিমল আসবে। কথা বলছে একটা-দুটো, কিন্তু পুরোনো কথা কিছুই মনে করতে পারছে না।

অরুণার আগ্রহভরা চোখ জলে ভরে উঠেছে বলেই যে সে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মহেশ্বরী অনায়াসেই সেটা বুঝতে পারেন। তিনি বুঝতে পারছেন কী শুনতে চায় অরুণা, কিন্তু বানিয়ে মিথ্যে কথা বলতে তো তিনি পারবেন না।

ক্লান্ত পায়ে অরুণা ঘরে চলে গেল। মহেশ্বরী পিছু ডাকেন না— তাঁরও আজ মন ভালো নেই। ছেলে আসছে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে— আনন্দই হওয়া উচিত কিন্তু হচ্ছে না। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরছে বটে কিন্তু এ কেমন ছেলে— যার দু-চোখে অপরিচিতের বিস্ময়। কতকাল ওমনি হয়ে থাকবে কে জানে। আর ওই মেয়ে। এমন মেয়ে তো তিনি কখনও দেখেননি। এ কি খামখেয়ালি মেয়ে! সব জেনেশুনেও নিজেব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুনীলের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে দ্বিধা করছে না। না কি এ একরকমেব বিলাস আজকালকাব মেয়েদের— ভালোবাসার নামে ভালোবাসার ভান করা।

খেতে বসে অরুণা বলে, আমি কিন্তু ওকে আনতে যাব না মা, আপনি আর বিমল যাবেন। আমি ঘরটা গোছাব।

মহেশ্বরী বলেন, আবার গোছাবে কী? অততেও হল না?

এখনও অনেক বাকি। এমন করে রাখতে হবে যেন ওর পুরোনো কথা চারপাশে ছড়ানো থাকে। ডাক্তার কী বলেছে মনে নেই, হঠাৎ স্মরণশক্তি ফিরে আসবে।

মহেশ্বরী ডালের হাতার দিকে চোখ নামান হঠাৎ— মেয়েটা ওই এক কথাকে সম্বল করেছে। বুকের ভেতরকার কান্নাকে যেন ওই এক কথাতে থামিয়ে রাখতে চায়। রাখতে পারে রাখুক কিন্তু মহেশ্বরী আশা করবেন না। জীবনে কেবল আঘাতই পেয়েছেন তিনি— এইসব মেয়েদের মতো অত কঠিন বিশ্বাস তাঁর নেই।

বিমল এসে মহেশ্বরীকে নিয়ে গেছে— কথা ছিল গাড়ির শব্দ পেলেই দরজা খুলে দেবে অরুণা। কিন্তু ট্যাক্সির শব্দ পাবার কত আগে থেকে কে জানে হাঁ করে খোলা দরজায় ভর দিয়ে রাস্তার দিকে ব্যগ্র দুই চোখ মেলে সে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হবে এই দুদিন ধরে জোর করে কান্না চেপে রেখে উৎসাহের আতিশয্য দেখিয়ে কাজ করা শেষ করে এক নিঃস্ব, রিক্ত মেয়ে উদাস হয়ে গেছে

আকাশের দিকে চোখ তুলে। সে আকাশ শরতের, ঘন নীল তার রং, সেখানে পাখি উড়ছে মাটিতে ছায়া ফেলে। শহরে ইট-কাঠের বন্ধন ডিঙিয়ে কাদের বাড়ির মস্ত উঁচু একটা নারকেল গাছের মাথাটা এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে। এই মুহূর্তটাতে এত শিথিল আর অলস তার দাঁড়াবার ভঙ্গি যেন কোনও ভাবনা নেই তার মনে। গোটা দুই বখাটে ছেলে অনেকক্ষণ থেকে ওকে ওমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু রসিকতা করবার আশায় দুবার শিস দিল— দুবার সামনে দিয়ে যাতায়াত করে বিমর্ষমুখে আবার সরেও গেছে কখন অরুণার তা লক্ষেও এল না— এমনি করে দাঁড়িয়ে থাকা যে উচিত নয় সে-কথাও মনে পড়ে না।

বিমলই প্রথম ট্যাক্সি থেকে নেমে কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে সজাগ করে তোলে, ওরে, তোর আবার কী হল?

যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে অরুণা। চমকে উঠে ছুটে আসে ট্যাক্সির কাছে। সেখানে গদিতে মাথা রেখে বসে আছে নিঃশব্দ এক রুগ্ন মূর্তি। আগ্রহভরা গলায় ডাকে অরুণা, সুনীল।

দু-চোখে জ্বলে ওঠে না পরিচয়ের আলো মুখের একটা রেখাও আগ্রহে কেঁপে ওঠে না সে মূর্তির, ইট-কাঠ-পাথরের মতোই সে বসে থাকে, বিমল আর মহেশ্বরীর হাত ধরে নেমে আসে যন্ত্রের মতো।

মহেশ্বরীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে দেখে অরুণা জেদী গলায় বলে, কাঁদবেন না মা, ওকে আমি ভালো করে তুলবই।

ঘরে গিয়ে বিমল চেঁচাতে থাকে, ওরে বাবারে। এ কী করেছিস রে? এ যে দেখছি রাজপুত্রের ঘর।

মহেশ্বরীও বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছিলেন ঘরখানাকে— সারা দুপুর ধরে মেয়েটা তবে এই কাণ্ড করেছে।

ঘরের চারকোণের চারটে সুদৃশ্য ফুলদানী থেকে রজনীগন্ধার গন্ধে সমস্ত ঘর ভরে আছে। ঘরের এককোণে সুনীলের বিছানা ঢাকা আছে দামি একটা বেডকভার দিয়ে। জানালায়-জানালায় ঝুলছে দামি পর্দা আর ঘরের সবখানি জুড়ে আছে সুনীলের আঁকবার সরঞ্জামে। ডানদিকে যদি সে হাত বাড়ায় পাবে তুলি, রং, খাতা-পেন্সিল— বাঁদিকে হাত বাড়ালেও। তার অর্ধেক শেষ হওয়া ছবিখানাকে ঘরের ঠিক মাঝখানে রেখে দিয়েছে অরুণা স্মরণচিহ্নর মতো— সবসময় ওটার দিকে লক্ষ পড়বেই।

যার জন্যে এত কাণ্ড সে কিন্তু এসব কিছুরই দিকে ফিরেও তাকায় না। সেই যে তাকে বিছানার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল— জড়ের মতো তেমনি সে বসে আছে, মনে হয় জন্মেও সে তার ছবিখানাকে দেখেনি।

এত সুন্দর সাজানো ঘর— সুনীল নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে

কিন্তু তবুও সবাই কেমন করে যেন নির্বাক হয়ে গেছে। বিমলের মতো হাসিখুশি মানুষের চোখ পর্যন্ত ছলছল করে উঠতে চায় এ-পরিবেশে।

অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয় বিমল নিজেই। অন্ধকার হয়ে আসা ঘরে খুট করে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে নীলাভ আলোয় সারা ঘর ভরে ওঠে। সে আলোয় স্পষ্ট করে কারুর মুখ দেখা যায় না— চোখের জল ধরা যায় না বলে সুবিধে হয় বিমলের। সে বলে, আমি এবার যাই মাসিমা। কাল সকালে আসব। অরুণা রইল, আপনার কোনো ভাবনা নেই।

অরুণার পিঠে হাত রেখে সে বলে, যাচ্ছি, বুঝলি।— তার মুখের দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে অরুণা চোখ নিচু করে হঠাৎ এমন করে যে অমন বলিষ্ঠ পুরুষ মানুষ বিমল— তারও হঠাৎ শিশুর মতো কাঁদতে ইচ্ছে করে অরুণার জন্যে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলে, দ্যাখ, কুক্ষণে তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। একটা ভালো, অন্তত করতে পারলাম না কখনও। এ এক জ্বালা— বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বেরোয় আর হয়তো এই দমবন্ধ আবহাওয়া থেকে মুক্তি নেবার জন্যেই মহেশ্বরীও বেরিয়ে আসেন তার সঙ্গে।

এবার খালি ঘরে অরুণা আর সুনীল। যেন এতক্ষণ লোকজন থাকায় নববধূর লজ্জা ছিল এবার কেটে গেছে এমনিভাবে অরুণা দরজা হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকা মূর্তিটার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে দেয়। কাঁদে না, ফিশফিশ করে বলে, সুনীল তুমি আমাকে চিনতে পারছো না? সত্যি করে বল তো। নাকি আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে ইচ্ছে করে এমন করছো?

এতটুকুও শব্দ করে না সুনীল। কেবল ভারি যেন কৌতুকের চোখে তাকিয়ে থাকে তার বুকে মাথা রেখে ছট্‌ফট্ করা অচেনা একটা মানুষকে দেখে।

দু-হাতে তার মুখটা আলোর দিকে তুলে ধরে অরুণা বলে, এবার ভালো করে দ্যাখ তো আমাকে। সত্যি চিনতে পারছো না? সত্যি? কেমন করে পড়ে গেলে তুমি?

একটু নড়ে ওঠে সুনীল— কী যেন একটা অস্ফুটে বলেও কিন্তু সে-কথা বোঝা যায় না। কেবল ঠোঁট কেঁপে উঠে থেমে যায়। অরুণা সে-মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেলে এবার— যেন সত্যিই তার আশা ছিল সুনীল কথা বলবে। হঠাৎ সুনীলের ফ্যাকাশে ঠোঁটের ওপর অধীর আগ্রহে নিজের ঠোঁট চেপে ধরে— যদি সে-স্পর্শে চমকে ওঠে সুনীল। যদি হঠাৎ অরুণাকে তার মনে পড়ে যায়। কিন্তু চমকায় না কেউ— অনুভূতিহীন একটা স্পর্শে অরুণার এবার হতাশ নিঃশ্বাস পড়ে। ছোট শিশুর মতো হাত ধরে সুনীলকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে, তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে মহেশ্বরীর ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে তার পাশে। একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তার মুখের ওপর

ফেলে মহেশ্বরীও চুপ করে থাকেন। ইলেকট্রিকের স্পষ্ট আলোয় অরুণার মুছে ফেলা চোখের জলের দাগ তখনও গালে স্পষ্ট হয়ে লেগে আছে।

এ যেন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে থাকবার প্রতিযোগিতা। সুনীলের মুখে, তার চিঠিতে কতবার তিনি এই মেয়েটার নাম শুনেছেন অথচ চাক্ষুস দেখাটা হয়েছে অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে। সেখানে কুণ্ঠা সংকোচের পথ ছিল না। দুঃখ আর হতাশার নগ্নতার মধ্যে দুজনের পরিচয়, সুনীলের দুটি পরম শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়। তিনি তো মা, নিজের রক্তের জিনিস সুনীল, যেমন হয়েই আসুক কাছে টেনে নিতেই হবে চোখের জল চেপে— সহ্য করতে হবে নিঃশব্দে। কিন্তু লেখাপড়া জানা শিক্ষিতা, উপার্জনক্ষম এই মেয়েটা— ও কেন তার দুঃখের ভার হাসিমুখে সহ্য করছে। কেন অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের আশায় নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিচ্ছে। ও কী পেয়েছে সুনীলের কাছ থেকে? কী দিয়েছে ওকে তার ওই চুপচাপ থাকা, সংসার-ছাড়া অদ্ভুত ছেলেটা। অন্য ছেলেগুলোর মতো মানুষ হল না— নিজের বিদ্যেবুদ্ধিকে অর্থের কাজে লাগালো না, বলে চিরকাল যার জন্যে আক্ষেপ করে এসেছেন— সেই তার সুনীল। অরুণার সব কথাই তো শুনেছেন তিনি। নিশ্চিত সুখ-ঐশ্বর্য-রূপ নিয়ে যে তাকে আর কয়েকটা মাত্র দিন পরেই বরণ করে নিত— তাকেও ত্যাগ করে এসেছে অবহেলায়। কিন্তু! এখন আর ওর কীসের আশা। ইচ্ছে হল সে-কথাটা একবার জেনে নেবেন অরুণার কাছ থেকে। তারই রক্তের ছেলে সুনীল অথচ তার পরিচয় বেশি গভীর হয়ে আছে একটা সম্পূর্ণ অনাত্মীয় মেয়ের কাছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে গিয়ে লজ্জা হল। এ-কথা বলা যায় না। অরুণার দৃঢ় অন্যমনস্ক মুখটার দিকে তাকিয়ে তো আরও বেশি করেই বলা যায় না। হয়তো এই মুহূর্তে ও নিজেই ভাবছে অন্য কথা। হয়তো এখুনি বলবে, আর পারব না। আমি এবার যাই। বলবে, আমার সমস্ত আনন্দকে মেরে ফেলে পারলাম না এ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দায় নিতে। যেন এখুনি বলবে সে-কথা, মহেশ্বরীর সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

অরুণা ডাকে, মা।

শান্ত মুখে তাকান মহেশ্বরী: তাহলেও তিনি ওকে ক্ষমা করবেন— ক্ষমা করবেন।

অরুণা বলে, মা! একটা কথা বলি আপনাকে। স্বাভাবিক সময় হলে হয়তো এ-কথা মুখে আনবার কল্পনাই করতাম না, কিন্তু এটা সে-সময় নয়। আপনি তো জানেন, আমাদের বিয়ে এখনও হয়নি— তবু আমাকে রাত্রে ওর ঘরে থাকতে দিতে হবে। জানি, এ-কথা শুনলে আপনার খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। আমি প্রতিটি মুহূর্ত ওর কাছে থাকতে চাই— কোন মুহূর্তে ওর হয়তো পুরোনো কথাগুলো মনে পড়ে যাবে— তখন যে আমাকেই ওর কাছে

থাকতে হবে— নইলে... সে আমি সইতে পারব না।

লজ্জা-বিষাদ মাখানো মুখখানা অরুণা তাঁর দিকেই তুলে ধরে তাকিয়ে আছে। যদি আপত্তি করেন তাহলে কী করবে মেয়েটা। করা তো উচিত আপত্তি— এ যে তার চিন্তার বাইরে, তার মজ্জাগত ধ্যান-ধারণা সব কি পালটে দিতে চায় এরা। ভ্রু কুঞ্চিত করে মহেশ্বরী মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অরুণা ডাকে আবার, মা, আমি জানি খুবই খারাপ লাগছে আপনার, কিন্তু ও যদি জ্ঞান ফিরে পেয়ে আমাকে না দেখতে পায় ... যদি ... থাকগে আপনার যখন মত নেই।

মত! — মহেশ্বরী হঠাৎ দু-হাতে অরুণাকে কাছে টেনে নেয জোর করে, তোমার চোখেব দিকে তাকিয়েও আপত্তি জানাব আমার সাধ্যি কি অরুণা। আমার মত আছে।

অরুণাকে সোজা হয়ে বসে চোখের জল মুছে ফেলতে দেখে মহেশ্বরীর বুকের মাঝখানটায় সমস্ত হতাশা ছাপিয়ে কোথাও একটুখানি কাঁটা বেঁধার মতো ব্যথিয়ে উঠল— না একেবারেই সরে গেছে সুনীল! দুঃসাহসের নেশা লাগিয়ে দিয়ে সরে গিয়ে সে যেন পরীক্ষা করছে মেয়েটাকে। এত বড়ো দুঃসাহসকে মাথা পেতে নেবার জোর তাঁর রক্তে নেই— ওরাই পাবে।

যেন তপস্যা শুরু হয়েছে আজ কতদিন ধরে।

এ-ঘবে মহেশ্ববীরও ঘুম হয় না। নিজের ছেলের চেয়ে বেশি ভাবনা হয় পরের মেয়েটার জন্যে। যখন-তখন তন্দ্রা ভেঙে ধড়ফড় করে উঠে বসেন, তারপর গিয়ে চুপি চুপি চোরেব মতো বন্ধ দরজার ফাঁকে চোখ রাখেন— কান পেতে থাকেন।

আজও সুনীলেব মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে অনর্গল বকে যাচ্ছে অরুণা— যেন গল্প করছে আর একটা স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে— মনে আছে, সেই মাইলের পর মাইল হাঁটা? বুঝতে পারছি দুজনেই কিন্তু বলতে পারছি না। আমি ভাবছি, কী কুক্ষণেই তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আর তোমার সংকোচ আমি বিজয়ের বাক্‌দত্তা। কথা খুঁজে না পেয়ে কেবলই হাঁটছি— কোথায় যে যাচ্ছি তা কিন্তু জানি না। মনে আছে?

উত্তর দেয় না কেউ, কেবল মহেশ্বরী সব ভুলে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আসেন দরজার কাছে— আরও উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। চুপি চুপি সমস্ত রহস্যটা শুনে নিতে চান, যা হয়তো কোনোদিন শুনবার সুযোগ তার হবে না।

অরুণা মুখটা আরও নামিয়ে এনেছে সুনীলেব মুখের ওপর— তারপর? মনে আছে? ভয়ে ভয়ে সংকোচ কাটিয়ে জানতে চাইলাম নির্লজ্জের মতো— আমাব কথা কবার ভাবেন সারাদিনে? তুমি কী বলেছিলে বল তো?

মহেশ্বরী হঠাৎ বিস্মিত হয়ে থাকেন একটা মুহূর্ত— তবে কি সুনীল কথা বলছে আজ? এমন স্বাভাবিকভাবে নইলে কার সঙ্গে কথা বলছে অরুণা! ছেলের কথা শোনবার আশায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে থাকেন কিন্তু কোথায়? কথা বলছে আবার অরুণাই, তুমি খানিক চুপ করে হাঁটলে তারপর একসময় গম্ভীর হয়ে বললে, সে-কথা বলা যায় না। কিন্তু তবু তো কিছুই চাপা রইল না— পেরেছিলে না বলে? তারপর... হঠাৎ একসময় চমকে উঠে অরুণা বলে, ও তোমার ঘুম পাচ্ছে সুনীল? আচ্ছা—

শিশুর মতো মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়ায় মেয়েটা, নীল আলোটায় ঢাকনা পরিয়ে দিয়ে তারপর চুপ করে পাশে বসে থাকে, মা যেমন রুগ্ন শিশুর মুখের দিকে উদ্বেগকাতর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে পরম স্নেহে। হয়তো ওমনি জেগে থাকে সারা রাত। মহেশ্বরী একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন— ঘুম নামে সুনীলের চোখে, কেবল হয়তো ঘুমোয় না ওই মেয়েটাই— অদ্ভুত দুঃসাহসী এক মেয়ে! ও যে ঘুমোয় না সে-কথা বুঝতে দেরি হয় না সকালে ওর চোখমুখ দেখে।

যতবার মাঝরাতে, রাত গভীর হলে এসে চোখ পেতেছেন— দেখেছেন আবছা নীলাভ এক আলোয় বিনিদ্র এক মূর্তি পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে আছে সুনীলের মাথার কাছে। যখনই কান পেতেছেন— শুনেছেন— সুনীল! তোমার ছবিটা কি তুমি চিনতে পারছ না? সুনীল তোমার কি কিছুই মনে পড়ছে না? আমাকে চিনতে পারছ না তুমি?— অমনি কান্না-চাপা বুকের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা কথাগুলো— আগ্রহ-ব্যাকুল স্বর যেন গম্ভীর রাতের নিঃস্তব্ধতাকে আঘাতে ভেঙে ফেলতে চায়।

আলো এসে পড়েছে অরুণার মুখে। সে-মুখ স্থির আর দৃঢ় ছিল এতদিন কিন্তু আজ এই মুহূর্তে হঠাৎ কেমন বিচলিত দেখাচ্ছে ওকে। হঠাৎ ছটফট করে ওঠে অরুণা। খাট থেকে নেমে মাটিতে বসে পড়ে, ভেঙে পড়া মানুষের মতো দু-হাতে মুখ ঢেকে তার উচ্ছ্বসিত কান্নার শব্দ পাওয়া যায় ঘর থেকে, আর সে-শব্দে দরজার এ-পাশে কখন নিঃশব্দে মহেশ্বরীর গাল বেয়ে জল গড়ায়। কখন একসময় নিঃশব্দে সরে যান তিনি কান্নার শব্দ গোপন করবার জন্যে।

এ-ঘরে এসে শব্দ করে কাঁদেন অন্ধকারে বসে বসে— চোখের জল ফুরিয়ে গেলে ভূতের মতো বসে থাকেন চুপচাপ অনেকক্ষণ। হতাশায় আর তিক্ততায় ছেয়ে গেছে মন তার। ছেলে তার ভালো হবে না আর এ-কথা মা হয়ে তিনি বুঝতে পারছেন আর ওই মেয়েটা বোঝে না। রাত জেগে ও কার সেবা করে চলেছে? মেয়েটাও কি পাগল হয়ে গেছে নাকি? অরুণাকে এবার বোঝানোর দরকার হয়েছে— এবার সুনীলকে কোনো মেন্টাল হসপিটালে দিতেই হবে— আর পাগলামো করা চলবে না পাগল নিয়ে।

কী মনে করে আবার উঠে এসে ওদের ঘরের দরজায় চোখ রাখতে গিয়ে অবাক হয়ে অস্ফুট শব্দ করে পিছিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে কখন বুঝি মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছে অরুণা। আর তার মাথার কাছে বসে আছে সুনীল! যেন এক শিশু, নতুন চোখে অবাক হয়ে দেখছে পৃথিবীটাকে। দেখে মহেশ্বরী হঠাৎ নিজের ছেলেকে ভয় করতে লাগলেন আজ, আতঙ্কে বুকের ভিতর তার কাঁপতে শুরু করেছে ওই দুঃসাহসী মেয়েটার কথা ভেবে। একটা অস্বাভাবিক মানুষের কাছে এমন পরম নির্ভরতায় কী করে নিজেকে সঁপে দিল মেয়েটা। এখন যদি কিছু হয়... যদি...। প্রতিটি মুহূর্ত যেন অনন্তকাল!

এলোমেলো হয়ে তেমনি ঘুমিয়ে আছে অরুণা— তেমনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সুনীল, আর তিনি হয়ে আছেন দরজায় বাইরে নীরব দর্শক।

এই মুহূর্তে, ভয়-ভাবনা ছাড়াও হঠাৎ নিজেকে ভারী ছোটো আর স্বার্থপর মনে হয় তার। হয়তো মনের কোণের কোনো এক স্বার্থপর চিন্তায় মেয়েটাকে তিনি এমন করে ছেড়ে দিয়েছেন। হয়তো ভেবেছিলেন, নিজে যা দিন-রাত সইতে পারবেন না, ওর ওপর দিয়ে সেটা বয়ে যাক।

কিন্তু আর নয়। এবার তাকে কর্তব্য করতে হবে, এই মুহূর্তে সজাগ করে দিতে হবে মেয়েটাকে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছে সুনীল— বিছানা থেকে বালিশটাকে নিয়ে এল। ডাকতে ভুলে গিয়ে মহেশ্বরী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। অরুণার মাথা উঁচু করে মাথার নীচে বালিশটা গুঁজে দিয়ে সরে যাওয়া গায়ের আঁচল ঠিক করে দিল সুনীল। সেই আঁচলেরই প্রান্ত দিয়ে অরুণার চোখের জলের দাগ মুছে দিল ধীরে ধীরে। ক্লান্ত অরুণা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে শুয়েছে— জানতে পারছে না কিছু, কেবল মহেশ্বরীর চোখ দিয়ে আবার নতুন করে জল গড়াচ্ছে।

দুটো-একটা পাখি ডেকে উঠেছে বাইরে। ভোর হচ্ছে। মহেশ্বরী সরে গেলেন দরজা ছেড়ে।

সারাদিন ধরে যতবার দেখা হয়েছে অরুণা কী যেন বলতে চেয়েছে মহেশ্বরীকে। ওর দু-চোখে বিস্ময় আর সামান্য খুশির আভাস তার দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি জানেন কী বলতে চায়, কিন্তু বারেবারে কী এক কুণ্ঠায় নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে মেয়েটা।

শেষে মহেশ্বরী নিজেই বলেন, কিছু বলবে আমাকে অরুণা?

একটুখানি চুপ করে থেকে প্রায় ফিশফিশ করে অরুণা বলে, কালকে খুব ক্লান্ত হয়ে অনেক রাত্রে মাটিতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বালিশ-টালিশ কিছু নিইনি আমার বেশ মনে আছে। সকালে উঠে দেখি, আমার মাথার নীচে একটা বালিশ, গায়ের ওপর একটা চাদর ঢাকা দেওয়া। আপনি কী করে ঢুকলেন। ভেতর থেকে

দরজা তো বন্ধ ছিল।— কথা শেষ করে পরম আগ্রহে তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অরুণা। কী আশার আলো ওর চোখে জ্বলে উঠেও উঠছে না— যেন জ্বলে উঠতে ভয় পাচ্ছে।

মহেশ্বরীর চোখ ছলছল করে আসে সে-মুখের দিকে তাকিয়ে, খুব ইচ্ছে হয় রাতের ঘটনাটা খুলে বলতে— হয়তো তাতে লজ্জাটা তার কিন্তু অরুণা সব ভুলে খুশি হয়ে উঠুক। মুখের রং ফিরুক এই তপস্বিনী মেয়ের। কিন্তু বলা হয় না বাইরের কড়া নাড়ার শব্দে। বেশ সবল হাতের নাড়া পড়েছে দরজা, সুনীল ফিরে আসার পর থেকে এমন শব্দে কেউ এ-বাড়ির নিস্তব্ধতা ভাঙেনি। শব্দটা শুনে একটা মুহূর্ত থমকে থাকে দুজনে, শেষে অরুণাই আগে যায় দরজা খুলতে।

দরজা খুলে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় যে-মানুষটার সঙ্গে, তাকে দেখে পাংশু হয়ে ওঠে অরুণা, কিন্তু ভালো করে বোঝবার আগেই হাসিমুখে সে অভ্যর্থনাও জানায়।

আধ-খাওয়া সিগারেটটা জুতোর তলায় পিষে ফেলে বিজয় বলে, তারপর? কী খবর তোমার? শুনলাম চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছ? দেখাটাও কবলে না?— এত স্বাভাবিক শোনায় তার গলার স্বর, যেন মনে হয় মাঝখানে মস্ত একটা ব্যবধান কিছুই সৃষ্টি হয়নি। ভালোবাসার তার কোথাও যেন কেটে যায়নি দুজনের মন থেকে।

তাকে বাইবের ঘরে বসিয়ে অরুণা বলে, চলে এসেছি আমি অনেকদিনই— এতদিন পরে খবর পেলে বুঝি? আর দেখা করব কখন— আমি কি বাড়ি থেকে বেরোই?

কেন? এক পাগলের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ কবেছ বলে?

শুনে মুখের একটা পেশিও কুঞ্চিত হতে দেয় না অরুণা, ক্রুদ্ধ মনকে আশ্চর্য উপায়ে সংযত করে নিয়ে হাসিমুখে বলে, অমন পাগলকে সেবা করেও সুখ আছে বিজয়। ও যে মহৎ, পাগল হয়েও সেটা প্রমাণ করেছে, কারণ যতক্ষণ জ্ঞান না ফেরে তোমাবই লাভ। হয়তো সত্যি, কথাটা বলতে হবে বলেই পাগল সেজে রয়েছে— এমন হতে পারে।

সে-কথা শুনে এবার বিজয়ের ফরসা মুখ এক মুহূর্তের জন্যে ফ্যাকাশে হয়ে আবাব রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে। আরও স্বাস্থ্যবান হয়েছে বিজয়, আরও সুন্দর। পোশাকে-পরিচ্ছদে-চেহারায় সর্বত্র তার প্রমাণ।

সে বলে একটা মোহের বশে নিজের জীবনকে নষ্ট করতে চলেছ, অরুণা। সুনীল যদি সুস্থ থাকত তবে কিছু বলবার থাকত না; ঐশ্বর্য ছেড়ে গরিব আর্টিস্টকে বিয়ে করা আজকালকার মেয়েদের একটা ফ্যাসান মনে করে না হয় চুপ করে থাকা যেত, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে পারি না।

একটু বিদ্রুপের হাসিতে মুখ ভরিয়ে অরুণা বলে, তুমি কি আমার অভিভাবক নাকি বিজয় যে বাড়ি বয়ে এত কথা শোনাতে এসেছ?

বিজয়ের চোয়াল শক্ত হয়ে আসে, তার সুন্দর চোখদুটোর দৃষ্টি একেবারে পালটে যায়— কিন্তু এ-কথা তো ভুললে চলবে না অরুণা, যে তোমার প্রতিষ্ঠার মূলে আমি। কোথায় থাকতে তুমি আমার সাহায্য না পেলে? সুনীলকে তোমার সঙ্গে পরিচিত করেও দিয়েছিলাম আমি— আজ সে-সব কথা একেবারে ভুলেছ? এত বড়ো বিশ্বাসঘাতক তুমি?

অরুণা বলে, ভুলিনি আমি কিছুই। সুনীলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে বলে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমি।

বিজয় বলে, কৃতজ্ঞতা আমি চাই না। আমার দরকার তোমাকে। এ ছেলেখেলা আমি কবতে দেব না তোমাকে। লোকে হাসাহাসি করছে জানো তোমার কাণ্ড দেখে। পাগলের জায়গা রাঁচি— টাকা লাগে তো আমি দিচ্ছি, কিন্তু সে তোমার কথা ভেবেই। সুনীলকে চোখেব সামনে থেকে সরিয়ে দিলেই দেখবে সব পাগলামো তোমার সেরে গেছে।

হঠাৎ ছটফটিয়ে উঠে তীক্ষ্ণ গলায় অরুণা বলে, তাই বুঝি সরিয়ে দিতে চেয়েছিলে... —তারপব কথা শেষ না করেই চঞ্চল গলায় বলে, আমি যাই বিজয়, সুনীল অনেকক্ষণ একা রয়েছে। তা ছাড়া পাশের ঘরে আমার শাশুড়ি রয়েছেন— তোমার কথাগুলো তাঁর কানে গেলে তিনি নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন না। আজ তুমি এসো।

বিজয়ের মুখটা অপমানে একবারে কালো হয়ে ওঠে, হাসবার চেষ্টা করে বলে, ও, সরি! তোমার শাশুড়ি আছেন? বিয়ে না হতেই শাশুড়ি! নির্লজ্জতাবও একটা সীমা থাকা উচিত অরুণা। যাক— থাকতে আসিনি কিন্তু যাবার আগে তোমার মহৎ পাগলকে একবার দেখে যাই।

সামনে এগিয়ে যেতে যেতে অরুণা অবিকৃত গলায় বলে, এসো আমার সঙ্গে।

বাইরে থেকে দবজা খুলে ঘরে ঢুকে যেন জেদী গলায় বলে, দেখ বিজয়। দেখেছো?

বিজয় দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ কুঞ্চিত চোখে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা রোগা লম্বা মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে। মস্ত বড়ো ক্যানভাসের ওপর তার খানিক এঁকে রাখা ছবিখানাকে দেখছে সুনীল— আজই প্রথম সে এমন করে উঠে দাঁড়িয়েছে। অরুণা তাব পিঠের ওপর হাত রেখে আস্তে আস্তে ডাকে, সুনীল!

সে ডাকে স্থির নিস্পন্দ মূর্তিটা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো কেঁপে উঠে ফিরে দাঁড়ায় আর সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ গিয়ে পড়ে বিজয়ের মুখে। এই প্রথম স্থির

মূর্তিটার চোখে যেন চেনা জগতের আলো এসে পড়েছে, ঠোঁট কাঁপছে, যেন শিউরে উঠেছে তার ভেতরকার সংকুচিত পেশিগুলো প্রচণ্ড এক আলোড়নে।

বিজয়ের বিস্ময় কাটতে একটা সেকেন্ড লাগলো কি লাগলো না— নিজেকে প্রাণপণে সংযত করে নিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে উর্দ্ধশ্বাসে, তার সঙ্গে অরুণাও। তার লালপেড়ে কাপড়ের আঁচল বাতাসে দুলে মিলিয়ে যাবার আগেই সুনীলের ভেতরকার সমস্ত জমানো কথা যেন এক প্রচণ্ড আর্তনাদে ভেঙে পড়ে— অরুণা!

নীচের দরজা বন্ধ করতে করতে সে-ডাক শুনে দু-হাতে বুক চেপে ধরে যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে রাখতে চায় অরুণা— কে ডাকে। দ্রুততর পায়ে উঠতে থাকে সিঁড়ি দিয়ে। এতদিনের এক ক্লান্তি— এত রাত জাগার কষ্ট, হতাশাতেও যা হয়নি আজ সেই শরীর তার থরথর করে কাঁপছে। মহেশ্বরীকে খুঁজবার জন্যে সে পাগলের মতো তাকায় কিন্তু ডাকতে গিয়ে গলার তার স্বর ফোটে না।

সুনীল যেন কান্নার মতো আকুল আহ্বানে ডাকছে— অরুণা— অরুণা— অরুণা। ডাকতে ডাকতে সে বেরিয়ে এসেছে সিঁড়ির মাথায়, তার দু-চোখে জ্বলে উঠেছে পরিচয়ের আলো কিন্তু এখন আর উঠে আসবারও ক্ষমতা নেই অরুণার— সমস্ত শক্তি যেন আজই নিঃশেষ হয়ে গেছে তার।

পাগল হয়ে যা করেনি, সুস্থ সুনীল এবার তাই করে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে দুই হাতে অরুণাকে কাছে টেনে নিয়েও যেন সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না— আরও দুবার অস্ফুটে উচ্চারণ করে তার নাম ধরে। আর তার কাঁধে মাথা রেখে যেন প্রোষিতভর্তৃকার দীর্ঘদিনের জমানো বিরহের কান্না কাঁদতে থাকে অরুণা।

গোলমাল শুনে এতক্ষণ পরে মহেশ্বরী এসে দাঁড়িয়েছেন সিঁড়ির মাথায়— এতদিন পরে লজ্জায় ছটফট করে ওঠে মহেশ্বরীকে দেখে, কিন্তু সুনীল ছাড়ে না। তেমনিভাবেই খুশি মুখে মহেশ্বরীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে— মাগো, এ যে অরুণা, সেই পাজী মেয়েটা। চিনেছো?

মহেশ্বরীও হাসতে থাকেন খুশিতে, ওই নির্লজ্জ মেয়েটাই বুঝি তোর অরুণা? জানতাম না তো। আমি তো ভেবেছিলাম কে না কে?

অরুণার হাত ধরে ওপরে উঠতে গিয়ে কি কথা মনে পড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে সুনীল বলে, বিজয় এসেছিল না? জানো অরুণা— ওই তো... হাত দিয়ে সুনীলের মুখ চেপে ধরে অরুণা বলে, চুপ, আমি যদি ওকে ক্ষমা করে থাকি, তুমিও পারবে।



যে গল্পের শেষ নেই

আজ কিছুদিন থেকে ওই একই আলোচনা চলছে ওদের। দেখা হলে অন্য কথার চেয়ে ওই কথাটাই জরুরি মনে হয় বেশি। যেন অন্য কথা কবে বলেছে কিংবা বলেছে কিনা তা মনেই করতে পারে না।

শিপ্রা বলে, কী যে হবে বাপু, বুঝিনে। সময়মতো অসুখটি বাধালে। একসঙ্গে যে জায়গায় দুজনে পড়তে পারতাম, দিলে তার পথ বন্ধ করে। এখন থাকো হাঁ করে ডুয়ার্স না মুয়ার্স, কোথায় থেকে চিঠির আশায়।

হাঁ করে না হয় আমি থাকলাম, কিন্তু তোমার তো আর ওসব ভাবনা নেই, ডাক তো পেয়েই গেছো। আমি না হয় এ বছরটা...

ভালো হবে না বলে দিচ্ছি—শিপ্রা প্রায় কেঁদে ফেলে। তুমি পড়ে থাকবে আমার চেয়ে বেশি বিদ্যে নিয়ে আর আমি ড্যাং ড্যাং করে ট্রেনিং নিতে যাব, ইনক্রিমেন্ট পাব। কিছু ভালো লাগে না ছাই।

সোমেশ খুব শান্ত হাসি হাসে, এমন করে কথা বলছো যেন আমরা মস্ত একটা কী করতে যাচ্ছি। যাওয়া-আসা, ইনক্রিমেন্ট—হো হো করে এবার সে শব্দ করে হেসে ওঠে, ইনক্রিমেন্ট পাঁচটা না সাতটা টাকা, যাওয়া-আসা, কয়েক মাসের ছুটি— এই তো ব্যাপার। এমন তুমি কাণ্ড করছো যেন আমরা পেরু কিংবা ভেনিজুয়েলা যাচ্ছি। তাতেও বোধ হয় তোমার মতো ব্যস্ত কেউ হয় না। এমন পাগল তুমি।

শিপ্রা তখন একটু শান্ত হয়ে ভাবে, ভাবতে ভাবতে হেসে ফেলে। তখন সত্যিই তার ব্যস্ত মনটা শান্ত হয়ে হয়ে আবার সোমেশের মুখের দিকে দৃষ্টি রাখে। এখনও তার মুখ থেকে, দু'চোখ থেকে রোগের চিহ্ন যায়নি। অসুখের সময় ওর

চুলগুলো ছোটো ছোটো করে ছেঁটে দিয়েছিল শিপ্রা নাপিত ডাকিয়ে, সেগুলো আবার বড়ো বড়ো হয়ে উঠছে। কিন্তু অসুখ থেকে উঠে ও যেন আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ওর যে শান্ত চোখ দুটো শিপ্রাকে কেবলই মুগ্ধ করে তাতে যেন কীসের একটা ছায়া পড়েছে— ভালো লাগছে, কিন্তু অর্থ বোঝা যাচ্ছে না।

চোখদুটোর মতো মনটা যে কেন শান্ত নয়— বুঝিনে, এ আমি কিছুতেই বুজিনে,—খুব সাবধানে প্রায় নিঃশব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে তার।

দুজনে রোজ যেমনভাবে এসে বসে, আজও তেমনি বসেছিল। শিপ্রার তক্তোপোশ দেওয়া, ঘুমানোর, খাতা দেখার, গল্প করার, টিউশানি করার ঘরে।

সোমেশ তেমনি করে চেয়াবের ওপর পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে কেমন অনায়াস ভঙ্গিতে সিগারেট ধরায় তার লোমশ বলিষ্ঠ হাতে। ওর চওড়া স্টিলের ব্যান্ড দেওয়া কব্জিঘড়িটা ঝক্‌ঝক্ করে এমন সুন্দর দেখায় বাঁ হাতখানার ভঙ্গি যে ওর চেহারার অন্য দৈন্যেব কথা আর মনেই থাকে না।

সেই বাঁ হাতখানা টেনে নিয়ে আলগোছে তার ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শিপ্রা বলে, জানো এই অসুখটা হবার পর থেকে তোমাকে যেমন আমি বেশি কাছে পেয়েছি, তেমনি কেবলই আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।

কী কথা?—তেমনি শান্ত চোখ মেলে জানতে চায় সোমেশ।

মনে হচ্ছে এসব সত্যি নয়। কী যেন একটা আসছে, কী যেন একটা...। জানো, মায়েদের অভিশাপ শেষ পর্যন্ত ফলে যায়।—চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে মাথা নিচু করে শিপ্রা বসে থাকে।

দেখি—সিগারেটটা অ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে সোমেশ টান টান হয়ে বসে চোখের থেকে হাতখানা টান মেরে সরিয়ে দিল, ছিঃ ছিঃ, কয়েক বছর ধরে না মাস্টারি করছো তুমি, তুমি না সেলফমেড একটা মেয়ে, একেবারে ছেলেমানুষের মতো হয়ে গেছো শেষ পর্যন্ত। ওইজন্যেই মেয়ে-স্কুলের মেয়েরা অমন ন্যাকা হয়। এই তো সব তাদের দিদিমণি।

অর্থাৎ ন্যাকামো করছি আমি। অর্থাৎ আমি যা বলছি সব বাজে কথা। দেখিনি আমি তোমার মায়ের দু'চোখের দৃষ্টি? ভদ্রতা কেমন করে বিরক্তিতে পরিণত হয়, একমাত্র ছেলের মা অসুখের সময় ছেলেকে দিনরাত আগলে রাখতে না পারলে মনে মনে কেমন হিংস্র হয়ে ওঠেন, তুমি কতটুকু তার জানো সোমেশ? তোমার মা এসে দাঁড়াতেন কাছে, আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতাম তোমার পাশ থেকে হাত ছাড়িয়ে, তা দেখে গম্ভীর হয়ে যেতেন তিনি। তুমি বলতে, 'বোস না মা তুমি ওই চেয়ারটায়। কিছু বলবে? টাকা চাই? দ্যাখো ওই ঝোলানো জামাটার বাঁ পকেটে।' তোমার মা দু'চোখে জল ভরে ঘর থেকে চলে যেতেন তাড়াতাড়ি,

বলতেন— 'না, জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম দুধটা দেব কিনা'। তুমি কি সেসব জানো?

জানি না..., কিন্তু কিছুটা অনুভব করতে পারি মায়ের সেই হিংস্রতার জ্বালা। তুমি আর কতটুকু সময় আমার পাশে যেতে শিপ্রা। তোমার তো কত কাজ— স্কুল, গানের স্কুল, সভা-সমিতি। আমি সারাদিন, একলা মায়ের একলা ছেলে হওয়ার সৌভাগ্য ভোগ করেছি কেমন করে জানো?

শিপ্রা তাকাল চোখ তুলে।

সোমেশ বলে, মায়ের হাতের তেল-মশলা ছাড়া রান্না আমার গলা দিয়ে নামত না অথচ ডাক্তারের নির্দেশ তাই খেতে হবে। তুমি দেখেছিলে। পরের ছুটির দিন তুমি গিয়ে কাগজে জড়ানো একটা টিফিন কৌটো সযত্নে মার হাতে তুলে দিয়েছিলে মনে আছে?

আছে।

মা অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'কী এতে?' তুমি বলেছিলে, 'ওর জন্যে এনেছি মাসিমা। ভাতের সঙ্গে খাবে। মার মুখটা অমনি বিরক্তিতে ভরে উঠেছিল, বলেছিলেন, 'ওর এই অসুখে তো ও যা-তা খেতে পারবে না, মশলা ছাড়া, তেল ছাড়া রান্না...।' তুমি একটু হেসে বলেছিলে, 'সে তো আমি জানি মাসিমা, ঠিক তেমনি করেই রেঁধেছি মাগুর মাছের ঝোলটা, কোনও ক্ষতি হবে না।' মনে আছে?

আছে মনে। আর সেই ঝোল দিয়ে ভাত মেখে তুমি তো আমার সামনেই খেলে বসে বসে -- তাও মনে আছে।

সেই একদিনই। তারপর যতদিন তুমি, তোমার বোন কিংবা চাকরের হাত দিয়ে রান্না পাঠিয়ে নিজে যাবার সময় পাওনি, সে-রান্না আর কোনওদিন আমার পাতের কাছে আসেনি।

ইস্—শিপ্রার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল, কেন? তোমার তো খারাপ লাগেনি। তুমিই তো বরং মাসিমাকে বললে প্রথম দিন আমার রান্না খেয়ে, 'এরকম করে রান্না করলে, মশলা তেল ছাড়া তবু খাওযা যায়। তুমি এমনি করে আমাকে রেঁধে দিও।

সেই হয়েছিল আমার অপরাধ। ঘরে শুয়ে শুয়ে টের পেতাম তোমার বোন কিংবা চাকর কড়া নাড়ছে, দরজা খুলছেন মা। তোমার নামটা উচ্চারিত হতে শুনতাম, তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যেত, কিন্তু পাতের পাশে পেতাম প্রতিদিনের সেই রান্না। একদিন বলেছিলাম, শিপ্রা বুঝি আর পাঠায় না রেঁধে? মা একটু ইতস্তত করেছিলেন, দুবার ঢোক গিলেছিলেন তারপর মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন, 'পাঠায় কিন্তু এত মশলা দেয়। ও তোমার না খাওয়াই ভালো।' কি, খুব ভালো

লাগছে শুনতে?

বুকের মধ্যে একটা কাঁটার খোঁচার মতো ব্যথা ছাড়া রাগ কিংবা বিরক্তি এল না শিপ্রার, কেবল অভিমানে চোখ পুরে জল এসে গেল। বলল, বিশ্বাস করছি তোমার কথা, কিন্তু রাগ করতে পারছি না। এ হচ্ছে এক ছেলের মায়ের সাইকোলজি— যে মাকে আমি দেখেছি দিনের পর দিন তোমার আরোগ্য কামানায় উপোস করে থাকতে। কতদিন বিকেলে গিয়ে মাসিমাকে হয়তো জিজ্ঞেস করেছি, 'মাসিমা! আজ দুপুরে ভাত খেয়েছেন তো, না আজও উপোস? না কি সোমেশের পড়ে থাকা খানিকটা তেল, মশলা ছাড়া রান্না দিয়েই দুটো ভাত...।' অমনি উনি আমাকে অনুনয় করে থামিয়ে দিয়েছেন, 'চেঁচিও না শিপ্রা, শুনতে পাবে! আমার কি আর মাথার ঠিক আছে মা—ওকে কেমন করে যে ভালো করে তুলব! আমার খাওয়াটাই তো বড়ো নয়।' এমন কতদিন...। এ-কথা কি তুমি জানো সোমেশ? তুমি অনায়াসে আমার কোলের ওপর মাথা রেখে হাতখানা শক্ত করে চেপে মুখের ওপর ধরে রেখেছো তোমার মায়ের সামনেই—একেবারে নির্লজ্জের মতো। আমি তোমার বউ না, কিছু না! একটা বাইরের লোক, বন্ধু মাত্র। তোমার পরিচয়ে যাই, মাসিমা বলে তাঁকে ডাকি। কী আমার জাত, কী আমার অতীত, কী আমার ভবিষ্যৎ কিছু তাঁর জানা নেই বরং কিছু দুর্নাম তাঁর কানে গেছে মাত্র— এটুকু আমি হলফ করে বলতে পারি। এমন একমাত্র ছেলের মায়ের হিংসে কিংবা বিরক্তিকে কি আমাদের চোখ দিয়ে বিচার করে রায় দেওয়া উচিত?

বেশ, বুঝলাম তোমার কথা। মায়ের প্রতি তোমার এত সহানুভূতির জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ— এবার বক্তব্যটা বলো।

বক্তব্য আবার কী? আমার মনে হয়, দোষ তোমার। আমাকে তুমি তোমার মায়ের মনে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবার আগেই আঘাতে আঘাতে সম্পর্কটাকে তিক্ত করে তুলছো। সহজভাবে, প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবার সময় না দিয়ে জোর করে আমাকে টেনে নিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকিয়েছো।

বেশ করেছি। অসহিষ্ণুর মতো সোমেশ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, বলেছি তোমাকে আমি বিয়ে করব। এক মায়ের এক ছেলে বলে কি আমার নিজের সত্তা বিসর্জন দিতে হবে আমাকে? দিইনি কি আমি? জানো, এই মায়ের জন্যেই আমি লামডিঙের সেই মিলিটারির পোস্টটা নিলাম না, নাগা হিলসের ওদিকে সেই এডুকেশান অফিসারের পোস্টটা ছাড়লাম, মা চান না বলে। চান না বলেই এই এঁদো শহরে এক মাস্টারির চাকরিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছি...। একমাত্র লাভ তুমি। সেই তোমাকে যদি ছাড়তে হয় তবে আমি মা কেন, কাউকেই সহ্য করব না।

এ-কথায় শিপ্রার দু'চোখ আবার জলে ভরে ওঠে, ইচ্ছে হয় সোমেশের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে একটু কাঁদে, কিন্তু চোখের জল মুছে সে হাসতে থাকে।

সে-হাসি দেখে সোমেশ আরও ক্ষেপে ওঠে, তার শান্ত চোখ দুটোর দৃষ্টি পালটে যায়, বলে, হাসছো তুমি? ব্যঙ্গ করছো নাকি আমাকে শিপ্রা? শুনবে সে-কথা? সহ্য করতে পারবে?

পারব। বল তুমি।

আমার সে-কথা শুনে মা প্রথমে কেমন অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন, ছোটো কোনও শিশুর অদ্ভুত কোনও প্রচেষ্টা দেখতে দেখতে যেমন হেসে ওঠে প্রিয়জনেরা। তারপরেই হঠাৎ কেঁদে ফেললেন, শিপ্রা যে বিধবা!

হলই বা। স্বামীর সঙ্গে ওর পরিচয়ই বা কদিনের। তার মৃত্যুর পরে আবার শিপ্রা যা ছিল তাই।

ওর সঙ্গে যে জাতে মেলে না আমাদের।

মনে তো মেলে।

ওর নামে যে অনেক দুর্নাম শুনি।

দুর্নাম তাকেই দেয় লোকে, যার তা গ্রহণ করার ক্ষমতাও আছে। দুর্নাম না থাকলে ও তো আর পাঁচটা সাধারণ ভালো মেয়ের মতো হত— ভালোই লাগত না আমার।

উত্তর শুনে মা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপর চোখের জল মুছে ফেলে আমার মুখের দিকে এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন, যে দৃষ্টি আমি কখনও দেখিনি আগে। তারপর একটি অদ্ভুত অস্ত্র প্রয়োগ করলেন আমার সে কাকবন্ধ্যা মাতা। কি তা জানো?

চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে উঠেছে সোমেশের, জানলা দিয়ে বাইরে সে স্টেশনের মালগাড়ির শান্টিং দেখতে থাকে।

কী?

তাঁর ভাষায় তর্জমা করলে বক্তব্যটা এই দাঁড়ায়—তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না সোমেশ। বি.এস.সি. পড়বার সময় নমিতাকে নিয়ে তুমি কত কাণ্ড করলে, তাকে তো আমার একটুও অপছন্দ ছিল না। তাকে তুমি কখনও বিয়ে করতে পারো ভেবে আমি কত খুশি হতাম। সে কুমারী মেয়ে ছিল, জাতের মিল ছিল, দেখতে সুন্দর ছিল। কোথায় গেল নমিতা? এম.এস.সি. পড়ার সময় এল তপতী, কিছুদিন তাকে নিয়েও তুমি মাতলে— সেও কোথায় গেল? আর এ শিপ্রা, দেখতেও সুন্দর নয়, বয়সেও হয়তো তোমার চেয়ে বড়োই হবে, বিধবা, স্বাস্থ্য খারাপ— তোমার নতুনত্বের তেষ্টা মিটলেই আবার এও হয়তো কোথায় যাবে...।

বলে মা কথা বন্ধ করে দিলেন। সোমেশ যেন অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে শার্টের হাতা গোটাচ্ছে, এসব কথা তিনি বললেন আমাকে, যেন এসব কথা আমি গোপন করেছি তোমার কাছ থেকে, যেন আমি মিথ্যে মিথ্যে করে ভোলাচ্ছি তোমাকে।

তুমি তো এ সবই জানো শিপ্রা— জানো না?

জানি। ওই একটা ব্যাপারে তুমি অকপট। যাদের তোমার একসময় ভালো লাগত, তাদের পরে কেন আর ভালো লাগল না তার বিশ্লেষণ তোমার মতো কেউ করতে পারবে না। জানিই তো— বল যদি তো আমি সাক্ষীও দিতে পারি।

ঠাট্টা করছো?

না না, ঠাট্টা নয়। সত্যিই তো তুমি যে আমাকে সবই বলেছো এ-কথা মাসিমার জানা নেই বলেই তো এত কাণ্ড।

ওদের সঙ্গে তোমার পার্থক্য কী? তুমি আমাকে কী টানে টেনেছো, কত দীর্ঘ দিনের নীরবতা, অবজ্ঞা, অবহেলা আর উপেক্ষা দিয়ে একটু একটু করে তুমি আমাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে নিয়ে খাঁটি সোনা করে নিয়েছো, এ-কথা কি বলিনি তোমাকে?

তাও বলেছো সোমেশ।

বাইরেটা আস্তে আস্তে কখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, ঘরের ভিতরটাও। হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বালতে গিয়ে হাতটা আবার গুটিয়ে নিল শিপ্রা। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলোটা এসে ঘরে পড়েছে— সেই আলোয় ঘরের ভেতবটা দেখা যাচ্ছে, সেই ভালো।

সোমেশ তাকায় শিপ্রার স্থির-মুখের দিকে, কথা বলছো না যে?

বলছি। তক্তোপোশের ওপর পা দুটো তুলে শিপ্রা ঠিক হয়ে বসে নিল, তুমি বলছিলে না প্রথমে, যে আমি ব্যস্ত হচ্ছি সামান্য ব্যাপারটায়? সত্যিই ব্যস্ততাটা আমারই বেশি, কারণ এক ছেলের মায়ের মন দিয়ে না বুঝলেও, ভালোবাসার মন দিয়ে বুঝতে পারি তোমার যাওয়া মানে আবার ভারসাম্য হারানো। আবার সরে যাবে তুমি আর-এক ইতিহাসের জগতে, আমিও হারিয়ে যাব— তাই ভয়। কিন্তু তোমার ক্ষমতা আছে সোমেশ এ আমি স্বীকার করবই। নইলে আবার নতুন করে তুমি আমাকে...। প্রায় শব্দ করে হেসে উঠল সে।

তবু ঘরের আবহাওয়া সোমেশের শক্ত মুখের মতো স্তব্ধ হয়ে রইল, সে-হাসিতেও সহজ হল না।

সে বললে, বুঝেছি তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না। তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছো শিপ্রা, যেমন একদিন খেলা করে একটা কাগজে আঠারোটা প্রশ্ন লিখে আমার চোখের সামনে হেসে হেসে তুলে ধরেছিলে। আজও তেমনি মিষ্টি কথায় চ্যালেঞ্জ করলে। বেশ, সে-চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম আমি। যদি জয়ী আমি হই তবে তোমার এই হাসি হাসি মুখের নিষ্ঠুরতাকে আমি সারাজীবন দিয়ে তিলে তিলে পিষে মারব, আর...।

যদি তোমার কথাই সত্যি হয় তবে তুমি আমাকে কিছুতেই ক্ষমা কোরো না।

অসীম নিষ্ঠুরতায় আর ঘৃণায় আমার স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলো, আমি এতটুকুও দোষ দেব না তোমাকে। নিশ্চিহ্ন করে দিও আমাকে।

আঃ! চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল শিপ্রার, তা যদি পারতাম সোমেশ! তোমার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে...! তবে এই শেষ। সত্যিই নিষ্ঠুর হব আমি, ক্ষমা আমি আর করব না। আমার কথাই যদি সত্যি হয় তবে নিশ্চিহ্ন করেই মুছে দেব তোমাকে। দিয়ে মনের পাথরটাকে এমন শক্ত করে লাগাব যে কোথাও আর এতটুকু ফাঁক না থাকে...। আর নয়, আর নয়, ওঠো এবার সোমেশ, রাত অনেক হল। আমার একগাদা পরীক্ষার খাতা দেখা আছে, সাতদিনের মধ্যে দিতে হবে। —খট করে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালিয়ে দিল শিপ্রা, নিজেও উঠে দাঁড়াল। সারা ঘরটা আলোয় ভাসছে, বাইরের মালগাড়িগুলোর আস্তে আস্তে চলে যাওয়ার একটানা শব্দ উঠছে লোহার লাইনের ওপর, পাশের ঘর থেকে ছোটো বোন মালার গুনগুন পড়ার শব্দটা কানে আসছে। মনে পড়ে গেছে সব কথা। সাতদিনের মধ্যে পবীক্ষার খাতা দেওয়া ট্রেনিং-এ যাবার প্রস্তুতি, সোমেশেব কি হয় না হয় সেজন্যে উদ্গ্রীব হয়ে থাকা, কালো বেঁটে ছাতাটা হাতে করে নিত্যকার মতো স্কুলে যাওয়া, সেই পাঁচটা-ছটা পিরিয়ডের ক্লান্তি, খিদে, মাথার যন্ত্রণা। বোকা বোকা ক্ষুধার্ত কতকগুলো মুখ শেষ ঘণ্টায়। ছুটিব ঘণ্টা, কলরব। রোজ সেই এক ইতিহাস : অফ্ পিরিয়ড মাত্র একটা, তাও আবার ক্যাজুয়াল রুটিন। আর পারিনে বাপু। কী অমানুষিক ব্যাপার। অঙ্কের সুলতা অ্যাবসেন্ট বলে নমিতাকে আজ তার ক্লাসও করতে হবে। ইস্, ক্লাস সেভেনের মেয়েগুলো একেবারে খাজা...।

আলোয় ভেসে যাওয়া ঘরখানার মতো এটাই সত্যি, এটাই বাস্তব। এতক্ষণ কী কথা হচ্ছিল তাদের? কী! সোমেশের চলে যাবার পরেও তক্তোপোশের ওপর বসে বসে শিপ্রা ভাবতে চেষ্টা করে— চ্যালেঞ্জ, ক্ষমা, ঘৃণা— কী সব কথা! অন্ধকারের মধ্যে বলা কথাগুলো আলো জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেল? আবার কি আলো নেভালে ফিরে আসবে তারা? আসবে কি? আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সোমেশের বসে থাকা চেয়ারটার পিঠের ওপর হাত রেখে ফিশফিশ করে শিপ্রা কেঁদে উঠল, চ্যালেঞ্জ নিয়ো না সোমেশ। আর কাউকে যেন আমার ঘৃণা করতে না হয়।

বিছানায় শুয়ে পাতা উলটে উলটে পড়ে শোনাচ্ছিল আরতি, পাশে প্রায় ওর মাথার ওপর গাল রেখে শুনছে অপর্ণা। নীচে ঢং ঢং করে ঘন্টা পড়েছে শুনতে পেয়েছে দুজনে, পাশের ঘরগুলো থেকে, মাথার ওপরে তেতলার ঘরগুলোর ঘরে-পরা চটির ঘসটানো শব্দ, থালা-বাটির ঠুং-ঠাং শব্দ, সব ওদের কানে গেছে। সিঁড়িতে খস্ খস্ খস্র করতে করতে দল বেঁধে কলরব করতে করতে মেয়েরা

নামছে।

আরতি কিংবা অপর্ণা কেউ নড়ল না সে-শব্দ শুনে, কেবল খাতাখানা আঙুল নিয়ে মাঝখানে বন্ধ করে রেখে আরতি একবার বলে, ওঠ না, অমন করে প্রেমিকের মতো আমার মাথার ওপর গাল রেখে শুয়েছিস কেন? জানিসনে তো মাধুরীকে... বিশ্রী হত...।

দাঁড়া, আগে আমার একটা কথার জবাব দে। এটা তুই কী শোনালি আমাকে?

কী আবার? গল্প।

কার গল্প?

কার আবার! গল্প— গল্প। যেটুকু লিখেছিলাম পড়ে শোনালাম।

এ তোর কথা।

ধ্যেৎ! তুই না, আচ্ছা একটা বোকা।

আরতি তুই বিধবা?

তবে কি তোর স্বামী আছে?

কোনও জন্মে না।

তবে কি তুই কুমারী?

তাও কোনও জন্মে না।

তবে তুই কী?

সৃষ্টির তত্ত্ব অনুসারে প্রথমে আমি হচ্ছি একটা প্রাণ, তারপর মানুষ, তারপর তোদের ভাষায় মেয়েমানুষ— কারণ আমার শরীরের ভেতরকার গ্ল্যান্ডগুলো আমাকে তাই করে গড়েছে।

লক্ষ্মীছাড়ী! পোড়ারমুখী! পাজির পা ঝাড়া। কোনও একটা কথার কি সঠিক জবাব দিবিনে? উঃ! কেন যে তোর সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল, কেন যে এক ঘরে মরতে সিট পড়েছিল আমার। অপর্ণা ওর চুলের বিনুনিশুদ্ধ মাথাটা টেনে ওঠাল-- চল খেতে মুখপুড়ি। এসেছেন ট্রেনিং নিতে— লিখছেন গল্প।

দাঁড়া, এ ব্যাচে আমরা নই, সে-কথাটা তুই ভুলে গেছিস! আরতি উঠে বসে চুল ঠিক করে আর হাসে।

তাই তো, দোতলার ওরা কেউ যায়নি। ঠিক আছে। তবে শোনা তোর বাকি গল্পটা। কোথায় গেল সোমেশ, কী হল শেষ পর্যন্ত।

জানিনে। এর বেশি কিছু লিখিনি তো জানব কেমন করে, বল?

আরতি তুই নিজের কথা আমার কাছে কিছু বলিসনে কেন রে? এত বড়ো হোস্টেলটায় কত রকমের মেয়ে আছে। সবাইকে আমি বুঝি— তোকে বুঝিনে। কী যে ভাবিস তুই।

এতই সোজা! মাত্র তিন মাস আছিস আমার সঙ্গে। কোনও মানুষ কোনও

মানুষকে সারা জীবনেও বলে বুঝতে পারে না, আর তুই তো অপর্ণা পোদ্দার। স্বামী সোহাগিনী, ফেলে আসা ছেলের জন্যে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদিস, ধ্যাবড়া করে সিঁদুর দিস মাথায়, স্বামীর চিঠির আশায় হাঁ করে থাকিস— তুই কী বুঝবি রে?

আঙুর ফল টক না? অপর্ণা কান মুচড়ে দিল আরতির, জীবনে এ স্বাদ পাসনি তো কখনও। আরতি, খবরদার তুই আমার স্বামী ছেলে নিয়ে কিছু বলবিনে বলছি—অপর্ণার চোখ এবার জলে পুরে এসেছে।

না, ভারি কোমল আর লজ্জিত হয়ে গেল হঠাৎ আরতি, না, সত্যি, ওদের নিয়ে আমি কিছু বলব না ভাই। ওটা আমার অন্যায়। তোর ছেলের জন্যে তোর যে মনখারাপ তাকে আমি যেন অনায়াসে অনুভব করতে পারি জানিস, অথচ আমি তো কখনও মা হইনি। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সত্যিকার যে টান, তাকেও আমি উপলব্ধি কবতে পারি জানিস অনায়াসে। জানিস অপর্ণা— যে মফস্‌সল শহরটায়, যে মেয়ে-স্কুলে এতগুলো বছর আমার কাটল তাতে কেবল একটা কথা লেখা আছে, বেঁটে কালো একটা ছাতা, আর বিরস গম্ভীর একটা মুখ আর একবছর থেকে দু'বছর, দু'বছর থেকে তিন বছর, এমনি করে করে বছরগুলো বেড়ে যাওয়া। কিন্তু বেঁটে ছাতা আর বিরস গম্ভীর মুখটার বুকের মধ্যে যে-কথাটা লেখা থাকে তা হল ওই মফস্‌সল শহরটার চিৎকার, হল্লা, রাস্তা ছাপানো নোংরার স্তূপের পর স্তূর পাব হয়ে, রিক্সা, ঠেলাগাড়ি আর সাইকেলের ধাক্কা বাঁচিয়ে একটা সুর শুনতে পাওয়ার চেষ্টা। সেটা কিছু নয়। সে-কথা শুনলে তুই হেসে উঠবি।

বল তুই, হাসব না বলছি—

একটা বাঁশের বাঁশি বিক্রিওয়ালার হঠাৎ হঠাৎ বাঁশিতে টান দেওয়ার সুর। সারা শহরের উপচে পড়া কোলাহল, ইতরামি, নোংরামি, বোকামি আর কদর্যতা ছাপিয়ে সে-সুরটা হঠাৎ আকাশের দিকে আমার মুখটাকে উঁচু করে দেয়। আমি সেই একটা মুহূর্তে সব কিছুর ঊর্ধ্বে চলে যাই— যেতে পারি। জীবনের যত কুশ্রী, সুশ্রী, ভালোমন্দ মিশিয়ে আমি তখন বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ পাই। আমার সামনে দিয়ে নির্বাচনের গলাবাজি করতে করতে বিশেষ দলেরা চিৎকার করতে করতে চলে যায়, পাশের কাটা কাপড়ের দোকান থেকে দুটো লোক অশ্লীল খিস্তি করে হাঁটু চাপড়ে চাপড়ে হি হি করে হাসে, ছোট্ট সবুজ বাসখানার পেটের মধ্যে মানুষগুলোকে জানোয়ারের মতো পুরেও তৃপ্তি নেই, আরও যাত্রী নেবার জন্যে, স্টার্ট নিয়েও থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে থেকে সে পেট্রোল পোড়ায়, আর তার রোজ দেড়টাকা মাইনের কন্‌ডাকটার চিৎকার করে করে লাঙ্‌স ফুটো করে ফেলে। ধর্মের সাক্ষী গোটা কয়েক ষাঁড় সারা রাস্তা জুড়ে ফলের খোসা চিবোয় আর ছড়ায়, আর তারই মাঝখান দিয়ে বেঁটে কালো ছাতা মাথায় এক মাস্টারনি টুকটুক করে চলে, আর সেই বাঁশিওয়ালার লোক-ভোলানোব জন্যে

টান-দেওয়া সুরে হঠাৎ হঠাৎ কী এক স্পর্শ পেয়ে এসব কিছু ছাড়িয়ে চলে যায় চোখ ছলছল করতে করতে। সে যে কী! তা জানি না— জানি না অপর্ণা।

সে কি তোর ওই সিঁথিতে ধ্যাবড়ানো সিঁদুরের লোভ, সে কি তোর ওই স্বামীর একখানা চিঠি পাবার লোভ, সে কি তোর ওই পাঁচ বছরের পিন্টুর মতো কোনও পিন্টুর লোভ...।

নয়? তবে কী?

কী তা যদি 'আমি জানতাম, তাহলে... ও সব, অথচ ও সবও নয়... কী যে... কী যে...।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠছে একসঙ্গে অনেক। প্রথম ব্যাচের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কলরব করতে করতে দলে দলে ওপরের মেয়েরা ওপরে উঠে আসছে। কে যেন চেঁচাল সিঁড়ি থেকে, এই অপর্ণা, আরতি। কী প্রেমকূজন করছিস রে। খেতে যা।

সত্যিই তো এসব কী হচ্ছে সুখলতা মেমোরিয়াল গার্লস হোস্টেলেব সিঁড়িব বাঁদিকের এই ঘরটায়। টেবিলের ওপর খোলা পড়ে আছে শিক্ষার ইতিহাস, আর ওরা দুজনে কী এক স্বপ্নে মশগুল হয়ে কী এক অদ্ভুত ধরনের কথা বলছে, যা শুনে সারা হোস্টেলের ছিয়াশিটা মেয়ে এখন হাঁ করে থাকবে, নয়তো মুখ টিপে হাসবে, নয়তো ঠাট্টা করবে— সেই কথা আরতি শোনাচ্ছে সিঁদুর ধ্যাবড়ানো, একটু গেঁয়ো গেঁয়ো, সরল সরল ওই অপর্ণার কাছে।

এসব কী কথা! এর সঙ্গে তাদের জীবনের যোগ কোথায়, পাঁচ-সাত টাকা ইনক্রিমেন্টের আশাটার মিল কোথায়? আলো-জ্বালা ঘরে বসে আবতি নামে মেয়েটা ছিয়াশিটা মেয়েকে হাসানোর মতো এ কী কথা বলছে!

চল, চল, খেতে চল। ওরে, অপর্ণা। আরতি থালা-বাটি গোছাতে লাগল, খস্‌খস্‌ করে হেঁটে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে, ওরে অপর্ণা।

অপর্ণা যেন চমক ভেঙে উঠল এতক্ষণে, তোর গল্পের শেষ আমি দেখবই। তুইও তো মানুষ— মেয়ে। তোর ভাবনাটাই বা আমাদের চেয়ে আলাদা হবে কেন শুনি? তুই কিসে ভালো বল? শিবানীর মতো পরীক্ষায় প্রথম হতে পারিস, কেকা দত্তের মতো ভালো ইংরিজি লিখতে পারিস— বলতে পারিস? মনীষা, ইন্দ্রাণীদের মতো গিটারে রবীন্দ্রসংগীত বাজাতে পারিস? কিসে তুই বিশেষ একজন বল যে তোর সবকিছুকে বিশ্বাস করতে হবে আমাদের থেকে আলাদা বলে?

দু'হাতে আরতি তাকে জড়িয়ে ধরে টেনে ওঠায় বিছানা থেকে, কে বলেছে তোকে আলাদা করে ভাবতে, আমাকে তোদের থেকে আলাদা করে দেখছিসই বা কেন? তোদের ইচ্ছের মধ্যে আমার ইচ্ছেগুলো লুকোনো রইল মাত্র।

খেতে গেল দুজনে, তারপরে কিন্তু অপর্ণা কেমন অন্যমনস্ক হয়েই রইল। কী

যে ভাবছে সে। ঘুমভাঙা অবাধ্য, খেতে না-চাওয়া ছেলের মতো এক-একটা গ্রাস মুখে তুলে তুলে নিচ্ছে। আরতি সবায়ের সঙ্গে হাসছে, কথা বলছে, অপর্ণা ভুরু কুঁচকাতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে ওদের ঘরে অনিমা, রেবা, প্রীতি— একদল মেয়ে বসে বসে খানিক আড্ডা দিয়ে গেল। সেখানে আলোচনা হল মেট্রনের ব্যবহারের কথা, সেখানে আলোচিত হল হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্টের সম্পর্কে শোনা কিছু গুজব—

বাবা রে! আর কটা মাস গেলে বাঁচি। এ এক আচ্ছা জায়গা।

আমি কেবল কমলাদির কথাই ভাবি, ওই তো হাতির মতো শরীর, তাও রোগা হয়ে যাচ্ছেন বলে রোজ এক গ্লাস করে কমলালেবুর রস...।

জানিসনে বুঝি আরও? সকালের ব্রেকফাস্ট দেখেছিস কখনো? আমি দেখেছি—খান ছয়েক টোস্টের সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি...।

আর সেসবই তো আমাদের ঘাড় ভেঙে! আবার এদিকে তো 'ক' লিখতে কলম ভাঙে— বাবা এতটুকু লজ্জাও কি নেই সেজন্যে...!

এমনি কথা— মন্তব্য, বিরক্তি তার মধ্যেও অপর্ণা চুপ।

এই অপর্ণা, তুই চুপ করে আছিস যে বড়ো? কী হয়েছে? কর্তার চিঠি পাসনি বুঝি?

না রে, ছেলের কথা মনে পড়েছে ওর— কে যেন বলে আর অপর্ণার যেন একটা কান্নার সুযোগ জুটে যায়। তার বড়ো বড়ো চোখ দুটো জলে ভরে উঠে উপচে পড়তে থাকে।

মেয়েরা এতটুকু লজ্জিত হয় না তার জন্যে, বরং রেবা আঁচল দিয়ে গা ঢাকে। মাত্র আট মাসের বাচ্চাটাকে তাকে মায়ের কাছে রেখে আসতে হয়েছে। যদিও রোজ বিকেলে সে একবার ঘন্টা খানেকের জন্য তাকে গিয়ে দেখে আসে। যদি কোনওদিন না যেতে পারে তারও তো এমনি কষ্ট হয়।

তারপর এক সময় তেতলার মেয়েরা তেতলায়, চারতলার মেয়েরা চারতলায় চলে যায় গল্প শেষ করে। তখন আরতি চোখ পাকিয়ে তাকায় অপর্ণার দিকে, তুই সন্ধে থেকে এমন করছিস কেন বলতে পারিস? কী অপমান করেছি তোকে আমি বল! তুই আর মিশিসনে আমার সঙ্গে বুঝলি!

এবার অপর্ণা হাসছে, এতক্ষণে সে চোখের জল মুছে আরতির কাছে সরে আসে, সেই ভালো। একঘরে থাকব অথচ দুজনে কথা বলব না, কি সুন্দর সম্পর্ক, না রে? তোর গল্পের সোমেশ যখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবে তখন যেমন তোর নায়িকা করবে, একই শহরে থাকবে। সেই ছাতা মাথায় দিয়ে নিত্যদিনের পথে চলে যাবে, ওর সঙ্গে দেখা হবে... কিন্তু কত লোকের সঙ্গেই তো দেখা হয়... কত পথচারী, ও তাদেরই একজন। তুই তা পারিস আরতি।

আরতি হাসতে হাসতে বর্ণনাটাকে সেখানেই শেষ হতে দিল না, শিপ্রার আগে আগে সেই পথচারী চলেছে। মায়ের একমাত্র ছেলের পাওনা যত্নে শরীরটা তার বিশাল মোটা আর বেঁটে হয়ে গেছে। হাতে তার একটা তালি দেওয়া ছাতা, মাথায় কোঁকড়া চুলগুলো ছোটো ছোটো করে ছেঁটে প্রচুর তেল দিয়ে চকচকে করে টেনে আঁচড়ানো, একমুখ তার পান। মাঝ রাস্তায় থেমে সে নস্যি ঝাড়ল ডান হাতে, পকেট থেকে আধময়লা নস্যির দাগ-লাগা রুমাল বার করে নাক মুছে আবার চলল।

ছিঃ ছিঃ আরতি, কী বিশ্রী করেই না ভাবতে পারিস তুই! কিন্তু তোর গল্পের সেই শান্ত চোখদুটো স্টিলের চওড়া ব্যান্ড দেওয়া কব্জি-ঘড়িটা?

সে কোথায় চুলোর দুয়োরে গেছে— কে তার খবর রাখে।

কেন? এত রাগ কেন? কেন তুই অমন করে একটা মানুষকে ভেবে রাখবি! কেন তুই ভালো কিছু ভাবতে পারবিনে?

কারণ ভালো কিছু আমার নায়িকা পায়নি। লেখিকার মন বলছে এরকম হবে। আমার গল্প আমি কখনও শেষ হয়তো করব না, কিন্তু যদি শেষ হত তবে এরকমই হত।

এর চেয়ে ভালো কিছু ভাবতে পারিসনে বুঝি?

ভেবেছিলাম। সে একটা স্বপ্নের গল্প। সে ইজিচেযারে শীতেব দিনে পা ঝুলিয়ে শুয়ে থাকবে, গোল গোল হয়ে রোদের রেখা গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, পায়ের ওপর আলতো করে ঢাকা থাকবে একটা লাল আলোয়ান। ছোট্ট বাড়িটাকে দেখতে হবে বাংলো প্যাটার্নের, তার সামনের বাঁশের জাফরি-কাটা বারান্দার গায়ে উঠবে নীল অপরাজিতা।

ওরে মেয়ে! তারও এসব সাংসারিক ভাবনা আছে তাহলে। কেবল বাঁশির সুরের হঠাৎ হঠাৎ টানেই তার চোখ ছলছল করে না, ওই ভাবনাগুলোও চোখ ছলছল করায়।

হয়তো হতে পারে। কিন্তু ও তো মেঘের রাজ্যের স্বপ্ন। যে ভাড়া করা বাড়িতে দুটো কুঠুরির মধ্যে আমার নায়িকা, গত বছর পঁয়ষট্টি বছর হয়ে যাওয়া বাবা, মা আর দুটো ভাইবোন নিয়ে থাকে, যেখানে পাশেই মালগাড়ির ইঞ্জিনের শান্টিং-এর শব্দে মাঝে মাঝেই তার ছোটো বোন মালার পড়ার শব্দও ডুবে যায়, সেখানে এ স্বপ্নের রেশটা শুধু সকালের রোদের মধ্যে খানিকক্ষণের জন্যে মিশে থাকে, তারপর মুছে যায় টিউশানির ছাত্রীরা এলে। মাসের প্রথমে সে মাস্টারির মাইনে গুণে নেয় আর কেবল সস্তা বিসর্জন দিয়ে দিয়ে ভোঁতা হয়ে, রাতকাণা মথের আলোর চারপাশে বৃত্তাকারে ঘোরে— ঘোরে...।

সোমেশের কাছে তবে তোর নায়িকার এত আশা কেন? কেন তবে এত

কান্না তার জন্যে?

সেই তো ভাবি। তাই তো গল্পটার আরম্ভই জানি, শেষ জানিনে। সোমেশও তো সেই অন্ধ মথের দলের— তারও তো ঘোরা এই বৃত্তাকার আলোটার সামনেই। সেই মফস্‌সলের কাঁচা ড্রেনের ওপর ভাড়া করা বাসা, সেই বাজারের জল-কাদায় পা ডুবিয়ে যাচাই করে করে মাছ-তরকারি কেনা, সেই তো সুর করে কাঁদা কুষ্ঠ রোগী মেয়েটাকে এড়িয়ে, হিন্দি সিনেমার জন্যে লাইন দেওয়া লোকের গা ঘেঁষে ঘেঁষে, অব্যক্ত শব্দ করতে করতে মাত্র দুটো লোকের হাঁফাতে হাঁফাতে ঘামতে ঘামতে টেনে নিয়ে যাওয়া আম-বোঝাই ঠেলাগাড়ির পাশ দিয়ে, পানের দোকান থেকে আধুনিক গানের নাকি নাকি সুর শুনে শুনে, আষাঢ়ের পেছল আর মাছি ভ্যানভেনে, থুথু ফেলা, নোংরা, সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া। তারও তো মাইনে গুণে নেওয়া, অ্যাসিসট্যান্ট হেডমাস্টারের সঙ্গে সাতটা পিরিয়ড করতে না চাওযার কথা কাটাকাটি, তারও তো স্বপ্নের বিরুদ্ধে দুঃস্বপ্ন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনিচ্ছা, সত্যের বদলে মিথ্যা, ভাবনার বদলে আঘাতের জীবন। তবু... তবু তার কাছ থেকেই হয়তো কিছু আশা করেছিল আমার নায়িকা।

তোর সেই সত্যি সোমেশ না গল্পের সোমেশ? অপর্ণা যেন ঝোপ বুঝে কোপ মারে।

কোনটা সত্যি, কোনটা গল্প কী জানি! কখনও ভাবি হয়তো সত্যি সোমেশ আছে, আবার দেখি সত্যি নেই, গল্পে আছে।

তুই আমাকে গোলোকধাঁধাঁয় ঘোরাতে পারিস, কিছু না বলতে পারিস, কিন্তু হোস্টেলের অনেক মেয়ে ফিশফিশ করে আমাকে কী বলেছে জানিস? তুই বিধবা।

বলেছে বুঝি? আশ্চর্য তো ওদের ঘ্রাণশক্তি! এত যে লেখাপড়া শেখা— এই যে ছিয়াশিটা বি-এ, এম-এ পাস মেয়ে এ হোস্টেলের বাসিন্দা— তবু সাধারণ, গেঁয়ো, মুর্খ মানুষের মতো বিশেষ একটা শব্দে এত উল্লাস কেন রে?

কারণ শিক্ষা এখনও আমাদের বাইরের পোশাক হয়ে আছে, মনে ঢোকেনি—তুই-ই তো বলিস।

আর কী বলে রে ওরা? চোখ বড়ো বড়ো করে, ফিশফিশ করে?

তোর নাকি কে একজন লাভার আছে . . তোর...।

ওরা তো সর্বজ্ঞ দেখছি রে অপর্ণা।

কেবল একঘরে থেকে আমিই জানিনে কিছু। তুই আমাকে নিজে বলবি তবে শুনব।

তবু তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অপর্ণা বলে, আরতি তোর সত্যি বিয়ে হয়েছিল?

হয়তো হয়েছিল— মনে নেই।

তোর নামে অনেক দুর্নাম আছে। তোদের শহরের উর্মিলা দেবী বিদ্যালয়ের অরুণা ঘোষ বলে যে মেয়েটা এসেছে, সে বলেছে মেয়েদের কাছে।

দুর্নাম! এবার আরতি শব্দ করে হেসে ওঠে, সে তো আমার গল্পের নায়িকার আছেই। দুর্নাম জিনিসটা এমন মজার জানিস অপর্ণা— যেন দিল্লি কা লাড্ডু, না খেলেও পস্তাতে হয়...। হয় তুমি ভীষণ ভালো হয়ে সিঁথিতে ধ্যাবড়া করে সিঁদুর দিয়ে ছেলে কোলে গণেশ-জননী হয়ে কাটাও, না হলে উচ্ছৃঙ্খল হও, বদমায়েশি কর— এর মাঝে আর পথ নেই না কি? সেই বাঁশির সুরটা তবে কী বলে? ইতিহাসে টিকতে গেলে রাজা-উজিরদের যেমন হয় মহৎ হতে হয়, না হলে ভীষণ পাজী হতে হয়— তবে তার নাম থাকে। দুর্নাম আর সুনামের মধ্যেও এই খেলা, তারও আবার ডিগ্রি মাপা আছে। আমার ভাগে কত ডিগ্রি রে?

তোর কাছে অনেকে এসেছে কিছুদিন, কিছুদিন পরে আর আসেনি— ওরা বলে তুই দূর করে দিয়েছিস তাদের...।

বল আর?

আর আবার কী? এত তীক্ষ্ণ আর নিষ্ঠুর কেন তুই? ঘব-সংসার তুই কোনওদিনই করতে পারবিনে— যা তোব স্বভাব!

স্বভাব! তাই বোধ হয়। ঘর-সংসার হবে আকাঙ্ক্ষা করে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন, বছর দুই পরে ঘর-সংসার চুকিয়ে সে এল চলে সর্বনাশীর মতো। এসে বাইবের ঘরের কোণের চড়ুই পাখির আর শালিখের বাসা ভাঙতে তার দুদিন গেল। তারপব সে নিজের চেষ্টায় আইন পাস করল, বি.এ. পাস করল, চাকরি নিল, দশটা বছর তার কোথা দিয়ে কেটে চলে গেল যৌবনের পুঁজি থেকে। তা এরই মধ্যে সে দুর্নাম কুড়াল আর জীবনের পথে হাঁটল। হাঁটল— আব ক্লেদাক্ত, নোংরা সেই মফস্‌সল শহরটার পথ চলতে চলতে হঠাৎ বাঁশির সুর শুনে শুনে খুশি হয়ে উঠল। পালিয়ে যেতে পারলে সে এতদিনে পালিয়ে যেত কোথাও, কোনও সমুদ্রের ধারে, কোনও রোদ ওঠে অথচ তাপ লাগে না। এমন ঠান্ডা দেশে কিংবা সেই বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির নীল অপরাজিতা-ওঠা বাঁশের জাফরির কাছে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে লাল আলোযানে পা ঢেকে সে বসে থাকত।

এব মধ্যে সোমশেকে না আনলেই হত। স্বপ্নটা একা একা দেখলেই পারত— ও বেচারীকে ধরে টানাটানি কেন?

ওই বাঁশির সুরটা শুনতে শুনতে একদিন একটা সময়ে ওরা দুজনেই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা হাঁটছিল। তার শোনা সুর আর আমার নায়িকার শোনা সুর এক জায়গায় এসে মিলে গেল কখন যেন...।

তাই যদি তবে আবার তার সঙ্গে এত তীক্ষ্ণ ব্যবহারই বা কেন? তাকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দেওয়ার কথা কেন? তাকে ক্ষমা না করার প্রতিজ্ঞা কেন? বয়স তো বাপু

কম হয়নি তোমার নায়িকার, থামাও না তাকে এবার। গণেশ-জননী না হয় তিনি নাই হলেন, একজন কারও কাছে তিনি অন্তত হোন না একটু কোমল।

কোমলতা। আরতি একটা হাই তুলল, বিছানার ওপরের ঢাকা তুলে, সাদা চাদরটা হাত দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে নিভাঁজ পরিপাটি করে, মশারির চার কোণে দড়ি পরাতে লাগল। কোমলতার খবর তুই কি জানিস? 'আমার বুকের মাঝে সুধা আছে, চাও কি? হায়, বুঝি তার নাগাল পেলে না। আমার নায়িকার বুকের মধ্যে কোমলতার একটা সমুদ্র আছে জানিস। কিন্তু... নে ঘুমো— এগিয়ে গিয়ে সুইচ অফ করে ঘরটা অন্ধকার করে দিয়েছে আরতি, আর বক্‌বক্ করিসনে অপর্ণা।

বলে মশারিব মধ্যে ঢুকে পাশ ফিরে শুয়ে সে ঘুমোল এত তাড়াতাড়ি যে অপর্ণা ডেকে ডেকেও আর তার সাড়া পেল না। একবার মনে হল খুব নিঃশব্দ কান্নার চাপা একটা শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে কিন্তু পরমুহূর্তেই সেটাকে আবার আরতির নিঃশ্বাসের শব্দ বলে মনে হল। কান্না আর নিঃশ্বাস, নিঃশ্বাস আর কান্নার পার্থক্যটা ধরতে ধরতে তার নিজের চোখই কখন একসময় বন্ধ হ'য়ে এল। সে তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পিন্টুর স্বপ্ন দেখে কেঁদে কেঁদে বালিশ ভেজাতে লাগল।

বাইরে হোস্টেল কম্পাউন্ডের মঞ্জরি-ভরা শালের ডালে ডালে হাওয়া দোল খেয়ে যেতে যেতে শুকনো পাতা ঝরিয়ে ঝরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। টেবিলের ওপরকার ওদের ট্রেনিংয়েব বইপত্তরের পাতা উড়িয়ে দিয়ে আবার জানলা দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। আরতির টেবিলে সেদিনকার ক্লাসে টুকে নেওয়া নোটের খাতা, আর অপর্ণার টেবিলে তার খোলা বইয়েব পাতা ওড়ার খসখস শব্দটা শুধু ভেসে বেড়াতে লাগল সারা ঘরে।

তর্ক চলল ওদেব আরও ছ'মাস ধরে। তিন মাসে যার সূত্রপাত হয়েছিল, ন'মাসে তা যুক্তি-তর্কে আরও ধারালো হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে কয়েকটা ছুটি এল-গেল। বাড়ি কয়েকবার করে ঘুরে এল হোস্টেলের মেয়েরা, গোটা দুই পবীক্ষা দিল আর সিঁড়িতে, করিডোরে ক্লাসে ফাঁক পেলেই দুজনে দুজনকে যুক্তি-তর্কে বোঝাতে লাগল। এর মধ্যে বার চাবেক ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল। কতদিন অপর্ণা আরতির কড়া কড়া কথা শুনে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলল— তবু তর্কটা ওদের থামে না, থামল না।

আরতি বলে, ছিলেন গজাননের মা, এখন আবার হতে চলেছেন কুমার কার্ত্তিকেয়ের জননী। এসেছিস ট্রেনিং নিতে— এত থিওরি, এত আদর্শ, এত নজির, গিয়ে কোথায় সেসব কাজে লাগাবি তা না...।

অপর্ণা বলে, শাট্ আপ, তুই কোনও কথা বলবিনে এ ব্যাপারে। তোর এই অপবিত্র মুখ থেকে এসব কথা শুনতে আমি চাই না। চাকরি ছেড়ে দেব, যার জন্যে সিঁথিতে ধ্যাবড়া করে সিঁদুর পরি, সেই নেবে সব ভার। তা নইলে কি তোর মতো

বাঁশির সুর শুনে, উদাস হয়ে হয়ে সারাজীবন ধরে কেবল রাস্তাই হাঁটি... আহা রে!

আরতি এ কথায় হয়তো শেষ পর্যন্ত একটু ম্লান হয়ে যায়, একটু বিষণ্ণ হয়ে যায়, কিন্তু অপর্ণার কাছে হার মেনেছে এমন কোনও চিহ্নই দেখা যায় না। অপর্ণাকেই শেষ পর্যন্ত হার মেনে সন্ধি করতে হয়, তোর সেই গল্পটা আরতি! শেষ করবিনে? আচ্ছা কেন এত দুঃখ দিস বল তো তোর নায়িকাকে। ওকে একটু কম অহংকারী কর না। ধর যে প্রতিজ্ঞা সে করেছিল তাকে একটু শিথিল করে সোমশেকে না হয় ক্ষমা করে নিল।

আচ্ছা পাগল তো। এখন কি আমার গল্প শেষ করার সময়? আর একমাস পরে না ফাইনাল? চুপ কর, আয় দুজনে মিলে পড়ি। তোর তো আবার সন্ধে হলেই পড়ে পড়ে ঘুম। তুই যে কেন পড়তে এসেছিস বাপু, জানিনে।

আলো জ্বেলে গম্ভীর হয়ে শুধু পড়াব কথা ভাববে বলে বসে দুজনে। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে অপর্ণা গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে থাকে, সেফটিপিন দিয়ে দাঁত খোঁচায় আর কী ভাবে, বলে, তোর কপালে দুঃখ আছে রে আরতি। তুই আমাকে যত কথা এই ন'মাসে বোঝাতে চাইলি, কিছু বুঝলাম না আমি। না! আমি বুঝতে চাইনে, তুই মিথ্যে বলেছিস, বানিয়ে বানিয়ে বলেছিস। তোর নায়িকাও নেই, নায়কও নেই, বাজে বাজে কতকগুলো কথা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে—। ওবা আবার বলছিল তুই নাকি গল্প লিখিস কী সব পত্রিকা-টত্রিকায়— শিবানী, মাধুরী নাকি পড়েছে। ছাই লিখিস। গল্প না হাতি, মাথা আর মুণ্ডু। আসলে তুই হচ্ছিস আমাদেরই মতো মেয়ে— তার বেশি আবার কি হতে পারিস! বরং আমরা যা পেয়েছি তুই তাও পাসনি। তাই অনেক ছলে ঝাল ঝাড়িস— আমি হ্যানো, আমি ত্যানো— ফুঃ! সেফটিপিনটা সে আবার চুড়িতে বন্ধ করে রাখে ঝগড়াটে মুখে।

সত্যি রে সত্যি! আরতি হেসে হেসে তাকে জড়িয়ে ধরে। এই কথাগুলো বুঝে নিলেই তো আমাব আর কোনও জ্বালা থাকে না। তুই তো বিশ্বাস করতে চাসনে যে ওটা শুধুই গল্প, তাও যার আরম্ভটা করে শেষ করতে জানিনে আমি। বোঝ, বুঝে শান্তি পা।

এমনি করে ঝগড়া-তর্ক অমীমাংসিত থাকতে থাকতেই একদিন কবে ওদের পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে। কয়েকটা রাত তর্কটা বন্ধ থেকেছে, অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বেলে পড়াশোনা করেছে দুজনে। সেই কটা দিনের ব্যস্ততায় চলে যাবার দিন যে এত কাছে এসে গেছে সে-খেয়াল ছিল না— ভেবেছিল পরীক্ষার শেষে বুঝি মেটাবে। পরীক্ষা শেষ হতে না হতে হোস্টেল ছাড়ার নোটিশ পড়ে গেল— একটা দিন মাত্র মাঝখানে রেখে দুজনে এবার স্থির হয়ে দুজনের দিকে তাকাল।

অপর্ণা বলে, খুব জিতে গেলি আরতি। তোর যুক্তিগুলোই বহাল রয়ে গেল, খণ্ডন করার সময় হল না আর! তোর নায়িকার সারা জীবনের পথ হাঁটায় আর

বাধা আসবে না। চোখ ছলছলিয়ে যত পারিস হাঁটা তাকে রাস্তায় রাস্তায়।

আরতি তাকে ঠিকানা দিয়েছে কিন্তু চিঠি লেখার কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়নি। অপর্ণার চোখ জলে ভরে গেল, জানি তো আর মনে রাখবি নে, দশ বছর ধরে এই শিক্ষাই তো দিয়েছিস নিজেকে। যা নিষ্ঠুর তুই আমি বুঝে নিলাম।

কাঁদছিস কেন? চিঠি দিয়ে কোনও সম্বন্ধকে কি চিরকাল টিকিয়ে রাখা যায়? চিঠি তো মানুষের মনের সাময়িক আলাপ-প্রলাপ-বিলাপের জিনিস। যা চিরকালীন তা যদি চিঠিতে পাস, জানিস তা চিঠির ভাষা নয়, একজনকে উপলক্ষ করে নিজের সাহিত্যিক বিলাস। ওই ধরনের জোর করে টেনে রাখা সম্পর্কে আমার রুচি নেই।

তবে কিসে তোর রুচি বলতে পারিস? হিমালয়ে যা না সংসার ছেড়ে। রাস্তাঘাটে দেখা হলে চিনতে পারবি তো নাকি তাও পারবি নে? আরতির হোল্ডলের বেল্টটা ঠিক করতে করতে অপর্ণা কাঁদতে থাকে।

নামটা মনে পড়িয়ে দিলে নিশ্চয়ই পারব দেখিস। না না কাঁদিস্‌নে। আরতি বিব্রত মুখে অপর্ণার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে, তোর এই বাচ্চাটা হলে আমাকে খবর দিবি। কখন, কেমন থাকিস জানাবি?

তুই ঘর-সংসারী হবি বল। কথা দে, তোর ওই নায়ক সোমেশের সঙ্গে নায়িকা শিপ্রার ছাড়াছাড়ি হতে দিবি নে। কথা দে, গল্পটা তুই তেমনি করে শেষ করবি?

আরতি অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে থাকে কথা দেবার ভয়ে, কিন্তু মনে হয় কাঁদছে সে। তার জন্য আনতে পাঠানো ট্যাক্সিটা বারে বারে হর্ন দিচ্ছে নীচে।

একে একে সারা হোস্টেলটা খালি হয়ে হয়ে শেষ ট্যাক্সিখানাও শিবানীকে নিয়ে কম্পাউন্ড ছেড়ে বেরিয়ে গেল। গেল না কেবল অপর্ণা। বাঁকুড়া জেলার যে শহরটায় তারা থাকে, তার গাড়ি রাত দশটার আগে নেই। স্বামী পরেশনাথ বিশেষ অনুমতি নিয়ে অন্তত রাত আটটা পর্যন্ত তাকে হোস্টেলে থাকতে বলেছে, সে ট্যাক্সি নিয়ে এলে তবে অপর্ণা যেতে পারবে।

সারা হোস্টেলের ছিয়াশিটা মেয়ের চলে যাওয়ার পরের নৈঃশব্দের বোঝাটা বড়ো ভারি হয়ে বসেছে অপর্ণার মনে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হোস্টেল কম্পাউন্ডের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এতগুলো মাসের কথা সে ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে খালি ঘরগুলোর সামনে দিয়ে ভূতের মতো সে ঘুরে বেড়ায়। ঘরগুলোর দেওয়ালে এখানে-ওখানে ঝুলছে মশারি টাঙানোর দড়ি, কোনও দেওয়ালে ক্যালেন্ডার, ঘরের কোণে জমা করা খালি তেলের শিশি। এ পাশের ঘরখানার বোর্ডার সুভাষিনী রামকৃষ্ণের ফোটো পুজো করত রোজ ফুল দিয়ে, কয়েকটা শুকনো ফুল পড়ে আছে ঘরের এক কোণে। সারা ঘরগুলোয় পেরেক ঠোকার চিহ্ন, কে যেন একটা কাচের গ্লাস ফেলে গেছে? হোস্টেলের ঝাড়ুদারনি ময়লা নেবে কুড়িয়ে। কয়েকটা

মাথার কাঁটা, দুটো পুরোনো ফিতে, আর সারা ঘরময় পুরোনো খবরের কাগজ। কিছু ছেঁড়া পোস্টকার্ডের চিঠি, কার যেন একজোড়া ছেঁড়া চটি পড়ে আছে।

বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে সে এই সুখলতা মেমোরিয়াল হোস্টেলের কথা ভাবতে বসল— মেমোরিয়াল কথাটার অর্থ ভাবতে লাগল। মেমারি কথাটা অনেকবার তারা তাদের ক্লাসের লেকচারে শুনেছে, বইতে পড়েছে— স্মৃতি, স্মরণ কতরকম করেই না তাকে বিশ্লেষিত করা হয়েছে। সুখলতারও একটা ইচ্ছে ছিল— ইচ্ছে ছিল মানুষের মনের স্মারক হয়ে বেঁচে থাকবার। কে জানে তার স্বামী ছিল কি না, সন্তান ছিল কি না? মানুষ তো বংশপরম্পরায় সন্তানের মধ্যে বেঁচে থাকে। সে নিজেও তো বেঁচে থাকবে তার পিন্টুর মধ্য দিয়ে, আরও, যেটি আসছে, তার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ তো এমনি করেই স্মরণীয় হয়— এই তো চলে আসছে।

ভদ্রমহিলার হয়তো স্বামী-পুত্র কিছুই ছিল না, হয়তো বিধবা ছিলেন, তাই বেঁচে থাকবার প্রবল আকুতিতে হোস্টেল গড়বার টাকা দিয়ে গেছেন— স্মারক হয়ে রয়েছেন ইট, কাঠ, পাথরের মধ্যে। তাই প্রত্যেক বছর একদল চলে গেলে আর এক দলের জন্য কান পেতে থাকে হোস্টেলটা— যেখানে মেট্রন মোটা হাতির মতো শরীর নিয়ে দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন বলে সকালে কমলালেবুর রস খান, যেখানে সুপারিনটেন্ডেন্ট মলিনাদি তাঁর প্রৌঢ় রুক্ষতা নিয়ে অত্যন্ত বিশ্রী ব্যবহার করেন মেয়েদের সঙ্গে, যেখানে প্রতিদিনে খাওয়া নিয়ে অভিযোগে টেবিল মুখর হয়ে ওঠে, যেখানে মেয়েদের চিঠি সেন্সার করা হয়— সেই সুখলতা মেমোরিয়াল হোস্টেলে তবু প্রতি বছর মেয়ে আসে। বিরক্ত, তিক্ত হয়ে হয়ে যখন তারা প্রতিবাদ করবে বলে ঠিক করে, তখনই দেখে তাদের যাবার সময় হয়ে গেছে, অমনি বাক্স-বিছানা গুছিয়ে তারা চলে যায়। আবার আর একদল আসে... আবার যায়... আবার আসে। প্রাণহীন ঘটনা, একঘেঁয়ে, বৈচিত্র্যহীন, হয়তো বিধবা সুখলতার জীবনের মতোই, হয়তো আরতির পথ হাঁটার মতোই...।

মাথা ঘুরছে তার, গা-টা গুলিয়ে উঠছে। তেতলা থেকে সে নেমে এল। কথা বলতে ইচ্ছে করছে তার। এই নৈঃশব্দের বোঝা বড়ো ভারি! আটটা বাজতে এখনও দেরি। শরীর তার খারাপ, কোথা থেকে ঘুরে আসতেও ইচ্ছে করছে না। শেষ পর্যন্ত মেট্রন কমলাদির সঙ্গেই গল্প করতে যাবে নাকি। ঘণ্টাখানেক কোনওমতে কাটাতে পারলে...।

নিজেদের পরিত্যক্ত ঘরটার সামনে একবার দাঁড়াল। তার সতরঞ্চি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বিছানা আরতির নিজের হাতের বাঁধা— তার পাশে তার ট্রাঙ্ক, বই আর কাপড়-চোপড় বোঝাই। আর সারা ঘরময় অন্য ঘরগুলোর মতোই দেওয়ালে মশারির দড়ি, ক্যালেন্ডার, তেলের খালি শিশি আর পুরোনো কাগজ। দাঁত বার-করা তোশক তুলে নেওয়া দু'খানা নেয়ারের খাট। ডানদিকের খানায়

আরতি শুত, বাঁদিকের খানায় সে। মনে হল এখুনি বুঝি ঘরের কোণ থেকে কথা বলে উঠবে আরতি। খসখস করে আরতির টেবিলের ফেলে-দেওয়া পুরোনো খবরের কাগজখানা বাতাসে খাটের তলা থেকে উড়ে যাচ্ছে, সেখানা সরে সরে এসে তার পায়ের কাছে পড়ল, তার তলা থেকে বেরিয়ে রয়েছে একটা ফিকে সবুজ রঙের খামের গা। খামখানা সে তুলে নিল হাতে। আরতির নামের চিঠি। খোলা খাম— পড়া হয়েছে চিঠিটা। খুব যেন হেলাফেলা করে, এলোমেলো করে খামের মুখটা কেউ খুলেছে, পড়ে আবার এলোমেলো করে ঢুকিয়ে রেখেছে ভেতরে। হয়তো ছিন্ন টেবিলের কাগজের নীচে, টেবিলটা পরিষ্কার করতে গিয়ে কাগজখানার সঙ্গে পড়ে গেছে মাটিতে, ঢাকা ছিল, চোখ এড়িয়ে গেছে আরতির।

দু-আঙুলে চিঠিখানা সে বার করে আনে, বসে আরতির খাটখানার ওপর, চোখ কুঁচকে একবার সে চিঠির মাথার ঠিকানাটা দেখতে চেষ্টা করে— নেই কিছু, তারিখহীন, ঠিকানাহীন একটা চিঠি। কয়েকটা মাত্র লাইন— এলোমেলো, ছড়ানো-ছিটোনো কয়েকটা শব্দ। যে লিখেছে সে যেন তার অবহেলার ভাবটা ইচ্ছে করে ফোটাতে চেয়েছে।

পর পর দু'খানা চিঠির উত্তর না পেয়ে বুঝেছি আমাকে তুমি তোমার কথামতোই মুছে ফেলেছো নিশ্চিহ্ন করে। আমার চ্যালেঞ্জে আমিই হেরে গেছি এ-কথাই বোঝাতে চেয়েছো.. তবু আর আমার ভয় নেই। যে মেয়েটার কথা লিখেছিলাম সে ছিল বাঙালি— সে আর নেই আমার জীবনে। এখন একটা পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে, মাঝে মাঝে পাহাড় ডিঙিয়ে যাই তার কাছে— ভালো লাগে। তোমার সেই আমাকে স্বপ্ন দেখানোর চেষ্টা, সেই বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ উপলব্ধি করানোর চেষ্টার কথা মনে পড়লে তোমাকে আমার এমন প্যানপেনে লাগে। ...তোমার কাছে ক্ষমা না পেলে কি বয়ে যায় আমার? ভয় করি না— আর ভয় করি না তোমাকে...।

...এখন আমি বিশ্রী মোটা হয়েছি, আয়নায় নিজের দিকে নিজেই তাকাতে পারিনে। আমি সিগারেট ছেড়ে নস্যি ধরেছি, চুলগুলোকে ছোটো ছোটো করে ছেঁটেছি, সেই যেমন আমাদের জন্ডিসের সময়...। তবু আমার শান্তি নেই, তবু তো সেই এক শহরেই থাকা, এক রাস্তা...। আমি যেমন করে পারি আর কোথাও চলে যাব, তুমি কিছু ভেব না।

নামহীন, ঠিকানাহীন চিঠি পড়া শেষ করে অপর্ণা খামখানার ওপর পোস্টাফিসের ছাপটা খুঁজতে থাকে— তাও এমন অস্পষ্ট যে কিছুতেই তার পাঠোদ্ধার করা যায় না।

আরতি তার গল্পের শেষটা বুঝি রেখে গেছে।



প্রতীক

মাথার কাছে অনেকের আসা-যাওয়া, কিন্তু সব মুখই অচেনা। চোখ পুরে যদি জল আসে তবে তাকে অন্তত উপচাতে দেওয়া হবে না, এই প্রতিজ্ঞায় দুটো চোখ ঢেকে, কপালের ওপর হাতখানা আড়াআড়ি রেখে, লম্বা সরু করিডোরটায় নিস্তব্ধ হয়ে সে পড়ে ছিল। মধ্যরাত্রে তাকে এনেছে এখানে, তার সেই বুকের ব্যথাটা দেখা দেবার একটু পরেই। এনে প্রথমে ডাক্তাররা অনেকে মিলে তাকে নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা করেছেন, দুটো ইনজেকশান দিয়েছেন— ভোরের একটু আগে এখানে এনে শুইয়ে দিয়ে গেছেন।

তারপর সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে এত ডাক্তারদের যাতায়াত এত গাদা গাদা ছাত্রছাত্রী আর নার্সদের আনাগোনা যে একটা মুহূর্ত সে চোখ বুজতে পারেনি। বিরক্তিতে তার কান্না পাচ্ছে। এখানে কে তার কথা বুঝবে, কে তার অবস্থার কথা বুঝিয়ে দেবে ওদের, কেমন করে ও তাদের বোঝাবে যে এই সরু করিডোরটায় মাঝরাত থেকে পড়ে থেকে থেকে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সে একটু ঘুমোতে চায়।

আঃ। খুট্ খুট্ খুট্ খুট্, দলে দলে সাদা পোশাক পরা ছাত্রীর দল একবার করে ডাক্তারের পিছনে হল্লা করতে করতে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। ওদের পায়ের হিল তোলা জুতোর শব্দ হচ্ছে খুট্ খুট্ খুট্ খুট্— প্রতিটি শব্দ যেন তার কানের পাশে হাতুড়ি ঠুকছে।

ভারি ভারি গাউন চাপানো রোগিণীরা সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তার কালো মুখটার দিকে হয়তো একবার তাকাচ্ছে। হয়তো কেন— নিশ্চয়ই তাকাচ্ছে, সে চোখ দুটো ঢেকে রেখেছে বলে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলেই বা কী করতে

পারত, ভাষা কোথায়? সেই যে মধ্যরাতে এসে দাদা ওদের ভাষাতেই ওদের কী সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দিয়ে চলে গেছেন, ব্যাস তাঁর কাজ ফুরিয়ে গেছে। ভারি খুশি হয়ে চলে গেছেন তিনি, যাবার সময় বলে গেছেন, মিনু, আর কিছু ভয় নেই, এইবার ওরা তোর রোগের গোড়াশুদ্ধ খুঁজে বার করবে।

একটা ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মেয়ে সে। আভিজাত্যে, সম্মানে, পদাধিকারে তার যে একটা সম্ভ্রম জাগানো অস্তিত্ব ছিল তার নিজের দেশে, এখানে এই মুহূর্তে কান্না পেয়ে সেসব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ওরা তাকে পরিয়ে দিয়েছে সাদা ঢোলা ফ্রক, তার ওপর ঘুরে বেড়ানোর জন্যে গাউন। সেটা খুলে পাশে রেখে সে সারা গা চাদরে ঢেকে শুয়ে আছে। সে শুধু দুটো কথা জানে, এদের ভাষায়— তার একটা 'ভালো' আর একটা 'অসুখ'।

এখানে অসুখ এই কথাটা বলাই বাহুল্য, কারণ এখানে কেউ সুস্থ নয়। তার মাথার কাছে যে চার্টটা লাগানো আছে তাতে তার অসুখের মোটামুটি বিবরণটা লিখে রাখা হয়েছে তা সে জানে— সুতরাং কেউ তাকে জিজ্ঞেস করবার আগেই সেটা পড়ে নিতে পারে।

আঃ, আবার সেই খুট্ খুট্ খুট্ খুট্ শব্দটা এগিয়ে এসে থেমে গেছে তারই মাথার কাছে। বেডটা একবার শব্দ করে ওঠে, কেউ একজন বসেছে তার পাশে সন্তর্পণে। খুব নরম গলায় ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে সে বলে, কাঁদছো তুমি?

কে? দু'চোখের ওপর থেকে হাতখানা সরিয়ে তাকায় মীনা, কে?

হাসে সে। এ-দেশের বরফের শুভ্রতা তার গালে, দুটি চঞ্চল ধূসর রঙের চোখ, ছোটো করে ছাঁটা লাল চুল, লম্বা রোগা শরীর, বলে, আমি। আমি নীনা। কাঁদছো কেন?

মীনা এতক্ষণে তার ভারি সবুজ গাউন দেখেছে। ও হাসপাতালের নার্সও নয়, ডাক্তারও নয়, ও নিজেও একজন রোগিণী। ও মীনার কান্নাই দেখেছে কিন্তু উপকাব কিছু করতে পারবে না। কী হবে বলে!

তুমি ভারতীয়? তুমি বাঙালি? তোমার দুটো চোখ দেখেই চিনেছি। বল ঠিক কি না?

ঠিক! কেমন করে চিনলে?

তোমাদের সব বাঙালিদের মুখ আর চোখ কি একরকম— আশ্চর্য তো! মেয়েটি যেন স্বগতোক্তি করে।

না, তা কেন হবে, ভাই-বোন কি মা-ছেলের মিল থাকে— তোমাদের থাকে না?

থাকে আমাদেরও। কিন্তু...! কী হয়েছে তোমার?

মীনা অসুখের নাম জানাল, সময় জানাল।

ভালো হয়ে যাবে তুমি। ও অসুখের এখানে খুব ভালো চিকিৎসা হয়।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

কোথায় বল তো? মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে মুখের ওপর।

শরীরে নয়— সে তো ইন্‌জেকশানেই গেছে— ঘুমোতে পারছিনে আমি। শব্দ, গোলমাল। সেই মাঝরাত থেকে...।

ইস্‌, ইস্‌, একথা তুমি বলনি কেন এতক্ষণ?

কাকে বলব, আমি যে ভাষা জানি না।

দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি দিচ্ছি ব্যবস্থা করে।

তুমি? মীনা অবাক হয়ে থাকে, তুমি কী করবে? তুমিও তো রোগী। তোমার কথা তো ওরা শুনবে না।

ওরা কারা? ডাক্তাররা? নার্সরা? এখানে সবায়ের কথা সবাই শোনে। মেয়েটি দ্রুতপায়ে উঠে চলে গেল।

আশ্চর্য হয়ে মীনাও ততক্ষণে উঠে বসেছে। আরে! তার মাথার কাছে টেবিল এর মধ্যেই একটা প্লেটে করে কে যেন দুটো সিঙ্গাপুরী কলা, কতকগুলো আঙুর আর আপেল রেখে গেছে। আবে! এ করিডোরটায় সে তো একা নেই, আরও খান চারেক বেডে আরও চারজন রোগিণী— তারা ঘুমোচ্ছে অঘোরে। এত গোলমালের শব্দে ওদের তো কই ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে না!

একজন লম্বা সাদা পোশাক পরা মহিলাকে সঙ্গে করে ফিবে আসছে মেয়েটি। কী যেন সে হাত-পা নেড়ে বোঝাচ্ছে তাঁকে। ওদের সঙ্গে যে মেয়েটি সে নিশ্চয নার্স। কয়েকবার সে ছুটোছুটি করে চলে গেছে এখান দিযে। বসে থাকা মীনাকে দেখে ডাক্তার হাসলেন একটু, তার গালটা আদর কবে ছুঁয়ে দিলেন— যেন সে এতটুকু মেয়ে। নার্স তাকে ইনজেকশান দেওয়া শেষ করে আব-একবার তার মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে চলে গেলেন— যেন সে বায়না ধরা খুকুমণি। সবাই চলে গেলে মেয়েটি কলা তুলে নিল প্লেট থেকে, হাতে দিয়ে বলে, খাও। এক্ষুনি তো যাবে ঘরে।

এক্ষুনি?

আমি খুব বকলাম ডাক্তারকে, তোমার ঘুম হয়নি। ওরা বললেন তোমার জন্যে ঘরে সিট বিকেলেই হয়ে যেত। শুধু কয়েকটা ঘণ্টা ..।

তুমি বকলে?

বকব না? আমাদের রোগিণীদের কষ্ট হলে একশোবার বকব। শোনো, শোনো—। মেয়েটি আরো উল্লসিত হয়ে উঠেছে। তুমি যাচ্ছো কোথায় জানো?— আমারই ঘরে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে করিডোরের পশ্চিমদিকের ঘরে চলে এল মীনা। মেয়েটির আর তার বিছানা পড়েছে পাশাপাশি। হয়তো ডাক্তাররা ইচ্ছে করেই

করেছেন, কারণ ও ইংরিজি জানে। মীনাকে বুঝবার পক্ষে সুবিধে হবে।

আঃ! চওড়া বিছানায়, নরম গদিতে আর সাদা ধবধবে চাদরে গা এলিয়ে মীনা একেবারে ঘুমে ভেঙে পড়তে পড়তে শুনতে পেল মেয়েটি মুখে আঙুল দিয়ে কাকে যেন বলছে স্-স্; ওদের ভাষায় কী যেন বলছে। হয়তো বলছে, চুপ করো, ঘুমোতে দাও একে।

ঘুম যখন তার ভাঙল তখন দুপুরে ওদের খাবার সময় হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যেকার মস্ত বড়ো ডাইনিং টেবিলটার চাকাওয়ালা গাড়িতে করে সুপ ভর্তি প্লেট, রুটি আর আনুষঙ্গিক খাবার সাজিয়ে দিতে ব্যস্ত গোলাপি গাল এক প্রৌঢ়া পরিচারিকা। কাজ করতে করতে কিছু একটা রসিকতার কথা বলছে সে চেঁচিয়ে। রোগিণীদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়েছে। যারা বিছানা থেকে নামতে পারে না তারা কোলের ওপর তোয়ালে বিছিয়ে সুপ খাচ্ছে চামচ দিয়ে।

মেয়েটি আর বলছে না স্-স্। সে নিজের বিছানায় বসে মীনার বিছানার দিকে তাকিয়ে আছে উৎসুক চোখে। চোখে চোখ পড়তেই হাসল। ঘুম ভেঙেছে? ওঠো, খাবে না?

তাই তো! বিছানায় উঠে বসে টেবিলে অপেক্ষমান মেয়েদের দিকে তাকিয়ে একটু অপ্রতিভের হাসি হাসল মীনা। তাব নিজেব দেশ হলে সে এখন স্নান করার কথা ভাবত, এ ঠান্ডার দেশে রোজ স্নানের প্রশ্ন নেই। সে বললে, 'বাথরুমটা দেখিযে দেবে?'

নিশ্চয়ই। তুমি কখন উঠবে, আমি তো তোমারই জন্যে বসে আছি। মেয়েটি তাব হাত ধরে।

তোমার নাম মীনা? আরে অদ্ভুত তো! আমার নাম জানো?

জানি। মীনা— বিদেশি উচ্চারণে উচ্চারণ করল নীনা।

অদ্ভুত মিল তো তোমার আর আমার নামের!

মনেরও দেখো মিল হবে, নীনা বলে। এসো, মুখ ধোও। নিজের কাঁধ থেকে একটা তোয়ালে টেনে নিয়ে ছোটো মেয়ের মতো মীনার মুখ মুছিয়ে, গাউনের পকেট থেকে এটা চিরুণি বার করে তার চুলের সামনেটা আঁচড়ে দিয়ে আবার সে হাত ধরে মীনার, চলো ওরা অপেক্ষা করছে। জানো? সবাই ওরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, কিন্তু পারছে না কেবল ভাষার জন্যে। তবু একটা কথা শিখিয়ে দিই, সবাইকে গিয়ে বলা চাই।

কথাটা মুখস্থ করতে করতে গেল মীনা। তারপর বসে থাকা মেয়েদের উৎসুক চোখের দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা নামিয়ে সে ওদেরই ভাষায় বলে, 'নমস্কার'। আর টেবিলশুদ্ধ প্রৌঢ়া, তরুণী, বৃদ্ধা রোগিণীরা সমস্বরে হেসে উঠে কলরব করে মীনাকে তাদের পাশে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। হাসপাতালের

খাবার ছাড়াও ঘরের খাবার যার যা ছিল মীনার প্লেটে ওরা সাজিয়ে দিয়েছে।

সেদ্ধ মাংস, সেদ্ধ মাছ কিংবা সেদ্ধ মেটের গন্ধে মীনার কান্না পাচ্ছে। সে তো এগুলোর কোনওটাই খেতে পারে না, অসহায়ের মতো চোখ তুলে সে নীনার মুখের দিকে তাকায়।

যে পরিচারিকা পরিবেশন করছিল, নীনা তাকে ডেকে নিচু গলায় কী যেন বলে। সে মাথা নেড়ে বেরিয়ে যায়, আবার একটু পরেই এসে কাজে লাগে।

তুমি এই মেটেটা খাও মীনা। কোনওমতে খাও। আচ্ছা, তারপর এই শুকনো ফলের শরবতটা খাও। পরে কিছু ফল খেয়ে নিয়ো। না খেলে কেমন করে শরীর ভালো করবে বল তো?

একটু পরেই মাথায় সাদা টুপি দেওয়া, অ্যাপ্রন পরা মধ্যবয়স্কা এক মহিলা এসে মীনার পাশে দাঁড়িয়ে তার খাওয়া দেখতে থাকে। হাতে কাগজ পেন্সিল।

নীনা বলে, বল এবার কী খাবে?

কী আবার খাব? এই তো কত খেলাম! আরও!

না, না, এখন নয়— অন্যদিন— সকালে, দুপুরে, রাত্রে।

কী খাওয়াবে? ভাত?

হাসতে থাকে নীনা। না, ভাত এরা দিতে পারবে না হয়তো। অন্য কী? কী মাংস তুমি পছন্দ কর?

মুরগি।

বেশ মুরগি। মেট্রনকে সে বুঝিয়ে দেয়, আর?

আর স্যালাড।

বেশ স্যালাড। আর?

আর কী?

দুধ, দই, শরবত, ফল এগুলো থাক।

কলম চলতে থাকে মেট্রনের। লিখে শেষ করে সে ঘর থেকে চলে যায়।

খাওয়া শেষ করে নীনা বলে, বাগানে যাবে মীনা?

বাগান? আছে বুঝি? চলো। চারটের আগে চলে আসব কিন্তু, দাদা আসবে, বউদি আসবে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওরা বাগানে আসে। সবুজের সমারোহ চারিদিকে ছিল কিছুদিন আগেও যখন মীনা এসে পৌঁছেছিল এ-দেশে, এখন গাছগুলো পাতা ঝরাতে শুরু করেছে। তবু এখনও ফুল ফুটে আছে এখানে-ওখানে, গাছের তলাগুলো ঝরাপাতায় ভরা, রোদটা কেমন ছায়া ছায়া। গাছপালার আর ফুলের বেডগুলোর মাঝে মাঝে বসবার ব্যবস্থা। রোগিণীরা দলে দলে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ বসে গল্প করছে, কেউ সেলাই করছে, কেউ বই পড়ছে।

একটা খালি বেঞ্চি নিয়ে বসল দুজনে। তুমি কে? দোভাষীর কাজ কর? এত ইংরিজি শিখলে কী করে?

শিখেছিলাম ইনস্টিটিউটে, ইচ্ছে ছিল দোভাষীর চাকরি নেবার। হয়নি। একটা রিসার্চের কাজে আছি আমি।

কী রিসার্চ বলো তো? কোন ঠিকানায়?

নামটা বলে নীনা। মীনা বলে, আরে, আরে! ওখানে আমার দাদা কাজ করে যে। এই বছরই তো শেষ হয়ে যাবে সে-কাজ, দেশে ফিরে যাবে।

কে? কে তোমার দাদা? দুজন ভারতীয় আছেন আমাদের সঙ্গে।

নাম শুনে নীনার মুখটা একবার কেমন রং বদলেই আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। আস্তে আস্তে মীনার হাতখানা সে নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে নিচু গলায় বলে, মীনা, তুমি আমার সত্যিকারের আপন লোক। শুধু বন্ধু নও, তুমি আমার সহকর্মীর বোন।

না, শুধু তাই নয়। আরও কী আছে এই বিদেশি মেয়ের গলার সুরে। মীনাকে যতই এরা গাউন-টাউন পরিয়ে, দু'বিনুনি করা ছেলেমানুষ মেয়ে ভাবুক। এ যদি তার বাংলাদেশ হত আর সে যদি তার নিজের জায়গায় শাড়ি-পরা গৃহিণীর দায়িত্বে থাকত তবে এর অর্থ সে ঠিক ধরতে পারত।

নীনা, তোমার বয়স কত?

বলো তো কত?

কত হবে আর? পঁচিশ?

দূর! তেত্তিরিশ।

বিয়ে করনি তুমি?

না।

না? সে কি? তেত্তিরিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে করনি। তোমাদের দেশে তো অবাধ মেলামেশা। শুনেছি তোমাদের ছেলেমেয়েরা বেশ কম বয়সে বিয়ে করে। তুমি করনি?

বিয়ে করে লাভ কী?

সে কী কথা? তবে লোকে করে কেন? বিয়ে না-করা কত অসংখ্য মেয়ে তুমি দেখতে পাবে এ-দেশে। সারাজীবন বিয়ে না করে বুড়ি হয়ে গেছে এমন মেয়ে।

কেন?

যুদ্ধ আমাদের শক্ত সমর্থ প্রায় কোটি খানেক লোককে গিলে খেয়েছে যে— তার মাশুল দিতে হবে না?

তার মধ্যেই তো বিয়ে করছে মেয়েরা— ছেলেও জুটছে।

যে সংখ্যার বিয়ে করছে তার চেয়ে বেশি করতে পারছে না, ছেলে যত

জুটছে, তার চেয়ে বেশি জুটছে না। অবশ্য আমার সমস্যটা ছেলের নয়— মনের।

সত্যি বল কেন করনি?

আমি যাকে ভালোবাসতাম সে মারা গেছে কুড়ি বছরে, যুদ্ধে।

তখন তো তুমি কতটুকু কিশোরী। তারপরে কি জীবন গড়েনি তোমাদের মেয়েরা?

নিশ্চয়ই গড়েছে— নীনা জোর দিয়ে বলে, কিন্তু আমার আর সময় হয়নি, ইচ্ছে হয়নি, কেন যে তাও জানি না। হয়তো কাউকে পছন্দই হয়নি এমনও হতে পারে। মুখ টিপে নীনা হাসে চোখের ওপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে।

তাজ্জব সত্যি! কুড়ি বছরের সেই ছেলের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বসে আছো তুমি?

বসে কী আর আছি? আসলে সময় হল না। পড়াশোনা নিয়ে মেতেছিলাম, তারপব কাজে লেগে মেতে গেলাম। এখন তো এই হার্টের অসুখ— কখন আছি, কখন নেই।

ও-কথা বোলো না। তোমাদের এমন সুন্দর ব্যবস্থা, এত সুন্দর ব্যবহার, আমার তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মনে হচ্ছে আমি বুঝি সুস্থ হয়ে গেছি।

এমনি করে ওদের কথা চলছিল। নীনার ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে কথা, মীনার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, কিন্তু সব কথা অনায়াসে বলা হয়ে গেল। প্রাণেব কথায় ভাষার ব্যবধান আড়াল করতে পারল না দুজনকে। নীনা তাকে শেখাল এ-দেশি ভাষায় কী বললে বলা হয় ভালো আছি। কী করে বোঝানো যায় প্রাণের কৃতজ্ঞতা, কী ভাষায় বলতে হয় আমি তোমাকে ভালোবাসি, কী করে বাড়ির কুশল জিজ্ঞাসা করতে হয়।

কখন চারটে বেজেছে— বাগান খালি করে বোগিণীরা চলে গেছে একটু আগে। 'চলো, চলো, তোমার দাদার আসার সময় হল যে।'

তোমার কে আসবে নীনা?

আমার? মা, ভাই, বোন।

আর?

আর আবার কে? আর কেউ না।

সত্যি নীনা, তোমার একটা পুরুষবন্ধু পর্যন্ত নেই? এ তুমি কী বলছো?

পুরুষবন্ধু থাকবে না কেন? আছে তো। কিন্তু এমন কেউ নেই যে আসবে বলে আমি আগ্রহে পথের দিকে তাকিয়ে থাকব। কেবল একজন... সে যদি আসত! ...কিন্তু কেন সে আসবে!

কে সে? নিশ্চয়ই তুমি তাকে তোমার কথা বলনি— তাহলে নিশ্চয়ই সে আসত।

বলার উপায় নেই। কারণ সে বিবাহিত।

ইস্, কেন তুমি বিয়ে-করা মানুষকে ভালোবাসলে? আর কি কেউ ছিল না?

সেরকম আব কেউ যে ছিল না, আর সে আমার দেশের লোকই নয়।

কী নাম তাব?

নামটা শুনো না মীনা, জিজ্ঞেস কোরো না।

বেশ, তবে থাক আমাদের বন্ধুত্ব। আমাকেও কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেব না।

না না মীনা, রাগ কোরো না। তোমাকে আমি পরে বলব।

একটু পরেই এসে গিয়েছিলেন মীনার দাদা, বউদি।

আরে আরে নীনা! মীনার দাদা অমল হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাগ্রহে। তুমি এই হাসপাতালে? ভালো আছো? কবে ছাড়ছে? এই আমার বোন মীনা, যার নামের সঙ্গে তোমার নামের মিল আছে বলতাম না?

জানি, ও যে আপনার বোন তা আমি পরে জেনেছি, কিন্তু ভাব হয়েছে তার অনেক আগে।

মীনা একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে নীনার প্রশংসায় ফেটে পড়ে আর কাবেরী হাসতে থাকে— তুমি নাকি ছেলেমানুষের মতো কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিলে সকালে? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে একজন ডাক্তার বললেন।

আহা! মীনা লজ্জায় মাথা নিচু করে, আর ওদের কথা বুঝতে না পেরেও নীনা হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। অমল ব্যস্ত হয়ে বলে, আরে দাঁড়াও, কারেরীর সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিই। এই কাবেরী— আমার স্ত্রী। নীনা হাসিমুখে হাত বাড়ায়, পরিচয়ের পালা শেষ করে সে হাসিমুখেই অপেক্ষা করা মা-ভাইবোনের কাছে চলে যায়।

তারপর প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রিয়জনের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথায়, সাংসারিক কথায় ডুবে যায়। কোথা দিয়ে যে সময় চলে যায়। একসময় বিদায়ের সময় হয়ে আসে। দাদা-বউদিকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে মীনা। এসে দেখে নীনা তখনও তার মা, ভাই, বোনকে নিয়ে করিডোরে দাঁড়িয়ে। বলে, এসো, আলাপ করিয়ে দিই। এই আমাব মা, এই আমার ভাই আর দু'বোন। মীনা ওমনি তার শেখা ভাষায় বলে 'নমস্কার'। বলে, ভালো আছি, আপনারা কেমন? নীনা ভীষণ ভালো মেয়ে—। আর নীনার মা বাঙালি মায়ের মতো বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরেন। বোনেরা ভাইয়েরা খুশিতে হাসে ওর মুখে শেখা ভুল উচ্চারণেব কথাগুলো শুনে!

ওরাও একসময় চলে গেলে দুটি রোগিণী করিডোরটায় একটা সোফায় বসে থাকে চুপ করে।

তোমার বউদি কী সুন্দর মীনা!

দেখতে তো সুন্দর নয়— সুন্দর বলছো কেন?

না না, চেহারার কথা নয়— বলেছি স্বভাবের কথা। তোমার দাদা নিশ্চয়ই সুখী?

হ্যাঁ, ওদের দুজনের ভারি ভাব।

বেশ লাগে দেখলে। ভারি পবিত্র আর সুন্দর।

আমার দাদাও যে ভারি ভালো। এমন দরাজ হাসি এমন দরাজ মন— কোথাও এতটুকু মালিন্য নেই মনে।

আমি তা জানি মীনা। একসঙ্গে কাজ করেছি যে। দেখো না, কে কার জন্যেই বা করে? আমার অসুখ বলে কত চেষ্টা করে আমাকে নিয়ে এল।

তোমার কথা তো কিছুই বলনি আমাকে মীনা। এবার বল। তুমি কি বিয়ে করেছো?

করেছি, খুব অল্পবয়সেই বিয়ে হয়েছিল আমার। দেখছো না সিঁথিতে লাল রঙের রেখা।

নীনা ওর সিঁথির লাল রেখাটা উৎসুক চোখে দেখে হাসে— তাই? কাবেরীরও ওমনি আছে। ভারি সুন্দর তো। ছেলেমেয়ে নেই তোমার?

একটি মাত্র ছেলে ছিল— সে গত বছর মারা গেছে—। বলতে গিয়ে ঝরঝর করে কাঁদতে থাকে মীনা। তার সেই পুরোনো অসুস্থতা আবার ফিরে আসে। নীনা ব্যস্ত হয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। দু'হাতে তাকে বুকের কাছে টেনে নেয়, বলে, তুমি এমন করে কেঁদো না মীনা। কী হয়েছে তাতে। আবার মা হবে তুমি।'

না, আর আমি কোনওদিন মা হব না— সে আমি জেনেছি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে মীনা মাথা নাড়ে।

তাতে কী! তোমার স্বামী তো আছেন। তিনি তোমাকে ভালোবাসবেন, তিনি তোমাকে ভুলিয়ে দেবেন সব কিছু।

স্বামী! মীনা মাথা তোলে, তাঁর টাকা আছে কিন্তু প্রাণ নেই। তিনি আমার কিছুই বোঝেন না। ওই ছেলেটাই একটা বন্ধন ছিল দুজনের মধ্যে, এখন হয়তো আর তাও থাকবে না।'

সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে না পেয়ে নীনা চুপ করে থাকে। একসময় তাকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসে। মহা উৎসাহে খাতা, পেন্সিল নিয়ে সে মীনাকে তাদের ভাষা শেখায়। খেলা খেলা হাসাহাসির মধ্য দিয়ে মীনা একেবারে সত্যিকারের ছাত্রীর মতো সত্যি সত্যি ভাষা শিখে ফেলে। কাবেরী অমলকে অবাক করে দেয়। রোগিণীদের বিছানার পাশে গিয়ে গল্প করে। নার্সদের কাজে সাহায্য করে। হাসপাতালের টানা করিডোর পার হলেই যে দোকান আছে, যেখানে রোগিণীরা ইচ্ছে করলে প্রয়েজনীয় খাবার দাবার থেকে শুরু করে সবরকম জিনিস কিনতে পারে, সেখান থেকে সে

ভিনিগারে ভেজানো কচি শশা খায়— কেক, বিস্কুট, চকোলেট কিনে সবাইকে খাওয়ায়। সন্ধেবেলা সিনেমা শো দেখে, হাসপাতাল লাইব্রেরি থেকে ভালো ভালো ইংরিজি নভেল পড়ে, সারা হাসপাতালটায় নীনার হাতে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। একটা আশ্চর্য আনন্দে যেন অবারিত হয়ে গেছে তাঁর মন, বিগত জীবনকে সে যেন ভুলে গেছে, ভুলে গেছে ভবিষ্যতে তার ভাগ্যে কী আছে!

এর মধ্যে মাঝে মাঝে সে হঠাৎ কাঁদে। রোগিণীদের ছেড়ে আসা ছেলেমেয়েদের জন্য মনকেমন করলে, তাদের কান্না দেখলে, তার নিজের সেই একমাত্র ছেলের জন্য বুকের ভেতরটা তার ফেটে ফেটে যায়। সে নিঃশব্দে কাঁদতে চায় বালিশে মুখ লুকিয়ে, কিন্তু তখনই নীনা এসে তাকে জোর করে ওঠায়।

সেদিনও এসে নীনা জোর করে তাকে ওঠাল। বলল, তোমার একমাত্র ছেলের শোকে যে তুমি এমন কর, চল আমি তোমাকে আমাদের দিদিমার কাছে নিয়ে যাই। বলে নিয়ে গেল তাকে করিডোরের পুবদিকের লম্বা ঘরখানায়, যেখানে দিদিমা কাশফুলের মতো সাদা একমাথা পুরুষালী ছাঁটে ছাঁটা চুল, বিষণ্ণ অথচ ভারি একটা মহিমামণ্ডিত মুখ নিয়ে, বড়ো বড়ো ম্লান চোখে বসেছিলেন বিছানায়।

এসো, এসো— দু'হাতের সাদরে তিনি মীনার হাত চেপে ধরে বিছানার পাশে বসালেন। একরাশ ফল তিনি সামনে ধরলেন, খাও।

দিদিমা, ও আপনার কথা শুনতে এসেছে— নীনা বলে। দিদিমার হাসিটুকু ক্রমে ম্লান হয়ে এল, থেমে থেমে গম্ভীর হয়ে তিনি যা বলে গেলেন নীনা তা ইংরিজিতে তর্জমা করে শোনাল। তাঁর স্বামী, তিনটি যুবক ছেলে সবাই মারা গিয়েছে যুদ্ধে। একটার পর একটা মৃত্যুসংবাদ শুনেছেন তিনি বুক চেপে ধরে। সব গিয়ে অবশিষ্ট ছিল একটিমাত্র চব্বিশ বছরের মেয়ে, সেও গত বছর একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। তবু তো হাসি আমি, বাঁচতে চাই। ডাক্তারকে বলি তাড়াতাড়ি ভালো কর আমাকে, আমার যে কত কাজ! সত্তর বছরের জীবন আমাকে নিষ্পেষিত কবেছে— তবু তো হারিনি আমি। দুঃখকে ভয় পাবে মানুষ?

মীনা স্থির হয়ে বসে থাকে। হয়তো দিদিমার মুখ থেকে সোজাসুজি শুনতে পেলে কথাগুলোর মধ্যে তাঁর চোখের জলটা ধরা যেত, এখন শুধু গলাটা কাঁপছে তাঁর— স্থির, নিষ্কম্প শিখার মতো একটা মুখ।

করিডোরটা পার হয়ে আসতে আসতে নীনা তাকে আরও উদাহরণ দেখাল। জানো, আমার বন্ধু ভালিয়া, মাত্র তিরিশ বছর তার বয়স, ক্যান্সার হয়েছে। হয়তো বাঁচবে না। দুটো ছেলেমেয়ে তার, স্বামী। ওই যে তোমার পায়ের দিকের বেডের নতুন আসা অল্পবয়সি সুন্দরী মেয়েটি, ওর স্বামী মাস দুয়েক আগে প্লেন ক্র্যাসে মারা গেছে, বিয়ের মাত্র একমাসের মধ্যে। ওই যে গালা-কে মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ কাঁদতে দেখতে পাও তুমি, ও এসেছে অনেক দূর পাহাড়ি অঞ্চল থেকে। ওর

অসুখটা সবচেয়ে কঠিন আর দীর্ঘস্থায়ী। ওকে একবছর হাসপাতালে থাকতে হবে, অথচ তিনটে ছেলেমেয়ে পড়ে আছে বাড়িতে। এমনি কত অসংখ্য। তুমি কেঁদো না মীনা। দেশে ফিরে গিয়ে কাজ কোরো কিছু, সব ভুলে যাবে।

কতদিন এর মধ্যে অমল এল, কাবেরী এল। নীনা আর একবারও ওদের সামনে গেল না।

মীনা অভিযোগ করে, আর তুমি দাদার সঙ্গে দেখা কর না কেন নীনা? তোমার তো সহকর্মী?

সে হাসে সে-কথা শুনে, কী হবে সামনে গিয়ে? তোমাদের নিজেদের কত কথা থাকে। দূর থেকে তো দেখি।

আমাকে নাকি শিগগিরই ছেড়ে দেবে— দাদা বলে গেল।

আমি জানি। তুমি ভালো হয়ে গেছ— ডাক্তার বলেছেন।

তুমি কবে ছাড়া পাবে নীনা?

আমি? এখনও বেশ কিছুদিন থাকতে হবে আমাকে, তারপর যেতে হবে স্যানেটোরিয়ামে। কাজ থেকে আমার এখন দীর্ঘদিনের বিশ্রাম।

ইস্, তাহলে যে তোমার সঙ্গে যাবার সময় দেখা হবে না নীনা। দাদাব তো চুক্তি অনুযায়ী কাজ ফুরিয়েছে। এবার ফিরে যাবার পালা।

তোমাদের যাবার দিনটিতে তোমাদের নীনা যেমন কবেই হোক উপস্থিত থাকবে। আমি বিশেষ অনুমতি নেব ডাক্তাবের।

বাইরে তখন পেঁজা তুলোর মতো বরফ হাওয়ায় ভেসে ভেসে গাছের মাথায়, ছাদের কার্নিশে ঝরে ঝরে পড়ছে। গাছগুলো যত বাহুল্য সৌন্দর্য ঝরিয়ে দিয়ে শীর্ণ শীর্ণ বাহু বাড়িয়ে যেন ওদেবই জন্যে অপেক্ষা করে আছে কবে থেকে।

দুজনেই ওরা নির্বাক হয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। একটা ছায়া ছায়া ঠান্ডা ঠান্ডা হাত যেন নেমে এসে ওদের বুকের মধ্যেটা চেপে চেপে ধরছে।

জানো মীনা, ববফ পড়ার এই কটা মাসই আমাকে হাসপাতালে কাটাতে হবে, এই সময়টা ভারি খারাপ লাগবে আমার, নিঃসঙ্গ লাগবে। মনে হয় তখন যদি কেউ আসত— মা, ভাই, বোন ছাড়াও আর কেউ।

সে-পথ তো তুমিই বন্ধ করেছো নীনা?

নীনা ম্লান, বিষণ্ণ হাসি হাসে, সবায়ের জীবনে কী সব হয়? আমার সেজন্যে কোনও দুঃখ নেই। আমাদের দেশে জীবনকে ব্যাপৃত রাখবার এত ‘সুযোগ আছে, ব্যক্তিগত দুঃখকে ঠিক যেন অনুভব করা যায় না।’

তবু তো নিঃসঙ্গ লাগে?

হ্যাঁ লাগে, স্বীকার করছি। কিন্তু পিপাসা পেয়েছে বলেই কি ময়লা জল

খাওয়া যায়?

কাচের জানলার ওপাশে তেমনি অবিরল বরফ পড়ে পড়ে সারা দেশটা যখন সাদা হয়ে উঠছে, বাইরেটায় আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসছে, তখন ওরা ঘরে ফিরে আসে, আলো জ্বালা ঘরে বসে অন্য কথা বলে— ভাষা শেখে, হাসতে চায় আর তখনি দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। বাইরের জমা বরফের মতো বুকের ভেতরটায় একটা চাপা কাঠিন্য, স্তব্ধ নীরবতা।

অনেক রাত্রে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে যখন নার্স চলে গেছে, যখন সারা হাসপাতালটা স্তব্ধ হয়ে এসেছে, পাশের বেড থেকে নীনা ডাকে ফিশফিশ করে, মীনা, ঘুমিয়েছো তুমি?

না, ঘুম আসছে না। কিছু বলবে?

বলছিলাম, তোমাদের যাবার দিন আমি থাকব বলেছিলাম, সে বোধহয় হবে না। ওইদিন আমার অপারেশান।

অপারেশান! কই তুমি তো এর আগে আমাকে বলনি।

বলিনি কারণ তোমার মনখারাপ হবে। তবে ভয়ের কিছু নেই, আমাদের দেশে এসব ব্যাপার একেবারে স্বাভাবিক। অপাবেশানের কথা আমিও আগে জানতাম না।

নীনা?

বল। নিজের ভাষায় সাড়া দিল নীনা।

তুমি তো আমাকে কিছু বলনি, তবু আমি সব বুঝেছি। কিন্তু এতে তোমার সুখ কোথায়?

সব সুখ কি সবাইয়ের ভাগ্যে হয়? আমার সুখ তো আমার সাবা দেশে ছড়ানো, কোনও বিশেষ সুখ নাই বা হল।

নীনা তোমার কাছে একটা অনুমতি চাই— দেবে? তোমার কথা দাদাকে জানাব আমি।

অন্ধকারে একটুখানি হাসির শব্দ ভেসে এল, কী হবে জানিয়ে? আচ্ছা... যদি ইচ্ছে হয়... কিন্তু এ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে যখন মাঝ আকাশে উঠে যাবে, একমাত্র তখনই তুমি বোলো তাঁকে আমার কথা, তার আগে নয়।

আচ্ছা তাই। আর একটা অনুরোধ, পারলে কাউকে তুমি বিয়ে কোরো। মা, ভাইবোন এরা ছাড়াও আর কাউকে দরকার— যে তোমাকে আশা দেবে, আশ্বাস দেবে, সঙ্গ দেবে।

দেখি। তবে একটা কথা কী জানো— আশা, আশ্বাস, বিশ্বাস আমরা দেশ থেকেই পাই, আমাদের জীবনযাত্রায় সে-ব্যবস্থা আছে। মীনা, তোমার কথা বল। মন শান্ত হয়েছে?

জানিনে ভবিষ্যতে কী আছে, কিন্তু এখন মন শান্ত। আর কাঁদব না আমি।

কাঁদব না বলেও পরদিন সারাটা দিন কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলাল মীনা নীনার সঙ্গে সঙ্গে। রোগিণীরা ওকে নানা উপহার দিয়েছে। সারাদিন ওরা সঙ্গে সঙ্গে থেকেছে। এরই মধ্যে এতদিন পরে যাবার সময় তার শাড়ি, ব্লাউজ নিয়ে এসেছে ওপরে। সবুজ গাউন, সাদা ফ্রক, দুটো বিনুনি, সব ছেড়ে মীনা আজ শাড়ি পরা বাঙালি মেয়ে হয়ে গিয়ে ওদের যেন অবাক করে দিয়েছে। যে ডাক্তাররা ওর চিকিৎসা করেছিলেন, যে নার্সরা ওকে দেখাশোনা করেছেন, যে পরিচারিকারা কাজ করেছে— সবাই আজ তার শাড়ি-পরা বাঙালিনী মূর্তি দেখে হেসে হেসে অস্থির। ওরা যতই তাকে ঘিরে আসে, মীনার চোখ দিয়েই ততই জল গড়ায়। এই নাকি হাসপাতাল, এই নাকি ডাক্তার, এরা নাকি নার্স, পরিচারিকা! কী আশ্চর্য সূত্রে, কী আশ্চর্য আন্তরিকতার টানে সবাই বাঁধা। এমন তো কখনও মীনা কল্পনাও করেনি। আর ওই যে মেয়েটি! একটু ফ্যাকাশে মুখ বড়ো বড়ো হাসিভরা ধূসর চোখ দুটো, লাল-লাল চুলে-ঘেরা মুখ! ওই বা কী এক অমৃতের স্বাদে তার প্রাণকে ভরিয়ে তুলেছে। এদের ছেড়ে যাওয়া কী কষ্টের!

নিতে এসেছে কাবেরী— অমল আসেনি। নীনার উৎসুক চোখ দুটো একমুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল। সে মীনাকে গরম জামা-কাপড় পরিয়ে দিতে সাহায্য করতে থাকে কাবেরীকে। —বাইরে বরফ পড়ছে, ঠান্ডা লাগে না যেন। নিজের হাতে বোনা মাফলার সে যত্ন করে জড়িয়ে দিল মীনার গলায়। কান ঢেকে মাথায় বেঁধে দিল গরম কাপড়— যা যেখানে দরকার।

দাদাটা এল না, ইস্! কেন? আজকের দিনটা সে আসতে কি পারত না? মীনা বারেবারে ভুরু কোঁচকায়।

কাবেরী হাসে, কেন? বউদি যে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে এ বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? দেখ নীনা, তোমার বন্ধু আমাকে অবলা নারী বলেই ভেবে রেখেছে তোমাদের মতো দেশেও। কী শিক্ষা দিলে ওকে এতদিন ধরে?

নীনা চোখের জল মুছে জোর করে হাসে।

মীনার বিদায়যাত্রা দেখে কাবেরী একেবারে অবাক, অভিভূত হয়ে থাকে। মীনা তোমাকে যে নতুন করে শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছে দেখি। এ কী কাণ্ড! এত কান্নাকাটি! মীনা এত কেঁদো না তো তুমি। এখানে সব হার্টের অসুখের রোগী, ওরা তোমাকে কাঁদতে দেখলে কাঁদবে।

না, মীনা আর কাঁদবে না। ছেড়ে যাকে যাতে হবে তাকে ছেড়ে যাওয়াই ভালো। নীনার চোখের জল সে নিজেই মুছিয়ে দেয়, দিয়ে রোগিণীদের স্নেহচুম্বন সে তার মাথায়, কপালে, গালে গ্রহণ করে নেয় আশীর্বাদের মতো।

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছেন সাদা কাশফুলের মতো চুল নিয়ে সর্বস্ব

হারানো দিদিমা, বিয়ের মাত্র পনেরো দিন পরে প্লেনক্র্যাসে স্বামী মারা যাওয়া সুন্দরী মেয়েটি, দূর পাহাড়ি অঞ্চল থেকে আসা দুরারোগ্য আর দীর্ঘস্থায়ী অসুখ নিয়ে উত্তীর্ণ-যৌবনা ঘরের বউটি। আর তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে! যুদ্ধে মারা-যাওয়া তার কিশোর সাথীর স্মৃতিকে আজও বহন করে যে মেয়ে তেত্তিরিশ বছর পর্যন্ত কাটিয়ে হঠাৎ একটা দরাজ মন, দরাজ হাসি হাসা বাঙালি সহকর্মীকে দূর থেকে কেবল তাকিয়ে দেখেছে মুগ্ধ হয়ে। বিদেশি মেয়ের প্রগলভতায় যে এগিয়ে যায়নি কাছে, চেষ্টা করেনি তার বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা নষ্ট করতে।

ভারি কোট গায়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে মীনা আর কাবেরী। বাইরে দাঁড়িয়ে তাকাল বারান্দার দিকে, যেখানে বন্ধ কাচের জানলার কাছে অসংখ্য মুখ— তখনও তারা হাত নাড়ছে। ওই তা নীনা— ওই যে... সব ঝাপসা হয়ে গেল, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, যাঃ।

চল। কাবেরী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, এরা সত্যি এমন আপন করে ফেলে। আমাদের দেশ হাসপাতাল বলতে কী আতঙ্ক বাবা! ...ডাক্তাররা যেন কোন স্বর্গলোকের অধিবাসী, দূর থেকে একবার টহল দিয়ে যান। নার্সরা খাটুনির চাপে কী বিরক্ত। রোগিণীরা... বাবাঃ! একবার মেডিকেল কলেজের সেই গুড ইভ্ ওয়ার্ডে... মনে নেই...? তোমার দাদাও তো বকবক করছেন কাল থেকে। এদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। একটা দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিতে উঠে রাস্তার নির্দেশ দিল কাবেরী এ-দেশি ভাষায়, তারপর বললে, এসব দেখে সুশান্ত চ্যাটার্জী আর তপতীদের সেই ঘটনাটাকে কি সত্যি বলে মনে হয় তোমার?

মীনা ভুরু কুঁচকে তাকায়।

বারে? মনে পড়ছে না? সেই যে সুশান্ত চ্যাটার্জী পাঁচ বছরের চুক্তিতে কী একটা ভারতীয় ভাষা শেখানোর চাকরি নিয়ে এসেছিল? বউ তপতী ছিল দেশে, সে বেচারি দেশে তখন কী একটা ট্রেনিং নিচ্ছিল। সেটা শেষ করে বছর খানেকের মধ্যে যখন স্বামীর সঙ্গে বাস করতে এল। এসে দেখে কে এক মেয়ে রয়েছে তার স্বামীর ফ্ল্যাটে। তারপর সে এক বিশ্রী কাণ্ড! তপতী কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল দেশে। আঃ! কিছু মনে পড়ছে না তোমার? সেই যে কালো, লম্ব মতো মেয়েটি, আসত আমার কাছে?

মীনা বলে, হ্যাঁ মনে পড়েছে।

তাই শুনেই তো আমার কী ভয়! তোমার দাদাকে আমি কিছুতেই একলা ছাড়লাম না। বাবাঃ! ওইসব কাণ্ড হোক আর কি?

ছাড়লেও তোমার কোনও ক্ষতি হত না বউদি। সব মেয়ে কি একরকম হয়? জহুরীতে জহর চেনে যেমন, তোমার সুশান্ত চ্যাটার্জীদের মতো মানুষরাও তেমনি হয়তো...। কিন্তু এমন মেয়েও আছে যে কুড়ি বছরের মৃত সাথীর স্মৃতি বহন করে

বেড়ায়, যে দূর থেকে...।

নিশ্চয় তোমার নীনা?

শুধু নীনা নয়, এমন মেয়ে অনেক পাবে তুমি, তারাই সংখ্যায় বেশি। সুশান্ত চ্যাটার্জীর ফ্ল্যাটে ঘরকন্না করা মেয়েদের নীনারা ঘৃণা করে। ওরা অপাঙক্তেয়, দেশের মেয়েদের মনেও।

তাই তো হওয়া উচিত— কাবেরী বলে। মাতৃত্ব, প্রেম, ভালোবাসা, পবিত্রতা এসব জিনিস দেশে দেশে, কালে কালে চিরকাল একই, শাশ্বত। ওরা ফরসা, ওরা স্বাধীন, জীবনের সুযোগ-সুবিধা ওদের নিশ্চয়ই অনেক বেশি— কিন্তু বুকের মধ্যে কোমলতা যেখানে লুকোনো থাকে সেখানকার রূপটা একই। তোমার তবে কিছু উপকার হয়েছে মীনা? আর মনখারাপ হবে না তো?

না। আমার দুঃখ আমি এখন বইতে পারব বউদি।

যে সকাল থেকে ওদের যাবার তোড়জোড়, সেই সকালে এসে অমল বলে, তোর একটা ফোন এসেছে মীনা।

কে ? নিশ্চয় নীনা। দাদা, তুমি ওর গলা চিনতে পারলে না?

কেমন করে চিনব? এত দুর্বল স্বর...। আর কোনও পরিচয় দেয়নি তো।

ফোন ধরে মীনা বলে, নীনা?

হ্যাঁ মীনা। আজ যাচ্ছো তোমরা।

তোমাব যে আজ অপারেশান...। আসতে দিল ফোনে?

জোর কবে এসেছি। নার্স আছে সঙ্গে। মীনা কটায় তোমার প্লেন ছাড়বে?

আটটায়।

আটটায়! তখন আমি...। কে জানে জ্ঞান তখনও ফিরবে কিনা।

মীনা কেঁদে ফেলে। সে-শব্দ শুনে নীনা বলে কেঁদো না মীনা, ছিঃ।

মরব না আমি। রাত আটটার পরেই তোমরা মাঝ আকাশে উঠে যাবে, না?

হ্যাঁ, যদি ঠিকমতো প্লেন ছাড়ে...। আর তখন আমি বলব দাদাকে সেই কথাটা— আর তো কোনও ক্ষতির ভয় থাকবে না?

বলবে? আচ্ছা! বিদায় মীনা। আর কখনও কোনোদিনও দেখা হবে না জানি...।

দাদার সঙ্গে একটু কথা বলবে?

না না, থাক। কাবেরীকে, তোমার দাদাকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো। মীনা, ওরা আর কথা বলতে বারণ করছে...।

ফোন ছেড়ে দিয়ে ছড়ানো-ছিটোনো মালপত্রের আড়ালে বসে মীনা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল, অমল আর কাবেরী ব্যস্ত হয়ে রইল অন্য ঘরে।

এরোড্রামে এসেও নানা কলরবের মধ্যে, নানা ব্যস্ততা আর নাম ডাকাডাকি,

ঘোষণা আর ছুটোছুটির মধ্যে একটা সোফায় নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল মীনা। বাইরে বরফে সারা দেশটা সাদা হয়ে আছে। আরও বরফ পড়ছে। বিরাট ঠেলা দরজাটা ঠেলে ঠেলে কত যে লোক ভেতরে ঢুকছে, কত যে লোক বেরিয়ে যাচ্ছে— কোনও কিছুতে তার ঔৎসুক্য নেই। অমল আর কাবেরীকে ঘিরে তাদের বিদায় দিতে আসা বন্ধুরা কলরব করছে। মীনা তাদের ভদ্রতাসূচক শিষ্টবাণী জানিয়ে এসে চুপ করে বসে আছে। সে জানে এ অসম্ভব! তবু যতবার ঠেলা দরজা ফাঁক করে কোনও মেয়েকে ঢুকতে দেখছে ওমনি সে চমকে উঠছে।

বিকেলে আসবার আগে অনেক আগে অনেক চেষ্টা করেছিল সে হাসপাতালে ফোন করতে, কানেকশান পায়নি। ভীষণ ব্যস্ততা। তারপর তাকে চলে আসতে হয়েছে এরোড্রামে।

বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অমল একবার এগিয়ে আসে কাছে, মিনু, শরীর খারাপ লাগছে নাকি রে? এমন বিমর্ষ হয়ে গেলি কেন? চল, আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবি।

আমি হাসপাতালে একটা ফোন করব দাদা। নীনার অপারেশান আজ। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেছিলেন সিরিয়াস অপারেশান।

ইস্, আয় আমার সঙ্গে। নম্বরটা দে!

ছোট্ট কাচের ঘরটার মধ্যে ঢুকে ডায়াল ঘোরাতে থাকে অমল, কাচের দরজার ওপাশে তার ঠোঁট নড়ে শুধু, তারপর দরজা ঠেলে একসময় সে বেরিয়ে এসে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে— অপারেশান হয়ে গেছে রে মিনু, কিন্তু এখনো জ্ঞান ফেরেনি।'

ওরা কী বললেন? ভয় নেই তো কিছু, দাদা?

না রে ভয় নেই। এদের কাছে প্রতিটি প্রাণের দাম যে কী তা তো তুই নিজেই দেখেছিস। নীনাটা কী যে ভালো মেয়ে...! যতদিন একসঙ্গে কাজ করেছি কত রকমেই যে সাহায্য করেছে আমাকে! একদিন শুনলাম ও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেছে। এত যে সিরিয়াস...! কখনও দেখতেও যাইনি একদিন।

নীনার একটা কথা তোমাকে বলব দাদা।

আমাকে? কী কথা রে?

সে এখন না। যখন মাঝ আকাশে উঠে যাব আমরা, যখন আর কোনও ক্ষতির ভয় থাকবে না— তখন। তুমি আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো।'

একটু ব্যথিত, একটু অন্যমনস্ক হয়ে অমল আস্তে আস্তে মীনার সঙ্গে ফিরে আসে, বন্ধুদের সঙ্গে কথাও বলে কিন্তু আর সে হাসতে পারে না। কাবেরী বলে, দেখেছো। এই শুরু হয়ে গেছে কিন্তু বিবাদ। তুমি না বলেছিলে যাবার সময় হাসি মুখে বিদায় নেবে এই হাসিমুখ দেশটার কাছ থেকে? বলে সেও বিষণ্ণ হয়ে যায়।

বন্ধুদের চোখগুলো ছলছল করে। সমস্ত পরিবেশটা কেমন অন্যরকম হয়ে মোটা কাচের দরজাটার ঝাপসা গায়ের মতো হয়ে যায়। তারই মাঝে মাঝে ওদের তিনজনের নাম ধরে ঘোষকের ডাক। প্লেন ছাড়বার সময়ের নির্দেশ। সবকিছু তালগোল পাকিয়ে, আলোয়, ব্যস্ততায়, কথায়, দীর্ঘনিঃশ্বাসে আর নীরবতায় যেন এক ব্যূহ রচনা করে। একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত বন্ধুরা আসতে পায়, তারপর দূর থেকে তারা কেবল হাত নাড়ে এরোপ্লেনটা রানওয়ে না ছাড়া পর্যন্ত। প্লেনের মোটা কাচের জানালায় চোখ লাগিয়ে যতদূর পর্যন্ত ওদের দেখা যায় দেখে কাবেরী আর অমল। মীনা তাকিয়ে থাকে সাদা বরফ-ঢাকা মাঠ-প্রান্তর আর আলো-জ্বলা শহরটার দিকে। এর কোথায় কোন প্রান্তে নীনা? সেই শিশুর মতো চঞ্চল চোখে, চোখমুখ ঢাকা লাল চুলে, সাদা বরফের মতো নিটোল মুখে যে মীনার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল। কোন এক অন্ধকারের রাজ্যে বিচরণ করছে তার সত্তা?

বিরাট আলো-জ্বলা শহরটা পিছনে রইল পড়ে। বাতাসে ভেসে পড়েছে প্লেন। ক্রমে পায়ের তলে পড়ে রইল আলোর সমারোহ। পড়ে রইল বরফ কঠিন স্তব্ধতা আর গাম্ভীর্য।

কাবেরী জানলার কাছে বসবে বলে সামনের দিকের বিদেশি যাত্রীর পাশের সিটটা অমলের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে। প্রথম থেকেই সে দু'কানে তুলো গুঁজেছে শব্দের ভয়ে। বেল্ট দিয়ে নিজেকে বেঁধেছে সিটের সঙ্গে অমলের ঠাট্টা অগ্রাহ্য করে। তারপর কাচের জানলায় চোখ লাগিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একটা ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতায় প্লেনের ভেতরের যাত্রীরা কেউ সিটে মাথা দিয়ে পড়ে আছে, কেউ কেউ ম্যাগাজিন ওল্টাচ্ছে। মাঝে মাঝে এয়ার হোস্টেসের আনাগোনা, ধীর গম্ভীর গলায় যাত্রাপথের বর্ণনার ঘোষণা ভেসে আসছে।

এইবার আমরাও শহরের সীমানা পার হয়ে মাঝ আকাশে। অন্য সীমানার দিকে চলেছি। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই একটা হল্ট পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে। কী যে বলবি বলেছিলি মিনু, মনে করিয়ে দিতে বলেছিলি?

থাক, কী আর হবে বলে। মীনা চোখের জল মুছে গলার স্বরে ঔদাসীন্য আনল।

বললি যে তখন? মাঝ আকাশে উঠে বলবি?

বলছিলাম নীনাদের কথা। নীনা যেন ওর দেশের ভালোবাসা, পবিত্রতা, বন্ধুত্ব আর প্রাণের একটা প্রতীক হয়ে রইল। ও বাঁচবে না দাদা?

নিশ্চয় বাঁচবে রে। তুই বৃথাই ভয় পাচ্ছিস। ওরা কি নীনাকে মরতে দেয়?

জানো দাদা, নীনা তোমাকে...

ততক্ষণে কাবেরী দু'কানের তুলো খুলে ফেলেছে, কী এত গল্প করছ তোমরা দুজনে, আমি বুঝি শুনতে পাইনে?



শেষ সন্ধ্যা

সকালের বাতাস সারেঙ্গীর সুরে করুণ হয়ে উঠল। বিশ্রী দেখতে একটা যন্ত্র থেকে এক আশ্চর্য, মধুর, করুণ সুর তুলে তুলে তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে একেবারে মগ্ন হয়ে গেছেন নিমাইবাবু। অনেকক্ষণ ধবে তাঁর সেই আশ্চর্য সুরের সাগরে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ভাসিয়ে ভাসিয়ে তুলে যেন এক রুদ্ধ যন্ত্রণায় আমার বুকের ভেতরটা ভরে ভরে তুলতে লাগলেন।

এত বড়ো শক্তসমর্থ পুরুষমানুষ আমি। ব্যাবসা করে খাই। রুক্ষ নীরস গদ্যের জীবনে নিজেকে ঠেসে ঠেসে ভরে দিয়েছি চিরকাল। আজ সকালে এসেছিলাম নিমাইবাবুর কাছে, বাজনা শুনতে নয়, এসেছিলাম একটু বৈষয়িক কাজে। তখন তিনি ওই যন্ত্রটা নিয়ে পরম যত্নে ধুলো ঝাড়ছিলেন। একগাদা সরু সরু টেলিগ্রাফের তারের মতো অসংখ্য তার দেওয়া বেঁটে, কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রটাকে তিনি প্রায় বুকের কাছে তুলে পরিষ্কার করছিলেন এমন করে, মনে হচ্ছিল আদর করছেন।

কী যন্ত্র মশাই ওটা? কিম্ভূতকিমাকার দেখতে।

সারেঙ্গী।

ভারি পুরোনো হয়ে গেছে তো যন্ত্রটা। বাজান না মশাই শুনি— কখনো তো শুনিনি ও -বাজনা।

কচিৎ বাঙালিদের হাতে শোনা যায়— শুনবেন আর কি করে? বাঙালিরা সারেঙ্গী বাজায় না— এ লজ্জাই তো ভাঙতে গিয়েছিলাম খাঁ সাহেবের কাছে।

শেষ পর্যন্ত স্বীকার করিয়েছিলেন তো তাঁকে দিয়ে যে বাঙালিরাও পারে।

আমি তো শুনেছি সব যন্ত্রই বাজাতে পারেন আপনি— স্বীকার করিয়ে নেননি?

মুহূর্তের মধ্যে কেমন উদাসীন আর বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন নিমাইবাবু— কেমন করে জানাব বলুন? সে-কথা জানবার আর তো সময় হয়নি। বলে সারেঙ্গী তুলে নিয়েছিলেন কোলের ওপর আর আঙুলের গায়ে ঘষে ঘষে, অদ্ভুত প্রক্রিয়ায়, অদ্ভুত সুর বার করে শুনিয়েছিলেন আমাকে। সত্যি কথা বলতে কী, আমি সুর, তাল, লয়-এর মানে কিছু বুঝি না— তবু সে-সুরে যেন কী ছিল! যেন মনে হচ্ছিল কেউ একজন মনের সমস্ত প্রেম, ভক্তি আর প্রার্থনায় নিজেকে নত করে দিয়েছে তার প্রিয়তমের কাছে। তার চোখের জল, শঙ্কা-সংকোচ সব সে বিসর্জন করে দিতে চাইছে কারও পায়ে। না না, এসব আমি কিছু ভেবে বলছি না, আমার কোনও কবিত্বও জাগেনি— তবু সেই ঝরে-পড়া সুরের মধ্যে এ জিনিস আমি যেন স্পষ্ট অনুভব করলাম, করে আমি বিষাদে, বেদনায়, করুণায আর সহানুভূতিতে অন্য মানুষ হয়ে যেতে লাগলাম। কী যে বলতে এসেছিলাম নিমাইবাবুকে তা আমি আর মনে করতে পারলাম না। আমার তখন সব অন্য অন্য কথা মনে পড়তে লাগল, অন্য অন্য ইচ্ছে জাগতে লাগল। আর তখনই দীর্ঘ করুণ একটা টান শেষ করে সারেঙ্গী থেমে গেল। কিন্তু থেমে যাওয়ার পরেও নিমাইবাবু যেন আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। মনে হল কী এক দুঃখের পাথারে তিনি এখনও ডুবে রয়েছেন। ম্লান, বিষণ্ণ, উদাস একটা সংকেতে ঠোঁটের কোণটা কুঁচকে আছে। যেন স্বগতোক্তি করছেন, এই সুরটাই শেষ দিয়েছিলেন তিনি।

শেষ মানে? বেশিদিন শেখেননি বুঝি?

সময় আর পেলেন কোথায় যে শেখাবেন? যা অহংকার ছিল। ঠিক অহংকারীর গর্ব নিয়েই একদিন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কেবল যন্ত্রটা পড়ে ছিল আমার জন্যে।

কী ব্যাপার মশাই? রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন। কিছু কাণ্ড-বাণ্ড বুঝি?

হ্যাঁ, সে অনেক কাণ্ড। সে-কথা শুনলে আপনার দিন খুব খারাপ হয়ে যাবে বিনয়বাবু, বিশ্রী হয়ে যাবে মনটা। কী দরকার মশাই ওসব শুনে।

না না, বলুন। এই আমি বসলাম লেপ্টে, না শুনে উঠছিনে।

খানিকটা স্তব্ধ হয়ে রইলেন নিমাইবাবু, তারপর স্মৃতির পাতা ওল্টাতে লাগলেন আপনমনে :

আমার তখন বয়স অল্প। সাত বছর বয়স থেকে গান, সেতার, বীণা, এস্রাজ সবগুলোর দরজায় ঘুরছি। জীবনে অন্য কোনও চিন্তা নেই, ভাবনা নেই। যে কাকা আমাকে মানুষ করেছেন তাঁর কেবল একই আকাঙ্ক্ষা আমাকে সত্যিকারের শিল্পী করে তোলার। তিনি বেঁচে থাকতে তাই আমার একটাই মাত্র কাজ ছিল, দিনে আঠারো ঘণ্টা রেওয়াজ করা। আর কিছু ভাবনা আমার ছিল না, করতামও না।

কিন্তু সেই শিল্প একদিন যে আমার পেশায় দাঁড়াবে আমিও আগে ভাবিনি, কাকাও কখনও ভাবেননি। কাকা মারা যাবার পর স্ত্রী, পুত্র নিয়ে দায়িত্বের বোঝা টানতে গিয়ে আমি পেশাদার হয়ে গেলাম। পথে বসব না জানতাম, বরং পথের লোকেরা আমার বাজনা শুনে ঘরে উঁকি দিয়ে যেত। কলকাতায় এসেছি— অনেক তখন রোজগার, অনেক ছাত্র। তারা নানা জনে নানা বিদ্যা আহরণ করে আমার কাছ থেকে, কেউ প্রয়োজনে, কেউ অপ্রয়োজনে। কেউ দু-দিন পরে চলে যায় ধৈর্য রাখতে না পেরে, কেউ ধৈর্য ধরে টিকে থাকে।

নিজের ঘরভরা যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে গর্ব হয়, আনন্দ হয়, আবার কী এক অভাববোধ মনকে পীড়িত করে। সে হচ্ছে শিল্পীর অসন্তুষ্টি। একদিন একটি ছাত্রের কথায় সে অসন্তোষ প্রকাশিত হয়ে পড়ল। সে বললে, আমার এক বড়োলোক বন্ধু সারেঙ্গী শিখতে চায় মাস্টারমশাই। ওকে নাকি কোন অবাঙালি বন্ধু ঠাট্টা করে বলেছে, বাঙালিদের সারেঙ্গীতে এতটুকু নাম নেই। ওটা অবাঙালি মুসলমানদের একচেটিয়া। আপনার কাছে...।

শুনে আমার ভারি ক্ষোভ হয়েছিল সেদিন, বলেছিলাম, ঠিক আছে। তাকে ঠিক ছ-মাস পরে আমার কাছে এনো। শেখাব তাকে সারেঙ্গী।

তারপরে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম ভালো সারেঙ্গীর গুরু। চিৎপুরের বাজনার দোকানগুলোতে, কিছু জানাশোনা লোকজনকে অনবরত জিজ্ঞেস করতে করতে অবশেষে একদিন খোঁজ পেলাম। ওরা বললে, আপনাকে যেতে হবে তাঁর কাছে। যদি তাঁর সাকরেদদের হাত ছাড়িয়ে আর্জিটা একবার পেশ করতে পারেন, যদি কোনওমতে মন গলাতে পারেন তাঁর, তবে হয়তো শেখালেও শেখাতে পারেন। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন? অনেক টাকাতেও শেখান না? তবে তাঁর পেশা কী?

টাকা? ওরা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পেশা? সে-কথাতেও হাঁ করে রইল— যেন আমি আরব্য উপন্যাসের গল্প শোনাচ্ছি ওদের, যেন ওরা এসব কথা জীবনে শোনেনি। মুচকি হেসে, মেহেদী দেওয়া দাড়িতে হাত বুলিয়ে তারা বললে, যান। গেলেই বুঝতে পারবেন।

গেলাম খুঁজে খুঁজে। বউবাজারের গলির মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির দরজার কড়া নাড়লাম। ভেতর থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো যন্ত্রের সমস্বর একঘেয়ে নাকি সুরের মধ্যে প্রথমবারের কড়ানাড়া গেল ডুবে। বিরক্ত হয়ে আবার জোরে জোরে কড়া নাড়লাম। মনে হল একজন কেউ উঠে দরজার কাছে এসেছে। বাকি যন্ত্রগুলো আর্তনাদ করেই চলেছে সেই এক সুরে সা রে গা মা পা ধা নি। সেই যে আমার সেতারের গুরু বলতেন এক সাধে তো সব সাধে অর্থাৎ এক সা রে গা মা পা ধা নি-তেই যদি হাত পাকাতে পারে তো বাকিগুলোর জন্য ভাবনা নেই। আর যা করতে গিয়ে আঠারো ঘন্টা রেওয়াজে কতদিন চোখের জল পড়েছে, ধৈর্য

হারিয়েছি, এরা দেখছি সেটি আশ্চর্যরকম আয়ত্ত করেছে।

যে দরজা খুলে দিল তার এক হাতে তখনও সারেঙ্গী ধরা। লম্বা-চওড়া শরীর কিন্তু শিশুর মতো সবল মুখ, ছোটো ছোটো চোখ। সে দরজা খুলে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘরের মধ্যে ঢুকে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেই একটানা সা রে গা মা পা ধা নি শুনতে শুনতে যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে ভাবছি পালাই, তখন ওদের মধ্যে একজনের বোধহয় দয়া হল, বললে, বৈঠিয়ে বাবুজি।

সারা ঘরখানায় কোথাও বসার জায়গা নেই। ঘরের এককোণে শুধু ভাঙা একটা প্যাকিং বাক্স উপুড় করা। তার ওপর বসে সে যন্ত্রে আঙুল ছোঁয়ানোর আগেই কথা বলে উঠলাম, ইমতাজ খাঁ সাহেবের সঙ্গে আমি একটু দেখা করতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি দু-কানে হাত দিল, দিয়ে হাসল, বললে, তিনি তো ওপর থেকে এখন নামবেন না বাবুজি।

কখন নামেন তিনি?

সে অনেক দেরি।

কত দেরি? আমি না হয় অপেক্ষা কবব।

আজ তো কিছুতেই হবে না।

তবে কবে হবে বলুন, আমি সেইদিনই আসব।

লোকটি তবু চুপ করে আছে। নিশ্চয়ই কোনও দুষ্টুবুদ্ধি আছে ওর মনে। আমাকে যারা বলেছিল যদি সাকরেদদের হাত ছাড়িয়ে একবার তার কাছে পৌছতে পারেন... —তার অর্থ এখন বুঝতে পারলাম।

সে বললে, বাবুজি, খাঁ সাহেব তো এখন আর কাউকে শেখান না।

না শেখান। তবু একবার দেখা করতে চাই আমি।

নাছোড়বান্দার মতো বসে রইলাম। লোকটি খানিক চুপ করে রইল, তারপর বললে, আজ আপনি যান বাবুজি। তিনদিন বাদে আসবেন। আমি বলে রাখব তাঁকে। যখন নীচে নামবেন তখন দেখা হবে।

আমার তবু উঠতে ইচ্ছে নেই। ভাবলাম গল্প করে করে লোকটিকে খুশি রাখি, পরে কাজে লাগবে। আপনারা সবাই বুঝি খাঁ সাহেবের দেশের লোক? গায়ে পড়ে আলাপ করছি।

হ্যাঁ বাবুজি।

সবাই বুঝি এ বাড়িতে থেকে কাজকর্ম করেন কোথাও?

আমাদের কথা বলা দেখে অন্য লোকগুলি তাদের যন্ত্র থামিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমার প্রশ্ন শুনে শিশুর মতো সরল গলায় হেসে উঠল

কয়েকজন, কাজকর্ম আবার করব কী? সারেঙ্গী বাজাই— এই তো কাজ।

তবে চলে কী করে আপনাদের?

ওরা আবার হেসে উঠল, বাঈ থাকতে, ওস্তাদ থাকতে ওদের আবার চলার ভাবনা।

তবে যে বললেন উনি কাউকে শেখান না। এই যে আপনারা দশটা লোক যন্ত্র নিয়ে শিখছেন, কে শেখান তবে?

উনি, উনি হাতে ধরে শেখান না। আমরা রাত তিনটে থেকে উঠে বেলা একটা পর্যন্ত এমনি করে সা রে গা মা বাজিয়ে যাই, যাব— মাসের পর মাস। উনি যেমন আমাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটা অনায়াসে করে দেন, তেমনি একদিন অনয়াসে এসে নতুন একটা গৎ দিয়ে যান। কিন্তু যতদিন না দেবেন ততদিন এমনি চলবে... ভীষণ কষ্টের বাবুজি। আপনার তাগদ বরবাদ হয়ে যাবে।

মনে মনে বুঝলাম ওরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। রাত তিনটেয় উঠে আর মাসের পর মাস সাধনাতেও যদি ওদের তাগদ অটুট থেকে থাকে তবে আমার তাগদও থাকবে। কিন্তু আজ ওবা আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হতে দেবে না এটা নিশ্চিত। সুতরাং আজ আমাকে যেতে হবেই।

যে লোকটি তিনদিন পরে আমাকে আসতে বলেছিল তাকে বললাম, তিনদিন পরে নয় ভাই। আমি কাল, পরশু রোজ আসব। আপনি একটু বলে রাখবেন আমার কথা।

তার পরদিন যথাসময়ে গেলাম, গেলাম তার পরদিনও। কিন্তু সেই একই অবস্থা রোজ। সেই সমবেত যন্ত্রসংগীত, সেই মুচকি হাসি, সেই ফিরিয়ে দেওয়া।

তৃতীয় দিনের দিন অবস্থাটা একটু পালটেছে মনে হল। কড়া নাড়তে গিয়ে দেখি দরজাটা খোলাই রয়েছে, ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। সেই সা রে গা মা পা ধা নি— বেজেই চলেছে, কেবল বসবার জন্যে সেই উলটানো প্যাকিং বাক্সটা রযেছে। ঘরের মাঝখানে এসেছে ছোট্ট একখানি তক্তাপোশ, তার ওপর ঘন লাল রঙের একখানি জাজিম পাতা। ওরা আজ সবাই যন্ত্র থামিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকাল। আজ আর সেই অবহেলাভরা মুচকি হাসি নেই, ভারি প্রাণখোলা ডাক ভেসে এল, আইয়ে বাবুজি, বৈঠিয়ে। আমাকে ওরা বসতে ইঙ্গিত করছে তক্তাপোশের ওপর।

যে লোকটি প্রথম দিন আমার সঙ্গে কথা বলছিল সে আজ বললে, আজ ওস্তাদজির সঙ্গে দেখা হবে বাবুজি।

ওরাও সকলে মাথা নেড়ে সমর্থন করে ডুবে গেল নিজেদের সাধনায়। সেই লোকটিও বাজাতে লাগল মাথা নিচু করে, একসময় তার আঙুল আবার থেমে গেল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা সে বুঝে নেবার চেষ্টা করলে,

তারপর গলা নামিয়ে বললে, বাবুজি, এই যে তিনদিন ধরে আপনি কষ্ট পেলেন এতে আমাদের কোনও স্বার্থ নেই।

কথাটা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি দেখে সে বললে, বুঝলেন না বাবুজি। ওটা ওস্তাদেরই আদেশ। একদিন, দুদিন, তিনদিন ধরেও যে ধৈর্য রাখতে পারে তাকে দেখা দেন তিনি। যাদের ধৈর্য নেই তারা আর আসে না। আপনি আমার পরীক্ষায় পাস করেছেন বাবুজি।

এইবার শেখাবেন তো আমাকে? পাশের যন্ত্রটাকে কোলের ওপর তুলে নিই।

শেখাবেন কিনা সে তাঁর মর্জি। আমার কাছে আপনি পাস। গুরুজির কাছে আরও পরীক্ষা আছে...।

হঠাৎ সারেঙ্গীগুলো থেমে গেল, ঘরের সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, সিঁড়িতে খড়মের শব্দ করে কেউ একজন নেমে আসছেন। খালি গা, কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং, প্রৌঢ় এক সৌম্য চেহারার মানুষ। কাঁধের ওপর একখানা তোয়ালে ফেলে নেমে এসে কোনওদিকে না তাকিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ওদিকে কোথায় যেন চলে গেলেন। জল ঢালার শব্দ পেলাম, বুঝলাম স্নান করতে নেমেছেন তিনি।

ওরা ততক্ষণে ঘরের সঙ্গে লাগানো বাবান্দায় মস্ত একটা উনুন কোথা থেকে টেনে এনে রাখল, তার ওপর চাপানো একটা উৎসব বাড়িব রান্নাব হাঁড়ি।

মাথা মুছতে মুছতে স্মিত প্রসন্নমুখে তিনি এসে দাঁড়ালেন ঘরের মাঝখানে। ওদের মধ্যে দুজনে মিলে পাশের কোনও একটা ঘর থেকে বয়ে নিয়ে এল একটা কাঠের মন্দিরের মতো জিনিস। ঘরের মাঝখানে রাখল। সামনে পেতে দিল একটা আসন। সে-মন্দিরে কী আছে দেখবার জন্যে একটু উঁকি দিলাম আমি চেষ্টা করে, দেখি, কিছু নয়—একপাশে একটি কালীর ফোটো, আর একপাশে পাথরে গড়া ছোটো একটি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। তারই সামনে চুপ করে বসে আছেন তিনি। একখানা বড়ো কাঠের থালায় হাঁড়িতে যা সেদ্ধ হচ্ছিল তারই খানিকটা রেখে দিল ওদেরই একজন কেউ। দেখি, তা এক ধরনের খিচুড়ি— চাল, ডাল, ঘি, বাদাম, পেস্তা মেশানো খাদ্য। লম্বা একটা হাতা দিয়ে তা থেকে একটু প্রসাদ প্রথমেই তিনি অনায়াসে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন কথা না বলে, হাত পেতে গ্রহণ করলাম আমি, খেলাম। তারপর ওরা প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করল তাঁর হাতের দেওয়া প্রসাদ, আবার সরে গেল কাঠের মন্দিরটা।

এতক্ষণে চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে, সেই স্মিত হাসি নিয়েই উঠে এসে আমার পাশে বসলেন, আপনার কথা শুনেছি। রোজ এসে ফিরে গেছেন। তার মানে গরজ আছে খুব। তারপর মুখের সেই হাসি মিলিয়ে গিয়ে একটা

কাঠিন্য, একটা রূঢ় জিজ্ঞাসার ছাপ ফুটে উঠল, সারেঙ্গী শিখতে চান কেন? আরও তো কত যন্ত্র আছে? এ বড়ো তখলিফের ব্যাপার, এ আপনি পারবেন না বাবুজি।

পারব ওস্তাদজি— আপনি যদি মেহেরবানী করেন একটু...।

গানবাজনা এর আগে কিছু করা অভ্যাস আছে?

আমি সতর্ক ছিলাম সে-কথা স্বীকার করব না বলে, তাহলে হয়তো কিছুতেই শেখাতে রাজি হবেন না উনি। বললাম, না, কোনও অভ্যাস নেই, সামান্য সুরবোধ আছে, সারেঙ্গী শেখারই আমার খুব ইচ্ছে।

আমার মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি, একটু হাসলেন কী ভেবে। আমার সত্যিকার পরিচয় ধরে ফেললেন নাকি?

না, কোনও কথাই তুললেন না সে-সম্বন্ধে, গম্ভীর হয়ে অন্য কথা বললেন, কোনও ওস্তাদের কাছে শিখতে হলে আগে নাড়া বাঁধতে হয় জানেন?

শুনেছি, কখনও বাঁধিনি। বলুন আমাকে সেজন্যে কী করতে হবে?

সোনা, চাঁদি আব অন্য অনেক জিনিস লাগবে। শ রূপেয়া খরচ লাগবে আপনার।

সে-খরচ আমি নিশ্চয়ই দেব। আমি টাকা দিয়ে দেব, আপনি আয়োজনটা করে দিন।

একটু গম্ভীর হয়ে আবার কী ভাবলেন, বললেন, সপ্তাহের দুদিন করে শেখাব আমি। প্রতিদিনের জন্যে পঁচিশ টাকা করে লাগবে— পারবেন দিতে?

আমাকে কি উনি পরীক্ষা করছেন? কেমন জেদ চেপে গেল, বললাম, পারব নিশ্চয়ই। বেশি হলেও পারব।

খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, বাবুজি, আপনি করেন কী?

একটা ঢোক গিললাম আমি। মিথ্যে কথা বলতে বুকের ভেতরে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল, তবু বললাম, ব্যাবসা করি।

কী বুঝে হাসলেন একটু— কে জানে কেন! উঠে দাঁড়ালেন, বেশ, এরপর যেদিন ইচ্ছে আপনার আসবেন— নাড়া বাঁধতে। তারপর শেখাব।

কালই একশো টাকা দিয়ে যাব আমি। পরশু থেকে শিখতে চাই।

কাল। পরশু। আচ্ছা! মনে হল মুখ টিপে ওঁর সাকরেদদের মতো উনিও মুচকি হাসছেন। উনি কি ভেবেছেন টাকার জন্যে আমি পিছিয়ে যাব? আমার তখন আয় মাসে হাজার দেড়েক। সামান্য কটা টাকার ভয় দেখিয়ে উনি কি আমাকে ভয় পাওয়াতে চান?

একশো টাকা পরদিন গিয়ে দিয়ে এলাম সাকরেদদের হাতে।

তার পরদিন গেলাম তাঁরই নির্দেশমতো। আজও দরজা ভেজানো ছিল। ঘরে

ঢুকে দেখি ঘর শূন্য, তক্তপোশের ওপর আজ সাদা চাদর পাতা, দু-পাশে দুটো তাকিয়া পড়েছে, ইমতাজ খাঁ বসে বসে পান খাচ্ছেন। পাশে আর একটা সারেঙ্গী, তার ওপর আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছেন আপন মনে।

আমি যেতেই আজ ভারি প্রাণখোলা হাসি হাসলেন, আইয়ে বাবুজি। টাকা কটি পায়ের কাছে রেখে বসলাম পায়ের কাছে। উনি গুরু, আমি শিষ্য— অন্য কিছু আমার মনে পড়ল না, কারণ শিল্পীর জাত নেই । উনি হাত ধরে আমাকে পাশে বসালেন, টাকাগুলো তেমনি রইল পড়ে, একবার ফিরেও তাকালেন না, তুলবার চেষ্টাও করলেন না। সারেঙ্গী ধরা শেখাতে লাগলেন আমাকে। শিখবার প্রক্রিয়াটা দেখালেন। কঠিন সে প্রক্রিয়া। আমি এতগুলো যন্ত্র বাজাই কিন্তু কোনও যন্ত্র শিখবার এমন অদ্ভুত প্রক্রিয়া আমি জানি না। সুর বেঁধে দিলেন। সব আমি অবোধ শিশুর মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, কারণ আমি যে কিছুই জানি না।

আজ এই পর্যন্ত বাড়িতে অভ্যেস করে কালই আসবেন। খুব কঠিন জিনিস, ধৈর্য রাখতে পারলে তবে...। বলে উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেলেন আস্তে আস্তে। টাকাগুলো তেমনি পড়ে রইল তক্তপোশের ওপর। আমি রাস্তায় নেমে এলাম।

বাড়িতে গিয়ে সারেঙ্গী সাধতে বসে আমার প্রায় কান্না পেয়ে গেল। এ কী প্রক্রিয়া! জানি সারেঙ্গী বাজাতে হয় আঙুলের উলটো পিঠে ঘষে ঘষে। কিন্তু আমার গুরু যা দিয়েছেন সেরকম প্রক্রিয়ার কথা জীবনে শুনি না, জানি না। আঙুলগুলো জ্বালা করতে লাগল, ঘষায় ঘষায় ছাল উঠে গেল, কিন্তু কী যে জেদ চেপেছে। অন্য সব ঘরভরা আয়োজনকে আমার এ জেদের কাছে তুচ্ছ মনে হতে লাগল। মনে হল, কত সহজে এসব শিখেছি আমি, তার তুলনায় কত কঠিন এ সাধনা। কিন্তু সত্যিই এত কঠিন, নাকি আমাকে পরীক্ষা করছেন উনি? ওর সাকরেদদের সেই গা-জ্বালানো মুচকি হাসি মনে পড়তে লাগল। ওঁর সেই সন্ধানী চোখ দুটোর দৃষ্টির কথা মনে পড়তে লাগল আর প্রতিজ্ঞায় আমি দৃঢ় হয়ে উঠতে লাগলাম। ওই মুচকি হাসিকে আমি বিস্ময়ে পরিণত করব।

সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়াকেই আয়ত্ত করে নিয়ে পরদিন আবার গেলাম টাকা নিয়ে। ঠিক তেমনি খালি ঘরে চুপ করে বসে আছেন তিনি। আমাকে ঢুকতে দেখে হয়তো সামান্য বিস্ময় ফুটে উঠল তাঁর চোখে, কিন্তু পরক্ষণেই হাসি দিয়ে তা তিনি মুছে ফেললেন। তেমনি টাকা রইল পড়ে, বললেন, বাজান। বাজালাম। সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়াতেই যতটা আয়ত্ত করতে পেরেছিলাম শোনালাম তাঁকে। দু-চোখের বিস্ময় এবার স্থায়ী হয়ে রইল, বললেন, আপনি পারবেন বাবুজি। এইভাবে সারেঙ্গী বাজানোর নিয়ম নয়। আমি আপনার ইচ্ছেটা পরীক্ষা করার জন্যে এ

উপায় দিয়েছিলাম। বাবুজি আপনি তো অদ্ভুত। তাই ঠিক করে নিয়ে এসেছেন! পিঠের ওপর হাত রাখলেন, যেন আদর করে। তারপর সত্যিকারের প্রক্রিয়াটা দিলেন শিখিয়ে। অনেক বাজনা-শেখা হাতে সেটা আমার কাছে এতটুকু কঠিন মনে হল না। আশা হল পরীক্ষার পালা তাঁর শেষ হয়েছে হয়তো।

মাসখানেক এমনিই চলল। নিয়মিত যাই, শিখি। সেই তিনি তেমনি অপক্ষা করে থাকেন অমার জন্যে, সেই তেমনি টাকাগুলো তক্তপোশে পড়ে থাকে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে উঠে চলে যান।

সেদিনও যথাসময়ে গেছি। গিয়ে দেখি ঘবের চেহারা আবার আগের মতন। সেই তেমনি উলটানো প্যাকিং বাক্স, তেমনি দশটা যন্ত্রের একটানা সা রে গা মা পা ধা নি। শুনলাম ওস্তাদজি মুজরায় গেছেন, বেনারস না লক্ষ্ণৌ কোথায়।

কবে ফিরবেন?

ঠিক নেই। সাতদিন হতে পারে, একমাস হতে পারে, তিনমাস হতে পারে।

নাড়া বেঁধেছি। এসেছি শিখতে। টাকা তো ওঁর নামেই আনা। টাকাগুলো আমি সাকারেদদের মধ্যে একজনকে দিযে এলোম।

এমনি চলল সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস। যখনই যাই, শুনি, এখনও ফেরেননি তিনি। কবে ফিরবেন তা ওরা জানে না। নিয়মিত দিনে গিয়ে টাকাটা রেখে আসি, ওরা তেমনি মুচকি হাসে।

এমনি করে তিনমাস কেটে গেছে। আমি ক্লান্ত, বিষণ্ণ হয়ে পড়েছি নির্দিষ্ট দিনে সারেঙ্গী ঘাড়ে বয়ে বয়ে। অনেক ছাত্র ছেড়ে গেছে আমাকে দিনের পব দিন সময়মতো না পেয়ে।

আজও গিয়েছিলাম— শেষবারের মতো। ভেবেছিলাম আজও যদি তিনি না ফিরে থাকেন তবে আর যাব না। এই শেষ!

সেদিন খুব সকাল সকাল গিয়েছিলাম, ভেজানো দরজা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। তেমনি সবাই বসে আছে সারেঙ্গী হাতে কিন্তু আজ ওরা বাজাচ্ছে না, কী এক আগ্রহে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। আমাকে দেখেই সমস্বরে বলে উঠল, আইয়ে বাবুজি, আইয়ে।

বুড়ো সারেঙ্গীওয়ালা উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আমার হাত ধরলে, তখ্‌লিফ্ আপনার শেষ হয়েছে বাবুজি। যান— ওপরে চলে যান।

ওপরে?

ফিরছেন তিনি তবে?

সে আবার মুচকি হাসল, সেসব বাতচিত তার সঙ্গে করবেন বাবুজি, লেকিন ওপরে আপনার ডাক পড়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অভিমানে, ক্ষোভে মন আমার ভরে তুলেছিলাম।

দেখা হলে কী বলব ওস্তাদজিকে তার মহড়া দিচ্ছিলাম— বলব, আমার আর শেখার ইচ্ছে নেই সারেঙ্গী। কিন্তু একটা জিনিস শিখে নিলাম— সে তোমাদের! তোমরা আসলে শিল্পী হলে কী হবে, নিজেদের অহংকার আর জাতের কৌলিন্য ছাড়তে পারনি আজও। না হলে অনর্থক এমন হয়রানি করে মানুষকে!

সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠতে উঠতেই ভারি সুন্দর গন্ধ পাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল যে কোনও মন্দিরে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে কারা পুজো করছে। ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, চন্দনের গন্ধে সকালবেলার আলো-বাতাস যেন ভরে উঠেছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপটা অতিক্রম করে বারান্দার মুখে দাঁড়িয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। দেখি রেলিং-ঘেরা চওড়া বারান্দার একপাশে একটি সাদা পাথরের মন্দির। তার মধ্যে অপূর্ব সুন্দর এক যুগলমূর্তি, রাধা আর কৃষ্ণ। রাধাকে কে যেন মনের মতো করে সাজিয়েছে— পরনে দামি পোশাক, পাথরের শরীরে নানা অলংকার, মাথায় তাঁর মুকুট— যেন বিজয়িনীর মূর্তি কৃষ্ণের নিরাভরণ মূর্তি, হাতে শুধু একটি রুপোর বাঁশি। আর তার সামনে দুটি আসনে দুজন মানুষ, একজন ওস্তাদ ইমতাজ খাঁ। অন্যজন—জানি না আমি তিনি কী! হিন্দু না মুসলমান, বাঙালি না অবাঙালি? ভেজা চুলের গোছা পিঠের ওপর ছড়ানো, গরদের একখানি শাড়ি কুঁচিয়ে পরা, রেশমি ব্লাউজ লম্বা হাতার।

আমাকে দেখে ওস্তাদজি ইসারা করলেন একটু, বুঝলাম বসতে বলছেন ঘরে।

নিরাভরণ অথচ পরিচ্ছন্ন একটি গালিচা পাতা ঘরে গিয়ে বসলাম। একপাশে পাখোয়াজ, আর একপাশে একটি তানপুরা নিয়ে দুটি মানুষ বসে আছেন।

কখন একটা মৃদু সুরের জালে আচ্ছন্ন হয়ে গেল চাবিধার, পাখোযাজ আর তানপুরার সঙ্গতের সঙ্গে। দুটি নারী-পুরুষের সাধনা করা শিক্ষিত গলার সুরে কী যে জাদু ছিল। কী যেন গাইলেন ওঁরা! মনে হল সামস্তোত্র, মনে হল কোনও পদাবলী, মনে হল কবীরের ভজন না হয় কোনও উর্দু প্রার্থনা। আমি সেসব তলিয়ে কিছুই বুঝলাম না। সুরের জালে আমি জড়িয়ে গিয়ে সম্মোহিত হয়ে গেছি।

সময় কেটে গেছে কোথা দিয়ে। ওস্তাদজি গান শেষ করে ঘরে এসে বসেছেন আর সেই দীপ্ত নারীমূর্তি নিশ্চয়ই ওস্তাদজীর সঙ্গিনী। হাসিমুখে আমার সামনে সুন্দর পাথরের থালায় রেখেছেন প্রসাদী, রেখেছেন শরবত। আমি নবাগত বলে আমাকেই প্রথম সংবর্ধনা জানালেন তিনি। সকালের আলো এসে তাঁর চোখে-মুখে পড়েছে, খোলা চুলে পড়েছে। পরে জেনেছিলাম ইনিই সেই বিখ্যাত রোসেনা বাঈ। থাক সে-কথা।

আস্তে আস্তে সব মোহ কেটে গেল। বাস্তবে ফিরে এলাম আবার। সেই

তেমনি স্মিত হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করছেন ইমতাজ খাঁ, বাবুজি ভালো আছেন?

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ক্ষোভ আর অভিমানে আমার যেন গলা বুজে এল, বললাম, শরীর ভালো আছে কিন্তু মন ভালো ছিল না ওস্তাদজি? তিনমাস পরে ফিরলেন আপনি। বেনারস গিয়েছিলাম মুজরায়, ওরা বলল?

হাসলেন আমার চোখে চোখে তাকিয়ে, ওদের ওইরকমই নির্দেশ যে দেওয়া ছিল।

কথার অর্থ বুঝতে না পেরে তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, এ বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যাইনি বাবুজি। জানি আপনি খুব দুঃখ পাবেন, রাগও হবে। কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় নেই। আমি আজকাল কাউকে শেখাই না কিন্তু আপনার ধৈর্য দেখে মায়া হয়েছে আমার। দুটো জিনিসের অভাব হলে মানুষ এ পথ ছেড়ে দেয়। আমি আপনাকে টাকার পরীক্ষা করেছি, দেখেছি টাকার জন্যে পরোয়া নেই আপনার। বাকি ছিল ধৈর্যের পরীক্ষা— তাতেও আপনি জিতেছেন। নইলে আমি আমার ঘরে ডেকে আনতাম না আপনাকে।

কথাগুলো ভারি মিষ্টি। কখনও হেসে, কখনও গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন কথাগুলো, কিন্তু আমার তখনও ক্ষোভ যায়নি। তখনও অভিমানের একটা সূক্ষ্ম জাল আমাকে আচ্ছন্ন করে ছিল। তারই ঝোঁকে কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে, আমি কিন্তু রোজ এসে পঁচিশ টাকা করে দিয়ে গেছি আপনাকে— ওদের হাতে। যা আপনি বলেছিলেন।

রুপেয়া। একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে, সমুচা লে যাইয়ে আপ্। উঠে ঘরের একটা কোণ থেকে ছোট্ট একটা রেশমি থলি বার করে আমার পায়ের কাছে রাখলেন, এ টাকা যাবার সময় আপনার হাতে দিতাম। কথাটা ওঠালেন তাই। এ পর্যন্ত যা টাকা দিয়েনে সব আছে ওর মধ্যে। টাকার জন্যে আমি শেখাই না বাবুজি।

ইস্! লজ্জায়, অপমানে নিজেকে বিকৃত মনে হতে লাগল। হঠাৎ ওঁর দুটি হাত ধরলাম আমি। তখন অন্য একভাবে চোখ আমাব ছলছলিয়ে উঠেছে, অন্য আর এক আশঙ্কায় গলা বুজে আসছে, বললাম, ওস্তাদজি। তাহলে আপনি কি আমাকে বিদায় করে দিচ্ছেন? আমি যদি কোনও অপরাধ করে থাকি আমাকে ক্ষমা করুন।

আরে ছিঃ ছিঃ! দুহাতে আমাকে প্রায় আলিঙ্গন করলেন তিনি, রাগ তো আমি করিনি। বরং কত তখ্‌লিফ্ আপনাকে আমি দিয়েছি এই তিনমাস ধরে— আপনি বরং আমাকে ক্ষমা করে দিন বাবুজি। আজ থেকে আমরা দোস্ত। কাল থেকে রোজ আপনি আসবেন। কোনও এত্তেলা লাগবে না। এই ওপরে, সোজা উঠে আসবেন, আমি না থাকি আপনার বহিন রোসেনা থাকবে। দরকার মতো ও

আপনাকে নতুন পাঠ দিয়ে দিতে পারবে।

তবু সেই অর্থের প্রশ্ন আমার মন থেকে যায় না। মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করি, কী দেব আপনাকে?

কী আবার? যদি কিছু দিতে চান দোকান থেকে ভালো জর্দা দেওয়া দু-খিলি পান।

না, না। হেসে ফেললাম, আদান-প্রদান না থাকলে কেমন লাগে যে।

বেশ মাসে পাঁচ টাকা দেবেন, যদি মন না শোনে। টাকা নিয়ে কী করব আমি? খাই তো নিরামিষ, রোসেনা আর আমি একটা মুজরা নিই বছরে— বছর চলে যায়...।

সারেঙ্গীর প্রয়োজনীয় তত্ত্ব, গৎ শেখাতে লাগলেন। অন্য যন্ত্রে যার আঙুল অভ্যস্ত, এসব শেখা তার কাছে নতুন নয়। তবু মিথ্যে যখন বলেছি তখন বোকামির ভান করতেই হবে। উনি কিন্তু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন, বারেবারে তাকাতে লাগলেন আমার আঙুলের দিকে।

সেদিনকার মতো শেখানো হয়ে গেলে বললেন, বসুন বাবুজি, গান শুনবেন? শুনবেন আমার সারেঙ্গী?

বিহ্বল খুশিতে মাথা নাড়লাম আমি। তখন রোসেনা বাঈ এসে আসরে বসলেন। পাখোয়াজে তাল পড়ল, তানপুরার সুর চড়ল, সারেঙ্গী তুলে নিলেন খাঁ সাহেব আর সুরের সুধাসাগরে ডুবে গেলাম আমি। ভৈরোর সুরে সারেঙ্গী বাজতে লাগল, গান চলতে লাগল।

তারপর একসময় রোদ এসে পড়ল ঘরে। সারেঙ্গী নিয়ে উঠে এলাম আমি। সমস্ত পথ যেন আমার কাছে সারেঙ্গীর একটানা সুরের মতো মনে হতে লাগল।

মাঝখানে একবার কয়েকদিনের জন্যে মুজরায় গেলেন ইমতাজ খাঁ রোসেনা বাঈকে সঙ্গে নিয়ে। সেই কটা দিন ছাড়া তার পরের একটা বছর ধরে আর কোনও ব্যাঘাত হয়নি শেখায়। আমি তাঁর কাছে আর শিক্ষার্থী ছিলাম না, হয়ে গিয়েছিলাম দোস্ত। আর রোসেনা বাঈ-এর ভাইয়া।

একদিন ধরা পড়ে গেলাম। রোজই যাবার আগে তাঁর বাঁধা সুরে সারেঙ্গী বেঁধে নিয়ে যাই। সেদিন ভুলে গেছি, বেঁধেছি আমার অন্য যন্ত্রের সুরের প্রক্রিয়ায়। সারেঙ্গীর ওপর ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটি দিয়ে একবার মাত্র স্পর্শ করলেন তারগুলো, তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বসে রইলেন গম্ভীর হয়ে। উচ্চকণ্ঠে পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, রোসেনা।

রোসেনা বাঈ বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন সামনে।

রোসেনা, তোমার ভাইয়াকে আর শেখাব না আমি।

সে কী? কেন? বড়ো বড়ো প্রশান্ত চোখ তুলে রোসেনা বাঈ বিস্মিত গলায়

প্রশ্ন করেলেন।

তোমার এই ভাইয়া একটা মস্ত মিথ্যুক। ওস্তাদকে ঠকিয়েছে? আমার কি শেখানো উচিত তুমিই বল?

তখনও জিনিসটা আমার বোধগম্য হয়নি। লজ্জায়, গ্লানিতে মাথা নিচু করে বসে আছি আমি। রোসেনা বাঈ দেখি খিলখিল করে হেসে উঠলেন, বললেন, বেশ তুমি না শেখাও, শেখাব আমি। ভাইয়া মাথা তোলো, কিচ্ছু লজ্জার ব্যাপার নয়।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ইমতাজ খাঁ বললেন, সত্যি কথা বল তো দোস্ত কটা বাজনা তুমি জানো? কত বছর ধরে গান শিখছো? আমি ধরতে পারিনি ভেবেছো? অনেকদিন আগেই ধরেছি।

এতক্ষণে সংশয় কাটল আমার। মাথা তুলে বললাম, হ্যাঁ, এই একটা ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে আমাকে। ভয় ছিল যদি না শেখান। তার জন্যে কী শাস্তি দেবেন দিন।

শাস্তি? কপট রাগের ভান করে, গলার স্বর গম্ভীর করে তিনি বললেন, তুমি সেতার শেখাবে রোসেনকে— এই তোমার শাস্তি। ওর নাকি এই মুসলমানী বাজনা সারেঙ্গীর চেয়ে সেতার বেশি ভালো লাগে। ও আজও ভুলতে পারল না যে আমি মুসলমান।

রোসেনা বাঈ একটুখানি লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলেন, তারপর বললেন, যাই ভাইয়ার জন্যে পান নিয়ে আসি। নাড়া বাঁধব মিষ্টি পান দিয়ে।

ইমতাজ খাঁ সাহেব সেই চলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যেন স্বগতোক্তি কবতে লাগলেন, তুমি কি আমাদের এই জীবনকে ঘেন্না করো দোস্ত?

না তো। ঘাড় নাড়লাম আমি।

না, তোমরা ঠিক এভাবে হয়তো দেখতে অভ্যস্ত নও। কী করব— উপায় নেই। তোমাদের এই রোসেনা বাঈ এর নাম ছিল পুতুল। এক বিধবা হিন্দু ঘরের বিধবা। অল্প বয়সের লোভানিতে ভুলে যে পুরুষটির সঙ্গে ও বাইরে বেরিয়ে এসেছিল সে কেবল বাইরের জগতে ওকে আছড়ে ফেলে দিয়ে গেল। কেউ ওকে আর তুলে নিল না। ও কেমন করে কবে হাতবদল হয়ে হয়ে গিয়ে পড়েছিল লক্ষ্ণৌতে। সেখানে মুসলমান বাঁদির পরিচয়ে আমার মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু ও যে তা নয় তা আমিই আবিষ্কার করেছিলাম, কারণ বাঁদি হতে হলে যেসব মুসলমানী কায়দাকানুন জানো থাকা দরকার তা ও জানত না। ওকে গানবাজনার পথে আমিই এনেছিলাম। আজও ওই পথেই আছে। আমাকে বিয়ে করতে হলে ওকে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হয়। ও চেয়েছিল, আমিই দিইনি। বলেছি, না হল বিয়ে, শিল্পীর আবার আলাদা ধর্ম কী আর তার পরিবর্তনই বা কী? তোমার

বিশ্বাস তোমার, আমার বিশ্বাস আমার— আর আমাদের দুজনের বিশ্বাস মিলে তো গান আর সুর। যেমন করে চললে তুমি সুখী হও আমি তেমনি করেই চলব...।

রোসেনা বাঈও একদিন বলেছিলেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আমার জন্যে নিজের জীবনের ধারা উনি একেবারে দিয়েছেন পালটে এ-কথা কেই বা বিশ্বাস করবে? উনি নিরামিশাষী। ওঁর চালচলন এমন করে রেখেছেন যে ফকিরের চেয়ে বেশি নয়। কেন? পাছে কোথাও আমার মনে এতটুকু ব্যথা লাগে। আর আমার নিজের কথা যদি বল, আমি নিজেকে হিন্দু ভাবি না, মুসলমানও ভাবি না। যে মানুষের সঙ্গে থেকে নিজের মূল্য পেয়েছি আমি নিজেকে কেবল সেই মানুষ হিসাবে ভাবি।

এমনি চলছিল। বন্ধুত্বে, স্নেহে, সুরে বউবাজারের সেই গলির দোতলার একটা ঘরে আমার মনটাকে রোজ রেখে আসতাম আমি। কেবল সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে আসতাম খাঁ সাহেবের বেঁধে দেওয়া সুরের স্পর্শ। বাড়িতে বসে যখন বাজাতাম তখন যেন ওমনি হাসিমুখ রোসেনা বাঈ-এর মিষ্টি সুরেলা গলায় ডাক আসত ভাইয়া, ইমতাজ খাঁর গুরুগম্ভীর ডাক শুনতাম দোস্ত।

কিন্তু একটা রক্তের লোভ যে রক্তমাখা থাবা বাড়িয়ে এগিয়ে আসছিল এ বিষয়ে একবাব সচেতন ছিলাম না আমরা। আমি ছিলাম না, ইমতাজ খাঁ ছিলেন না, রোসেনা বাঈ ছিলেন না— ছিল না আরও হাজার হাজার আমাদের মতো বোকা লোক। কিন্তু সে এগিয়ে আসছিল নিঃশব্দে, অগোচরে।

সেই বোধহয় আমি শেষ গেলাম ওদের কাছে। কদিন আগে নতুন একটা কঠিন গৎ দিয়েছিলেন। সেদিন সেটা শুদ্ধ নির্ভুলভাবে বাজিয়ে শোনালাম তাঁকে। বিকেলের আলো ম্লান হয়ে আসছিল। সারেঙ্গীর ওপর আমার হাত চলছিল দ্রুত, নির্ভুল। পাশে চোখ বুজে বসেছিলেন ইমতাজ খাঁ, ওপাশে রোসেনা বাঈ। ধূপের গন্ধ উঠছিল বড়ো ধূপাধার থেকে, সামনে একটা পেতলের থালায় যুথী, মল্লিকা, বেলফুল।

আমার বাজনা থেমে গেলে রোসেনা বাঈ প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। ইমতাজ খাঁ চোখ খুললেন অনেক পরে, যেন স্বপ্নের রাজ্য থেকে উঠে এলেন। বললেন, দোস্ত, তোমাকে আজ আমার শ্রেষ্ঠ বাজনাটি শোনাই। আমার রোসেনার ওটা খুব পছন্দ— অনেকদিন বাজাইনি। বাজাই রোসেনা?

রোসেনা বাঈ হঠাৎ আমার সামনেই কেঁদে ফেললেন। সে-কান্নার মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল না, দুফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে আসতেই তাড়াতাড়ি মুছে ফেললেন, আজ সকাল থেকে তোমার কী হয়েছে বল তো? কেবল আমাকে কাঁদাচ্ছো।

কেমন ম্লান, বিষণ্ণ একটু হাসি ফুটে উঠল ওস্তাদের ঠোঁটে, উত্তর দিলেন না

সে-প্রশ্নের। সারেঙ্গীটাকে কোলের ওপর তুলে নিলেন। তাঁর ঘরানায় তিনি বাজালেন। আমার কানে বাজতে লাগল বেলা শেষের পূরবীর করুণ তান। মনে হল বাইরের যে ধোঁয়া-ধুলো-ভরা আকাশটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিনে, তাতে কেবল অস্ত রবির রক্তাভ আলোই ছড়িয়ে পড়েনি, তাতে ছড়িয়ে পড়েছে রোসেনা বাঈ-এর চোখের জল, তাতে ছড়িয়ে পড়েছে ইমতাজ খাঁর বিষণ্ণ ম্লান হাসিতে, তাতে ছড়িয়ে পড়েছে আমার বিস্ময়।

আস্তে আস্তে সে-সুর কটার ঝংকার শেষবারের মতো তুলে মরে গেল রিনরিন করতে করতে। রোসেনা বাঈ মাথা নিচু করে রইলেন। সারেঙ্গীটি তেমনি কোলের ওপর নিয়ে চুপ করে বসে আছেন ইমতাজ খাঁ। আমি সে-বিষণ্ণতার পর্দা ছিন্ন করতে পারলাম না। ইচ্ছে হল কিছু কথা বলি, বলে ঘরের স্তব্ধতার জালটা ছিঁড়ে ফেলি, কিন্তু সাহস হল না।

তারপর কখন একসময় দেখি ইমতাজ খাঁ আমার পিঠের ওপর হাত রেখেছেন, হাসছেন, বলছেন, দোস্ত। রোসেনা ডাকছেন, ভাইয়া। আবার সহজ হয়ে এসেছে ঘরের আবহাওয়া। তখন দুহাতে সেই বিষণ্ণ জাল ছিঁড়ে ফেলতে আর আমার কষ্ট হল না। তানপুরা তুলে নিয়ে কোনও ভূমিকা না করে, কোনও অনুমতির অপেক্ষা না করে গান ধরে দিলাম আমি। গাইলাম আশার গান, সান্ত্বনার গান। আসবার সময় রোসেনা বাঈ এগিয়ে এলেন সিঁড়ি পর্যন্ত। ইমতাজ খাঁ এলেন। পিঠের ওপর হাত রেখে বললেন, আজকের সন্ধেটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে দোস্ত— তোমার মনেও, আমাদের মনেও। ভারি বিষণ্ণ লাগছিল সারা দিনটা। তুমি তা কাটিয়ে দিয়ে গেলে।

পরদিন সকাল থেকে সেই জানোয়ারটা তার রক্তাক্ত থাবা বসাল মানুষের বুকের মাঝখানটায়। আমরা যে-পাড়াটায় ছিলাম সেখান থেকে স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সরে আসতে হল অন্য পাড়ায়। একটা অপ্রত্যাশিত, অনাস্বাদিত যন্ত্রণার মধ্যে ছিটকে পড়লাম কোথা থেকে কোথায়। নিজেকেই মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তো? নিজেকে বাঁচানোর প্রশ্নটা আগে দেখা দিল।

দুদিন পরে মনে পড়ল তাঁদের কথা— ইমতাজ খাঁ, রোসেনা বাঈ। কার কাছে বলব তাঁদের নাম? ঘৃণা আর নিষ্ঠুরতা, আতঙ্কে আর অবিশ্বাসে ভরে গেছে মানুষের মন। যে বড়লোক ছাত্রের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার সাহায্যে পুলিশ এসকর্ট নিয়ে যেতে যেতে আরও একদিন দেরি হয়ে গেল।

গলির মুখের দুধারের জমায়েত মানুষেরা পুলিশের গাড়ি দেখে অদ্ভুত নিঃশব্দে কাছাকছি গলিগুলোর মধ্যে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু মনে হল লুকিয়ে লুকিয়ে এ-কোণ ও-কোণ থেকে আমাকে দেখে ওরা হাসছে বিদ্রূপের হাসি। হয়তো তা আমারই মনের ভুল। ছাত্রটি আমাকে কানে কানে একবার

বলেছিল, মাস্টারমশাই যাওয়াটা নিরর্থক। আমি শুনেছি রাজাবাজারের বদলা ওরা এখানে নিয়েছে...।

আমি কিছু শুনতে চাই না— চাইলাম না। সেই পরিচিত বাড়িটায় সামনে নামলাম। যেন তেমনি একই সঙ্গে সেই যন্ত্রগুলোর সা রে গা মা পা সা নি শুনব বলে কান পাতলাম। তেমনি ভেজানো দরজা খুলতে গেলাম, দেখি ভাঙা দরজা খোলাই পড়ে আছে— যেন কারা সরল হাসিতে মুখ ভরিয়ে এখুনি বলে উঠবে, আইয়ে বাবুজি।

নিস্তব্ধ ঘর পেরিয়ে অভ্যাস মতো সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। একবার মনে হল যেন রামকেলির সুর বাজছে কোথায়, আবার সেটা থেমে গেল। বারান্দায় শ্বেতপাথরের রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে যুগলমূর্তি তেমনি দাঁড়িয়ে— কেবল রাধার গা থেকে গয়না খুলে নেওয়া হয়েছে, কৃষ্ণের হাতের বাঁশি গড়াগড়ি যাচ্ছে মাটিতে— অনেকগুলো পায়ের চাপে তা চ্যাপটা হয়ে গেছে। মেঝেতে এখানে-ওখানে শুকনো রক্তের দাগ— যেন লাল গোলাপের শুকনো পাপড়ি ছড়িয়ে আছে। কে যেন মিষ্টি গলায় ডেকে উঠল— ভাইয়া! কে যেন গম্ভীব গলায় ডাকলে— দোস্ত! কোথা থেকে পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল। ঘরখানার দিকে এগিযে গেলাম। পাখোয়াজ আর তানপুরা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। ঘরের জাজিমখানা কারা যেন তুলে নিয়ে গেছে। আর অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে ঘরটা পোশাক-আষাক, শাল, জরির নাগরায় বিশ্রী হয়ে। দেওয়ালে লেগেছে রক্তের ছোপ, শুকিয়ে তা এখন কালো হয়ে মিশে আছে। সারা ঘরখানায় একটা বীভৎস, শূন্যতা, একটা আর্ত প্রার্থনা, একটা কান্নার সুর যেন ছড়ানো পড়ে আছে, কারা যেন তাকে পা দিয়ে দলে দলে মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। ঘরের এক কোণে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সারেঙ্গীটাই কেবল— যেটা ইমতাজ খাঁ নিজে বাজাতেন। কেউ হয়তো অমন বিশ্রী দেখতে যন্ত্রটাকে লাথি মেরে ঘরের একপাশে ছুঁড়ে ফেলেছে। সেটাকে তুলে নিলাম, আঙুলের ছোঁয়া লেগে তাতে সুর বেজে উঠল রিনরিন করে। মাঝখানের দুটো তার গেছে ছিঁড়ে তবু মনে হচ্ছে সেই সেদিনকার সন্ধেবেলার শেষ সুরটা বেজে বেজে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তার তরঙ্গ উঠে আমার বুকের ভেতরকার চাপা কান্নাকে বাইরে টেনে আনছে। ভূতের মতো বসে আছি শূন্য ঘরে।

ঘরের দরজার ছায়া ফেলে কে যেন এসে দাঁড়াল, ডাকল, মাস্টারমশাই। কারা যেন লাঠি ঠুকে ঠুকে উঠে আসছে। আমার চারপাশ থেকে সুরটা হঠাৎ থেমে গেল। ছাত্রটি আমার হাত ধরল, মাস্টারমশাই অনেকক্ষণ আটকে থাকার সময় নেই ওঁদের— তাড়া দিচ্ছেন। তা ছাড়া টেনসনটা আবার বেড়েছে। ওঁরা যেতে বলছেন।

চলে এলাম। সিঁড়ির মুখে কে যেন মিষ্টি গলায় ডাকলে, ভাইয়া! কার যেন স্পর্শ পেলাম পিঠের ওপর দোস্ত! নীচে সেই যন্ত্রগুলো একটানা বাজতে লাগলো সা রে গা মা পা ধা নি, সা রে গা মা পা...

পুলিশ অফিসার বিরক্ত গলায় বললেন, কী করছিলেন মশাই অতক্ষণ ধরে? রেখেছে নাকি কাউকে? যেমন এরা, তেমনি ওরা! উঠুন মশাই উঠুন। আমাদের কি অত সময় আছে? আমার হাতের সারেঙ্গীটার দিকে চোখ পড়তে ভ্রূ কোঁচকালেন, ওটা আবার কী? জোটালেন কোথা থেকে? না, না, কোনও জিনিসপত্র এভাবে নেওয়া অ্যালাও করা...।

আমার সেই বড়োলোক প্রভাবশালী ছাত্রটি ফিশফিশ করে কী বলল তাঁকে কে জানে। বিরক্তমুখে যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন অবশেষে।

যারা মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে জটলা করছিল তারা এই শব্দ করে পাড়া ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া গাড়িটার দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসাহাসি করতে করতে লাগল। রক্ত-খাওয়া দানবটা কেবল রক্তই খায় না— যাদুও জানে। ওরা দুপক্ষই সেই রক্তের মধ্যে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর হাসছে।

স্ত্রী পুত্রকে নিরাপদ দায়িত্বে রেখে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম কলকাতা ছেড়ে। সে-কথা ভুলতে আমাব অনেকদিন লেগেছিল।

এই সেই সারেঙ্গী! বলে পরম যত্নে তাকে একটা কালো কাঠের বাক্সে ভরে রাখলেন নিমাইবাবু।

আমি কেমন অভিভূতের মতো বসেছিলাম। আমি তো ব্যবসায়ী মানুষ, নিরেট হিসেব-নিকেশে আমার অবকাশগুলো ভরা। সুর আমার মনে দাগ কাটে না, গান শুনলে আমার অস্বস্তি লাগে। কিন্তু সেই আমারই মনে হতে লাগল ওই কালো বাক্সটার মধ্যে থেকে কী একটা সুর ছড়িয়ে পড়ে সকালের এই প্রসন্ন আলোকে ঢেকে ফেলেছে হঠাৎ। কোথা থেকে একটা বিশ্রী কোলাহল উঠছে, সকালের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে কাদের হাতের লাগানো আগুনে আর তারই মধ্যে কাঁদছে একটা প্রার্থনা, একটা আত্মনিবেদন, একটা শেষ মুহূর্তের শূন্যতা।

নিমাইবাবুর সেই মুখটার দিকে আর আমি তাকাতে পারলাম না। নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছি না এখন, কিন্তু ওই দানবটা যে একদিন আমাকেও গিলেছিল এ কথা নিমাইবাবু জানেন না। এ শহরে উনি নতুন এসেছেন।



ঘেন্না

হাওড়া ছাড়িয়ে ও-দিকে হুগলি পর্যন্ত যে-স্টেশনগুলি পড়ে তারই একটা থেকে কোলকাতামুখো ট্রেন ছাড়ছে। কলরব করতে করতে একদল মেয়ে আসে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে। বেশির ভাগই বিধবা— মধ্যবয়সি। প্রায় হাঁটুব ওপব উঁচু করে পরা আধ-ময়লা থান, সবাইয়েরই খালি গা, খালি পা। মাথায়, কাঁখে প্রত্যেকেরই একটা করে বস্তা। সবুজ নিশান দেখাতে শুরু করেছে গার্ড, অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে পায়ের গতি আরও বাড়ায় ওরা, হেই বাবা লোকনাথ, পৌঁছে দিও বাবা! হাঁসফাঁস করতে করতে উঠে পড়ে কোনোরকমে কামরায় মাথায়— কাঁখের বস্তাগুলোকে ফেলে দিয়ে বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নেয়, পেয়েছি গো বাবার দয়ায়। ভাবলাম আজ বুঝি আর যাওয়া হোলোনি।

হ্যাগো? সদি কই গো? একটু আরাম করে বসে কৌটো থেকে মিসি বার করে দাঁতে দিতে দিতে হঠাৎ খেয়াল হল সুন্দরীর, হ্যাঁরে তাকে কেউ দেখলিনি তোরা? এখনও এলনি। মাগি হাঁটতেই কি পারে?

ও-পাশের বেঞ্চ থেকে যোগমায়া বলে, বলিনি তখন, নিসনে ও বাঙালকে ব্যাবসার কাজে। শুনলিনি। ওর জন্যে তোকে বিপদে পড়তে হবে, এ আমি বলে দিলাম।

সুন্দরী উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়েছিল জানলা দিয়ে। দুটো বাঁশি পড়েছে ট্রেনের, এখনও এল না। —হেই যা! গাড়ি যে ছাড়ল গো।

একটু দূরে দেখা যায় সৌদামিনীকে। হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। জানলা থেকে সুন্দরী প্রাণপণে চেঁচায়, হেথা গো— এই সদি! দৌড়ো— দৌড়ো। গাড়ি পাবিনি! দৌড়োয় সৌদামিনী। সারা গাড়িসুদ্ধ লোক যেন হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, ভেবে কানদুটো লাল হয়ে ওঠে।

হেঁচকা টান মেরে প্রায় চলন্ত গাড়িতে ওকে তুলে নেয় সুন্দরী, আর চেঁচায়, এমন ঝকমারিও করিছি গো তোকে কাজে নিয়ে, আমার সব্বোনাশ না করে ছাড়বিনি তুই।

বলে নিঃশ্বাস ফেলে সদি। কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা নেমে আসছে। বড়ো বড়ো ভীরু চোখের দৃষ্টি দিয়ে গাড়ির ভেতরটা একবার দেখে নেয়।

গাড়ির যাত্রিনীরা এ-গ্রাম ও-গ্রামেরই ঘর-গেরস্থের। কেউ বউ, কেউ শাশুড়ি। মুখ চেনাচিনি এর সঙ্গে ওর, আনকোরা বাইরের লোক ছাড়া এসব লাইনে আসে না। একজন জিজ্ঞেস করে, একে আবার কোথায় পেলি সুন্দরী! নতুন লোক যে।

পাশের একজন গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, বাঙাল গো বাঙাল, বুঝছোনি? হাঁটা, চলাফেরা দেখেই বোঝা যায়।

সুন্দরী সৌদামিনীর ফেলে দেওয়া বস্তা ভালো করে বেঞ্চির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে ঠিক হয়ে বসে, তারপর ট্রেনটা জোরে চলতে শুরু করলে আঁচলে বাঁধা একরাশ মুড়ি কোলের ওপর রাখে, বলে, খা— আজ তো আর সারাদিন পাবিনি খেতে। ছলছল করছিল তখনও সৌদামিনীর চোখ। ভারি গলায় বলে, আসার সময় ছেলেটা হাত টানাটানি করে কাঁদতেছিল, বলে আমি যাব। ওরে ফেলে আসতি মন চায় না।

থাকবে ঠিক। কেন আমারও তো রয়েছে গঙ্গা আর বোঁচা, মানুষ লয় ওরা? তোর ছেলে বাপু বড়ো নেই আঁকড়া।

ওরা যে বাঙাল কয়ে খেপায় ওরে। কানতিছেল কাল রাত্তিরে, এখানে থাকতি চায় না।

ও-পাশে কয়েকজন মুচকি হাসে সৌদামিনীর পূর্ববঙ্গের টান শুনে— ওর ছলছলে চোখ দেখে।

রেগে গিয়ে সুন্দরী মুখভঙ্গি করে, তা যাও, দেশেই ফিরে যাও তোমরা। সুখে আছ— সইবে কেন? পড়েছিলে তো সেই ইস্টিশনে— সেই ছিল ভালো। তোমাকে দিয়ে আমার ব্যাবসা চলবেনি বাপু। এই তো সেদিন শ্রীরামপুরের রামলোচন দোকানির সঙ্গে ঠিক করে এলুম পঁচিশ টাকা মন, তোমাকে দিল চব্বিশ টাকা। একটা আপত্তিও না কিছু না। ন্যায্য দাম চাইতে গেলাম, বলে, দেব কেন? যার চাল সেই তো দিলে।' আরে বাপু টাকাটা সেদিন ধার দিয়েছিল কে? বলে সামনের বেঞ্চের সহযাত্রীর মুখের দিকে তাকাল সমর্থনের আশায়। "তা যাও। দুটো পয়সা পাচ্ছো আর এখন বুঝি দেশের মায়া উথলে উঠছে তোমার। ঝুঁটি ধরে ধরে মুসলমানগুলো তাড়াল যখন, তখন তো কই বাঁচাল না তোমাদের দেশ।

আবার ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠে সৌদামিনী, তাড়াবি কেন। ওরাও থাকতেই কইছিল। সকলে আসতিসে দেখে আমি আর থাকি কোন ভরসায়।

কিন্তু ভরসা কি একেবারেই ছিল না? যাবার খবর পেয়ে কানাই এসে বসেছিল, ম্লানমুখে বলেছিল, সত্যই যাবাই।

যাব না?

না।

ক্যান?

যাচ্ছ কি মুসলমানগারে ভয়ে, আমাদের হবিস কাকা আর হাফেজেরে জিজ্ঞেস কর না?

লজ্জিত হয়ে বলেছিল সৌদামিনী, না— তা না। এখানে থাকলি খাব কী? বাবুগারে পাড়ায় ভদ্দরলোক এক ঘর নাই যে খাট্যে খাব— পেট চলবি কীসে?

ক্যান, আমরা নাই? তুমি আমার মিতে কার্তিকের বউ না? একসঙ্গে মাঠে যাই নাই ফসলের দখল নিতে? আমার কোলের উপর প্রাণডা যায় নাই কার্তিকের?

তবু ভরসা পায়নি সে। ছেলের হাত ধরে একটা পোটলা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। খানিকটা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে হন্ হন্ করে এগিয়ে এসে পেছন থেকে কানাই বলেছিল, কাজডা কিন্তু ভালো করলে না তুমি। শহরে পথে কত বিপদ-আপদ, লোভ আর পাপের ছড়াছড়ি। মান-ইজ্জত নিয়ে টানাটানি সেখানেই বেশি। অপমান আর দুঃখু পালি এখানে জানাবাব লোক আছে তোমার— সেখানে নাই। এর বেশি কিছু বলতে পারেনি, গলাটা ধরে এসেছিল।

এখনও ওর সেই নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, সেই ভাসা ভাসা গলার স্বরে আটকানো কথাগুলো কানে বাজে। মাঠে-ক্ষেতে লাঙল চালানো, ঘামে-ভেজা চকচকে চওড়া পিঠ চাষিকে দেখলেই মনে পড়ে কার্তিকের কথা— কানাইয়ের কথা। চোখে জল আনে রাত্রে শুয়ে, দ্যাশ কই? এ-কনে আলাম আমি। চোখের জল ঠোঁট দিয়ে চেপে নিয়ে অস্ফুটে কাঁদে সৌদামিনী— বাঙালের কান্না।

সেই নোনা জলেই ভরে আসছিল চোখ, হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। কথা থামিয়ে কাজে লাগার সময় এখন। সুন্দরী বলে, আয়রে সদি। একটা বস্তার মুখ খুলে ভেতর থেকে চটের টুকরো বার করে একখানা, লাঠি দিয়ে চটখানাকে অদ্ভুত কায়দায় ঢুকিয়ে দেয় দরজায়— মাঝখানের ওই এক ইঞ্চি সরু ফাঁকে। তারপর সুন্দরী ছোট একটা র‍্যাশন ব্যাগে পুরে দেয় চাল আর ও ঢালে। হাত কেঁপে কটা চাল উড়ে পড়ে বাইরে— কটা ছড়িয়ে পড়ে ভেতরে। হাঁ হাঁ করে ওঠে সুন্দরী, ফেলিসনি, ফেলিসনি। গায়ে বুঝি লাগে না তোর, হ্যাঁরে সদি? টাকাটা আমার কিনা, মায়া হবেই বা কেন!

ও-পাশে আরও দুজন দুটো দিক অধিকার করেছে, একজন দরজায় ফাঁকে ঢালছে, একজন ঢালছে জানলার ফাঁকে।

সর দেখি। ওকে সরিয়ে সুন্দরী নিজে ঢালে চাল। সৌদামিনীর হাত কাঁপে— বুকের ভেতরটা কেমন করে। ঘরে কি চাল দেখেনি সে!

উঠোনে ধান এনে ফেলত কার্তিক। নিজের হাতে সেই ধান ভেনে ঘর ভরে রেখেছে। একটা চাল মাটিতে পড়লে খুঁটে তুলেছে। চাল না লক্ষ্মী, সোনাদানার চেয়েও বেশি।

কী যে দুঃখ তার! চালের মূল্য বোঝাতে আসে সুন্দরী চুরি করা চালের ব্যবসা করতে গিয়ে! হায় রে কপাল! উপুড় হয়ে কপালটা একবার মেঝেয় ঠুকে দেয়।

সুন্দরী বলে, কী লো, ঘুমোচ্ছিস নাকি! দে, এটা দিলেই তো শেষ হয়।

তারপর কাজ শেষ করে, শুকনো মুখ করে চুপ করে বসে থাকে সবাই। কপালে হাত ঠেকিয়ে যোগমায়া ফিশফিশ করে, দোহাই বাবা তারকনাথ, এই ইস্টিশনটা পার করে দাও বাবা।

ওরা জানে বিশেষ একটা স্টেশনের কথা। ধরা পড়ে বেশির ভাগই ওখানে। সব জায়গায় পয়সা দিয়ে কেঁদেকেটে মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে শক্ত পাহারা। তাই বড়ো ভয় ওদের শেওড়াফুলি জংশনকে। ওটা পার হয়ে গেলেই আবার কাজে মন দেয়। নীচের থেকে চটখানাকে টানে আর সব চাল ছড়িয়ে পড়ে বাইরে। সেগুলোকে কুড়িয়ে তুলতে হয়। সুন্দরী বলে, একটা করে খুঁটে তোল সদি, পড়ে থাকেনি যেন। এ আব পারিনি বাপু, আধমন চালে আমার দশ সের যাবে গুনাগার।

এ আর পারিনি বাপু! —এই কথাটা সদির মনে কান্নার ঢেউ তোলে। বুকের মধ্যে উথালপাথাল করে দুঃখের সাগর। সত্যিই আর পারে না সে। এই চুরি করে পেট চালানো, অপমান আর অভিযোগ।

ছেলেটার কথা মনে পড়ে। আহা, কচি ছেলেটা। সেই অন্ধকার শেয়াল ডাকা মাঠের মধ্যে কুঁড়েতে পিদিম জ্বালিয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকে সে। গেলে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, আমি থাকব না— কিছুতেই থাকব না। তুই আমারে কানাই কাকার কাছে রাখ্যে আয়। ছেলে-মা দুজনেই কাঁদে।

ছেলে বলে, ক্যান তুই আলি ইস্টিশন থে। ওখানে কত লোক ছিল চেনা, এখানে ওরা আমারে বাঙাল কয়, হাসে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঘুরতে ঘুরতে সৌদামিনীব ওপর চোখ পড়েছিল সুন্দরীর, বলেছিল, যাবি মা, ব্যাবসা করবি— স্বাধীন ব্যাবসা? দুটো পয়সা আসবে। এত কষ্টে থাকতে হবে না।

সাগ্রহে তখন রাজি হয়েছিল সে। সুন্দরী ঘর দিয়েছে একখানা। টাকা ধার দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসা বোঝায়। তাই ওর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে আছে সে। আর অন্যদের মতো সুন্দরী মুখরাও নয়, মনটা নরম আছে এখনও।

অন্যদের হাসি-ঠাট্টা-ব্যঙ্গের উত্তরে কতদিন বিরক্ত হয়ে সুন্দরীকে বলতে শুনেছে সৌদামিনী, বাঙাল-টাঙাল বুঝিনি বাপু। কষ্টে পড়েছে, বলতেই এল, নিয়ে

এলাম। তোরাই বা অমন বাঙাল বাঙাল করে মরিস কেন? বাঙালরা কি মানুষ নয়?

স্টেশনে পৌঁছে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সবাই, একসঙ্গে থাকলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। কুলিরা জানে কোথায় পৌঁছে দিতে হয় বস্তাগুলোকে। টিকিটবাবু, দাঁড়িয়ে থাকা রেলের লোক, গার্ড সবাইয়ের জন্য আলাদা করে পয়সা গুঁজে রাখে ট্যাঁকে। হাত ওরাও বাড়িয়ে থাকে, এবাও বাড়িয়ে রাখে। কথার চেয়ে কাজ হয় তাড়াতাড়ি। রিক্সায় উঠে সুন্দরী বলে, দাঁড়া বাবা, দাঁড়া একটু। পেছনেরটাকে বেশি ছাড়িয়ে যাসনি। পেছনের রিক্সায় আসে সৌদামিনী। তাকে ডেকে বলে দেয়, বলে দিবি সুবল সখাকে, টাকা আর আমি ফেলে রাখবনি। পারিস যদি, আজই আনবি আদায় করে।

সুবল সখা বড়ো বাকি ফেলে রাখে টাকা, একটু বেশি দাম পাওয়া যায় বলে ওর কাছে চাল দিতে হয় বটে, কিন্তু টাকা আদায় করতে প্রাণ যায়। নিজের অতিকষ্টে জমানো সমস্ত জীবন ধরে জমানো গোটা পঞ্চাশেক টাকা নিয়ে কাজে নেমেছিল সে। ভারী তো লাভ, ঘুষ থেকে শুরু করে গুনাগার দিয়ে সারাদিন একটা টাকাও তার লাভ হয় কিনা সন্দেহ। তবু তারই জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম, অপমান, প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয়, সারাটা দিনের না খাওযাব ধকল— ভেবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে। এ-ব্যবসা ছেড়ে দিলেই বা খাবে কী সে! তিনটে ছোটো ছেলে— নিজের পেটটা তো আছে!

স্টেশন থেকে কত দূরে সব দোকান! বাবা! অসমান রিক্সার ওঠা-নামায শরীরে যেন ব্যথা ধরে যায় সৌদামিনীর। খিদেয় পেটের ভেতরটা মোচড়ায়। আজ সকালে খেয়েও আসেনি সে মনটা খারাপ ছিল বলে। গলা শুকিয়ে আসে তেষ্টায়।

সুবল সখার দোকানে যাবার সময় দেখল বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখানকার কাজ শেষ হলে স্টেশনে পৌঁছতে হবে তাড়াতাড়ি-- সাড়ে ছটার গাড়ি যদি চলে যায় তবে আটটার আগে আর গাড়ি নেই। ছেলেটাকে দুটো রেঁধে দিতে হবে তাড়াতাড়ি গিয়ে।

চালের ছোট বস্তাটা পাশের ঘরে রেখে এসে বেঞ্চটা গায়ের গামছা দিয়ে ঝেড়ে দিয়ে একটা হাতপাখা এগিয়ে দিয়ে সুবল সখা বলে, "নাও বোসো। যা রোদ, জিরিয়ে নাও একটু।

বসে পড়ে সৌদামিনী বলে, বসবার সময় নাই, টাকা কয়ডা যদি দেতেন আজ... সুন্দরীদিদি কয়ে দিল।

সে হবে এখন। অনুরোধের দৃষ্টি নিয়ে সুবল বলে, টাকা কি আর ফেলে রাখব নাকি? জল খাবে? বলে একগ্লাস জল এগিয়ে দেয়। সৌদামিনী মুখে দিয়ে দেখে শুধু জল নয়, মিষ্টি, ঠান্ডা ঠান্ডা! একচুমুকে সেটা শেষ করতে করতে একটা

শিরশিরানি ভাব জাগে মনে। স্টেশনে একধরনের লোকের আনাগোনা, তাদের খুব কাছে এসে দাঁড়ানো দেখলে এমনি একটা গা ঠান্ডা-করা ভাব জাগত। অনেকদিন পরে মনের মধ্যে সে-রকম করে উঠল। জলের গ্লাসটা শেষ করে ভোঁতা আর বোকা চোখে তাকিয়ে রইল।

ছেলেমেয়ে আছে তোমার? সুবল প্রশ্ন করল।

আছে, এক ছাওয়াল মাত্তর।

একটু ইতস্তত করে সুবল, কী-একটা কথা বলতে গিয়ে বলে না। খানিক চুপ করে কী যেন ভাবে, তারপর মৃদু স্বরে বলে, রাগ যদি না করো তবে একটা কথা বলি সৌদামিনী।

ঘরের চারপাশটা একবার আবছায়ার মতো চোখ বুলিয়ে নিল সৌদামিনী, তারপর ম্লান নিস্তেজ গলায় বলল, কন্, কী কবেন। আমার আবার রাগ আর বিরাগ!

বলি কী, সুন্দরীর সঙ্গে ব্যাবসা করা ছেড়ে দাও তুমি। আমারও ত্রিসংসারে কেউ নেই, ছেলেকে নিয়ে তুমি আমার এখানে চলে এসো। তুমি ঘর-সংসারের কাজ করবে, আমি উপায় করে আনব।

অত্যন্ত সহজ-সরল প্রস্তাব। এরকম দু-একটা প্রস্তাব স্টেশনে থাকতেও এসেছিল তার কাছে। সিঁটিয়ে তাই যেন গুটিয়ে গেল সৌদামিনী।

ওকে অসহায়েব মতো চুপ করে থাকতে দেখে সুবল বলে, কথাটা আমি ভেবেছি তোমাকে দেখার পর থেকেই, বলিনি সাহস করে। বড়ো লক্ষ্মীর মতো চেহাবা আর স্বভার তোমার। ও চুরির ব্যাবসা যে তোমার ভালো লাগে না, তাও বুঝি আমি।

তবু সৌদামিনী গুটিয়ে থাকা ভাবটা যায় না। মাথা নিচু করেই বসে থাকে। প্রায় গোপন কথা বলার মতো করে সুবল বলে, এ-ব্যাবসা আমারও ভালো লাগে না— করি কেবল টাকার লোভে। আসল ব্যাবসা ত দেখছো আমার— এই দর্জির কাজ— এই ভালো। এ শালা চালের জন্যে জ্বালা কী আমারও কম! পুলিশ-দারোগার ভয়ে তটস্থ। দু-পাঁচ সের চালের উপরই যত নজর শালাদের।

তবু উত্তর না পেয়ে বিরক্ত মুখে সুবল বলে, কী বলবে বলো না— অন্যায় বলেছি কিছু? কী ভাবছো?

ভাবা কি এতই সহজ? সুন্দরী ছাড়তে যাবি ক্যান? আর আমি বাঙাল, আপনারা তো ঘেন্না করেন আমাগোরে— তার উপর বিধবা। মানের ভয়ে পালায়ে আস্যে, শ্যাষে কি দুর্নাম কেনবো?

ওসবের কোনোটাই মানিনে আমি— বাঙালও না, বিধবাও না। আর লোকে কী বলল না বলল ভদ্দর বাবুদের মতো তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামালে চলবে কেন?

হঠাৎ মাথা তুলে বেলার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে সৌদামিনী বলে, "সন্ধে

হয়ে গেল যাবনে কেমন করে আমি?

একটা রিক্সা করে যেতে বলে সুবল সখা। ভাড়াটাও দিয়ে দিতে চায়। কিন্তু একা যেতে রাজি হয় না সৌদামিনী। সুবলকে তখন উঠতে হয় পৌঁছে দেবার জন্য। দোকান বন্ধ করে, চাবিটা ট্যাকে গুঁজে খানিকটা রাস্তা এগিয়ে এসে মাঝরাস্তা থেকে একটা রিক্সা ডেকে বসে। নিজে যথাসম্ভব গুটিয়ে বসে জায়গা ছেড়ে দিয়ে। গাঁয়ের মেয়ে, তার ওপর বিধবা— পরপুরুষের পাশে বসে যেতে সংকোচ তো হবেই। সৌদামিনী সমস্ত শরীরটাকে শামুকের মতো গুটিয়ে আনে ভয়ে, সংকোচে। হয়তো মাথার ওপর হুড-তোলা রিক্সায় লোকটা জড়িয়ে ধরতে পারে। ওর অবস্থা বুঝে সুবল মুচকি হাসে, অত ভয় পাচ্ছো কেন গো? হাত-পা খেলিয়েই বসো না— ভয়টা কীসের?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গলাটা পরিষ্কার করে বলে, বলছিলাম— আসল কথার ত কোনো উত্তর দিলে না। আমি তো রাজি— তোমার আপত্তি থাকলে চালের ব্যাবসা ছেড়ে দেব তো বললাম।

সৌদামিনীর কমে আসা ভয়টা আবার বাড়ে। স্টেশনের পথ কতদূর একবাব তাকিয়ে দেখে নেয়। লোকটা বুঝি এখনই তার অধিকার কায়েম করতে চায়। খানিক জোর গলায় তাই বলতে হয়, কথা ত তোমারে এখনই দিতি পারিনে, দেখি ভাব্যে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেবেই দেখো তুমি। সে আমি জোর করে মত আদায় করব না তোমার। তা সামনের দিনেই যা হোক কিছু ভেবে এসো— কেমন?

সৌদামিনীর নিঃশ্বাস ফেলবার শব্দ পেয়ে সুবল বলে, বিশ্বাস করা না কবা তোমার হাত, আমার অন্তরের কথাই বলেছি— লোক আমি খারাপ না।

লোক যে খারাপ নয় সেটা টের পাওয়া গেছে রিক্সায় পাশাপাশি এসেই। কথাটা তা নয়, সৌদামিনীর এখন ধানের দখল দিতে গিয়ে প্রাণ দেওয়া স্বামীর কথা মনে পড়ে, তার মিতে কানাইয়ের কথা মনে পড়ে। দেশ-ঘর, জমি-ধান, পাপ-পুণ্য মিলিয়ে মনের মধ্যে অন্ধকার নামে।

স্টেশনের আলো দেখতে পেয়ে সুবল বলে, আমি এবার যাই। তোমার দলকে পেয়ে যাবে ওখানে।

হঠাৎ সুবলের হাত শক্ত করে চেপে ধরে সৌদামিনী, না, না, গাড়ি পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়ে যাও আমারে।

সাড়ে ছটার গাড়িটা একটু আগে ছেড়ে গেছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় পরের ট্রেনটার জন্য। সুবল ওকে স্টেশনের চায়ের স্টলের বেঞ্চিতে বসিয়ে কাপে করে চা খাওয়ায়।

গাড়ি এলে দুজনে একটা খালি কামরায় গিয়ে বসে থাকে পাশাপাশি। চুপ করে থাকে যেন সব কথা ফুরিয়ে গেছে।

যেতে পারবে তো একা? গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা দিলে সুবল জিজ্ঞেস করে।

চলন্ত গাড়ির সঙ্গে অনেকদূর এগিয়ে যায়। যেন অনেকদূর চলে যাচ্ছে তার প্রিয়-পরিজন, আর বুঝি দেখা হবে না।

গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেলে জানলার কাছ থেকে সরে এসে ভেতরে বসে সৌদামিনীর দু-চোখ ভরে জল আসে। খালি কামরায় গায়ের মধ্যে কেমন ছমছম করে। মনে হয় এ-সময়টায় সুবল সঙ্গে থাকলেই যেন ভালো লাগত— এই ভয় ভয় ভাবটা একটুও থাকত না তাহলে।

সেই গা ছমছম-করা ভাব নিয়ে ঘরে এলে ছেলেটা আগুনের মতো গরম গা নিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদে, তুই ছিলিনে মা। শীতে আমারে কাঁপাইছে সারাডা দুপুর। অনুতাপে বুকের মধ্যেটা পুড়ে যায়— কপালে বুঝি সত্যিই অনেক দুঃখ আছে তার। বিধবা মানুষ, ছেলের মা, দেড় কুড়ি বয়স হতে চলল। দেশ-জমি-জায়গা ছেড়ে এসে নইলে আবার নতুন করে সংসার করবার শখ জাগবে কেন মনে। ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে।

থমথমে মুখে সুন্দরী ঢোকে, বলে, আজ সুবাসী আর হারানীরে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ— একেবারে হাজতে চালান। ওভাবে আর নেওয়া যাবেনি চাল।

পাপপুণ্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে আসতে হয়, বোকা ভোঁতা চোখে তাকিয়ে সৌদামিনী জিজ্ঞেস করে, তবে কী করব?

উপায় আছে রে, উপায় আছে। এতক্ষণ পরে একটু হাসে, মিশি মাখা কালো দাঁতে বলে, বজ্জর অটনেরই গেরো যায় ফসকে। দে দেখি আট আনা পয়সা— দর্জিকে দিতে হবে। ব্যাবসাও রাখতে হবে— তোরও, আমারও। নইলে পোড়া পেট চলবে কী করে?

দর্জি? বিস্ময়ে সৌদামিনীর কথা আটকে আসে।

দেখেছিস কী? এবার মেমসাহেবি পোশাক পরতে হবে যে। উঠে আয় দেখি।

গুটিয়ে নিয়ে আসা মস্ত বড়ো একখণ্ড চটের টুকরো তার বুক থেকে পিঠ পর্যন্ত ফেলে একবার মেপে নিয়ে বলে, ঠিক হবে তোর এতে। আমি মোটা মানুষ, আমার লাগবে বেশি।

পয়সা নিয়ে যাবার সময় বলে, ভাবিসনি কিছু, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ওর চিন্তিত বিষণ্ণ মুখের দিকে চোখ পড়তে বলে, মর মাগি। ছেলের জ্বর যেন কারুর হয় না, কাঁদছিস কেন? রাতে আমার ওখান থেকে চাড্ডে খেয়ে নিসখনি তুই। কাল বোঁচাকে দিয়ে পাঁচু কবরেজের কাছ থেকে ওষুধ আনিয়ে দিলেই জ্বর সেরে যাবে— ভাবিসনি।

ছেলে বলে, তোরে যদি পুলিশে ধরে নিয়ে যায় মা? বলে কেঁদে ফেলে।

পাপ-পুণ্য একনিমিষে উধাও হয়ে যায় মন থেকে। সৌদামিনী বলে, যাবি চলে এখান থে সোনা? একজন আমাগোরে নিয়ে যাতি চাইছে। তোরে আমি লেখ্যাপড়া শেখাব।

ছেলে ভারি খুশি হয়ে বলে, তাই চল্ মা।

ওদের মনের মধ্যে সুখেব ছবিটা একবার জাগে, আবার মিলিয়ে যায়।

সকালবেলা সুন্দরী নিয়ে এল দর্জির তৈরি-করা জিনিসটা। গলার ওপর থেকে পেট পর্যন্ত একটা মস্ত বড়ো চটের টুকরো ভাঁজে ভাঁজে সেলাই-করা— পেছনে কাঁচুলির মতো কতগুলি দড়ি।

সুন্দরী বলে, চাল আন তো দেখি ক-সের। চালের ধামা এগিয়ে দিলে বলে, ধর্ দেখি লম্বা করে। তারপর কৌটোয় করে চাল ঢালতে থাকে সেলাই-করা ভাঁজগুলোর মধ্যে।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সৌদামিনী। দরজা-জানলার ফাঁকে ছালা গুঁজে চাল ঢালবার সময়ও এত আশ্চর্য হয়নি সে। ধামার প্রায় সব চালগুলি ঢেলে নিয়ে সুন্দরী বলে, আয় এদিকে। তার পা থেকে কাপড় ফেলে দিয়ে বেঁধে দেয় শরীরের সঙ্গে। চটের পরশ আর চালের ভ্যাপসা গন্ধে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। ভীষণ মোটা মেয়েমানুষের মতো হাঁপাতে থাকে সৌদামিনী, এ আমি পারব না। আমি মরে যাব ও-সব পরে— ও দিদি।

ছেলেটাও মায়ের অদ্ভুত সাজ দেখে হাউমাউ করে কাঁদে।

সুন্দরী রেগে ওঠে, পারব না তো করবে কে শুনি? আমি এমন মোটা মানুষ, আমি পারছিনে? আরও সবাই যে নেবে, কষ্ট তাদের নেই? না হয় চাল কিছু কম করেই নিও তোমারটায়। পেট চালাতে হবে তো? ফিতেগুলো খুলে দিয়ে আবার চালগুলো ধামায় ভবে ফেলে তাড়াতাড়ি। সেদিকে তাকিয়ে কান্নায় যেন গলা আটকে আসে সৌদামিনীর। সে কাকুতি জানায়, তিন-চারটে দিন আমাবে মাপ দেও দিদি। ছেলেডারে দেখার কেউ নাই। আমারও শরীরডা খারাপ। তারপর যাতি ত হবিই। তোমাগোরে যে পথ, আমারও সেই পথ— এ ত জানিই।

তা না হয় নাই গেলে তুমি কটা দিন। সুন্দরী এবার সহানুভূতিতে নরম হয়ে আসে, বুঝিস ত দিদি, পেটের দায়েই ত সব। এই বা ক-দিন, আবাগীর ব্যাটাবা ঠিক ধরে ফেলবে দেখিস। যত চোখ কি আমাদের উপর গো। দশ সের বিশ সের চাল নিয়ে কি দালান তুলব আমরা!

সুন্দরীর কথা সৌদামিনীর কানে যায় না। ও পথ খোঁজে। এইবার গিয়েই সে সুবল সখার প্রস্তাবে রাজি হয়ে আসবে। তারপর চলে যাবে ছেলেকে নিয়ে। তাতে যদি পাপ হয় হোক।

সেই একই সময়ে কলরব করে মেয়েরা দৌড়য় গাড়ি ধরতে। বস্তা নিয়ে ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকায় না বটে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসে। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নেয় আর হাঁপায়।

চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা হলে তারা হাসে, কী গো, তোমরা যে সব পাল্লা দিয়ে মোটা হচ্ছো?

ওরা গালাগালি করে, চুপ কর না ড্যাকরা, কে কোথা দিয়ে শুনবে— হয়ে যাবে ব্যাবসা করা!

বিকেলে ফিরে আসে স্বাভাবিক শরীর নিয়ে ওরাই, স্বাভাবিক মানুষের মতো নিঃশ্বাস নেয়।

সবাই বলে ছেড়ে দেব ছাই এ-ব্যাবসা। দু-পাঁচ সের চালের জন্য প্রাণ যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল গো?

কিন্তু ছেড়ে দেব বলেও কেউ ছাড়তে পারে না। কষ্টটা সেখানেই।

কটা দিন পরে ছেলে সুস্থ হয়ে গেলে কোনো অজুহাত দেওয়া যায় না। সুবল সখার সঙ্গেও দেখা করা দরকাব। এখনও যদি তার মত বদলে না থাকে তবে সৌদামিনী মত দিয়েই আসবে আজ। খানিকটা আশা থাকে বলে সের পনেরো চাল নিয়ে চটের পোশাকটা খুব ভারি মনে হয় না।

সুন্দরী বলে, আর একটু জোরে হাঁট।

চালের ভ্যাপসা গরমে কষ্ট হয়। হাঁটতে পারে না, তবু চেষ্টা করে। কেবলই মনে হয় আজই তো শেষ দিন তার!

চলতে চলতে ভাবে, সুবল পবিশ্রম করে ফিরবে, ছেলেটা স্কুলে যাবে পড়তে— সেও দরকার হলে সুবলকে সাহায্য কববে। আহা, একনিমিষে যদি পৌঁছে যাওয়া যেত সেখানে!

গাড়িতে উঠে কষ্ট হয়। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসে। দুটো স্টেশন পার হয়ে গেলে সুন্দরীকে বলে, একটু খুলি দিদি, আব ত পারতিছি নে।

ছেলেমানুষ বাতাসীও বলে, সত্যি, খুলেই বসি একটু।

কোন ইস্টিশন এটা, দেখি দাঁড়া। বলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে গিয়ে সুন্দরী চমকে সরে আসে। তখনও প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে যায়নি গাড়ি। খাকি পোশাক-পরা লম্বা-চওড়া দুজন লোক গাড়ির হাতল ধরে উঠে পড়ে ওদেরই কামরায়— সঙ্গে মস্ত লাঠিধারী সেপাই। নিমেষে মেয়েদের মুখগুলো শুকিয়ে যায়, বুকের মধ্যে সবাইয়েরই ধড়ফড় করে।

দুজনেই দরজায় পিঠ দিয়ে একটু দাঁড়ায। জামায় বুকে অনেকগুলো ব্যাজে রোদ পড়ে ঝকমক করে। দাঁড়িয়ে ছুঁচলো গোঁফজোড়াটায় পাক দেয়, আব একজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করে মেয়েদের। সেপাইটা যেন কাঠের পুতুল— চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকে অ্যাটেনশনের ভঙ্গি নিয়ে। মাঝবয়েসি, কমবয়েসে, মোটা মোটা অনেকগুলো মেয়ে পাশাপাশি বসে তবু ওদিকের দরজার কাছে বসে থাকা সৌদামিনীর দিকেই যে ওদের চোখ পড়েছে— ফ্যাকাশে মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেও সেটা সে বুঝে ফেলে। মেয়েরা ভোঁতা আর বোবা দৃষ্টি নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে— নড়ে না, শব্দও করে না একটা।

সিগারেটে দুটো বড়ো বড়ো টান দিয়ে পায়ের নীচে জুতো দিয়ে পিষে

একজন অফিসার হঠাৎ অদ্ভুত ক্ষিপ্র হয়ে উঠে বাতাসীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। "চাল নিয়ে ভাগছিস শালি? বার কর শিগগির।

হাউমাউ করে বাতাসী আর্তনাদ করে, ও বাবু, পায়ে পড়ি বাবু, আজকের মতো ছেড়ে দাও বাবু।

দাঁত বার করে তৃপ্তির হাসি হাসতে থাকে পেছনের লোকটা। সেই আবার এগিয়ে গিয়ে বাতাসীর কাপড় চেপে ধরে। আর-একজন সম্মতির দৃষ্টি নিয়ে সামান্য দূরে সরে দাঁড়ায়। রিভলবারটা বার করে হাতের ওপর নাচায়। মেয়েগুলোর ভয়ে আড়ষ্টতায় দম আটকানো ভাবটা ওরা খুব উপভোগ করছে— সেটা ওদের চোখ দেখেই বোঝা যায়।

সৌদামিনী হঠাৎ উঠে গাড়ি থামাবার শেকলটার দিকে হাত বাড়াতেই একজন এগিয়ে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে হাত নামিয়ে দেয়। —বড়ো যে শখ চাঁদ। শেকল টেনে গাড়ি থামাবে? চুরি করে ব্যাবসা করে আবার তেজ দেখ!

সৌদামিনী রাগে হাঁপায়, চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, তালি নাম্যে যাও। যা পার স্টেশনে নাম্যে কর। পাঁচজন লোকের সামনে বিচার হোক— পুলিশে দাও, হাজতে পোরো। তা না, চলন্ত গাড়িতে উঠে মেয়েগোরে কাপড় ধরে টানাটানি— এ কি চাল ধরা, না বজ্জাতি?

চোপরাও, হুংকার দিয়ে এগিয়ে আসে অফিসার একজন। ভারি যে গর্জন! সরকারি লোক দেখেও ভয় নেই একটু? ভাবছিস আমরা জানিনে চাল নিয়েছিস কোথায়? সব শালির কাপড় খোলাব আজ।

পেছনের দরজাটা বাতাসে কখন যেন খুলে গেছে, কিন্তু সেদিকে তাকাবার অবসরও থাকে না। লোকটা যতই এগিয়ে আসে, বুকের কাপড় শক্ত করে চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে সৌদামিনী পিছিয়ে যায়।

এতটুকু কুণ্ঠা নেই, আঁচল চেপে ধরে সরকারি লোক বলে, খোল কাপড়। সেপাইটার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, সেই যে চোখ নামায়, আর তোলে না।

রুদ্ধ কান্নায় শরীরটা তুলতে থাকে সৌদামিনী। তীব্র ঘৃণায় ঠোঁট দুখানা কুঞ্চিত হয়। শেষে প্রাণপণ শক্তিতে লোকটার চুলের গোছা মুঠি করে চেপে ধরে দু-হাতে। অফিসার বারেবারে মাথা নাড়ায়, ছাড়াতে পারে না। কষ্ট হয় খুব, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসে। শেষ উপায় হিসেবে বুটশুদ্ধ পায়ের একটা জোর লাথি কষিয়ে দেয় মেয়েটার পেটে। তাতেই কাজ হয়। কাপড়খানা থেকে যায় হাতে, খোলা দরজাটা দিয়ে সৌদামিনীই কেবল ছিটকে বেরিয়ে যায়। কাপড়ের শেষ প্রান্তটায় সামান্য একটু টান পড়ে। ভদ্রলোক নোংরা জিনিস হাতে পড়ার মতো চমকানো ভাব নিয়ে কাপড়খানাকেও জানলা গলিয়ে ফেলে দেয় বাইরে— বাতাসে ভেসে ভেসে উড়ে যায় সেটা।



লজ্জাহর

সে-কথা শুনে বন্ধুরা প্রথমে হেসেই অস্থির। শেষে চটে যায়। বলে কি প্রশান্ত!

এমন ছেলে, ধনে-মানে, রূপে-গুণে সারা বাংলাদেশে যার জুড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন —সেই ছেলেটা কিনা!

শুনে অবিশ্বাস হলেও কথাটা সত্যি। প্রশান্ত ভালোবেসেছে সেই কালো কুচ্ছিৎ, হতচ্ছাড়ী একটা গরিব মেয়েকে, যার অপদার্থতা আর অযোগ্যতারও জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার। শুধুই ভালোবাসেনি, আবার জোর গলার প্রশান্ত সে-কথা ঘোষণা করেও বেড়াচ্ছে। শুধু ঘোষণাও নয়— সবায়ের চোখের সামনে দিয়ে, নাকের ডগা দিয়ে সেই কুচ্ছিৎ মেয়েটাকেই নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সিনেমায়, পার্কে, রেস্তোরায়। কোনদিকে তার সঙ্গে কী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সে-কথাও বন্ধুদের বলে রাখতে দ্বিধা করছে না।

আপত্তি তো ছিল না। বিয়ে করবেই তো। প্রশান্ত বিয়ে করবে না তো কি বিয়ে করবে একশো তিরিশ টাকা মাইনের কেরানি অনিমেষ, নয়তো সিভিল সাপ্লাই-এর ছাঁটাই হয়ে যাওয়া বীরেশ্বর!

বিয়ে তো প্রশান্তরই সাজে! কিন্তু হোক না যোগ্যে, যোগ্যে। কেউ কি তাতে আপত্তি করবে? বরং তারাই তখন দিন-ক্ষণ দেখবে, দিন গুনবে।

কে কি প্রেজেন্ট করবে সুন্দর প্রশান্তর ততোধিক সুন্দর বউকে, সেটাও পনেরো দিন আগে থেকেই ঠিক করবে তারাই।

কিন্তু ছিঃ, এ কী কাণ্ড!

সবচেয়ে বেশি চটে অনিমেষই। সে একেবারে ক্ষেপে গেছে। প্রশান্তর মায়ের চোখের জল সে ভুলতে পারছে না কিছুতেই—তিনি যে তার হাত ধরে মিনতি

করে গেছেন ছেলেকে ও-পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার দায়িত্ব তাকে দিয়ে। বলে: ছোঃ, পছন্দের বাহাদুরী আছে বটে তোর। মুখে বলতিস একটা অদ্ভুত কিছু করবি, সত্যি সত্যি করলিও তাই?

প্রশান্ত একটু হাসে, রাগ দেখায়, তারপর শান্ত গলায় বলে: অদ্ভুতটা কী বল্? ভালোবাসার কি জাত-বিচার আছে? আর আমি নিজেই কি জানতাম যে আমি ওকে অত ভালোবাসি?

—যা, যা, বড়ো বড়ো কথা বলিসনে। ওই মেয়েকে ভালোবাসিস ভাবতে তোর লজ্জা হয় না?

একটা কালো কুচ্ছিত মেয়ে। দেখিনি তাকে ভেবেছিস? ক্রমাগত পেছনে লেগে থেকে থেকে ও যে কি মোহে ফেলেছে তোকে—। এখন বুঝছিস্নে। পরে বুঝবি।

তবু সেই গা জ্বালান হাসি হাসে প্রশান্ত: মোহ-টোহ নয় রে। সে-অবস্থাটা পার হয়ে গেছি। আমার পেছনে ও লেগে থাকবে কি রে? আমিই বরঞ্চ ডেকে ডেকে পাইনে। যা মেয়ে! জোর করে জেনে না নিলে হয়তো কোনোদিনই জানতে পারতাম না ওর কথা। শেষে কোনদিন হয়তো তোদেব কথামতো অন্য একটা কাউকেই বিয়ে করে বসতাম। ভগবান বাঁচিয়েছেন।

কথাটা মনে করে যেন সত্যি সত্যিই শিউরে ওঠে প্রশান্ত, আর অনিমেষ অবাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কথাগুলো যেন শুনেও বিশ্বাস হয় না। কী কুক্ষণেই যে আনন্দ মেয়েটাকে চ্যারিটি শোয়ের টিকিট বিক্রি করতে পাঠিয়েছিল প্রশান্তর কাছে।

এখন তার রাগ হয় অনেক কথা ভেবে। নিজের বোনটা ছিল, বি. এ. পড়ে, দেখতে সুন্দর, স্মার্ট। একটু মেলামেশা করতে দেওয়া পর্যন্ত হয়নি। আসলে সে ভাবতেই পারেনি সে-কথা। ভেবেছিল প্রশান্তর দৃষ্টি বুঝি অনেক ওপরে তোলা। কিন্তু ছিঃ! বোন অণিমার মতো তো দূরের কথা, শেষে ভালো লাগল এমন একটা মেয়েকে যাকে অনিমেষও হয়তো বিয়ে করতে রাজি হত কিনা সন্দেহ।

প্রশান্তর ভাবে-ভঙ্গিতে, কথায়-বার্তায় এমন একটা শান্ত জেদ যে বেশ বোঝা যায় সে তার সংকল্প স্থির করে ফেলেছে। সেখানে আর কোনোমতেই হাত দেওয়া যাবে না। তবু শেষ চেষ্টা করতে হয়— বন্ধুরা সবাই তাকিয়ে আছে অনিমেষের মুখের দিকেই।

—চল, তোকে আমি এমন সব মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, মিশে পরে এর কথা মনে করে তোরই লজ্জা হবে।

—লজ্জা! লজ্জা কিন্তু প্রশান্ত অনিমেষের কথাতেই পায়। একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, ভাই, তোরা সত্যি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। মেয়েরা কি পুতুল নাকি রে

যে তুই যা বলবি সেই কথামতো চলবে— হ্যাংলার মতো শুধু শুধু মিশবে কারুর সঙ্গে। তুই চেষ্টা করে কী করবি বল, আমি শুনব না;

—তাহলে তুই ওই বিধবা মেয়েটাকে বিয়ে করবি শেষ পর্যন্ত? দিনও ঠিক করেছিস নাকি?

—বিধবা! এবার প্রশান্ত হো হো করে হাসে, ওকে দেখে তোদের বিধবা মনে হচ্ছে? ওর যে স্বামী আছে সে খোঁজটাও রাখিসনে?

এবার অনিমেষই বিস্ময়ে আর লজ্জায় যেন মুষড়ে পড়ে।

—বিধবা ও নয়। স্বামী আছে? বলছিস কী তুই? কেন মেয়েটা স্বামীর ঘর করে না সে খোঁজ নিয়েছিস?

মাথা নেড়ে প্রশান্ত বলে, নিয়েছি। সে আমাবই জন্যে।

আর কি বলবে অনিমেষ? এরপরই আব কি-ই বা বলবার থাকতে পারে লোকের। হয় রাগ করে উঠে যেতে হয়, নয়তো স্তম্ভিত হয়ে থাকতে হয়।

দুটো মিশ্রিত ভাব নিয়েই খানিক বসে থাকে অনিমেষ, তারপরে উঠে যায় বটে কিন্তু হাল যে সহজে ছাড়বে না এমন একটা ভাব ফুটে থাকে ওর চোখে-মুখে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সেই হাল না ছাড়বার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি।

পরদিন সঙ্গে থাকে অক্ষয়, সুধীর, নীলকমল আর আনন্দ। বেশি লোক নিয়ে লাভ নেই, যারা ভালো করে কথা বলতে জানে— গুছিয়ে, ইমোশন দিয়ে— এমনি সব লোকই বেছে নিয়েছে অনিমেষ।

খুব পুরনো গলিটার ততোধিক পুরনো মেয়েদেব যে-মেসটায় মেয়েটা থাকে, তার দরজায় আনন্দ আর নীলকমল দাঁড়িয়ে থেকে। বিরক্ত হয়ে ভাবে অনিমেষ আর অক্ষয় আর কতক্ষণ ধরে বোঝাবে! যদি হঠাৎ প্রশান্ত এসে পড়ে। সব জেনে সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না ওদের— এটা নিশ্চিত।

নীলকমলকে আনন্দ বলে, তোবাও ভাই আচ্ছা, না হয় একটা খারাপ মেয়ের একটা ভালো গতিই হয়ে যেত, তাতে তোদের কী? বিয়েটা তো প্রশান্ত তোদের কাউকে করছে না? ওর যদি ভালো লেগে থাকে...! আর মেয়েটা কিন্তু সত্যিই ভালো রে নীলু, এক অফিসে কাজ করি তো। গল্পে-উপন্যাসে যা হতে পারে, বাস্তব জীবনে সত্যি হলেই মানুষ চটে কেন?

—কী জানি, নীলকমল সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বিরক্তমুখে বলে, আসলে অনিমেষ এখন জ্বলছে নিজের বোনটার কথা ভেবে, আর অক্ষয়ের রাগ তার শালীর জন্যে। নইলে সত্যি দেখ, প্রশান্তটা আমাদের এত ভালোবাসে, হয়তো এই নিয়েই সম্পর্কটা যাবে চুকে।

অবশেষে অনিমেষ আর অক্ষয়কে আসতে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হওয়া যায়। ওদের পেছন পেছন আসছে মেয়েটাও। তাকে দেখে নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। ভেতর থেকে একটা অপরাধবোধ তাকে কেবলই পীড়া দিচ্ছে, তাই বুঝি সোজাসুজি কিছুতেই তাকানো যায় না।

মেয়েটা কিন্তু তাকায়, আনন্দকে একটা নমস্কারও করে হাসিমুখে। কিন্তু হাসিটুকু যে জোর করে টেনে আনা, ওর শুকনো চোখদুটোর পেছনে একরাশ জল যে থমকে থেমে আছে— তা বুঝতে পারবে না এত কম বোধশক্তি আনন্দের নয়।

সেই বিষণ্ণ চোখ দুটো দেখেই বোঝা যায় যে জয় অনিমেষেরই হয়েছে।

যাবার সময় দরজার দাঁড়িয়ে সে বলে, তাহলে সেই কথাই রইল শিবানী দেবী? যেমন করে পারি এক সপ্তাহের মধ্যে বাসা একটা খুঁজে দেবই আপনাকে। দেখুন তো কাণ্ড। ভাবলেই অবাক হচ্ছি, পরিমলের স্ত্রী আপনি— এই কথাটা আগে জানতাম না, সত্যি অদ্ভুত।

তারপর খানিকটা উদাত্ত গলায় বক্তৃতা দেবার মতো করে অনিমেষ সবাইকে শুনিয়ে বলে, শুনে রাখ তোমরা সবাই। যেমন করে পার প্রাণপণ চেষ্টায় একটা বাসা খুঁজে বার করতেই হবে। সমস্যাটা কী ভয়ংকর দেখেছ— একটা বাসার অভাবে দুটো মানুষ দুই ঠাঁই হয়ে রয়েছেন। উনি পড়ে আছেন এই এঁদো মেসে, আর আমার বন্ধুটিরও সেই অবস্থা। আপনি কিছু ভাববেন না শিবানী দেবী— ভার যখন নিলাম তখন ব্যবস্থা আমরা করবই।

মেয়েটা আবারও হাসার চেষ্টা করে, আবারও নমস্কার করে, তারপর পেছন ফিরে ভেতরের দিকে চলে যায় একটা রুগ্ন, অক্ষম লোকের মতো আস্তে আস্তে। যেন এখুনি কোথাও বসে পড়তে পারলে সে বাঁচে।

রাস্তায় নেমেই অনিমেষ বলে, ধ্যেৎ, যত সব রাবিশ কাজ এসে জোটে আমার ঘাড়ে। অতগুলো মিথ্যে কথা বলতে হল সকালবেলাটাতেই। ওর স্বামীকে তো আমি চিনিই না, নামটা কেবল জেনে নিয়েছিলাম প্রশান্তর কাছ থেকে, কিন্তু এতটুকু ধরতে পারল না মেয়েটা। একটা কথা জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না! দ্বিতীয় মিথ্যে হল— সে ভাই বলতে গিয়ে আমার নিজেরই কেমন করতে লাগল। স্রেফ বানিয়ে বলে দিলাম প্রশান্তর কথা। সে বলছে; আসলে সে মেয়েটাকে ভালোবাসে না, নেহাৎ নাছোড়বান্দা হয়ে বলে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে। তারপর দিলাম এক ইমোশনাল বক্তৃতা। বড়োলোকের খেয়ালি ছেলে। দুদিন একটু ইচ্ছে হয়েছে তাই মিশেছে— ভালমানুষি করেছে। কিন্তু আপনি, বিবাহিতা, বুদ্ধিমতী মেয়ে আপনি কেন ওকে প্রশ্রয় দেবেন?

আনন্দ বলে, বক্তৃতা তো দিলি বুঝলাম, কিন্তু শিবানী কী বলল তাই বল না।

একটা কথাও না। মাথা নিচু করে কেবল শুনে গেল চুপ করে। তারপর যখন

বললাম পরিমল আমার বাল্যবন্ধু, সেই আমাকে পাঠিয়েছে শিবানীকে ফিরে যাবার কথা বলতে, তখন জানিস ভাই— বলতে গিয়ে অনিমেষও যেন থমকায়। এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল যে আমার সারা শরীরটাই যেন কাঁপুনি ধরে গেল। মনে হল সমস্ত মিথ্যেটা যেন ধরা পড়ে গেল তখনই। তারপরই মেয়েটা কিন্তু হেসে ফেলল, বেশ উনি যদি বলে থাকেন যে বাসাটা একমাত্র সমস্যা আর আপনারা যদি সত্যি তাঁর বন্ধু হন তবে দিন একটা বাসা ঠিক করে। দেখব আর একবার... একবার।

বলতে বলতে সেই যে চুপ করে গেল আর একটা কথাও বলল না।

যা হবার হল। যার ভয়ে বাড়ি ছাড়া হয়ে দুদিন ধরে এখানে-ওখানে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে অনিমেষ, অনেক রাত্রে বাড়ি এসে শোনে সেই লোকটাই তাকে বারেবারে খুঁজে গেছে। প্রশান্ত এ-বাড়িতে কখনো একবার আসাটাই সবার পক্ষে একটা আলোচনার ব্যাপার— সেই প্রশান্ত পাগলের মতো কড়া নেড়ে নেড়ে বারে বারে খুঁজে গেছে তাকে। শেষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছে পর্যন্ত ওর আসার অপেক্ষায়।

আবার এসেছে খুব ভোরে পুলিশের মতো। কে জানে কেমন করে যেন বুঝেছে—সে-সময়টা আব পালিয়ে থাকতে পারবে না অনিমেষ। একটা ময়লা পাঞ্জাবি, উস্কোখুস্কো চুল আর রাত জাগার চিহ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে।

অনিমেষের জামার কলার চেপে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে প্রশান্ত তাকে সামনের পার্কে নিয়ে যায়।

অনিমেষ বলে, ওরে ছাড় ছাড়, ব্যথা লাগছে যে। দাঁতে দাঁত চেপে প্রশান্ত বলে, ব্যথা? তোর আবার ব্যথা বোধ আছে না কিরে? নাকি নিজের ব্যথাটাই বুঝতে শিখেছিস কেবল?

বেঞ্চে বসে পকেট থেকে চিঠি বার করে দেখায় প্রশান্ত। তার সেই শান্ত হাসি কোথায় চলে গেছে, হিংস্র, নিষ্ঠুর হয়ে গেছে মুখ। শক্ত করে হাত চেপে ধরে অনিমেষের, এসব কী? আমি ওকে দয়া করি—আমি ভালোবাসি না। এ-চিঠি আমাকে লিখল কেন? হোস্টেল ছেড়ে চলে গেছে কেন? অফিসে আসে না! কোথায় গেছে? বল শিগগির—নইলে তোকে গুলি করে মারব।

তার চোখ-মুখ দেখে সে-কথাও অবিশ্বাস হয় না অনিমেষের।

সে ঢোক গিলে বলে, কোথায় গেছে আমি জানি নে। কিন্তু শিগ্‌গির ওরা বাসায় যাবে দুজনে এটুকু জানি।

তারপর প্রশান্তর কাছেও সে সেই পুরনো মিথ্যে কথাটাই বলে, আগে জানতাম না— জানিস ওর স্বামী পরিমল আবার আমাদেরই দেশের ছেলে, এককালে বন্ধুত্বও ছিল। ছেলেটাকে তো বেশ ভালো বলেই জানতাম। ওর কাছ

থেকেই শুনলাম আসল ব্যাপারটা। মেয়েটাই আসলে ভালো না রে। স্বামীর সঙ্গে রাগারাগি করে পাতা সংসার ছাড়ে যে-মেয়ে সে আর কত ভালো হতে পারে?

সব কথা শুনছে কিনা প্রশান্তর মুখ দেখে তা বোঝা যায় না। সে কেবল বারে বারে একটা কথাই বলে, তুই শুধু ও কোথায় আছে বলে দে, আর কিছু চাইনে।

অনিমেষেরও যেন জেদ চেপে গেছে। সে বানিয়ে আর একটা মিথ্যে কথা বলে, আমিই কি জানি? তবে কাল পরিমল বলেছিল ও নাকি কোন্ বাসার খোঁজ পেয়েছে। হয়তো সেই নতুন বাসায় উঠে গেছে দুজনে। আচ্ছা দাঁড়া আজ যেমন করে পারি পরিমলের সঙ্গে দেখা করে ওদের ঠিকানা জেনে তোকে জানাব— কেমন? যা এখন বাড়ি যা শান্ত। কী চেহারা করেছিস রে?

প্রশান্ত সে-কথায় কানও দেয় না, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে, শিবানী তবে তার স্বামীর কাছেই ফিরে গেছে বলেছিস? সত্যিই কি পরিমল ওকে ভালোবাসে?

ভালোবাসে মানে?— অনিমেষ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রশান্তর বলা কথাটার ওপর, দেব তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে ছেলেটাকে। দেখিস কত উদার তার মন। কত বার কত অন্যায় সে ক্ষমা করে গেছে। করবি আলাপ? প্রশান্ত জ্বলে জ্বলে ক্ষয়ে যাওয়া মোমবাতির শেষ টুকরোটার মতো হঠাৎ যে জ্বলে ওঠে এক মুহূর্তের জন্যে, বলে, তাই দে। শুধু ওর সঙ্গে নয়, সেখানে যেন শিবানীও থাকে, তোরা আমার সব বন্ধুরা থাকবি। আমি সব কথা সামনাসামনি শুনতে চাই, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে। আর— একটু থমকায় প্রশান্ত— একটা কান্না-মেশানো ভাঙা ভাঙা স্বর যেন বেরোতে চায় না গলা দিয়ে, সেদিন অনিমাকেও আনিস সঙ্গে করে, বুঝলি। তোর ইচ্ছেই দেখি পূর্ণ করতে পারি কিনা।

অনিমেষ লজ্জিত মুখে বোকার মতো একটু হাসে, বলে, বন্ধুত্বের অনেক জ্বালা রে শান্ত। কিন্তু এটা তুই একদিন না একদিন স্বীকার করবিই।

প্রশান্ত সেই সকাল বেলাকার শিশিরে ভেজা বেঞ্চিখানার ওপরই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বলে, তুই বাড়ি যা অনিমেষ, আমি এখানে একটু শুয়ে থাকি বরং।

সে কী রে? এখানে শুবি কী? নিজের বাড়ি না যাস্ আমাদের বাড়ি চল অন্তত। সারারাত তো ঘুমোসনি মনে হচ্ছে, ঘুমিয়ে থাকিস।

প্রশান্ত কিন্তু আর একটা কথারও উত্তর দেয় না, অনিমেষের হাজার ডাকাডাকি, টানাটানিতে সে ওঠে না। কেবল নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে, তবে যে বড়ো গলায় বলেছিলাম আমি ভুল করিনি। সে কীসের জোরে! কেন! সে কেন!

কটা মিথ্যে বলে তারই পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ে অনিমেষ বেচারীকে ছুটোছুটি বড়ো কম করতে হয় না ক'টা দিন।

যে পরিমলকে সে জন্মে দেখেনি তার ঠিকানা খুঁজে বার করতে তার তিন দিন অফিস কামাই করতে হয়। তারপর তাকে বোঝানোর পালা আছে শেখানোর কষ্ট আছে। শিবানীর খোঁজটা পেতেও তাকে কম কষ্ট করতে হয় না।

আর রাগ হয় বন্ধুদের ওপর। অদ্ভুত নিষ্ক্রিয় ঔদাসিন্যে সরে দাঁড়িয়েছে সবাই, যেন সব দায় তারই একার।

বোনের কথা ভেবে সত্যি সে এতদূর এগোয়নি— এখন অবশ্য ভাবছে। আর সে-কথাটাও মনে করিয়ে দিয়েছে প্রশান্তই, নইলে সে কি ভাবতে সাহস পেত?

ঠিক দিনে, ঠিক সময়ের আগেই সাজানো চেয়ারগুলোর একটাতে জেদি ঘোড়ার মতো ঘাড় শক্ত করে এসে বসে আছে প্রশান্তই সবার আগে। এমনকী সমস্ত ব্যাপারটা যার উৎসাহে ঘটতে চলেছে সেই অনিমেষ পর্যন্ত অনুপস্থিত। এক পেয়ালা চা চেয়ে নিয়ে প্রশান্ত চামচ দিয়ে এতক্ষণ ধরে নাড়ছে, দেখলে মনে হয় ওর মধ্যেকার চিনির দানা ক'টাকে যেন কিছুতেই গলাতে পারছে না, যেন চায়ের পেয়ালা চেয়ে নিয়েছে প্রশান্ত, অনন্তকাল ধরে নাড়বার জন্যে, চা খাবার জন্যে নয়।

আরও একজন এসেছে, চুপ করে বসে থেকে লক্ষ করছে প্রশান্তকে। সে অনিমেষের বোন অনিমা। প্রশান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে তার কেমন কষ্ট হতে থাকে, বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। তবু হাসবার চেষ্টা করে সে বলে, প্রশান্তদা, চা'টা অতক্ষণ ধরে নাড়ছেন, ঠান্ডা হয়ে গেল যে।

এতক্ষণে প্রশান্তরও যেন হঠাৎ খেয়াল হয় যে তার সামনে বসে আছে অনিমেষের বোন, সেই তাকে আসতে বলেছিল।

লজ্জিত হয়ে কাপটা মুখের কাছে তুলে আবার নামিয়ে রেখে সে কী যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ একসময় আনাড়ির মতো বলে বসে, অণিমা তুমি শিবানীকে দেখেছ কখনও? কোনোদিন? ঘাড় নেড়ে অণিমা বলে, না। কিন্তু আনন্দদা বলেন খুব ভলো মেয়ে।

ভালো, প্রশান্ত হাসবার চেষ্টা করে, হ্যাঁ, ভালো। শুধু ভালো নয়— ওকে আমার মনে হয়েছিল ভারি সুইট— প্লিজিং। জানিনে সে কেন? মনে হয়েছিল, ওকে ছাড়া আমি এতদিন ছিলাম কী করে? তুমি জানো না অণিমা, ও আমাকে কেমন করে পালটে দিয়েছে।

অণিমারও চোখ ছলছল করে, সে মৃদুস্বরে বলে, জানি। আগেও তো আপনাকে দেখেছি।

তারপর সামনে সরে এসে বন্ধুর কানে কানে বলার মতো করে সে বলে, প্রশান্তদা, আমি বলি কী, আপনি চলে যান। এত লোকের সামনে শিবানীদিকে অপমান নাইবা করলেন। কৈফিয়ত নিতে হলে আপনি নিজে নেবেন।

না। প্রশান্ত হঠাৎ শক্ত সোজা হয়ে বসে বলে, না। আমার সমস্ত বিশ্বাস আর

নির্ভরতার অপমান যে করতে পেরেছে, সে-অপমানের খানিকটা ভাগ তাকেও নিতে হবে বইকি। এই চকচকে আলোর নীচে বসিয়ে ওকে অপমান করে দিশেহারা করে দেব— অথচ পালাতেও দেব না— দেখব তখন কেমন লাগে। নিষ্ঠুর অভিমান-ভরা সেই থমথমে মুখ, আর অনিমেষের সঙ্গে আরও কয়েকজনকে আসতে দেখে অনিমা বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকে, কেবল তাঁর ব্যগ্র দুই চোখ মেলে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে সেই মেয়েটাকে দেখবার অপেক্ষায়। সে কেমন! কেমন সে-মেয়ে।

অবশেষে সেও আসে। তাকে দেখে চমকায় অণিমা। যেন ঝড়ে ভেঙে-পড়া গাছটা পড়তে পড়তে কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে পড়ে যাবার, অথচ হাত বাড়িয়েও কোনো অবলম্বন পাচ্ছে না।

পরিমলের পাশের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে অনিমেষই তাকে উচ্চকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়, আসুন, আসুন। পরিমল তো কিছুতেই ভিতরে ঢুকবে না। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিল আপনার জন্যে।

শুনে মেয়েটা একবার কেবল তার ভীরু ভীরু চোখদুটো তুলে পরিমলেব দিকে তাকায়। পরিমল তখন নিচু গলায় প্রশান্তর সঙ্গে কী কথা বলছে চেযারে কাত হয়ে, আর লক্ষ করলে বোঝা যায় প্রশান্তর কানে তার একবর্ণও ঢুকছে না, সে মনোযোগটাকে অন্যদিকে দিয়ে রেখেছে ইচ্ছে করে।

অণিমাই হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়ে তার পাশেব চেয়াবখানায় বসায় শিবানীকে— হাতখানা ধরাই থাকে হাতের মধ্যে। ঠান্ডা, ঘামে ভেজা একখানা হাত।

নিজের চেয়ার থেকে ঝুঁকে পড়ে শিবানীর কানের কাছে মুখ নিয়ে সে বলে, শিবানীদি, প্রশান্তদা সভা ডেকে আপনাকে অপমানই করুন আর যাই করুন, আসলে এত ভালোবাসা আর কোনও মেয়ে বোধ হয় পায়নি শিবানী আপনি নিজেও বোধ হয় তা জানেন না।

শিবানী একটা মুহূর্ত কেবল এই অপরিচিত মেয়েটার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাকায়, তারপরেই তার ঠোঁট দুখানা থরথর করে কেঁপে ওঠে, মনে হয় এখুনি সে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়বে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে নিজেকে সংযত করে ফেলে মেয়েটা।

একগাদা খাবার এসেছে অনিমেষের অর্ডারমতো— সেগুলো ছড়ানো রয়েছে যার যার সামনে কিন্তু তার একটাতেও কেউ হাত দেয়নি। আনন্দ, নীলকমল, অক্ষয়, সুধীর সবাই নিস্তব্ধ।

সে-নিস্তব্ধতা সহ্য করা কঠিন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, এক টেবিলে খাবার আর খান আষ্টেক চেয়ার দখল করে এরা যেন কোনো মৃত মানুষের শোকে

হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

অনিমেষই প্রথম সে-নিস্তব্ধতা ভাঙে। সে হাসিমুখে কাঁটা-চামচ তুলে নিতে নিতে বলে, আগে খাওয়াটা সেরে ফেল না সবাই, হাত গুটিয়ে বসে থেকে লাভ কী? অত গম্ভীর হবার তো কোনো কারণ নেই, কারণ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, একটি দম্পতীর সুখী জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্যে। তাঁদের মধ্যে মাঝখানে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝির ফলে একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল বটে কিন্তু আজ সেটা কেটে যাবে। তাঁরা আবার ফিরে যাবেন তাঁদের জীবনে।

কথাগুলো বলতে বলতে অনিমেষ নিজেই অবাক আর অভিভূত হয়ে যায় তার বাগ্মীতায়, বলতে বলতে তারও চোখ আবেগে ছলছল করে ওঠে।

কিন্তু তবু কেউ কাঁটা-চামচ হাতে তুলে নেয় না, কেবল প্রশান্ত অনর্গল সিগারেট খেয়ে চলে আর কাঁপা কাঁপা আঙুলে অনবরত সিগারেটের কল্পিত ছাই ঝাড়ে।

শেষ চেষ্টার মতো অনিমেষ আবার বলে, এখানে সেই দম্পতিটি উপস্থিত আছেন। শ্রীমতী শিবানী দেবী ও পরিমলবাবু দুজনেই তাঁদের কথা বলুন, তাহলে যে অবাঞ্ছিত ঘটনাটি ঘটেছিল সেটা এখান থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং আমরা আশা করব শ্রীমান প্রশান্ত এরপর নিশ্চয়ই প্রশান্ত মনে বাড়ি ফিরে যাবে।

অণিমা হঠাৎ অস্ফুট গলায় আর্তনাদ করে ওঠে, উঃ দাদা! তোমার পায়ে ধরছি, তুমি থামো।

সে-কথায় কানও দেয় না অনিমেষ, বলে, বলুন পরিমলবাবু আপনার কথা।

পরিমল চমৎকার কথা বলে। এমন পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে সে-কথা বলে যেন সবাইকে সে গল্প শোনাচ্ছে। শান্ত হাসিমুখে, শিবানীর বিবাহিত জীবনে প্রশান্তই যে প্রথম নয় সে-কথাটা এমন চমৎকার করে বর্ণনা করে যে বলা শেষ হয়ে গেলে সবাই ক্রুদ্ধ চোখে শিবানীর দিকে তাকায়।

পরিমল অবশ্য সেসবের জন্যে কোনোদিন স্ত্রীর ওপর অধিকার খাটাতে যায়নি— ক্ষুব্ধ হয়নি। বরাবরের মতোই স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু প্রশান্তর ব্যাপারের পর থেকে সে স্বভাবতই স্ত্রীকে আর প্রশ্রয় দিতে রাজি না হওয়ায় শিবানী তাকে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু প্রশান্তই যখন তার ভুল বুঝতে পেরেছে আর শিবানীও যখন রাজি আছে তখন পরিমলেরও কোনো দ্বিধা নেই শিবানীকে ফিরিয়ে নিতে। কেবল তার আগে শিবানী একবার নিজের কথা বলুক— প্রশান্ত যা যা শুনতে চায়। পরিমলের মনে হয়, তাতেই শিবানীর চরিত্রের একটা মস্ত বড়ো সংশোধন হয়ে যাবে, গ্লানিও কেটে যাবে। কৈফিয়ৎ দিক, কেন সে প্রশান্তর কাছে সত্য গোপন করেছিল, বিবাহিতা মেয়ে হয়ে কেন সে সবদিক বিবেচনা করেনি।

অনিমেষ বলে, বলুন শিবানী দেবী। পরিমলের কথার উত্তরে প্রশান্তকে সব শুনিয়ে দিন। ভীষণ ক্ষেপে আছে—!

যাদের উদ্দেশে এত কথা তাদের একজন এবার সিগারেট ছেড়ে মাথার চুলগুলো মুঠো মুঠো করে যেন ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে।

আর আসামীর কাঠগড়ায় আটকা পড়ার মতো চেয়ারে সমস্ত শরীরের ভারটা দিয়ে হতচৈতন্যের মতো মেয়েটা বসে আছে। তার পাংশু মুখ, তার চোখদুটোর দিকে তাকালেও বোঝা যায় না, সব কথা তার কানে যাচ্ছে কিনা।

অনিমেষ বলে, বলুন। এসব কি মিথ্যো?

খুব আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে মেয়েটা, বন্ধ করা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটামাত্র শব্দ বেরিয়ে আসে, না।

না! সবাই যেন একসঙ্গে চমকায় সে-কথা শুনে।

যদি সত্যিও হয় তবু কি লোকে এমন করে স্বীকার করে। একটু প্রতিবাদ করল না মেয়েটা, পরিমলের একহাত দূরে বসেও এতটুকু বাধা দিল না তার গল্পে। নির্বিবাদে কলঙ্কটা মেখে নিল নিজের গায়ে।

অনিমেষ বলে, তাহলে স্বীকার করছেন যে, বড়োলোকের ছেলের টাকার লোভে আপনিই অনিমেষের পেছনে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থেকে তাকে ভুলিয়েছেন? অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই ও আপনার ফাঁদে পা দিয়েছে, আর অভিজ্ঞতা ছিল বলেই আপনি ইচ্ছেমতো ওকে ঘুরিয়েছেন। নইলে, সত্যি বলতে কি, দুঃখিত হবেন শিবানী দেবী, অনেক অ্যারিসট্রোক্র্যাট মেয়ে ওকে পাবার জন্যে তপস্যা করছে।

তাহলে স্বীকার করছেন। যে ওর কোনো দোষ নেই, দোষ আপনার?

বিষণ্ণ চোখদুটো একবার মাত্র প্রশান্তর মুখের ওপর রেখে তারপরই নামিয়ে নেয় মেয়েটা, খুব মৃদু আরও একটা শব্দ বেরিয়ে আসে, হ্যাঁ।

হঠাৎ সবাইকে চমকে, ঝনঝন করে সামনের কাচের কাপ-ডিস আছড়ে ফেলে, চেয়ারখানাকে উলটে দিয়ে যেন দৈত্যের মতো হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে প্রশান্ত। ছুটে আসা বয়-বেয়ারাদের সে গ্রাহ্যও করে না। এগিয়ে এসে শিবানীর একখানা হাত শক্ত করে চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে, হ্যাঁ? এত বড়ো মিথ্যে কথাটা বলতে তোমার মুখে বাধল না? তুমি নাছোড়বান্দা হয়ে ভুলিয়েছ। আমার টাকার লোভে? তোমার কাহিনি শোনানো হচ্ছে আর তুমি তাই শুনছো?

শিবানীর চোখ ছাপিয়ে এতক্ষণ পরে জল নামে, সে মৃদুস্বরে বলে, তুমি যে তাই চেয়েছিলে।

—আমি! প্রশান্ত যেন আর্তনাদ করে ওঠে, আমি কি যা চেয়েছি সব তুমি

দিয়েছ যে এই অপমানের ভাগ নিতে দৌড়ে এলে? আমাকে শাসন করলে না কেন?— প্রশান্ত যেন কেঁদে ফেলবে এখুনি।

যেন একটা নাটক অভিনয় হচ্ছে। এ-পাশে, ও-পাশে কত যে লোক অবাক হয়ে দেখছে তাদের সে খেয়ালও নেই কারুর।

শিবানী বলে, কিন্তু যা শুনলে সে তো মিথ্যে নয়।

—কী মিথ্যে নয়। তোমার আগের কথা? মিথ্যে হলেই যে দুঃখ পেতাম বেশি। ভালোবাসতে জানো বলেই তো সীমাও টানতে জানো, কষ্ট দিতে পারো, কষ্ট নিতেও পারো। অন্যেরা তা পারে না, তাই তাদের রাগ হয়, হিংসে হয়।

হাতখানা আরও শক্ত করে চেপে ধরে প্রশান্ত বলে, চল শিগগির এখান থেকে। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। পকেট থেকে কতগুলো টাকা বার করে হতভম্ব অনিমেষের দিকে ছুঁড়ে দেয় সে, নে অনি, ভাঙাচোরার দাম শোধ করিস।

বন্ধুদের বলে, তোরা খেয়ে নে ভাই। আমরা চললাম, আবার দেখা হবে।

তার সেই পেশিবহুল হাতের মুঠো ছাড়ায় সাধ্যি কি শিবানীর! সত্যি সত্যিই পালিয়ে যেতে দেয় না তাকে প্রশান্ত। সেই দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলোর সারির মধ্য দিয়ে প্রশান্তর সঙ্গে বেরিয়ে আসতে লজ্জায় আনন্দে এতক্ষণে সত্যি সত্যি দিশেহারা দেখায় কালো মেয়েটাকে।



ফাটল

অজয় এসে অন্ধকার ঘরের বাইরে থেকে ডাকে, মা। অনেকখানি চোখের জল জোর করে আঁচল দিয়ে মুছে তবে সুমতি মুখোমুখি হতে আসেন, বলেন, কী খোকা?

মা, অরু এসেছে। বাইরের ঘরে চুপ করে বসে আছে, কিছুতেই ভেতরে আসবে না। তুমি গিয়ে নিয়ে এসো মা।

আমি? আমি যাব? নিষ্ঠুর কর্কশ গলায় সুমতি চেঁচিয়ে ওঠেন, এসেছে থাক, কিন্তু আমাকে আর কিছু করতে বলিসনে অজয়। ও মেয়ের মুখের দিকে আর ভালো করে তাকাতে পারব না।

অজয় বলে, ভালো করে সব না শুনেই... এমন হয়েছ তুমি...।

শুনব কী? কেন শুনব? আর কি কিছু শোনবার বাকি আছে আমার?

কে যেন লঘু পায়ে পেছনে এসে দাঁড়ায়, মৃদু গলায় বলে, বাকি এখনও কিছু আছে মা, কিন্তু সেসব আমি তোমাকে শোনাব না। আর থাকতেও আমি আসিনি মা, কয়েকটা দিন পরেই চলে যাচ্ছি চাকরির জায়গায়।

সুমতি কেঁদে ফেলে বলেন, অরু! এমন নিষ্ঠুর কথা তুই আমাকে শোনাতে পারলি? আমার যন্ত্রণা বুঝবিনে...। জানিস আজও তোদের বাবাকে স্মরণ না করে আমি এক গণ্ডূষ জলও খাইনে।

অরুণা বলে, সেটা কি খুব গৌরবের কথা মা?

সুমতি একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকেন মেয়ের ধৃষ্টতায়, তারপর বলেন, একটা নতুন কথা বলি শোন, খোকা তুইও শোন— তোরা জানিস আমিই বুঝি ইচ্ছে করে স্বামীকে ত্যাগ করেছিলাম— তা নয়। তিনিই আমাকে ত্যাগ করেন— কেন

করেন তার কারণ আজও জানিনে। তবু আমি তাঁর ছবি পুজো করি।

অরুণা মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে। তাকে হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার সর্বাঙ্গ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন সুমতি, তাঁর ঠোঁট কাঁপে থর থর করে, বলেন, এমন করলি কেন তুই? সে তো চরিত্রবান ছেলে। কোনও দোষের কথা তুইও তো কোনওদিন বলিসনি আমাকে? নিজে ইচ্ছে করে যে তুই তাকে বিয়ে করেছিলি— ছাড়তে কষ্ট হবে না?

এ-কথায় অরুণার চোখ বেয়ে ঝরঝরিয়ে জল নামে কিন্তু রুমাল দিয়ে চোখ টিপে সে বসে থাকে, কাঁদতে তার লজ্জা করে। কান্না-জড়ানো গলায় বলে, কষ্ট যে তোমার চেয়ে আমারই বেশি— এটা তো মানো? তবু...।

তবু কী? —তীক্ষ্ণ গলায় সুমতি জানতে চান।

তবু...। যাকে বলে সুখ, সেটা ছাড়া জীবন চলে না মা।

কেন তোদের কি সুখ ছিল না?

জানিনে মা। তার সংজ্ঞাটা আমার জানা নেই। চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু অনুভবের বাইরেই থেকে গেল সেটা।

তা হলে কী করবি তুই? কী করবি? —সুমতি যেন আর্তনাদ করতে থাকেন।

চলে যাব। একটা চাকরি পেয়েছি মা।

ঝগড়াঝাঁটি না— কিছু না। হাসতে হাসতে, কথা বলতে বলতে... এ পাপ! এ পাপ! —সুমতি হঠাৎ বিছানায় মুখ গুঁজে হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠেন।

অরুণা তাঁর মাথাটা তুলবার চেষ্টা করে ডাকে, মা, ও মা— শোনো— অমন কোরো না।

কান্নাভরা গলায় সুমতি বলেন, আর আমাকে মা বলে ডাকিসনে অরু। তোর ও-ডাক আমার কানে বিষ ঢালছে। ছিঃ ছিঃ, কী পাপ...।

খানিক স্তব্ধ হয়ে মাথার কাছে বসে থাকে অরুণা, কাঁদেও হয়তো নিজে, তারপর কখন একসময় উঠে চলে যায়।

তারপর থেকে সুমতি অনবরত কাঁদছেন ঘরে দরজা বন্ধ করে।

অনেক কেঁদে শ্রান্ত হয়ে উঠে বসে এক সময় সুমতি গলায় আঁচল দিয়ে ঘরের কোণে ঝোলা ছবিখানার উদ্দেশে প্রণাম করেন। কতবার অজয়ই ওখানা নামিয়ে রাখতে চেয়েছে— সরিয়ে দিতে চেয়েছে চোখের সামনে থেকে কিন্তু তিনি প্রচণ্ড আপত্তি করে বাধা দিয়েছেন। তারপর থেকে আজ কতদিন ধরে ওখানেই আছে— যখনকার ছবি তার চেয়ে অনেক বেশি বয়স বেড়েছে মানুষটার— সুমতি তা জানেন। কিন্তু তাঁর মনে গাঁথা আছে একটাই মুখ, যে মুখে বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি— পড়তে পারে না। ম্লান হয় না সে-ছবি কখনও। এখনও দরজা বন্ধ করে

মাঝে-মাঝেই তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন ছবিটার দিকে— তাকিয়ে তাকিয়ে অনুভব করেন সেই নিষ্ঠুর অতীতটাকে। দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে নিঃসহায় দেখেও মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া নিষ্ঠুর মানুষটার কথা মনে পড়ে। কিন্তু কই রাগ তো হয় না।

বহুদিন আগে উত্তেজিত হয়ে ভাইবোন বলত, কী বলব তোমাকে, মা, কী বলব? এখনও তুমি তাকে মনে করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল।

সুমতি তখন তাকিয়ে থেকেছেন অজয়ের বলিষ্ঠ চেহারার দিকে, অরুণার সুন্দর মুখখানার দিকে। একটা কথা ঠেলে ঠেলে উঠেছে বুকের মধ্যে, ও না হলে তোকে পেতাম না যে— তোদের— অজয় আর অরুণা! কিন্তু সে-কথা বলা যায়নি, কেবল ছেলেমেয়ের মুখে দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু ক্ষমার হাসি হেসেছেন তিনি।

এখনো তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর জ্বল জ্বল করছে স্বামীর কল্যাণ কামনায় রোজ সন্ধেবেলায় ফোটোখানার সামনে প্রদীপ, ধূপ-ধুনো জ্বালিয়েছেন তিনি। অজয় তাতেও রেগেছে, সিঁদুর মুছে ফেল তুমি। কেন ওই চিহ্নটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে শুনি? লজ্জা করে না?

ছিঃ ছিঃ, সুমতি অজয়ের মুখ চেপে ধরেছেন, ও-কথা বলতে নেই খোকা।

লজ্জা তাঁর করে না। ওই পরিচয়টুকু নিয়েই দুই ছেলেমেয়েকে বুকে করে মানুষ করে তুলেছেন তিনি।

বুক-ভাঙা সম্পদ তাঁর ওরা। কবে কোনদিন একটা লোক তাঁকে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিল ওই সিঁদুর। দিয়েছিল অজয় আর অরুণাকে। খানিকটা আশা, কিছু আনন্দও দিয়েছিল বুঝি কোনওদিন। কিন্তু সবকিছুকে সেই আবার মুছে দিল কেবল সিঁদুরটুকু ছাড়া। ছেলেমেয়ের মায়া তাকে টানেনি, তাঁর জীবনের পথ থেকে সরে একেবারে অন্য আর এক জগতে গিয়ে পড়েছিল সেই মানুষ। সে বড়ো ঘৃণার ইতিহাস। সে-কথা ভাবতে গেলে ইতিহাসটার ওপর রাগ হয়, কিন্তু চেষ্টা করেও মানুষটার ওপর রাগতে পারেননি তিনি, অন্য কিছু ভাবতেও দেননি মনকে। শক্ত হাতে তার রাশ টেনে রেখেছিলেন।

তাঁর ভাইরা রেগে-ক্ষেপে গিয়ে এক অদ্ভুত অসম্ভব কথাও মাঝে মাঝে শোনাত তাঁকে। মামলা করবে, সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করবে। আবার নাকি নতুন করে জীবনটা সফল করা যাবে। তেমন মানুষও ছিল সুমতিকে সাগ্রহে বরণ করে নেবার মতো। জীবনকে সুন্দর করবার মতো সুমতিরও তো ছিল রূপ, যৌবন, বুদ্ধি কোমলতা।

শুনে তিনি কানে হাত চাপা দিয়ে ছুটে পালাতেন। তাঁর বুক ভেঙে কান্না আসত। এ কি হয়! কখনও না— কিছুতেই না। ছিঃ।

কষ্ট হয়েছে। যন্ত্রণা হয়েছে। এক দুর্বোধ্য কষ্টে নিঃশব্দে কেঁদেছেন। এক হাহাকার করা ছটফটানিতে রাতের পর রাত ঘুমোননি তিনি। কিন্তু সে-কষ্ট তো নিজের। তাকে সহ্য করবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। রাগ করেননি— অভিশাপ দেননি। বরং ছবি টাঙিয়ে রেখেছেন, সন্ধেবেলায় ধূপ-ধুনো দিয়ে পুজো করেছেন। বিশেষ দিন স্মরণ করে মালা পরিয়ে দিয়েছেন মাঝে মাঝে।

তারপর অজয় বড়ো হয়ে উঠেছে...। তারপর অরুণা।

আর তাঁর চাইবার ছিল না। মুগ্ধ চোখের সামনে দিয়ে সমস্ত পরীক্ষাগুলোতে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কৃতবিদ্য হয়ে অজয় মাথা তুলেছে, তার ছায়া হয়ে অরুণাও বড় হয়েছে। মেয়েকেও লেখাপড়া শিখিয়েছেন তিনি অজয়ের মতো করেই।

ছেলেমেয়েকে নিজে তিনি যেমন ভালোবেসেছেন— ওরাও তেমনি তাঁকে ভালোবেসেছে। বড়ো হয়ে লেখাপড়া শিখেও সে ভালোবাসা এতটুকু কমেনি। কিন্তু একটা পরিবর্তন চোখে পড়েছে তাঁর। কোথায় যেন একটা অমিলও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।

সুমতি দেখেছেন তাঁর আজন্ম সঞ্চিত চিন্তার সঙ্গে অজয় মত মেলাতে পারে না, বড়ো যেন খাপছাড়া ওদের কথা— বিদ্যাবুদ্ধির কাছ থেকে পাওয়া জ্ঞান সবাযের মতো নয়।

কিন্তু মাকে ওরা সেজন্য কখনও ছোটো করেনি— হাসিমুখে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। হতাশ হলে রেগে যায়নি কিন্তু মেনেও নেয়নি তাঁর মতকে।

কতদিন ভয় পেয়ে সুমতি বলেছেন, অরুর ওইসব অদ্ভুত কথাকে তুইও সমর্থন করিস খোকা? স্বামী ছেড়ে আবার বিয়ে করবার অধিকার থাকবে মেয়েদের— ছিঃ।

অজয় হাসতে হাসতে তাঁকে আরও রাগিয়ে ক্ষেপিয়ে দিয়ে বলেছে, করিই তো। তোমাকে দেখেই আরও করি।

কিন্তু সেসবও হাসির কথা— লঘু করে উড়িয়ে দেবার কথা। সুমতির তারপরে আর মনে থাকেনি সে-কথা।

তারপর অরুণা ইচ্ছা করে বিয়ে করেছে তাঁর মতামতের অপেক্ষা না রেখেই। বিরক্ত হয়েছেন সুমতি, দুঃখিত হয়েছেন তাঁর আদর্শের বিরোধী বলে, কিন্তু বাধা দেননি।

অজয়ও বিয়ে করেছে ইচ্ছে করে তার কলেজের বন্ধুকে।

একটার পর একটা ধাক্কা খেয়ে সুমতি তারপরে অনেকখানি শক্ত হয়ে গেছেন।

অজয়ের বউকে নিয়ে ঘর করে দেখেছেন তিনি। ঠকতে হয়নি তাঁকে।

লেখাপড়া জানা মেয়েরা ঠিক একেবারে মনের মতো হয় না হয়তো, ঠিক যেভাবে আশা করা যায় তা হয় না, কিন্তু তাদের অন্য মূল্য আছে। বিপদে-সংকটে ওরা ভাবতে জানে— ওদের পরামর্শ কাজে লাগে।

যেমন করেই হোক সংসারটা মোটামুটি সুমতির সুখেরই ছিল। ছেলে-বউকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। মাঝে মাঝে অরুণা এসেছে। পরিমল এসেছে।

কিন্তু! কবে একদিন যেন সে শান্তিটায় ফাটল ধরল। একদিন কবে যেন অরুণার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গিয়ে অন্ধকার নেমেছে— সুমতি তা দেখেও বুঝতে পারেননি।

সুমতির চেয়ে পুত্রবধূ অনীতা বুঝেছে বেশি। একদিন বলেছে, অরুকে কিছুদিন এখানে এসে থাকতে লিখে দিন মা। ওর শরীরটা খারাপ।

কী এক সম্ভাবনায় উজ্জ্বল দেখিয়েছে সুমতির মুখ, তোমাকে কি কিছু বলে গেছে বউমা? কই আমাকে তো কিছু...?

অনীতা বলে, সেসব কিছু না মা।

তবে? সংসার ফেলে, পরিমলকে ফেলে তার আসা কি সহজ?

সংসার করবার মতো তার আর মনের অবস্থা নেই মা।

তারপর আর বলতে চায় না অনীতা, বলে, এবার যাবার সময় দাদাকে বলে গেছে। আপনি শুনে নেবেন ওর কাছ থেকেই বরং।

শুনে সুমতির বুকের মধ্যে কেঁপে উঠেছে। কতবার অজয়ের কাছে গিয়ে ফিরে ফিরে এসেছেন জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি। তাঁর মতো দুর্ভাগ্য কি অরুণার কপালেও নেমে আসছে তবে? ভেবে ভেবে রাতে তাঁর ঘুম হয়নি— ভাত খেতে গিয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। শেষে অসহ্য মনের যন্ত্রণায় একদিন অজয়ের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, বল খোকা, অরু কী বলে গেছে তোকে।

আশঙ্কার বুক-ভাঙা কান্না হঠাৎ মাঝপথে থেমে গিয়ে বিকৃত হয়ে গেছে গলা, কী বললি? অরুই সম্পর্ক রাখবে না? কী বলছিস তুই?

শক খাওয়ার মতো চমকে উঠে তিনি অজয়ের মুখে নিজের হাত চাপা দিতে দিতে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছেন, ও-কথা আর উচ্চারণও করিসনে খোকা।

ছেলের কোলের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে থরথর করে কাঁপতে থাকেন সুমতি, ওর যে বিয়ে হয়ে গেছে— ও যে সুখের সংসারের ঘরণী।

তার চওড়া হাতে সুমতির কাঁচা-পাকা চুলে হাত বুলিয়ে অজয় বলে, সংসারটাই ওর আছে মা— সুখ নেই। জীবনে যদি সুখই না থাকল তবে মানুষের কী থাকল বল?

আমারও তো ছিল না সুখ কিন্তু আমি তো সহ্য করেছি।

ও যদি তা না পারে?

তাই বলে...! সুমতি উচ্চারণও কবতে পারেন না সে-কথা।

অজয় বলে, সে-অধিকার কেবল ছেলেদেরই দেখে এসেছ তাই অমন লাগে মা। কিন্তু— সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অনীতাকে দেখিয়ে সে বলে, ও যদি আজ অনুভব করে যে ওর আনন্দ নেই, সুখ নেই জীবনে— ওর মুক্তির অধিকারও তবে ওর হাতে-ই মা।

কানে হাত চেপে সুমতি কাঁপতে কাঁপতে উঠে আসেন। ছেলেমেয়েরা তাঁকে ভালোবাসে কিন্তু তাঁকে নির্বিচারে মেনে নেয় না— এটা তিনি বহুদিন থেকে বুঝেছেন। কিন্তু তা বলে এতদূর— ছিঃ ছিঃ!

ঘর ছেড়ে যাবার আগে একটা কথা বলে এসেছিলেন তিনি, তার আগেই আমার যেন মৃত্যু হয় খোকা। আমাকে যেন এ অনাচাব দেখতে না হয়।

মৃত্যু হয়নি— দিনগুলো কেবল কেটে গেছে নিরানন্দভাবে। কোথায় যেন মস্ত বড়ো একটা ছন্দপতন হয়ে গেছে সুমতির জীবনে।

কাজ করেছেন, ঘুরেছেন-ফিবেছেন কিন্তু অজয়ের সঙ্গে আর একটা কথাও বলেননি। কষ্ট হয়েছে খুব কিন্তু ভেবেছিলেন এই নিষ্ঠুরতা দিয়েই হয়তো ফেরানো যাবে অজয়ের মতকে— অরুণার মতকে।

কিন্তু সেই আসন্ন সর্বনাশকে রোধ করা যায়নি। অরুণা এসেছে সেই সর্বনাশের বাণী বহন করে— অজয তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

অনীতা এসে দরজায় ঘা দিয়ে বলে, মা মা, উঠুন। এদিকে আপনি কাঁদছেন ওদিকে অরু কাঁদছে। উঠুন মা— আপনার পায়ে পড়ি।

ওঠেননি সুমতি। অরুণা যদি কাঁদে তো কাঁদুক। চোখের জলে ওর মনের পাপ ধুয়ে যাবে।

আবার একসময় দরজায় ঘা দিয়ে অজয় বলেছে, কাল থেকে না খেয়ে আছ। বেশ, তুমি না খেলে আমরাও খাব না কিন্তু জানিয়ে দিলাম। সে-কথাও তাঁকে ওঠাতে পারেনি।

শেষবার অনীতা যখন দরজায় অনবরত ধাক্কা দিয়ে কান্নাভরা গলায় বলেছে, ও মা, আপনি না খেলে ওরা যে কিচ্ছু খাচ্ছে না— দেখুন এসে। সব খাবার নষ্ট হচ্ছে— তখন উঠেছেন তিনি।

কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছেন না সুমতি।

অজয় তাঁকে সবল হাতে জোর করে ধরে দুধের বাটি মুখের কাছে তুলে ধরে। খেতে হয় খানিকটা, কিন্তু তারপরেই মুখ সরিয়ে নিয়ে আবার কাঁদতে থাকেন সুমতি, আমাকে কোথাও রেখে আয় অজয়। এ পাপের বাড়ি— এখানে আমার খেতে ইচ্ছে করছে না, থাকতে ইচ্ছে করছে না একটা মুহূর্তও।

সুমতির ঠিক পেছনেই অরুণা বসে আছে, তাকে তিনি দেখতে পাননি কিন্তু সে তাঁর কথা শুনতে পেয়েছে। কেঁদেছে সেও কিন্তু গলার স্বর তার শান্ত, বলে, পাপের বাড়ি থেকে পাপ-ই বিদায় হবে মা— তুমি কেন হবে?

তারপর কেঁদে ফেলে বলে, উঃ, এত নিষ্ঠুর তুমি মা!

সে-কথা শুনে সুমতির চোখ দিয়ে আরও জল গড়ায়। আবার তিনি গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন।

নিষ্ঠুর তিনি! বোঝে না তাই ও-কথা বলে মেয়েটা। তাঁর আদর্শ বড়ো কঠোর, তাকে অরুণাই বা কেন মেনে নিতে পারল না জীবনে?

অজয় তাঁকে প্রশ্ন করেছে, তোমার মতোই আরও একটা ব্যর্থ জীবন চাও তুমি?

ব্যর্থ! কোথায় ব্যর্থতা? সেজন্যে তাঁর মনে তো কোনও অভিযোগ নেই। অভিযোগ থাকলেই তা থেকে অনেক কিছুর জন্ম হয়— অভিযোগহীন জীবন তাই হয় শান্ত! তাঁর নিষ্ঠা আছে। ওদের নিষ্ঠা নেই— তাই অত অভিযোগ ওদের।

সারাটা রাত সুমতির অসহ্য যন্ত্রণায় কাটে— চোখের জল তাঁর যা পড়বার আগেই পড়ে গেছে, কেঁদে কেঁদে তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এবার জ্বালা করা শুকনো চোখ নিয়ে তিনি অন্ধকার ঘরখানায় ঘুরে বেড়ান।

মনে মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল, হয়তো অরুণা এসে পুরোনো দিনের মতো দু-হাতে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোলে মাথা রেখে বলবে, আমি তোমাকে ঠাট্টা করেছিলাম মা। ধ্যেৎ, তা কি হয়?

কিন্তু সে-আশা ফুরিয়ে গেছে, এখন অভিমানও হচ্ছে না। কেবল একটা ভয় মাঝে মাঝে তাঁর আপাদমস্তক কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তাঁর এতদিনকার তৈরি করা স্তম্ভকে যেন ভেঙে ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছে— এতদিনকার চিন্তাগুলোর গায়ে কে যেন কাদা ছুঁড়ে ময়লা করে দিয়েছে। কী করে বাঁচবেন তিনি সেই সঞ্চিত সঞ্চয় থেকে বঞ্চিত হয়ে?

একটুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে প্রদীপ ধরিয়ে তিনি দেওয়ালে টাঙানো ফোটোখানার দিকে তুলে ধরেন। আজও সন্ধেবেলায় তিনি প্রদীপ ধরিয়ে ফোটোখানার সামনে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। এ কাজে তাঁর ভুল হয় না।

কিন্তু কেন? সুমতি যেন নিজের মনেই প্রশ্নটা করে উত্তর দিতে না পারা পরীক্ষার ছেলের মতো প্রদীপ হাতে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন। প্রদীপের আলো কাচের ওপর খেলা করে— নড়াচড়া করে, তিনি মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বলিষ্ঠ একটা কঠিন মুখ— অজয় আর অরুণার বাবা। বাবা! কিন্তু তার বেশি পরিচয় কি আছে সুমতির জীবনে? একটা চরিত্রহীন, মাতালের মুখ ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সামনে। তাকেই তিনি পুজো করেছেন এতদিন— এই দীর্ঘ

তিরিশ বছর ধরে। একটা অদ্ভুত জেদের মতো আঁকড়ে থেকেছেন তাঁর চিন্তাকে। কিন্তু কেন!

আজ হঠাৎ নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতে থাকেন সুমতি। আজ বিকেলেও তিনি টলতে টলতে বেরিয়েছিলেন ঘর থেকে অরুণার সঙ্গে তর্ক করবেন বলে।

সে বলেছিল, আদর্শ মানতে গিয়ে অসুখী হয়ে কী লাভ মা?

কী লাভ করতে চায় ওরা! তিনি তো অরুণা আর অজয়কে পেয়েছিলেন... মানুষ করেছেন, সেটাকেই তিনি লাভ বলে মনে করেন। ওরা তার চেয়েও বড়ো লাভ কিছু চায়— কী সেটা? সেজন্য কি ঘরে ঘরে এমন করে ঘরভাঙার স্রোতটা ঢুকিয়ে দিতে হবে?

অরুণা বলেছে শক্ত গলায়, তা কেন? জীবনে আনন্দ থাকলে, ভালোবাসা থাকলে সে সুখ ছেড়ে যাবে কেন কেউ অন্য কথা ভাবতে? কথা শেষ করে অরুণা তাঁর কাছে সরে এসেছিল হয়তো তার স্পর্শ পেতে চেয়েছিল, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছেন তিনি।

এখন ফোটোখানার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মনকে বোঝাতে চান সুমতি— ঠিক করেছেন তিনি। অনুচ্চ গলায় বলেন, ঠিক করেছি কিনা বলো? এ পাপ। আমি তাকে প্রশ্রয় দিইনি।

দেওয়াল থেকে একটা টিকটিকি হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ডেকে ওঠে— সুমতির হাতের প্রদীপটা একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে থাকে তারপর কখন একসময় নিভে যায়।

অন্ধকারেই সুমতি তাঁর জাগ্রত দুই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন। আলোর দরকার নেই! যদি সত্যি তাঁর ভক্তি থাকে, যদি এতদিন ধরে কায়মনোবাক্যে শুধু তাঁরই কথা ভেবে এসে থাকেন, তবে অন্ধকারেই স্পষ্ট তিনি দেখতে পাবেন সে-চেহারা।

কিন্তু কোথায়! প্রায় অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন সুমতি— চেহারাটা তো মনে পড়ছে না তাঁর।

কই তবে তাঁর ভক্তির জোর— যার বলে দীর্ঘ তিরিশটা বছর তিনি তপস্যার মতো কাটিয়েছেন। সে কি বৃথা!

দেওয়াল থেকে সেই টিকটিকিটাই এবারেও ডেকে ওঠে সুমতিকে থমকে দিয়ে—তার দীর্ঘ একটানা টিক্—টিক্— টিক্ ডাকটা অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘরটার একমাত্র শব্দ হয়ে কানে বাজতে থাকে।

আসলে ছেলেমেয়েদের পরিচয়ের সূত্র হিসাবেই কেবল মনে ছিল লোকটাকে। নইলে সত্যি সত্যি তার মন...। সুমতি হাতড়ে হাতড়ে বেড়ান সেই শূন্য মনটায়। নিজেকে তিনি বঞ্চিতই করে এসেছেন মিথ্যে একটা আবরণ দিয়ে— ছিঃ ছিঃ।

আবার প্রদীপটা জ্বালিয়ে উঁচু করে ধরেন, এতদিন লক্ষ পড়েনি— আজ চোখে পড়ে, সারা ছবিটা জুড়ে মস্ত একটা কালো দাগ— চিড় খেয়েছে ফোটোর কাচটা।

খানিক থমকে দাঁড়িয়ে থেকে এক অদ্ভুত কাজ করেন সুমতি। ছবিখানাকে নামিয়ে আনেন দেওয়াল থেকে— কোনও এক গোপন জিনিসের মতো সেখানাকে লুকিয়ে রাখেন নিজের ট্রাঙ্কের মধ্যে।

বাইরে ভোর হয়ে আসছে— একটা গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ হল রাস্তায়।

ভেঙে যাওয়া সেই চরম বিশ্বাসের আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়ে, দরজা খুলে আর্তনাদ করেন ওঠে সুমতি, অরু— অরু রে!

নিস্তব্ধ হয়ে আছে বাড়িটা— মনে হয় মুখ ফিরিয়ে আছে তাঁর দিক থেকে। খানিকক্ষণ কেউ আসে না। তারপর কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যায়— অনীতা এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলে, অরু খুব ভোরে উঠে আবার পরিমলবাবুর কাছেই ফিরে গেছে মা।

চলে গেছে— চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায় সুমতিব সব কিছু।

একটা চিঠি দিয়ে গেছে মা আপনাকে।

থরথর করে কাঁপা হাতে সুমতি সেখানা পড়েন, মা, যত ভয় পেয়েছিলে সেরকম করে ছেড়ে আসিনি। কিন্তু সে-অধিকারও আমার ছিল।

যাই হোক, তোমার যন্ত্রণা আমার অসহ্য লাগছে মা। আমি আবাব ফিরেই যাচ্ছি—কিন্তু. . —আর লেখেনি অরুণা।

সে-চিঠিখানা হাতে করে সুমতি অজয়ের সামনে গিয়ে এবার আর কাঁদেন না, লাল লাল রাতজাগা দুই চোখ ছেলের মুখের ওপর তুলে আশঙ্কাভরা গলায় বলতে থাকেন; ও কেন ফিরেই গেল। কেন ওকে যেতে দিলি তোরা? থরথর করে কাঁপতে থাকে ঠোঁট, গাল বেয়ে আবার চোখের জল নামে।

অজয় অসহায়ভবে তাকিয়ে তাকিয়ে সুমতির কান্না দেখে— এতটুকু সান্ত্বনা দেয় না।



রূপ

পরপর দুদিন দেখেছে কমলেশ, তৃতীয় দিনেও দেখবার পর আর কোনো সন্দেহ থাকে না তার মনে। মেয়েটা নীলা-ই।

সে বাইরে চাকরি করে। কলকাতায় এসেছে কোম্পানির কাজে। দুপুরবেলাটা বেশিরভাগ দিন তার কাজ থাকে না, কিন্তু কাজ থাকে না বলে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতেও তার ভালো লাগে না। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কলকাতাকে দেখে। ঠিক দুপুরের কলকাতার একটা রূপ আছে, কমলেশের তা ভালো লাগে। কলকাতাকে এককালে খুব ভালোবাসত কমলেশ, কিন্তু ছেড়ে গিয়েছিল, নিজে ইচ্ছে করেই। কেবল ছেড়ে যাওয়া নয়, প্রায় পালিয়ে গিয়েছিল একটা ভয়ে। সে ভয়টা নীলা।

আর আজ এতদিন পরে সেই নীলা-ই চলেছে। এই ক-দিন থেকে লক্ষ করে করে তবে সন্দেহটা দূর হয়েছে তার।

পরপর তিনদিন তাকে একই সময়ে খানিকটা দূরে ট্রামের সেকেন্ড ক্লাস থেকে নামতে দেখে তারপর হোটেলটার পাশ দিয়ে অনেক অলিগলির মধ্যে কোথায় যেন রোজ হারিয়ে যায় মেয়েটা। কোথায় যায় কে জানে। ফেরে কিনা কে জানে। তখন আর দেখবার সময় কোথায়— কমলেশকে তখন কোম্পানির কাজে বেরুতে হয়।

কিন্তু মেয়েটা যদি নীলা হয় তবে কমলেশেরও একটা কর্তব্য আছে। হঠাৎ না বলে পালিয়ে আসারই একটা কৈফিয়ৎ তাকে দেওয়া দরকার— বিশেষ এখন যখন কমলেশ ভালো চাকরি করে একটা। মর্যাদা হয়েছে। সেই মর্যাদা রাখবার জন্যেই পুরোনো দিনের মর্যাদাকে ছোটো করলে চলবে না। তা ছাড়া, এক বাড়ির ভাড়াটে ছিল তারা অতকাল— তারও একটা মূল্য আছে বইকি।

আর। আরও একটা কথা আছে। সেটা মজার কথা— কৌতুকের কথা।

সেদিন একতলার বাসিন্দা সামান্য মাইনের ছেলের জন্যেই অত কাঙালপনা করেছিলেন নীলার বাবা? আজ যখন সে আরও প্রতিষ্ঠা হয়েছে, বাইরে থেকে তার স্বাস্থ্য ফিরেছে তখন তাকে দেখে নীলার মনের অবস্থাটা কেমন হবে? সেদিন নীলার মতো মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করে সে যে কাপুরুষতার কাজ করেনি কিছু, সেটাও জানানো দরকার।

আজ সে তাই জামা গায়ে দিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার দিকে চোখ পেতে। ট্রামটা এসে থামতেই দোতলার সিঁড়ি বেয়ে একেবারে সে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। মেয়েটা তখনো রাস্তা পেরোতে পারেনি। এদিকের রাস্তায় কমলেশ অপেক্ষা করে।

তেমনি-ই আছে চেহারা— বরং আগের চেয়ে আরও কৃশ, আরও কুৎসিত হয়েছে। এ-পাশের ফুটপাথে উঠে বাঁ-দিকের গলিটার মধ্যেই ঢুকবে, কমলেশ তাই অপেক্ষা করে, সামনাসামনি হলে বলে, শুনুন।

মাথা নিচু করে হাঁটছিল নীলা, বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে সামনে তাকিয়ে বলে, আমাকে বলছেন?

কমলেশ বলে, আপনার নাম নীলা না? নীলা রায়? আমি কমলেশ— চিনতে পারছেন না?

নীলা কেবল রোজ মাথা নিচু করেই হাঁটে না, পুরোনো কথাও ভুলেছে সঙ্গে সঙ্গে। নাকি কমলেশকে দেখে সত্যি চেনা যায় না স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে? কিংবা সত্যি চিনেও চিনতে চায় না?

কমলেশ বলে, সেই যে বাইশের একের তিন নম্বর শ্যাম রায় লেনে ছিলাম আমরা— মনে নেই?

ইচ্ছা করলে নীলা পুরোনো দিনের কথা মনে করে রাস্তার লোক ডেকে তাকে অপমান করতে পারে, সে সম্ভাবনাটাও চকিতের জন্যে উঁকি মেরে যায় কমলেশের মনে— কিন্তু নীলা সে-সব কিছুই করে না। সে শান্ত গলায় বলে, মনে আমার অনেকক্ষণই পড়েছে কমলেশদা— দু-দিন আপনাকে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই চিনেছি।

তবে? এমন ভাব করছিলে যেন রাস্তার লোক তোমার পেছু নিয়েছে। তারপর বলিষ্ঠ হাতখানা চোখের সামনে তুলে ঘড়ি দেখে কমলেশ বলে, দুটো বেজে গেছে— এসো না একটু চা খেয়ে যাবে নীলা। তোমাদের বাড়ির খবর শুনব। রোজ টিউশনিতে যাও বুঝি?

নীলা চা খেতে আপত্তি করে না, কিন্তু টিউশনির কথায় হাসে— খুব ভালো টিউশনি। পড়ানোটা যদি বিদ্যার দাসত্ব হয় তবে এটা কোন্ দাসত্ব জানিনে।

কমলেশের হঠাৎ কেমন কষ্ট হয়। মনে হয় মেয়েটার রূপ নেই সত্যি কিন্তু একটা কিছু আছে যেটা ফেলনাও নয়।

চা খেতে খেতে কমলেশ বলে, তোমার বাবা ভালো আছেন নীলা?

বাবা মারা গেছেন।

খুব অস্বাভাবিক কথা নয় কিন্তু কেমন একটা অপরাধবোধ ভেতর থেকে কমলেশকে পীড়া দিতে থাকে। চোখের সামনে ভাসে বাস্তুহারা, অসহায় একটা রুগ্ন দুর্বল মানুষের ছবি। কমলেশের জন্যেই অগাধ বিশ্বাস নিয়ে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকা মানুষটার জন্যে খুব কষ্ট হতে থাকে কমলেশের। কিন্তু নীলার মুখ দেখে সে-সব কিছুই বোঝা যায় না— তার কালো মুখে দুঃখের ছাপটা ধরা যায় না, ছোটো ছোটো চোখ দুটোয় অসহায়তা জমাট বেধে নেই। স্বাভাবিক মুখ তার।

সেই মুখ নিয়েই বরং হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া কমলেশকে সে চমকে দেয় স্বাভাবিকভাবে কথা বলে, আপনি সেদিন অমন করে না পালালেও পারতেন কমলেশদা, কারণ আমি জানতাম আমার মতো কুচ্ছিৎ মেয়েকে আপনি বিয়ে করবেন না। বাবা কিন্তু মরবার দিন পর্যন্ত আপনার কথা বলে গেছেন।

কমলেশের হঠাৎ নজর পড়ে নীলার মাথার দিকে, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে তা হলে?

মুচকি হেসে নীলা বলে, তবে কী ভাবেন, আমাকে বিয়ে করার ভয়ে আপনি পালিয়ে গেলেন বলে আমি পড়েই থাকব?

না— না— তা নয়, কমলেশ ইতস্তত করে, স্বামী কী করে তোমার?

হায় রে কপাল। স্বামীর সঙ্গে যদি সম্পর্কই থাকবে তবে আর ভীমরতি ধরা বুড়োর সেবা করতে যায় রোজ।

নাম কী তাঁর?

এবার অমন কুচ্ছিৎ মেয়েটারও গাল লাল হয়ে ওঠে: নাম শুনে কী হবে আপনার?

এমনিই। কিন্তু কোথায় টিউশনি করো বললে না?

এবার নীলা ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে, সে কী টিউশনি কমলেশদা? বাবা মারা যাবার পর মা-র অবশিষ্ট গয়না ক-খানা বেচে বাড়িভাড়া শোধ করে বেরিয়েছিলাম চাকরির চেষ্টায়। এক মেসাজ ক্লিনিকে চাকরি পেয়েছিলাম কিন্তু শুকিয়ে মরব জেনেও থাকতে পারলাম না বেশিদিন। এখন— সে-কথা নীলা বলতেই চায় না।

এখন কী বল নীলা।

এক টাকা-পয়সাওয়ালা বুড়োকে রোজ মেসাজ করতে হয়, তারপর ঘণ্টাখানেক তাঁকে রামায়ণ পড়ে শোনাতে হয়।

শুনে কমলেশ বলে, বেশ!

বেশ-ই তো? বুড়ো মানুষটার ক্ষমতা নেই কিন্তু লোভের ইচ্ছেটা আছে। বড় কষ্টের এ কাজ কমলেশদা— অনেক ভেবে শেষে এই কাজ নিয়েছি— বলে সে

মাথার সিঁদুর দেখায়— বিয়ে হয়ে গেছে জানলে তাঁর লোভটা খানিকটা কমবে। এ ছাড়া আর কী করব?

সত্যি বিয়ে হয়নি তোমার তবে?

না— লজ্জিতভাবে মাথা নাড়ে নীলা— মাথায় সিঁদুর আছে, পাড়ার লোকে জানে বিয়ের পর স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে। পাকিস্তানি মেয়ে ওরকম কত আছে। কেউ আর তাই আজকাল অবিশ্বাস করে না। আর পাড়ার লক্ষ্মী মেয়ে বলে আমার সুনামও আছে।

একটু চুপ করে থাকে নীলা, তারপর ম্লান হেসে বলে, আর এ কথাটাও তো মিথ্যে নয় যে, একদিন তুমি আমায় বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিলে কমলেশদা, আমিও সেই কথাই মেনে নিয়েছিলাম।

বিহারের জল-হাওয়ায় তিন বছর ধরে পুষ্ট হওয়া শরীর কমলেশের, বুকটাও চওড়া। কিন্তু সেই বুকের ভেতরটাই তার কেমন করতে থাকে। বলে, তবে এতদিন খোঁজ-খবর নেবারও তো কোনো চেষ্টা করনি নীলা।

খোঁজ নেব কেন, ছিঃ। সত্যি সত্যি তুমি আমাকে বিয়ে করবে এ আশা আমি করিনি।

খানিক নিস্তব্ধ হয়ে থেকে হঠাৎ একসময় মুখ তুলে কমলেশ বলে, আমি তোমাকে সত্যি সত্যি বিয়ে করব নীলা।

নীলার মুখের কোনো ভাবান্তর হয় না, সে বরং ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দেখ, তুমি আমার কাজের দেরি করিয়ে দিলে। দিনেরবেলাটা তবু একরকম— সন্ধের অন্ধকারে ও-বাড়িটায় ঢুকতে আমার গা ঘিন ঘিন করে।

কমলেশ গাঢ়-স্বরে বলে, তোমাকে ও-চাকরি আর আমি করতে দেব না নীলা— থাক্ গে না গেলে...।

অনায়াসে সেই কালো কুচ্ছিত মেয়েটা কমলেশের মুখের ওপর তার বিষণ্ণ চোখ দুটো রেখে বলে, এত তাড়াতাড়ি নয় কমলেশদা— বলে বেরিয়ে যায় দোকান থেকে। সেখান থেকে ঢোকে গলির মধ্যে, তারপর কোথায় যে মিলিয়ে যায় আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

সেদিন সারারাত ধরে ভেবে কমলেশকে নিজের মন ঠিক করতে হয়েছে। নীলা কালো। নীলা কুৎসিত, তবু বিনিদ্র চোখের পাতায় বারেবারে সেই মুখখানাই ভেসে বেড়ায়। সেজন্যে মনের সঙ্গে অনেক লড়াই করতে হয় তাকে, অনেক বোঝপড়া। কিন্তু জয় শেষ পর্যন্ত নীলারই হয়। আজ সারাটা দিন নীলা তার কাজ ভুলিয়ে দিয়েছে— কাছে থাকতে মেয়েটাকে এমন মনে হয়নি কখনো। সত্যি নীলা না হলে চলবে না তার। নীলার সেই শান্ত কালো মুখখানা তার বারেবারে মনে পড়ে। এতদিন পরে সে কি পুরনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চলেছে? নাকি নীলার কপালের ওই সিঁদুর আর উদ্ধত ঘোষণা তাকে টেনেছে : মাথায় আছে সিঁদুর,

পাড়ার লোকে জানে বিয়ের পর স্বামী আমায় ত্যাগ করেছে।

কমলেশকে ঘোচাতে হবে নীলার সেই লজ্জা।

সারাটা রাত তার প্রায় জেগেই কেটে যায়— তারপরেও প্রতীক্ষায় থাকতে হয় দুটো পর্যন্ত।

হাসিমুখে কমলেশ বলে, তোমাকে কোনো কাজ করতে দেব না আজ, চল কোথাও বেড়াতে যাই।

সে-কথা শুনে নীলা খুশি পর্যন্ত হয় না, নির্বিকার মুখে বলে, তা কি করে হবে? আজ মাসের শেষ তারিখ, আজ না গেলে ঠিক টাকা কেটে নেবে বুড়োটা। আর শুধু তো ওটা নয়— দুটো ছেলেমেয়েকে পড়াতে যেতে হয় কলুটোলায়।

তার গম্ভীর স্থির চেহারার দিকে তাকিয়ে কমলেশের আর জোর করবার ইচ্ছে হয় না। সে কেবল নীলার সঙ্গে গিয়ে বাড়িটা দেখে আসতে চায়।

এ-গলি, ও-গলি পেরিয়ে এক ছাতাপড়া দোতলা বাড়ি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নীলা বলে, এই বাড়িতেই সেই বুড়ো মানুষটি অধিষ্ঠান করেন, বলে কড়া নেড়ে ভেতরে ঢুকে যায়।

তারপরে বোধ হয় ঘণ্টাখানেকও যায়নি— হঠাৎ দরজার কড়াটা নড়ে ওঠে খট্ খট্ করে। এত জোরে এ-বাড়িতে কড়া বোধ হয় বহুকাল নড়ে ওঠেনি— বাড়িটার হাড়-পাঁজরা যেন ঝন্ ঝন্ করে কেঁপে উঠেছে।

রামায়ণ শুনতে শুনতে রোজকার মতোই আজও নীলার মনিব সেই বুড়ো মানুষটির কোটরে বসা চোখে লোভানি চক্‌চক্ করে উঠেছিল— সে পর্যন্ত চমকে নাড়া খেয়ে সোজা হয়ে বসে।

ঝি এসে নীলার দিকে তাকায়, বলে, তোমাকে ডাকছে গো— একটা নোক।

বুড়ো বিরক্ত মুখে বলে, লোক? কে লোক জেনে আয় আগে। যে সে এসে ডাকলেই হল, কাজের সময়।

ঝি ফিরে এসে এবারও নীলাকেই বলে, তোমাকেই গো। বললেন আমার ইস্ত্রী।

স্ত্রী।

নীলা বুঝি ভুলেই গিয়েছিল তার সিঁথিতে দেওয়া সিঁদুরের কথা। সুতরাং তাকে উঠতেই হয়, কুণ্ঠিত হয়ে ছুটি নিতে হয় অসময়ে।

রাস্তায় বেরিয়ে সে বলে, জানি, একটা কাণ্ড করবে।

কমলেশ বলে, আজ আর টিউশনিতে নয়, চল আমার সঙ্গে। ইতিমধ্যেই কী করেছি জান? তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছি— মায়ের সব ভার আমার।

এরপর আর চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না— নীলাকেও সারাদিন ঘুরতে হয় কমলেশের সঙ্গে। খানিকটা সময় সে বিষণ্ণ থাকে, কিছুতেই

খুশি হতে পারে না, খানিকক্ষণ সে কথা না বলে পাশে পাশে হেঁটেই চলে কিন্তু তারপরে নীলারও যেন হঠাৎ খুশির নেশা ধরে, গলার সুরে খুশির সুর লাগে। ভুলে যায় যে এই কমলেশই একদিন তাকে বিয়ে করবার ভয়ে না বলে পালিয়েছিল।

দোকানে দোকানে ঘুরে অনেক জিনিসপত্র কিনেছে কমলেশ— তাতে আপত্তি করেনি নীলা। কিন্তু একটা নীল বালব কিনতে দেখে সে আর হাসি চাপতে পারে না।

ওটা কী হবে?

চল না— দেখবে।

পথ চলার ফাঁকে ফাঁকে কখন বুঝি একসময় কমলেশ তাকে মধুর কথা শুনিয়েছে। বিয়ে করে সে নীলাকে নিয়ে চলে যাবে তার কাজের জায়গায়। আপাতত মা আর ভাই তার এখানেই থাকবে কিছুদিন, তারপর ওদেরও নিয়ে যাবে কমলেশ।

তোমার সেতারটা আছে তো নীলা?

আছে বুঝি কোথায় ধুলো-টুলো পড়ে। কে জানে?

কী যেন একটা মনে মনে পরিকল্পনা আছে কমলেশের— নীলা সেটা ধরতে পারছে না। না পারুক— আপাতত সে কমলেশের আবোল-তাবোল বকুনিতে সায় দিয়ে, মধুর ভবিষ্যতের স্বপ্নের ভাগ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

বাড়ি ঢুকে খাবার-দাবার জিনিসপত্র নীলার মায়ের জিম্মা করে দিয়ে আব্দার করে কমলেশ বলে, একটু ভালো করে রাঁধুন মাসিমা, হোটেলের খাওয়া খেয়ে খেয়ে যা মুখ হয়ে আছে!

তারপর সে নীলাদের সবায়ের থাকবার ওই একখানা ঘরের পেছনেও লাগে। নীলাকে লজ্জা দিয়ে সে নিজেই ঝাঁটা খুঁজে নিয়ে আসে। ছেঁড়া তোশকের ওপর নতুন কিনে আনা চাদর বিছিয়ে দেয়, ঘরের চার কোণে কী কৌশলে চারগোছা রজনীগন্ধা রাখবার জায়গা করে নেয়, তারপর বলে, এবার তোমার সেতারটা বার করো।

সে তো একরাশ ধুলো পড়ে আছে। তার গেছে ছিঁড়ে— সেটা দিয়ে কী হবে?

কমলেশই শেষে সেটাকে টেনে বার করে— ধুলো ঝাড়ে। তার ঠিক করতে করতে নীলার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, যেদিন এখান থেকে পালাই সেইদিনই সন্ধেবেলা তুমি সেতার বাজচ্ছিলে নীলা! শুনতে শুনতে এমন হয়ে গেল মনটা— ভাবলাম পালাব না। কিন্তু যেই সেতারটা থামল...।

নীলার মুখ দেখা যায় না, ঘর পরিষ্কার করতে করতে মাথা নিচু করে সে বলে, এতকাল পরে আমার জন্যে নতুন করে তোমার মায়া হল কেন কমলেশদা?

চেহারা তো সেদিনকার চেয়ে ভালো আমার হয়ইনি, বরং অভাবে-দারিদ্র্যে আরও শুকিয়েছি। একি তোমার খেয়াল, না মজা দেখছো?

কমলেশ গম্ভীর হয়ে বলে, না, তা নয়, তখন বয়স ছিল কম— রূপ, বাইরের জৌলুস— এ সবের ওপর ছিল আকর্ষণ। তারপরে ঘা খেয়েছি অনেক নীলা। বুঝেছিও অনেক জিনিস। তোমার কথা মনে হত খুব, কিন্তু...।

কথা আর বাড়ে না। কমলেশ ঘরের ধুলো-কালি পড়া বালবটা খুলে ফেলে কিনে আনা নীল বালবটা লাগিয়ে দেয়। সেতারটাকে পরিষ্কার করে একপাশে রেখে দেয়। ঘরটাকে এ-পাশ, ও-পাশ থেকে দেখে একসময় বলে, আমি থাকতে দেখতাম, তোমাদের এই একখানা ঘরই কত গোছানো— পরিষ্কার থাকত। নিজেও তুমি অত দারিদ্র্যের মধ্যেও খানিকটা ছিমছাম হয়ে থাকতে। কিন্তু সব বদলে গেল কী করে?

সারাদিনের মধ্যে নীলা বোধ হয় এই প্রথম এমন করে হাসে : তখন জীবনে আশা-ভরসা ছিল— এত কষ্ট, দারিদ্র্য, তবু সব যেন ভালো লাগত। কিন্তু জীবনটা তো আর তা নেই।

আমি আবার করে দেব নীলা— গভীর সুরে কমলেশ বলে।

তারপর সত্যি সত্যি সে এক স্বপ্নের জগৎ তৈরি করে ওই ভাঙাচোরা হাঁ-করা দেওয়াল খসে পড়া ঘরখানায়।

সন্ধে হলে সে নীল বালব জ্বালিয়ে সারা ঘর স্নিগ্ধ নীলাভ আলোয় ভরে দেয়। মেঝেতে একটা ফরসা চাদর পাতে, সাবা ঘরে একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। তারপর নীলার খোঁপায় একগোছা রজনীগন্ধা গুঁজে দিয়ে সেতারটা তার হাতে তুলে দেয়, বলে, আর কথা নয়। তোমার মা ওখানে রান্না করুন কিন্তু তুমি সারা সন্ধে আমাকে সেতার শোনাও। মনে কর যেন কনে দেখতে এসেছি। মনে রেখ আজকের ইমপ্রেশনের ওপর তোমার অনেক কিছু নির্ভর করছে।

বেশি কথা কোনোদিন বলে না নীলা, দু-একবার আপত্তি জানিয়ে সে সেতার নিয়ে বসে।

নীলাভ স্নিগ্ধ আলো ভরা ঘরে, রজনীগন্ধার মৃদু গন্ধের সঙ্গে সেতারটা খানিক টুং-টাং করে, তারপর বেজে ওঠে সুরেলা হয়ে। অদ্ভুত হাত! একেবারে মুগ্ধ হয়ে শোনে কমলেশ।

রাত কত হয়েছে কে জানে, অনেকক্ষণ বাজিয়ে থেমে গেলে চোখ খুলে কমলেশ দেখে, মুখে আঁচল চেপে ফুলে ফুলে নিঃশব্দে কাঁদছে সে।

সেতারের মধুর রেশটা তখনও সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে, রজনীগন্ধার গন্ধ আরও তীব্র হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে, তার সঙ্গে নীলার মায়ের রান্না সুখাদ্যের গন্ধটাও ভেসে এসে মন খুশি করে দিচ্ছে— এমন সময় কাঁদে কেন নীলা!

কমলেশ তার হাত ধরে মুখখানা উঁচু করে তার চোখের জল দেখে। নীলাভ

আলোয় এই কুচ্ছিৎ মেয়েটার মুখকেও সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে কমলেশ বলে, ফার্স্ট ইম্‌প্রেশন সাক্‌সেসফুল। তুমিই জিতেছ নীলা। কিন্তু কাঁদছ কেন?

সহজে বলতে চায় না, শক্ত হয়ে থাকে। তারপর আরও বেশি কেঁদে ফেলে নীলা বলে, আমরা তখন পাকিস্তানে, আমাকে সেতার শেখাত বাবার এক ছাত্র। বাজাতো অদ্ভুত আর ভালোবেসেছিল আমাকে। বিয়ে করতে চেয়ে বলেছিল, দুজনে মিলে আমরা দেখো নতুন এক সুরের জগৎ তৈরি করব। কিন্তু দেখতে খুব কুৎসিত ছিল বলে আপত্তিটা আমারই ছিল, বাবাও রাজি হননি। ওকে না জানিয়ে আমরাও পালিয়ে এসেছিলাম একদিন।

ও-সব কথা আজ কেন তোমার মনে পড়ছে নীলা? কেন শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ?

আমিও যে অনেক ঘা খেয়েছি কমলেশদা, তোমারই মতো।

তারপরে কেমন করে যেন সমস্ত কিছুর সুর কেটে যায়। নীল আলোটা জ্বলতেই থাকে, রজনীগন্ধার গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে কিন্তু পুরনো সুরটা আর জমে না।

চোখের জল মুছে ফেলে কমলেশকে সামনে বসিয়ে নীলা তাকে খাওয়ায়, হাসবার চেষ্টা করে, দুটো-একটা ভালো কথা বলে— কমলেশ তাতে খুশি হয়। কিন্তু বেশ বোঝা যায় নীলা নিজে খুশি হতে পারছে না কিছুতেই।

যাবার আগে দরজায় দাঁড়িয়ে কমলেশ বলে, কাল তোমার সঙ্গে আমার বোধ হয় দেখা হবে না নীলা। তুমি চাকরিটায় জবাব দিয়ে দাও। আমি কালই কোম্পানির কাছে কয়েকদিনের ছুটি চেয়ে পাঠাব— বিয়ের হাঙ্গামা আছে...। তুমি কিছু ভেবো না নীলা।

দরজায় দাঁড়িয়ে নীলা বলে, না, আমি ভাবব না।

পরদিন সন্ধেবেলা হোটেলের ম্যানেজার বলে, আপনার চিঠি আছে কমলেশবাবু। ...একটি ছেলে এসে দিয়ে গেছে।

নিশ্চয়ই নীলার চিঠি। আজ দেখা হয়নি, হয়তো কালকের জন্যে কিছু বক্তব্য আছে তার। একটু খুশির হাসি হেসে কমলেশ চিঠিখানা ছেঁড়ে। হাতের লেখাটা নীলারই, তেমনি গোটা গোটা লেখা কিন্তু বক্তব্যটা আলাদা—

একদিন আমাকে বিয়ে করবার ভয়ে তুমি পালিয়েছিলে— অনেক চেষ্টা করেও সে-কথাটা ভুলতে পারছি না। তাই মা আর ভাইকে নিয়ে আজ পাকিস্তানে আমাদের দেশে চলে গেলাম। শুনেছি আমাদের বন্ধ সদর দরজাটার সামনে একবুক জঙ্গল— ঢোকা যায় না। তবু ঢুকতে চেষ্টা করব; আর খুঁজে বার করব সেই ছেলেটাকে, যার ভয়ে একদিন আমিও পালিয়েছিলাম।



পাষণ্ড

রাত তিনটের সময় রোজ ঘুম ভেঙে যায় প্রসন্নময়ীর, তারপরেও একঘণ্টা বিছানায় বসে মালা জপ করেন। বাইরে দুচারটে পাখি যেই ডেকে ওঠে— একটুখানি আলো ফুটে ওঠে বাইরের, ওমনি উঠে পড়েন। স্নান সেরে সোজা চলে যান ফুলবাগানে। সেখান থেকে বেছে বেছে ফুল তোলেন, ঠাকুরঘরে এসে সেগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে রেখে, চন্দন ঘষে, ঘিয়ের প্রদীপ ধরিয়ে যখন পুজোয় বসেন তখন সীতা নামে আশ্রিতা মেয়েটার ঝাঁটার শব্দ পাওয়া যায় কেবল। তারও কত পরে ওঠে গোপীমোহন— বড়ো, মেজো দুই বউ— ছেলেমেয়েরা, সকালের সে নিঝুম প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

আজও সাদা দোপাটি, জুঁই ফুলগুলো বেছে বেছে আলাদা করে রাখছিলেন মালা গাঁথবেন বলে। দুই আসনে দুই মূর্তি। একটি কালো কষ্টি পাথরের, মাথায় তার সোনার মুকুট, দুহাতে ছোটো ছোটো দুটি সোনার বালা, হাতে বাঁশি— ওটা বড় ছেলে গোপীমোহনের বিগ্রহ। প্রসন্নময়ীর বিগ্রহ গোপাল— সাদা পাথরের। তার গায়ে আভরণ নেই— নিরাভরণ দেহ। গোপীমোহন পোশাক দিতে চায়, গয়না গড়িয়ে দিতে চায়, নেন না তিনি। সোনার গয়নার জন্য বাড়িতে শান্তি থাকে না— চুরি হয়ে গেলে দেবতার চেয়ে গয়নার শোক বেশি হয়ে ওঠে— যিনি শান্তি দেন তাঁকে নিয়েই হয় অশান্তি।

গোপীমোহনের বিগ্রহের জন্য এ ঘরে তালা দিয়ে রাখতে হয়। রাত্রে দরজা-জানলা বন্ধ আছে কিনা দেখে শুতে হয়— এত অশান্তি সহ্য হয় না প্রসন্নময়ীর। কিন্তু নিজে চান না বলে গোপীর ইচ্ছায় বাধা তিনি দেন না, বরং ওর ভক্তি দেখে মনে মনে গর্ব বোধ করেন। অপূর্ব আনন্দে বুক ভরে ওঠে।

স্বামী কালীমোহন ছিলেন শাক্ত, ছেলেদের সামনেই কারণ বলে মদ খেতেন তিনি। তান্ত্রিক সাধনার নামে অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছেন প্রথম জীবনে। সেই উদ্দাম জীবনের মধ্যেই গোপীমোহনের জন্ম। প্রসন্নময়ীর মতো সুন্দর স্ত্রী পেয়েও সে-পথ ছাড়তে তাঁর অনেক দেরি হয়েছিল। অবশেষে একেবারে ভালোমানুষ হয়ে গেলেন কালীমোহন। মদ ছাড়লেন, চরিত্র শোধরালেন আর কালী ছেড়ে কৃষ্ণভক্ত হয়ে গেলেন।

গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে একাহারী আর নিরামিশাষী হয়ে গেলেন। শেষের দিকের দিনগুলোয় আর তাঁকে সংসারে ধরে রাখা যায়নি— গুরুর আশ্রমে কাটাতেন, বাড়িতে থাকলে তাঁর অশান্তি হত। প্রসন্নময়ীকেও দীক্ষা নিতে হল।

বড়ো ছেলে গোপীমোহন তখন কৃতি হয়েছে, তার সাহায্যে নবনীও উঠে দাঁড়িয়েছে। কেবল উদ্দাম রয়ে গেল ছোটো মোহিনীমোহন। অন্য দুভাইয়ের মতো শান্ত হল না তার প্রকৃতি। সে রুক্ষ আর বদমেজাজি হয়ে বিশ্বসংসারের ওপর বিরক্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, অবশেষে বাইশ বছরের মোহিনী একদিন কাউকে না জানিয়ে মিলিটারির চাকরি নিয়ে পালাল। তারপর কয়েকটা মাসও গেল না। ছোটো মেয়ে ললিতা বিধবা হয়ে ফিরে এল শ্বশুরবাড়ি থেকে— সুযোগ বুঝে কালীমোহনও চোখ বুজলেন। বড় মেজ দুই ছেলের বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন কালীমোহন নিজেই, প্রসন্নময়ীও এবার সংসার ছেড়ে ঠাকুরঘরে আশ্রয় নিলেন। গোপী এবার মন্ত্র নিল। তাঁর সঙ্গে নিরামিষ খাওয়া শুরু করল। কপালে সকালের তিলক-ফোঁটা নিয়েই সে অফিস যায়, এমনি তার ভক্তি। প্রসন্নময়ীর পাশে বসে গোপীমোহন যখন পুজো করে— পুজো ভুলে তিনি ছেলের ভক্তি আপ্লুত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আনন্দে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। তিনটি ছেলের মধ্যে গোপীমোহন যে শ্রেষ্ঠ এ কথা স্বীকার করতে প্রসন্নময়ীর লজ্জা নেই।

মেজ ছেলে নবনী নেহাৎ ভালো মানুষ, কিন্তু দীক্ষার নামে সে হাসে— অবজ্ঞায় নয়, সংকোচে। বলে, দাদার মতো অত ভোরে উঠে শীত-গ্রীষ্মে কাঁপতে কাঁপতে পুজো করা, নিরামিষ খেয়ে, একাহারী হওয়া আমি পারব না মা —বলে প্রসন্নময়ীর পায়ের ধুলো মাথায় নেয়। গুরুদেব এলে সে যথেষ্ট ভক্তির সঙ্গে তাঁর চরণামৃত পান করে— পাতের প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে খায়। এতটুকু আপত্তি করে না বলেই প্রসন্নময়ীর এতটুকু বিরাগ নেই তার ওপর। সবাই কি গোপীর মতো হতে পারে? এ-কথা ভেবে তিনি নবনীকে অনায়াসে ক্ষমা করে যান। কিন্তু মা হয়েও ক্ষমা করা যায় না একজনকে— সে মোহিনী। যুদ্ধ থামলে সে ফিরে এসেছিল। চাকরি তার যায়নি কিন্তু উদ্দামতা কমেছে। যে কটা দিন থাকত প্রসন্নময়ীকে কিছুতেই উঠতে দেবে না। অত সকালে স্নান করতে দেবে না। ঠাকুরঘরে কখনও উঁকি মেরেও দেখবে না। বাড়িতে খেতে তার আর ভালো লাগে না বলে বাইরে খেয়ে আসে, বলে, মাছ

আনো বটে তোমরা কিন্তু সেগুলোও বৈষ্ণব হয়ে গেছে।

প্রসন্নময়ীর যদি-বা ইচ্ছে থাকে তো গোপীমোহনের একেবারে ইচ্ছে নেই বাড়িতে আমিষ আনবার— আর গোপীমোহনের ভক্তির কাছে প্রসন্নময়ী তো তুচ্ছ।

ক্রমে ক্রমে এ বাড়ি থেকে আমিষের পাট উঠে যাচ্ছে। ললিতাকে কিছুদিন বাড়িতে রেখে শেষে গুরুর আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রসন্নময়ী, গোপীমোহনের পরামর্শে। এ ছাড়া ওর জীবনের গতিই বা কী? ওর তো মহাভাগ্য যে গুরুদেব ওকে স্নেহ করে কাছে টেনে নিয়েছেন। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা ব্যথা আছে— যা মাঝে মাঝে সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। তাঁর সবচেয়ে ছোটো মেয়ে ললিতা— প্রথম যেদিন গুরুর আশ্রম থেকে চুল কেটে থান পরে এসে দাঁড়িয়েছিল, প্রসন্নময়ী হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন। তাঁর নিজের চুল তিনি কাটেননি। কাঁচায়-পাকায় মেশানো এখনও একরাশ চুল তাঁর, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অনুসারে জামা গায়ে দিয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করে চলতে হয় তাঁকে। কিন্তু আশ্রমের নিয়ম যে কড়া। সেখানে লতিকাকে থাকতে হবে এক বস্ত্রে, একাহারী হয়ে— সে বিধবা এবং ব্রহ্মচারিণী। গোবিন্দ ছাড়া তার তো কিছু ভাববার দরকার নেই। গোপীমোহন প্রসন্নময়ীর কান্নায় বিরক্ত হয়ে বুঝিয়ে শান্ত করেছিলেন এসব কথা বলে।

ললিতাও কেঁদেছিল প্রসন্নময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে। হয়তো কিছু বলতেও চেয়েছিল— কিন্তু তাঁর শোনবার সময় হয়নি। নিজের অশান্ত মনটাকে বারেবারে ধিক্কার দিয়েছিলেন। গুরুদেবের পায়ের তলায় ফেলে দিয়েও বিশ্বাস করতে পারছেন না ভেবে নিজেকে কেমন অশুচি লাগছিল তাঁর। তাড়াতাড়ি তাই ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকেছিলেন। বেরিয়ে যখন এলেন তখন মনে তাঁর পরম প্রশান্তি। তখন আর ললিতার মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট হয়নি। শান্ত সমাহিত হয়ে তাকে গুরুর সেবা করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। মোহিনীমোহন তখন কয়েকদিনের ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। শুনতে পেয়ে সে হাসতে হাসতে বলেছিল, বাঃ! মা তোমাকে কিন্তু মিলিটারিতে প্রচাব সচিবের পদ দেওয়া উচিত। মরতে হবে এই সোজা কথাটা ওরা কিছুতেই বলবে না। তাতে কত রকম যে রং চড়ায়। সোজা কথায় ললিতাকে বলে দাও না বাপু হে— ওই ভুঁড়েল গুরুটার সেবাদাসী করা হয়েছে তোমাকে।

প্রসন্নময়ী সে-কথা শুনে কানে আঙুল দিয়ে চোখ বুজে গোবিন্দ স্মরণ করেছিলেন। প্রায় কেঁদে ফেলে বলেছিলেন, তোর ও পাপমুখে গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিসনে মোহিনী। ওঠ ওঠ আমার সামনে থেকে। সেদিন তাঁর এক রুদ্ররূপ দেখা গিয়েছিল অপ্রত্যাশিতভাবে।

মোহিনী তবু ওঠেনি— থামেওনি, বলেছিল, যা খুশি বল আমাকে মেনে নেব, কারণ আমি মিলিটারি ফেরতা। গোরু-শুয়োরের মাংস খেয়েছি, জাত ধর্ম গুলে খেয়ে ফেলেছি, কিন্তু একটা কথা আমাকে বোঝাও দেখি, যে, ললিতার আবার কেন বিয়ে

দেওয়া যাবে না? অমন সুন্দর মেয়েটা ষাট বছরের একটা বুড়োর সেবাদাসী হবে কেন? তোমাদের ওই ভণ্ড গুরুর চেয়ে মিলিটারির অফিসারগুলো তাহলে অনেক ভালো বল, বদমাইশি করে তো সামনাসামনি— অমন কৃষ্ণ নামের আড়ালে নয়।

এরপর যে কদিন ছিল প্রসন্নময়ী আর মোহিনীর মুখ দেখেননি— কথাও বলেননি। যাবার দিন প্রণাম করতে এসেছিল— সে-প্রণাম গ্রহণ করেননি তিনি। তারপর চলে গেলে নাস্তিক পাষণ্ড ছেলেটার জন্য ঘরে দরজা বন্ধ করে কেঁদেছিলেন।

সে প্রায় এক বছর আগের কথা। সীতা তখন কেবল এসেছে। তাঁর অনেক দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের মেয়ে সীতা। কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এসে পড়েছে এখানে। তার মামা তাকে টাকার লোভে এক যক্ষ্মা রোগীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় জানতে পেরে কোথা থেকে ঠিকানা জোগাড় করে সে প্রসন্নময়ীর কোলের কাছে পৌঁছে গেল। মেজ ছেলে নবনী নির্বিকার। বউরা প্রথমে কেউ খুশি হয়নি তাকে দেখে। গোপীমোহনেরও খুব মত ছিল না তাকে আশ্রয় দেওয়ার। কিন্তু সেই অতটুকু মেয়েটার দুঃসাহসের কাহিনি শুনে খুশি হয়ে উঠে প্রসন্নময়ীকে রাজি করাল একজন— সে মোহিনী। সীতা আশ্রয় পেয়ে গেল।

আশ্রয় পেয়ে সে আশ্রিতা হল না। বরং সবায়ের নির্ভর হয়ে উঠল ক্রমে ক্রমে। সংসারের সমস্ত কাজ সে নিজের হাতে করতে পারে। ছেলেমেয়েদের যত্ন করতে পারে, রান্না করতে পারে চমৎকার। তার আব্দার নেই, বিরক্তি নেই। খাটতে পারে আর হাসতে পারে। সবায়ের বিরক্তি মাখানো মুখ সমান হয়ে গেলে দেখা গেল এত খেটে, অযত্নে ও অনাদরেও আগের চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যবতী হয়েছে সীতা— আগের চেয়ে সুশ্রী। কোথাও তার বিষাদ নেই— যেন সে কোনও একটা পরম আশ্বাস পেয়ে গেছে কোথা থেকে।

প্রসন্নময়ীর মাঝে মাঝে সীতার মুখের দিকে তাকিয়ে হিংসে হয়— বিস্ময় লাগে। তিনি বিশ্বাস করে দীক্ষা নিয়েছেন। সেই বিশ্বাস নিয়েই ঠাকুর ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন। কিন্তু প্রশান্তি কোথায়? ঠাকুরঘরে চোখ বুজে বসে থেকেও তো সংসারকে ভোলা যায় না। সেখানকার নানা জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে থেকেই সবকিছু ভুলিয়ে দিতে চায়। প্রসন্নময়ী তাঁর গোপালের হাসিমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিন্তু নিজে হাসেন না কখনও। অথচ সীতা তো একটা নিরাশ্রয় মেয়ে, পরের বাড়ির দাসীবৃত্তি করে দিন কাটায়— ওর পুজো নেই, বিগ্রহ নেই, গুরু নেই কিন্তু কীসের যেন পরম এক বিশ্বাস আছে। প্রসন্নময়ীর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে— দুটো বাড়ির পরেই কলেজের ছেলেদের যে হোস্টেলটা আছে সেখানকার কোনও ছেলের সঙ্গে ভাব আছে সীতার। বউরা ওর ভাঙা সুটাকেশটা, বিছানার তলা খুঁজে দেখেছে কোথাও বেচাল হবার সূত্র রেখেছে কিনা মেয়েটা— বাচালপনা করেছে কিনা।

প্রসন্নময়ী নিজে লক্ষ রেখেছেন ওর চলাফেরায়— বিনা কারণে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় কিনা, গোপী কিংবা নবনীর সঙ্গে অকারণে হাসাহাসি করে কিনা— কিন্তু সবদিক দিয়েই হতাশ করেছে সীতা তাঁকে— তাঁর বউদের। কোথাও এতটুকু শিথিলতা নেই তার। গোপীমোহনের বউ বাপের বাড়ি গেলে সে গোপীর যেমন কোনও অসুবিধা হতে দেয় না— নবনীমোহনের বউ-এর অসুখ হলেও সে তেমনি সেবা করে। ওর নামে ডাকে আজ পর্যন্ত কোনও চিঠি আসেনি যাতে মনে করা যেতে পারে ওর মন পড়ে আছে বাইরে। দেখে দেখে প্রসন্নময়ী খুশি হয়ে উঠেছেন। ভালোবেসে ফেলেছেন মেয়েটাকে। সীতাও তাঁকে ভালোবাসে সে-কথা তিনি বুঝতে পারেন। পাশের ঘরে প্রসন্নময়ীর ঘুম ভাঙাও যেন অনুভবে বুঝতে পারে। তিনি দরজা খুলে বেরোলেই দেখতে পান নিজের খোলা দরজার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা— এমনই হয় রোজ। তিনি স্নান করতে গেলেও তাঁর ঘর পরিষ্কার করে দেয়, পুজোর ঘর পরিষ্কার করে, তারপর সংসারের অন্য কাজে লাগে। রান্নাঘর থেকে এঁটো বাসন বার করে। উনুনে আগুন দিয়ে উঠোন ঝাঁট দেয়— এমনি করে শুরু হয় কুড়ি বছরের একটা মেয়ের প্রাত্যহিক জীবন। ও যেন একটা যন্ত্র— কেবল কাজ করাই জানে।

আজও রোজকার মতো টুং-টাং কাজের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল এতক্ষণ— চোখ খুলে প্রসন্নময়ী আর সেটা শুনতে পেলেন না। তার বদলে কানে এল একটা দ্রুত পদ-শব্দ— ছুটে আসা এলোমেলো সেই পায়ের আওয়াজ সীতার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কান পেতে রইলেন প্রসন্নময়ী— দুবার ডাকলেন সীতার নাম ধরে কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না, তার বদলে শোনা গেল একটা কান্নার শব্দ। কেউ যেন ভেতর থেকে ঠেলে আসা একটা কান্নার স্রোতকে কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারছে না। ঠাকুরঘর আর সীতার ঘরের মাঝখানের ব্যবধান দেওয়া দেওয়ালটা যেন সে-শব্দে হুমড়ি খেয়ে খেয়ে পড়ছে, যেন তাঁর গোবিন্দমূর্তির চারপাশ দিয়ে সে গুমরানো কান্নার শব্দ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পুজো করা হল না। প্রসন্নময়ীর সকালবেলার প্রসন্নতা নষ্ট হয়ে গেল। মালা গাঁথতে গিয়ে দুবার আঙুলে সুচ ফুটে গেল, চেষ্টা করেও গুণগুণ করে গোবিন্দ স্মরণ করা হল না। উঠতে হল!

সীতার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, দরজায় কান পেতে সীতার কান্নার শব্দটা এবার স্পষ্ট শোনা গেল। দুহাতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে মৃদু উত্তেজিত গলায় প্রসন্নময়ী ডাকলেন, সীতা, দরজা খোলো— সীতা।

দরজা খুলে দিল সীতা। তার গায়ের জামা সামনের দিকে ছিঁড়ে নেমে এসেছে। তার চুল এলোমেলো। নাকের পাশে, ঠোঁটে আর গালে লাল লাল আঁচড়ের দাগ দেখে প্রসন্নময়ী শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করলেন। সকালবেলায় এ কোন পাপের মূর্তি

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। সীতারও দুচোখের স্তম্ভিত দৃষ্টি, যেন হঠাৎ কেউ তাকে বিনা কারণে এক প্রচণ্ড চড় মেরেছে গালে— যেন তার পায়ের তলার মাটি হঠাৎ ধসে পড়েছে, হঠাৎ যেন শুকনো মাটি থেকে অগাধ জলে পড়ে গেছে সে। সে ফুলে ফুলে কাঁদে কিন্তু কথা বলে না।

প্রসন্নময়ী ছটফট করে ওঠেন। সীতার হাত ধরে ঝাঁকানি দিতে গিয়ে আবার কী মনে করে পিছিয়ে আসেন। বিকৃতস্বরে বলেন, কী হয়েছে বল— বল। সীতা বলে, গোপী দা।

কথা শেষ করতে না দিয়ে আর্তনাদ করে যেন থামিয়ে দিতে চাইলেন প্রসন্নময়ী কী বললি? গোপী কী...! কী করেছে গোপী।

আমি কেবল রান্নাঘর থেকে বেরিয়েছি— আমার মুখ চেপে ধরে হঠাৎ ঘরে নিয়ে গিয়ে গোপীদা...।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে ওঠেন প্রসন্নময়ী বিকৃত গলায়— মিথ্যে কথা। গোপীর নামে অত বড়ো মিথ্যে কথা বলিসনে সীতা। তোর মনে পাপ আছে— তুই ঢুকেছিলি গোপীর ঘরে।

শিউরে উঠে মাটিতে বসে পড়ে দুহাতে প্রসন্নময়ীর গরদ-ঢাকা পায়ের মধ্যে মাথা গুজে সীতা বলে, না মাসিমা, না— আমি তা কেমন করে পারি। বড় বউদি চলে যাবার পর আমি কখনও একা ও ঘরে ঢুকি না— গোপীদার ব্যবহার আমার ভালো লাগছিল না অনেকদিন থেকে। একা পেলেই এমন সব কথা বলতেন আমাকে...।

সীতার চোখের দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপা প্রসন্নময়ীর সে-কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, মেয়েটার দুচোখে করুণ মিনতি। কিন্তু গোপী। তাই বা কী করে হবে? প্রসন্নময়ী এবার হঠাৎ কেঁদে ওঠেন নিঃশব্দে— সে-কান্না সীতার প্রতি সহানুভূতিতে নয়, তাকে অবিশ্বাস না করতে পারার যন্ত্রণায়।

তখনও তাঁর দৃষ্টি কঠোর, চোখ মুছে শক্ত হয়ে বলেন, কী বলত তোকে গোপী?

সীতা চোখ মুছে বলে, সে-কথা শুনলে ঘেন্না করে, সে আপনার শুনে কাজ নেই।

কাউকে বলিসনি কেন তবে?

সীতা ম্লান হেসে বলে, কাকে বলব? কে আমার কথা বিশ্বাস করবে?

আমাকে।

আপনাকে? এত দুঃখের মধ্যেও সীতার মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে কান্নার বদলে। আপনি তো বিগ্রহ আর গোপীদাকে সমান বিশ্বাস করেন। নইলে ললিতাদিকে...।

ধমক দিয়ে থামিয়ে প্রসন্নময়ী বলেন, থাম, গোপী তোর কী করেছে বল।

সীতা তাঁর পায়ের উপর হাত রেখে মাথা নিচু করে বসে রইল একটুখানি

সময়। তারপর মাথা তুলে সহজ ভাষায় বলল, আমি কেঁদে ফেলে বলেছিলাম আপনি না পরমভক্ত! আমি আপনার মেয়ের মতো— তবুও এ প্রবৃত্তি কেন আপনার? বললেন, গুরুদেবদের কটা করে সেবাদাসী থাকে জানিস না। বেশি ফাজলামি করলে একটা অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেব তোকে এ বাড়ি থেকে।

প্রসন্নময়ী যেন গল্প শুনছেন। সম্মোহিতের মতো বলেন, তারপর।

জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে গোপীদাকে ঘরের কোণে ফেলে না দিলে ওঁর কোনও চৈতন্য হত না মাসিমা। আপনি খোঁজ রাখেন না, কিন্তু অনেক রাতে যে উনি বাড়ি ফেরেন সে-কথা বাড়ির বড়ো বউয়ের চোখের জলে লেখা আছে।

প্রসন্নময়ী কানে আঙুল দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিশফিশে গলায় যেন আর্তনাদ করে ওঠেন— আর বলিসনে সীতা— আর আমি শুনতেও চাইনে। কিন্তু তোর সব কথা যদি মিথ্যে হয়? যদি সত্যি না হয় তবে কী শাস্তি নিবি তুই?

সীতা এবার উঠে দাঁড়ায়। চোখ মুছে ফেলে। যদি মিথ্যে হয় মাসিমা তবে আমার সবচেয়ে যা দামি জিনিস তাকে যেন চিরকালের মতো হারাই— সেই শাস্তি আমাকে দেবেন।

নিরাশ্রয়া অসহায় একটা মেয়ে অকম্পিত গলায় কী যেন একটা শপথ করছে, অন্যমনস্ক প্রসন্নময়ীর তা কানেও যায় না। এগিয়ে যেতে যেতে বলেন, আজ সারাদিন ঘর থেকে বেরুতে পাবি না তুই। তোর হাতের জল এ সংসারের কারোর মুখে উঠবে না যতক্ষণ তোর কথার সত্যি প্রমাণ না পাই। আমার গোপীমোহনের এত বড়ো কলঙ্ক দিয়েছিস তুই, যে একাহারী নিরামিশাষী সাধু। যদি মোহিনী হত অবিশ্বাস করতাম না আমি— সে দেবতা মানে না তার পক্ষে পাপ করা সম্ভব। কিন্তু এ তুই কী শোনাতে চাস আমাকে? দরজা বন্ধ করে দে সীতা।

দরজা বন্ধ করতে করতে সীতার মুখে এক বিচিত্র তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে— যেন ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত চেহারাটা তারই সবায়ের সামনে টেনে নিয়ে যেতে খুব ইচ্ছে আছে!

ছেলেমেয়েরা উঠোনময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে। মেজো বউ নিত্যকার অভ্যাসমতো বেলায় উঠে সীতার ফেলে রাখা কাজের চাপে দিশেহারা হয়ে বিরক্ত মুখে তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল প্রসন্নময়ীকে দেখে। নিজেই জানিয়ে দিলেন তিনি— সীতার অসুখ করেছে বউমা— কাজকর্ম আজ নিজেরা করে নিও। নবনীকে বল বড়ো বউমাকে নিয়ে আসুক।

মেজোবউ ভালোমানুষ, নইলে সে প্রসন্নময়ীর দুচোখের স্তম্ভিত দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারত সীতার আর যাই করে থাক অসুখ করেনি। বুঝতে পারে না বলেই বোকার মতো বলে, কী হয়েছে সীতার? অক্লান্তকর্মা মেয়েটার এমন কী হতে পারে যার জন্য ভোরবেলায় পুজো ফেলে প্রসন্নময়ী তার বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

আছেন। কী হয়েছে! এতক্ষণে যেন প্রসন্নময়ীর সম্বিৎ ফিরে আসে। স্বাভাবিক ভাবেই সবাই জানতে চাইবে সে-কথা— কী হয়েছে?

স্থির গলায় বলেন, ও ঘরে তোমরা কেউ যেও না মা— ওর হয় তো বসন্ত হবে।

দু-পা সরে গেল মেজো বউ সে-কথা শুনে, আর নিজের বলা মিথ্যে কথাটা যেন বাজের শব্দের মতো বুকে গিয়ে বিঁধল প্রসন্নময়ীর। আজ সকালের পুজো তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে। আধখানা গাঁথা মালা পাথরের থালায় পড়ে আছে। গোপালকে স্মরণ করতে গেলে সীতার বিধ্বস্ত চেহারাটা ভেসে ওঠে। সব অন্ধকার করে দিচ্ছে। আর এসব কিছুর মূলে নাকি গোপীমোহন? নবনী নয়, মোহিনী নয়। পুজো করতে বসলে বিগ্রহের মতোই যে সমাহিত হয়ে থাকে— সেই তাঁর গোপীমোহন।

পুজোর ঘরের সামনে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখলেন গোপী বেরুচ্ছে পুজো সেরে। সাদা গরদের ধুতি পরা শুভ্র দেহ, রোজকার মতোই চন্দনের তিলক তার মুখে, কপালে, নাকে। বুকে কৃষ্ণের পায়ের ছোটো ছোটো চন্দনের ছাপ এখনো শুকোয়নি। রোজকার মতোই এগিয়ে এসে সে প্রসন্নময়ীর পায়ের ধুলো মাথায় নিল; জিভে, কপালে, বুকে ছোঁয়াল; মুখে গুরুর দেওয়া দীক্ষামন্ত্র।

গোপীমোহন যে তাঁর বিশ্বাসের ধ্বজা। এ হতে পারে না— এ হতে পারে না!

প্রসন্নময়ী বুকের ভেতর থেকে কান্না যেন সমস্ত বাঁধ ছাপিয়ে উঠেছে। মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করেও কোনও লাভ হল না। ছুটে ঠাকুর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। গোপীমোহনের দেওয়া মালা খুলে ফেলে দিলেন তাঁর বিগ্রহের গলা থেকে। তার দেওয়া ফুল টান দিয়ে ঘরের একপাশে ফেলে দিয়ে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলেন প্রসন্নময়ী।

স্বামীর স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রথম জীবনে যে কান্না কেঁদেছিলেন, তেমন বুকভাঙা কান্না অনেককাল আর কাঁদতে হয়নি তাঁকে। মেয়ে ললিতা বিধবা হলে কিংবা মোহিনীর ব্যঙ্গের হাসি ক্ষমা করতে না পেরে যা কেঁদেছেন তাতে ব্যথা ছিল, অভিমান ছিল— এমন যন্ত্রণা ছিল না। এ দুঃখ তাঁর ছেলে গোপীমোহনের জন্য নয়, তাঁর পাঁচটা ছেলেমেয়ে কিংবা বউটার কথা ভেবে নয়, এ যেন কেউ তাঁকে ওপরের আকাশ থেকে ছুঁড়ে নীচের মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়েছে। তাঁর বুকের মধ্যে থেকে কে যেন বারে বারে আর্তস্বরে বলে উঠেছে— এ হতে পারে না, এ হতে পারে না।

নবনীর ছেলেমেয়ে তিনটি অকারণে আজ মেজোবউ-এর হাতে মার খাচ্ছে। কারণ সংসারের হাল ধরতে আজ সীতা নেই। নবনী তার তেলের বাটির জন্য চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছে— কারণ সেটাও এগিয়ে দেয় সীতাই। হয়তো আর খানিকটা পরে গোপীমোহনের বউও এসে পড়বে। তখন হয়তো সংসারে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা

দেখা দেবে ওই একটা মেয়ের অভাবেই। অথচ কেউ জানে না ওই মেয়েটাই কী ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে প্রসন্নময়ীর বিশ্বাসের মূল ধরে। সীতার আর জায়গা হবে না এ সংসারে— পৃথিবীতে ওদের মতো মেয়ের জায়গার অভাব হবে না।

শক্ত হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে সীতার বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে প্রসন্নময়ী বললেন, দরজা খোল সীতা। দরজা খুলে গেল ভেতর থেকে। একইভাবে বসে আছে সে। সে-পাপের চেহারা আর একবার চোখের সামনে দেখে শিউরে উঠে চোখ বুজতে চাইলেন প্রসন্নময়ী। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের আর শেষ রইল না। কাঁদছে না আর সীতা, বরং কেমন উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে। যেন সে ব্যঙ্গ করছে প্রসন্নময়ীকে। তাঁর অস্থিরতা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে উপভোগ করছে। হাত ধরে তাকে সামনে টেনে এনে অস্থির গলায় ছটফট করে উঠলেন প্রসন্নময়ী।

তুই মিথ্যে বলেছিস সীতা। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না— বিশ্বাস করি না।

আমি মিথ্যে বলিনি মাসিমা।

আরও শক্ত করে হাত চেপে ধরে বিবর্ণ ভীত মুখে কর্কশ গলায় কথা বলে উঠলেন প্রসন্নময়ী, তুই কুড়ি-বাইশ বছরের একটা যুবতী মেয়ে, তোর বাসনা-কামনা আছে, তারই তাগিদে তুই ওর ঘরে ঢুকেছিলি।

আমি তা পারি না মাসিমা।

পারিস না! তুই একটা নিরাশ্রয় মেয়ে। পরের সংসারে দাসীর মতো খাটিস, অথচ এতটুকু বিষণ্ণতা নেই। এত খুশি তুই কেমন করে থাকিস? তোর গুরু নেই, বিগ্রহ নেই, অথচ কীসের তোর বিশ্বাস?

সীতা মাথা নিচু করে একটুখানি সময় চুপ করে থাকে। তারপর বলে, আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পাচ্ছেন না? কারণ আমাকে অবিশ্বাসই করাই সবচেয়ে সোজা— একথা আমি প্রথমেই বুঝেছি। আমিও আর এখানে থাকব না— আজই চলে যাব।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রসন্নময়ী বলেন, কোথায় যাবি শুনি? কোথায় তোর জায়গা? কেউ তোকে বিশ্বাস করে জায়গা দেবে ভেবেছিস?

সীতা উত্তর দেয় না।

প্রসন্নময়ী কর্কশ গলায় বলেন, কী তোর বিশ্বাস শুনি? যার জোরে তুই কোনও পাপ করতে পারিস না। বল দেখি।

সীতা এবার জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেয়, যেন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারপর তার সুটকেস খুলে অতি যত্নে তুলে রাখা কোনও একটা জিনিসের মোড়ক খুলতে থাকে— যেমন করে প্রসন্নময়ী রোজ সকালে তাঁর গোপালকে তোলেন, যেমন করে তার গা মুছিয়ে দেন, যেমন করে তার অঙ্গ চর্চিত করেন চন্দনে, যেমন

করে তার জন্য মালা গাঁথেন— তেমনি যত্নে সীতা প্রকাশ করছে তার বিশ্বাসকে। ছবিখানা সে প্রসন্নময়ীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এই আমার বিশ্বাস মাসিমা— ভালোবাসার বিশ্বাস। আমি অন্য পথে যেতে পারি না। প্রসন্নময়ীর কাঁপা হাত থেকে মিলিটারি পোশাক পরা হাসিমুখ মোহিনীর ছবিটা মাটিতে পড়ে যেতে সীতা সেটা সযত্নে কুড়িয়ে নেয়।

প্রসন্নময়ীর ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। ফ্যাকাশে মুখে বলেন, মোহিনীকে তুই এত বিশ্বাস করিস? কোন সাহসে?

যে সাহসে লোকে দুঃখ-কষ্টেও ভেঙে পড়ে না।

ও জাত মানে না, ধর্ম মানে না, দেবতা গুরু কিছুই মানে না। ও পাষণ্ড হয়ে গেছে যুদ্ধে গিয়ে। তোকে ঠকাবে না জানলি কী করে?

সীতার সমস্ত মুখ এবার লাল হয়ে ওঠে। মাথা নিচু করে অস্ফুটে সে বলে, জানি।

প্রসন্নময়ী এবার জেদি গলায় বলেন, কিন্তু সব শোনবার পর মোহিনী যদি তোকেই অবিশ্বাস করে। যদি আমি সে ব্যবস্থা করি?

সীতা শান্ত চোখে প্রসন্নময়ীর মুখের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে।

প্রসন্নময়ী ঝগড়াটে হিংসুক চোখে সে-মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সীতার হাত থেকে ছবিখানা কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে বলেন, এই আমি ছিঁড়ে ফেললাম ছবি— এখন?

তবু সেই একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মেয়েটা। তার সারা মুখের লাল আঁচড়গুলো তখনও মেলায়নি। তখনও তেমনি বিধ্বস্ত ক্লান্ত চেহারা তার। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে তার সেই নিঃশব্দ হাসি। সে মুখে শরতের আলো এসে পড়েছে জানালার ফাঁক দিয়ে। দু'চোখের কোণে তখনো চিকচিক করছে জল। হাসি দিয়ে কী যেন বোঝাতে চাইছে প্রসন্নময়ীকে!

হঠাৎ পাগলের মতো প্রসন্নময়ী দুহাতে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন মেয়েটাকে। তাঁর চোখের জল সীতার মাথার চুলে ঝরে ঝরে পড়ে।



ভাঙাঘরের কাব্য

ঝড়ে ভাঙা, উলটে-যাওয়া নৌকোর মতো একতলা ছাতা-ধরা বাসার কড়াটা নড়ে উঠল খট খট করে— দাড়ি কামানো শেষ না করেই বেরিয়ে এল সুমন্ত্র দরজা খুলতে।

একগাল হেসে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে মন্মথদা বললেন, ভালো আছ?

তাঁকে প্রায় দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সুমন্ত, মনুদা আপনি? উঃ কতকাল পরে দেখা! আসুন ভেতরে।

দরজায় খিল লাগিয়ে ভিতরে এসে সুমন্ত ভাবনায় পড়ল, বসাবে কোথায়। ঘরের মধ্যে তোলা উনুনে বাসন্তী রান্না করছে। এখন কিছু বলবে না ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে, পরে তার শোধ নেবে। দাঁতে দাঁত চেপে গা পোড়ানো কথা বলবে, সারাদিন খাবে না, ছেলেমেয়েগুলোকে পিটবে দুমদাম। দু-একবার আন্তরিকতা দেখিয়ে তার রান্না করার সময়টাকে কোনো বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘরে বসিয়ে এ অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে।

বউ বলে, সং নাকি আমি। ঘরের গরমে, আগুনের গরমে একে পারিনে জামা গায়ে রাখতে, তারপর ধুমসো এক পুরুষ মানুষ বসে থাকবে সামনে— বৌদি বৌদি করবে। না পারি হাত-পা নাড়তে, না পারি কথা বলতে। পেয়েছ কী আমাকে?

ঘরের সামনে ছোট্ট আধহাত বারান্দাটা বাসন্তীর রান্নার কয়লা আর কাঠে আর আজেবাজে জিনিস বোঝাই থাকে— নড়া যায় না, কাজেই ওখানে রান্নার কথা বলেও লাভ নেই।

শেষে ঘর থেকে একখানা চেয়ার এনে আধহাত বারান্দাটায় পেতে দিল। মন্মথদা বসলেন। কেমন ঝড়ে উড়ে পড়া কাকের মতো রুক্ষ, শীর্ণ চেহারা— এ

কী চেহারা হয়েছে মনুদা আপনার? সুমন্ত জিজ্ঞেস করল।

যস্মিন দেশে যদাচার। তুমি বা কোন্ ভালো আছ হে? একটু চা খাওয়াও দেখি।

সুমন্ত ঘরে ঢুকে বাসন্তীর সামনে অপরাধীর মতো দাঁড়াল, লক্ষ্মীটি রাগ করো না, তোমার কড়াইটা নামিয়ে একটু চা করে দাও।

আবার কে এলেন মাথা খেতে, শান্তি নেই একটু, বাবারে বাবা।

বাসন্তী দুম করে কড়াই নামিয়ে ছোটো একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে জল চাপিয়ে দিল। চা নিয়ে বাইরে এলে মন্মথদা খুশি হয়ে উঠলেন, চা খেতে খেতে বললেন, কই হে, বউ দেখাও। আছ কেমন?

সুমন্ত হাসল, কেমন দেখছেন?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ার মতো মন্মথদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, জানো অরুণা মরা গেছে।

ইস্! কেমন করে?

কেমন করে আবার। রাজরোগ হে, রাজরোগ। আবার বিয়েও করেছি, একটি পুত্রমুখও দেখেছি। মেয়েটি কে জানত— তোমাদেরই সহপাঠিনী জ্যোতি।

সে যে! সুমন্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

অবাক হচ্ছো যে। সে আমার মেয়ের বয়সি এই তো। তা আর কী বল? যদি আমাকে ছাড়া দুনিয়ায় কাউকে বিয়ে করবেই না বলে দিনের পর দিন হাঙ্গার স্ট্রাইক চালায় তবে আর আমার উপায়টা কী? তুমি অবাক হয়েছো, আর সব ছেলেগুলো নাকি হিংসে করে। মেয়েটা কিন্তু ভালো— আমাকে ভালোবাসে বড্ড।

সেই কলেজেই আছেন তো এখনও!

পাগল, কবে দিয়েছে ছাঁটাই করে। জানোই তো আমার মেজাজ— খোসামোদ করে চাকরি বজায় রাখা তোমাদের মানুদাকে দিয়ে হবে না।

সে কী, চলছে কী করে তবে?

কী জানি জ্যোতিই বুঝি কী করে চালায় মাস্টারি আর টিউশনি করে। বড় ভালো মেয়েটা বললাম না। কী জন্যে যে আমার মতো হতভাগার ঘাড়ে এসে পড়ল। ওসব তোমাদেরই মানাত ভালো।

সুমন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠল বাসন্তীর কথা ভেবে। হয়তো দরজার আড়ালে আড়ি পেতে আছে। এককালে ওর স্বামী কলেজের ভালো ছেলে ছিল আর তার মেয়েবন্ধু ছিল। এ দুটো এখনও বাসন্তীর কাছে ভয়ের জিনিস হয়ে আছে। কেউ দরজায় কড়া নাড়লে ও উৎকর্ণ হয়ে থাকে— পেছন থেকে দেখে নেয় আগন্তুক মেয়ে না ছেলে। স্বামীর সুন্দর চেহারা নিয়ে ওর ভারী ভয়। এখনও প্রায় প্রৌঢ় সুমন্তকে দেখে নাকি অনেক মেয়েরই মাথা ঘুরে যেতে পারে। মেয়েরা কিন্তু কোনোদিন এ-বাড়িতে আসে না কেউ— একটা ন-বছরের মেয়েও না, তবু

বাসন্তীর শান্তি নেই।

আর সত্যিই এখনও আশ্চর্য সুন্দর সুমন্ত— কে বলবে দুটো-তিনটে ছেলেমেয়ের বাপ হয়েছে। দারিদ্র আর দুশ্চিন্তা যেন স্পর্শ করে না ওকে। সাতদিন দাড়ি না কামানো মুখেও ওকে যেমন দেখায়— যেমন দেখায় ছেঁড়া গেঞ্জি আর ময়লা লুঙিতে, তেমনি দেখায় একটু সাজলে। হাঁ করে তাকিয়ে থেকেও আশ মেটেনা ওর। অফিস থেকে ফিরতে একটু দেরি হলে, রাগে আর শঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে থাকে, কেমন অজানা ভয়ে শিরশির করে বুকের মধ্যেটা। আজকালকার ওই আধুনিক মেয়েগুলোকে ওর বড়ো ভয়— এখনও কি ওরা ভুলেছে সুমন্তকে। সুমন্ত হাসে, অমন করে আর কতকাল আগলাবে স্বামীকে— লোকে পাগল বলবে। এখন আর চেহারায় ভোলে না কেউ— পরিচয় তো কবেই ভুলেছে। একশো টাকা মাইনের কেরানির দিকে কি ফিরে তাকায়! মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়ে তোলে, জানো আজ অফিসে টাইপিস্ট মেয়েটার পাল্লায় পড়েছিলাম। কিছুতেই ছাড়বে না। নিয়ে গেল রেস্টুরেন্টে, কত কী যে খেলাম। বলে আর আড়চোখে তাকায় ওর মুখের পরিবর্তন লক্ষ করবার জন্যে। বেশি কিছু করেনি সেদিন বাসন্তী— কেবল রান্না কবা তরকারিতে একঘটি জল ঢেলে উঠে গিয়েছিল।

সুমন্তকে তাই বাধা দিতে হল মন্মথদা'র উচ্ছ্বাসে। তবু থামানো যায় না, বলেই চলেন, এখনও কিন্তু জ্যোতি তোমার নাম প্রায়ই করে। ওর সঙ্গে তো তোমার বেশ ইনটিমেসি ছিল এককালে। বলে, এ সমাজে সত্যিকার লোকগুলো মূল্য পায় না। বুঝি সব ভায়া, দুঃখটা কোথায়। কী হতে কী হয়ে যায়।

অফিসের বেলা হয়ে এল— বিব্রত সুমন্ত এবার উঠে পড়ে, আচ্ছা, আর একদিন কিন্তু আসবেন মনুদা। আজ তো আর কথা বলতে পারছি না— যা অফিস, পাঁচ মিনিট এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষে নেই।

মন্মথ চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, বেকার মানুষ, বউ-এর কল্যাণে খাই-দাই ঘুরে বেড়াই, অফিস-ইস্কুলের কথা মনেই থাকে না।

দুপা এগিয়ে আবার পিছিয়ে এলেন, প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিশফিশ করে বললেন, গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পারো সুমন্ত, আছে? নিদেন দুটো! বাচ্চাটার জন্যে কিছু একটা কিনে নিয়ে যাব। কাল বড্ড রেগেছে জ্যোতি, ছেলেটার ওপর আমার নাকি একটুও মায়া নেই।

পকেটে ছিল— খুচরো আর টাকায় মিলিয়ে হাতে তুলে দিল, মাসের শেষ, আনতেই সব কাবার। দুটোর বেশি পারলাম না। মন্মথ খুশি হলেন, ঠিকানা বললেন মুখে মুখে, যেও একদিন। বেরিয়ে যাবার মুখে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, যেও, জ্যোতি খুশি হবে।

শনিবারের অফিস, দুপুরের চকচকে চেহারাটা বড়ো ভালো লাগল সুমন্তর। এখুনি উলটে যাওয়া নৌকোর মতো বাসাটায় ফিরতে হবে ভেবে মনটা খারাপ

হয়ে গেল। সময়মতো না ফিরলে বাসন্তী রাগে গুম হয়ে থাকবে, তা থাক— তবু আজ ফেরা হবে না।

মনে পড়ল মন্মথদার কথা— নোটবুক থেকে ঠিকানাটা দেখে নিয়ে বাসে উঠে সুমন্ত সন্তর্পণে একবার হাসল সূক্ষ্ম ঠোঁটে— জ্যোতির কথা ভেবে।

দরজার ওপাশে খিলটার ওপর হাত রাখল কে যেন!

একমুহূর্তে মনে হল সুমন্তর চলে যাবে কিনা। কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে ঠিক দুপুরবেলায় দেখা করতে আসা—। 'আহিরীটোলা আর বাগবাজার, এত কাছে, পাঁচ বছরের মধ্যে তো কই খোঁজ নেননি—?' যদি বলে জ্যোতি, যদি বলে আরও অনেক কথা, কিন্তু উপায় নেই। দরজটা ততক্ষণে খুলে গেছে শব্দ করে। মুখ বাড়িয়ে দেখে একটুখানি চমকে গিয়ে হেসে ফেলল জ্যোতি— আরে তু-আপনি? আসুন, আসুন, আমি তো ভাবতেই পারিনি।

চোখের বিস্ময় কেটে গেল এক মিনিটে। গায়ের আঁচলটা ভালো করে টেনে, দরজা বন্ধ করে সুমন্তকে নিয়ে ওপরে চলে এল জ্যোতি। গোছানো একখানা ঘর— চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নিজে গিয়ে বসল খাটের ওপর সোজা হয়ে— তারপর একটু হাসল, বাব্বাঃ, কতদিন পরে দেখা হল, কত খুঁজেছি আপনার ঠিকানা সুমন্তবাবু।

কেন মনুদা তো জানতেন। .

ওঁর কথা! জানতেন নাকি সত্যি, আমাকে বলেননি তো কিছু। গিয়েছিলেন বুঝি আপনার ওখানে!

হাসল সুমন্ত, হ্যাঁ, হঠাৎ গিয়ে হাজির— আমার তখন অফিসের বেলা হয়ে গেছে, কথাও বলা হল না ভালো করে।

উনি ওমনিই জানেনই তো, আজকাল আরও বেড়েছে। দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন। জ্যোতির চোখে নেমে এল ব্যথার ছায়া, ঝগড়াঝাঁটি করে চাকরিটা ছাড়লেন। তারপরেও কতবার ডেকেছে ওরা— যাবেন না। আমি ওঁর হয়ে দরখাস্ত করলাম— ইন্টারভিউয়ের ডাক এল দু-একটা জায়গা থেকে— গেলেন না।

অরুণাদি মারা যাওয়াতেই শকৃড হয়েছেন বোধ হয়, নইলে আগে তো এমন ছিলেন না।

জানেন তো সবই। আপনি তো পাস করে গেলেন বেরিয়ে, আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি সে-বছর। ওঁর কাছেই পড়ছিলাম। কেমন অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছিলেন— ছাত্রছাত্রী সব চলে গেল পড়াশোনা হয় না বলে, আমিই শুধু ছিলাম। এলেই দেখতাম চুপ করে বসে আছেন একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে, এত কষ্ট হত আমার। তারপর—।

সুমন্ত বাধা দিয়ে হাসল, তারপর আর কী। মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে

একটি মাত্র উপায়ই ছিল— শুরু হল কঠোর তপস্যা এবং তারপরই কুমার কার্ত্তিকেয়র আগমন।

লজ্জায় মুখ ঢেকে ফেলল জ্যোতি, ছিঃ, আপনি এখনও তেমনিই আছেন। ওমনি করে বলে?

ছেলেমেয়ের মা-বাপ হয়ে গেলাম, বুড়ো হতে চললে এখন আর ওসব কলেজি লজ্জা রাখো। কিন্তু কী করলেন তোমার সেই বিকাশ পাল? হিংসেয় বিদীর্ণ হয়ে গেল না তাঁর বুক?

সেই পুরোনো দিনগুলোর মোহ কেমন যেন ঘিরে ধরছে জ্যোতিকে, বলে, মনে আছে সেই হাতে হাত রেখে সারাজীবন বন্ধু থাকবার প্রতিজ্ঞা?

প্রাণখোলা হাসি হাসল সুমন্ত, আরে তা নইলে কি আর তুমি বয়সে চতুর্গুণ এক মাস্টারকে বিয়ে করতে, আর আমার কপালে জুটতো ফোর্থক্লাস পড়া সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মহিলা। কবে বিয়েই করে ফেলতাম তোমাকে।

দেওয়ালে ঝুলছিল অরুণার এক আবক্ষ মূর্তি— মধ্যবয়সী, শান্ত সৌম্য এক মহিলা— খাটের একপাশে ঘুমিয়েছিল ফর্সা সুন্দর ছেলেটা, ওদের একবার দেখে নিয়ে জ্যোতি একটু চুপ করে রইল, চোখ দুটো ছলছল করে উঠল হঠাৎ, বলল, কিন্তু মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ বলছিলেন আপনি, তা তো হয়নি সুমন্তবাবু— আমি যে একা সে একাই রইলাম। চাকরি— টিউশনি করে সারাটা দিন কাটলেও, অবসর সময়টা অসহ্য লাগে। বন্ধু-বান্ধব আর সহপাঠিনীরা আমার এ অদ্ভুত নির্বাচনে কেমন দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

ভাই-বোন নেই, মা দূরে থাকেন, এক স্বামী, তিনি আমার কাছে দুর্লভ। কেমন যেন মনের যোগ নেই। অথচ অরুণাদির সঙ্গে দেখেছি অদ্ভুত একটা সুন্দর সম্পর্ক ছিল। চাকরি করি হাওড়ার একটা স্কুলে— এম.এ. পাস করেছি অথচ মাইনে দেয় গ্র্যাজুয়েটের— আশি টাকা। বলেছিলাম সে-কথা। ও চাকরি ছেড়ে দাও— সোজা বললেন। কী করে যে চলবে সে-কথা একবারও ভাবলেন না। ছাড়া তো দূরের কথা চাকরির পরে আরও গোটা দুই টিউশনি করে চালাচ্ছি কোনোমতে। কোথাও ওঁর মন নেই— ছেলেটার কথাও ভাবেন না একবারও।

সুমন্ত বলল, সেদিনের দুটো টাকার ইতিহাস, চেয়ে নিলেন, বাচ্চাটার জন্যে কী যেন আনবেন বললেন।

কোথায়? জ্যোতি তাকাল বিস্মিত চোখে— আনেননি তো।

তোমাকে কিন্তু ভালোবাসেন, শ্রদ্ধাও করেন, সে তুমি যতই বল।

ওই পর্যন্তই। সেই গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক নিয়েই কাটাবেন স্থির করেছেন চিরকাল। ছেলের মা হয়েছি— এখনও বলেন এক কথা, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও জ্যোতি, কেন জীবনটাকে নষ্ট করবে আমার সঙ্গে, শুনেছেন? বলে আঁচল দিয়ে চোখের কোণ দুটো মুছে ফেলল, অন্যায় করলেও বকবে না কখনও, কষ্ট পেলে

তাকিয়েও দেখবেন না। এত খাটি— বাইরে থেকে বাড়ি ফেরার কথা ভাবতেই বুকের মধ্যে কেমন করে— স্বামীর ঘর করি আমি! সারাদিন বাড়ি না ফিরলেও জিজ্ঞেস করবেন না কোথায় ছিলাম— জিজ্ঞেস করবেন না খেয়েছি কিনা, এমনি, এতক্ষণে চোখের কোণে জল টলমল করে।

বাচ্চাটার জন্যে বুড়ি ঝি আছে। ইস্কুল থেকে ফিরেছি কাল, দেখি সে কাঁদছে হাঁউমাউ করে— ছেলেটা নীল শক্ত হয়ে গেছে। ও নাকি একটুখানির জন্যে কোথায় গিয়েছিল ওঁর ভরসায় ছেলেকে রেখে— পড়ে গেছে খাট থেকে। তাকিয়েও দেখেননি একবার। নির্বিকার, বসে বই পড়ছেন।

সত্যি! সুমন্ত আপশোস করে, এমন করলে কী চলে, ছিঃ। যা ছিলেন, তা ছিলেন এককালে। তোমার মতো মেয়েকেও ছিঃ। আসলে বুঝলে সচমচ সমাজটায় একটা ভীষণ গলদের বোঝা চেপে ধরেছে— আর তারই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনগুলোয়। তুমি যদি হতে অরুণাদির মতো নেহাতই গোবেচারা ভালোমানুষ— যার স্বামী ছাড়া আর উপায় নেই পেটটা চালানোর, পতি পরমগুরু বলে পরম নির্ভরতায় তাকিয়ে থাকতে পারতে মানুষটার মুখের দিকে তাহলে হয়তো এতটা হত না। গলদটা হয়েছে তোমার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের জন্যে— ওটাকে বিসর্জন দিয়ে দাও, বলে হেসে উঠে দাঁড়াল সুমন্ত, চলি আজ, আর একদিন আসা যাবে।

আরে, জ্যোতি উঠে দাঁড়াল তাড়াতাড়ি— যাবেন মানে, চা-টা না খেয়ে— । আর আমি যে ভাবছিলাম আপনাকে সঙ্গে বেরুব কোথাও।

হাতঘড়িটা একবার দেখে নিল সুমন্ত— চারটে বেজে গেছে, বাসন্তীর ধৈর্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে, দাঁতে দাঁত চেপে দরজাটার দিকে কান পেতে আছে আজ ঘটবে কিছু একটা।

তবু বলে, বেরোবেই যদি, বাড়িতে তবে আর হাঙ্গামা করা কেন, খেয়ে নেব কোনো দোকানে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নাও।

বেরুবার মুখে জেগে-ওঠা ছেলেটাকে কোলে তুলে একবার আদর করে নেয় জ্যোতি, ঝিকে বলে, 'ফিডিং বোতলে দুধ ভরে ঠিক চারটে পঁচিশের সময় খাওয়াবে ওকে বসন্ত— আর বাবু এলে চা করে দিও। ওকে ফেলে যেন কোথাও যেও না, আমি না আসা পর্যন্ত।

সুমন্ত নীচে দাঁড়িয়ে তাড়া দেয়, এসো তো তুমি।

নেমে এলে বলে, বড়ো বেশি সংসারী হয়েছো তুমি। লেখাপড়া তো চুলোয় গেছে বোধ হয়? জ্যোতি হাসে, না, ওই একটি বিষয়েই আন্তরিকতা আছে ওঁর। বই-টই নিয়ে পড়াতে বসে ভারি খুশি। রাগ করে যদি বলি ভালো লাগছে না তাহলেই উপদেশ, এখনও যেন সে-ছাত্রীই আছি।

সন্ধেটা আজ কাটল ভালো— অন্তত সুমন্তর বারেবারে মনে হতে লাগল

সে-কথা।

দুজনে চলে গেল অনেক দূরে, আউটরাম ঘাটের ওপরটায় নিস্তব্ধতায় কাটল সময়গুলো, চুপচাপ, চায়ের পেয়ালার চুমুক দিয়ে জ্যোতি হাসল মিষ্টি করে, স্কুল পালানো ছেলের মতো দুষ্টুমি-ভরা হাসি, বেশ লাগছে না? জীবনে যেন দুঃখ আর অভাব আছে বলে মনে হয় না এখানে এলে অথচ ব্যাগে তো তোমার আমার দুজনেরই আছে বোধ হয় কয়েক আনা পয়সা?

মনে হচ্ছে পুরনো দিনগুলোয় ফিরে গেছি আবার, সুমন্ত হাসল গঙ্গার ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে। চায়ের পয়সা দিতে গেলে জ্যোতি হাত চেপে ধরল, ওর সরু সরু ফর্সা আঙুলগুলো নীচে চাপা পড়ল সুমন্তর হাত। শেষে ঠিক হল সুমন্ত দেবে চায়ের পয়সা আর জ্যোতি খাওয়াবে চানাচুর।

ইডেন গার্ডেনে দুজনে চানাচুর খেল কাড়াকাড়ি করে, তারপর জলের ধারে বসে রইল চুপচাপ। কিন্তু একটু পরে এখানে-ওখানে আলো জ্বলে উঠতেই উঠে পড়ল জ্যোতি, আজ চল, বাবুলটা হয়তো কাঁদছে। রাত্রে আবার একরাশ পরীক্ষার খাতা দেখা আছে।

একমুহূর্তে দুজনেই আবার ফিরে এল বাস্তবে, সুমন্তর মনে পড়ল বাসন্তীর কথা, একতলা অন্ধকার ঘরের কথা। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল দুজনেরই। সেই ছেলেমানুষি ঝেড়ে ফেলে জ্যোতি একমুহূর্তে ফুটিয়ে তুলল মাস্টারের গাম্ভীর্য আর সুমন্ত গম্ভীর মুখে একটা সিগারেট ধরাল। সমস্ত রাস্তাটা নিঃশব্দে এসে জ্যোতিকে তার দরজায় পৌঁছে দিয়ে সুমন্ত বাড়ি ফিরে গেল।

দরজা খুলে দিল বাসন্তী, কিন্তু আজ আর দেরি হয়ে যাওয়া দিনগুলোর শঙ্কা আর গাম্ভীর্য মেশানো থমথমে মুখে নয়— খুলে দিল চঞ্চল আর হাসিখুশি মুখে। সুমন্তর করুণ গম্ভীর মুখখানার দিকে একবাব তাকিয়েও দেখল না।

ঘরে এসেও সেই হাসি হাসি মুখেই উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে এগিয়ে এল সুমন্তর জামাটা তুলতে, চা খাবে তো, নাকি খেয়ে এলে কোথাও? একটু আগে এলে সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যেতে। সত্যি কি মজার মানুষ তোমাদের ওই মনুদা! মাগো, হাসতে হাসতে পেটে আমার খিল ধরে গেছে এতখানি বয়স হয়েছে, এখনও ভেতরটা যেন ছেলেমানুষের মতো।

মনুদা এসেছিলেন?

সে কী এখন? অফিস থেকে ফেরোনি শুনে বললেন, একটু বসবেন। কী আর করি, দিলাম বসতে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব করে নিলেন এক মিনিটে। এমন মজার গল্প জুড়ে দিলেন যে ঘবে বসে বুড়ো মাগি আমিও হাসতে হাসতে বেরিয়ে পড়ি। আমার সঙ্গেও ভাব করে নিলেন জোর করে।

চায়ের পেয়ালা সামনে এগিয়ে দিয়ে বাসন্তী বসল চেয়ারে, পুরো দুটো ঘণ্টা ছিলেন— আমাকে তো জানো জীবনে পুরুষ মানুষের সঙ্গে ভালো করে কথা

বলতে পারি না। কিন্তু মনুদা চলে গেলেন যখন, মনে হল কত আপনার। সপ্তাহে দু-তিনদিন আমাকে এসে পড়িয়ে যাবেন।

চায়ের কাপে লম্বা একটু চুমুক দিতে দিতে শুনে গেল সুমন্ত কথাগুলো। মনের মধ্যে বাসন্তীর প্রগল্ভ আর উচ্ছ্বাসে ভরা কথাগুলো কেমন কাঁটার মতো বিঁধছে খচ্‌খচ্‌ করে— আনন্দে যেন উপচে পড়ছে মেয়েটার, সুমন্তর চোখে যা নতুন। বউ নাকি তার মনের কথাগুলোর প্রতিধ্বনি শুনেছে মনুদার কাছে যা কেউ তাকে শোনায়নি কোনোদিন। তবু ভালো অমন কালো থমথমে মুখখানায় শেষ পর্যন্ত হাসি ফুটিয়ে গেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর ভেসে উঠল জ্যোতির ক্লান্ত করুণ মুখখানা— স্তিমিত ছলছলে চোখ। তার অকারণে উচ্ছল হাসি হঠাৎ বিষাদের তিক্ততায় ভরে যাওয়া। জ্যোতির স্বামী মনুদা! শেষ পর্যন্ত অশিক্ষিত, সন্দিগ্ধমনা, দজ্জাল মেয়েকে খুশি করবার ভারই শুধু নিলেন না— তাকে পরিবর্তিত করে দিয়ে গেলেন মাত্র কয়েক ঘণ্টায়। অনেকক্ষণ পরে চেপে রাখা একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিজেই চমকে উঠল সুমন্ত, সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, আসল জায়গাটায় পৌঁছানো যাচ্ছে না অনেক ভেবেও।

জ্যোতিকে খবরটা দেবার জন্যেই বোধ হয় দুদিন পরে হঠাৎ প্যাটেল মরে যাওয়ায় অফিস ছুটি হয়ে গেলে, সুমন্ত এল। জ্যোতি এসে দরজা খুলে দিল। বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে তাকাল তার দিকে— কী হল? বাবলুর কিছু?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল সুমন্ত।

না।

তবে, অমন মুখ করে রয়েছো?

ওপরে নিয়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে জ্যোতি নিজে ঢুকল ভেতরে।

সুমন্তবাবু এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

একটু চমকে উঠে স্থির হয়ে গেল সুমন্ত, জ্যোতির তখনকার মুখের অবোধ্য ভাবটা অনেক সহজ হয়ে এল ওর কাছে— হাসিমুখে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এলাম আপনার কাছেই। আপনি নাকি সেদিন আমার ওখানে গিয়েছিলেন, বাসন্তী বলছিল। সময় তো পাইনে— ভাগ্যিস প্যাটেল মারা গেল।

এসো, কাগজখানা চোখের ওপর থেকে নামিয়ে মনুদা বললেন, ভাবছিলাম মনে মনে অনেক কথা। এই প্যাটেল, কী দুর্জয় আর দুর্দান্ত— গেল শেষ পর্যন্ত। আমাদেরও দিন হয়ে এল।

আপনার। সুমন্ত হা হা করে হেসে উঠল— প্রাণখোলা হাসির দমকে ঘরটা যেন ফেটে পড়তে চায়। জ্যোতির ছলছলে চোখ আর গম্ভীর মুখেও হাসির রেখা ফুটল। আপনি! প্যাটেল তো আপনার ঠাকুরদাদার বয়সি। কী যা তা ভাবছেন?

বাবলুর দিকে একবার চোখ তুলে তাকালেন মনুদা, জ্যোতি তো রইল, ওই

নিতে পারবে ছেলেটাকে মানুষ করবার ভার আর করছেও তো ওই। আমি তো কেবল— দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপচাপ বসে রইলেন।

খানিকক্ষণ পরে সুমন্ত উঠে দাঁড়াল, যাই আজ, যাবেন একদিন জ্যোতিকে নিয়ে।

সিঁড়ি দিয়ে জ্যোতিও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল, আজ ক-দিন থেকে দেখছি ওমনি করছেন যেদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম সেদিন থেকেই। কিছুই করতে পারলেন না আমার জন্যে— আমার একেবারেই অনুপযুক্ত এইসব কথা শোনাচ্ছেন দিনরাত। কান্না পায় আমার।

বেরুবে একটু?

না না, কী মনে করবেন আবার। ভীত, শঙ্কিত গলায় জ্যোতি যেন আর্তনাদ করে উঠল।

সামনের শনিবারে বীণার দুটো টিকিট কাটব, ওখানে থেকো তিনটের।

ওপর থেকে মনুদা গম্ভীর গলায় ডাকলেন জ্যোতিকে— সুমন্ত রাস্তায় নেমে এল।

সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে পা দুটো ব্যথা হয়ে গেল সুমন্তর, কী মেয়েরে বাবা! চিরকাল ওমনি, এমন ভীতু ভীতু ভাব করে। হয়তো আসবেই না শেষ পর্যন্ত।

শেষ পর্যন্ত জ্যোতি এল, বলল, চল চা খেয়ে আসি আগে, আজ মাইনে পেলাম যে।

কফি হাউসের এক কোণে বসে চোখ ছলছল করে এল, বলল, আজ প্রচণ্ড ঝগড়া করেছি তোমাদের মহাদেবের সঙ্গে— অনেক কথা বলেছি মনে আঘাত দিয়ে। বললাম সত্যিই নির্বাচনে আমার ভুল হয়ে গেছে। এতদিন ও কথা নিজে বলেছেন দিনেব মধ্যে সাতবার করে আর আজ যেই শুনলেন আমার মুখ থেকে ওমনি মুখখানা কালো হয়ে উঠল— এবার দেখব এর রিঅ্যাকশান। দুপুরে না খেয়ে বেরিয়ে গেলাম স্কুলে— একবার বললেও না খেয়ে যেতে।

সুমন্ত হেসে গল্প করে চলল, আজ দু-তিনদিন বাসন্তী কথা বলে না ওর সঙ্গে। আজ জোর করে ভাব করতে গিয়ে কেঁদেকেটে অনর্থ বাধাল। দেখতে সুন্দর হলেই হয় না, মনটাকেও সুন্দর করতে পারা চাই। বাসন্তীকে অত অবহেলা করার ফল সুমন্ত পাবে একদিন।

নির্বাচনটা আর বলতে পারেনি, কারণ নেহাতই শুভদৃষ্টি করে বিয়ে হয়েছিল, বলে হাসল সুমন্ত জ্যোতির দিকে তাকিয়ে, যা হওয়া উচিত ছিল তা না উলটো হয়ে গেছে সব আমাদের তারই ফল ফলছে। খাওয়া আজ আমারও হয়নি। রাগ চরমে বাসন্তী রান্না ভাত আর তরকারিতে দু-ঘটি জল ঢেলে মনের জ্বালা মিটিয়েছে।

দুজনে খেয়ে বেরিয়ে এল, আঃ, এমনি যদি জীবনটা হত, অবহেলিত আর অবজ্ঞাত হবার জ্বালা থাকত না মনের মধ্যে— শান্তি পেতাম সত্যি, বলে জ্যোতি ম্লান একটু হাসল সুমন্তর দিকে তাকিয়ে। কেমন একটু রুক্ষ দৃষ্টিতে অন্যমনস্ক হয়ে ও তখন তাকিয়ে আছে ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংটার দিকে, কয়েক সেকেন্ড পরে মস্ত এক নিঃশ্বাস ফেলে বলল, চল।

অন্ধকার খানিকটা স্বচ্ছ হয়ে আসতে জ্যোতি হাত বাড়িয়ে সুমন্তর হাতটা চেপে ধরল, আস্তে আস্তে বলল, পাশের তিনটে সিট পরে তাকিয়ে দেখ।

মনুদা, সে চোখ সরিয়ে এনে বলল।

পাশে কে ভদ্রমহিলা?

আর একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে সুমন্ত বলল, আমার বউ বাসন্তী। অন্ধকারে জ্যোতি কেমন সংকুচিত হয়ে উঠল— তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলল, চলে যাই চল।

কেন? না! শান্ত শক্ত গলার উত্তব পাওয়া গেল তার।

ভিড়ের মধ্যে হয়তো দেখতেও পেতেন না মনুদা— সুমন্তই এগিয়ে গেল, জ্যোতি চলে যাচ্ছিল পেছনে, খপ কবে হাতটা চেপে ধরল।

কেমন লাগল মনুদা বইটা?

জ্যোতির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মনুদা হেসে উত্তর দিলেন, মন্দ লাগল না নেহাত। ওসব বাতিক আমার নেই। বাসন্তীর জন্যে আসতে হল, ছাড়বে না কিছুতেই। বেড়াতে তো পায় না বেচারা! তোমাদের কেমন লাগল?

ততক্ষণে বাসন্তী গিয়ে চেপে ধরেছে জ্যোতির হাত, আপনিই? কত শুনেছি আপনার কথা। অমায়িক হাসি হাসলেও চোখের দৃষ্টি ওর করুণ আর ছলছলে— বুকের মধ্যে কান্নার পাহাড় জমে যাচ্ছে, কিছুতেই ও সোজাসুজি তাকাবে না সুমন্তর মুখের দিকে— চকচকে সুন্দর বলিষ্ঠ উজ্জ্বল অমন সুন্দর সুমন্তর দিকে। কেমন ভয় কবছে।

মনুদা আর জ্যোতি চলে যেতে চাইলেও বাসন্তী ছাড়ল না— জোর করে নিয়ে গেল ওর বাসায়— চা আর খাবার খাওয়াল, হাসিমুখে, চঞ্চল পায়ে ছোটাছুটি করে ওদের আদর যত্নের আর কিছুই বাকি রাখল না। সুমন্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল— বাসন্তীকে যেন চেনাই যায় না।

জ্যোতিকে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে বাসন্তী হাসিমুখে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, কথা বলছেন না যে? লেখাপড়া জানিনে বলে বুঝি ঘেন্না হচ্ছে কথা বলতে?

তাড়াতাড়ি হাত চেপে ধরে বাসন্তীকে কাছে টেনে নিল সে, ছিঃ ছিঃ, তা কেন ভাই। কলেজের কতগুলো ডিগ্রি পেলেই কি লেখাপড়া জানা হয়? আপনার মতো এমন চটপটে, মিষ্টি স্বভাব কি আছে আমার? সংসারটাকে কেমন সুন্দর গুছিয়ে

রেখেছেন— তাই দেখছিলাম চুপ করে।

মনুদা শেষ লুচিখানা মুখে পুরছিলেন, শেষ করে হাসলেন বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে, এমন আদরযত্ন করে মেয়েটা— যেতে ইচ্ছে করে না আমার এখানে এলে। লক্ষ্মীর মতো স্বভাব। এদের ওপর যেন নির্ভর করা যায় জীবনটাকে ছেড়ে দিয়ে।

জ্যোতির বিষণ্ণ কালো মুখখানার দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে সুমন্ত চোখ ফিরিয়ে নিল— ওর দু-চোখের কোণে খুব ছোটো দুটো জলের ফোঁটা চিকচিক করছে। হাতব্যাগটা থেকে ছোট্ট রুমালখানা আস্তে আস্তে বার করে আনল, সুমন্তর চোখ পড়েছে বুঝতে পেরে কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল। যাবার আগে দুজনে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল স্বামী-স্ত্রী, ওরা রাস্তায় নেমে এলেও বাসন্তী দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে বারে বারে বলল, আবাব আসা চাই, আসবেন কিন্তু ঠিক।

তারপর দরজার খিল পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়াল, এতক্ষণে সোজাসুজি তাকাল সুমন্তর মুখের দিকে. নমস্কার! খুরে খুরে নমস্কার তোমার। একটা সংসার ঘাড়ে, দুই ছেলেমেয়ের বাপ তুমি, কলেজি স্টাইলে রেস্টুরেন্ট আর সিনেমা করে বেড়াতে লজ্জা করে না তোমার? ঈর্ষায় আর রাগে থমথমে কালো মুখখানা থেকে স্বামীর সর্বাঙ্গে যেন বিষ ছিটিয়ে দিতে লাগল।

ঘরে এসে সুমন্ত গা থেকে জামাটাকে টান দিয়ে খুলে ফেলে দিল খাটের ওপর তারপর এক ব্যঙ্গ-মেশানো হাসিতে ভরে উঠল সমস্ত মুখটা, আর তুমি? শিক্ষিতা মেয়েদের মতো খুব যে মনের ভাব গোপন করতে শিখেছো দেখছি। এ বিদ্যে আবার পেলে কোথায়? মনুদার সঙ্গে থেকে নাকি? হিংসেয় তো মরে যাচ্ছিলে জ্যোতিকে দেখে— আবার আদর করে এনে খাওয়ালে কেন? ঘাড় ধরে যে বিদায় করনি কিংবা ঝগড়াঝাঁটি, চেঁচামেচি করে একটা কেলেঙ্কারি করনি এও আমার ভাগ্যি। উন্নতি সত্যিই হয়েছে দেখছি— কৃতিত্ব আছে মনুদার।

সুন্দর চোখদুটোয় এই প্রথম বিদ্রুপ আর ব্যঙ্গের কালো ছায়া নেমে এল।

জামাটা দেওয়ালের ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রেখে সামনে ফিরে সে চোখের দিকে তাকিয়ে আর কোনো কথাই বলতে পারল না বাসন্তী। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আর সেদিন থেকেই আশ্চর্য স্তব্ধ হয়ে গেল সুমন্তর বউ। চুপচাপ কাজ করে, রাগ নেই, জোরে কথা পর্যন্ত বলে না। অস্বস্তিভরা দিনগুলো কাটে— বাড়িটায় যেন নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না প্রাণভরে। অফিসের পরে সুমন্ত লক্ষ্যহীনভাবে এখানে-ওখানে ঘোরে, বাড়ি ফিরতে রাত হলে বাসন্তী আজকাল জিজ্ঞাসাও করে না।

ক-দিন পরে অফিসের ছুটি হয়ে গেলে আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল সুমন্ত— দরজাটা ভেজানো ছিল, ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। মেঝেতে একরাশ বই ছড়িয়ে— খাতায় মুখ গুঁজে কী যেন লিখে চলেছে বাসন্তী, নতুন কেনা, ছেঁড়া

আধ-পুরোনো একরাশ বই। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে লজ্জিত মুখে উঠে বসল।

হাসিমুখে সুমন্ত জিজ্ঞেস করল, হচ্ছে কী?

পড়ছি, মনুদা সব এনে দিয়েছেন।

মনুদা এসেছিলেন বুঝি?

হ্যাঁ, এসেছিলেন, তুমি অফিস যাওয়ার একটু পরেই।

মনুদা দেখছি তোমাকে শিক্ষিতা না করে ছাড়বেন না। তা বুড়ো বয়সে দু ছেলেমেয়ের মা হয়ে নতুন করে ওসব শিখে আর করবে কী— জ্যোতি তো হতে পারবে না? মনুদাকে খুশি করতে পারবে— আমাকে পারবে না। লক্ষ্মীর মতো স্বভাব।— সুমন্ত ব্যঙ্গমেশানো করুণ হাসি হাসল, ও সব লক্ষ্মীর মতো স্বভাবের সার্টিফিকেটে আমার দরকার নেই— পারো পাশে এসে দাঁড়াতে জ্যোতির মতো? জীবনের দুঃখ-কষ্ট আর আর্থিক সমস্যাকে দুজনে সমান ভাগ করে নিতে? কাল রেশনের টাকা নেই— সে-কথা তোমাকে বলে আমার লাভ হবে কিছু? মনুদাকে সেই শিক্ষাই দিতে বলো— আর বলো, নিজের বউটার কথা একবার ভাবতে— কী পেলেন তার মূল্য বুঝলেন না!

অদ্ভুত এক অসহায় দৃষ্টিতে বাসন্তী তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে, মুখের সমস্ত রক্ত চলে গিয়ে নিমেষে সাদা হয়ে গেল মুখটা— তারপরেই ভেঙে পড়ল অসহায় আকুল কান্নায়—। বুকের মধ্যে থেকে গুমরে ওটা অসহ্য দুঃখের যন্ত্রণা— অভিশাপের মতো। খোলা চুলের রাশ পিঠের দু-পাশে ভেঙে পড়ল— এক গাদা, ছেঁড়া, নতুন আর পুরনো বই-এর মধ্যে মাথা গুঁজে বাসন্তী কেঁদে চলল, কান্নার ফাঁকে অর্ধোচ্চারিত কয়েকটা কথা, ভালো করে বোঝা যায় না। দেখে দেখে সুমন্তর চোখ দুটোও জ্বালা করে উঠল— পাশে বসে পিঠের ওপর হাত রেখে বলল— চুপ করো বাসন্তী। ছেলেমেয়ে দুটো অবাক হয়ে গেছে— ওদের আর কাঁদিও না।

বউ হাতখানা সরিয়ে দিল— যাও যাও, আর ন্যাকামো করতে এসো না। তোমার জ্যোতির কাছেই যাও, যে পারবে দুঃখ-কষ্টের ভাগ নিতে। আমি তো তোমার সুখটাই ভোগ করে এসেছি-এতকাল— কত সুখেই রেখেছিলে আমাকে? চাকরানি আর রাঁধুনীর মতো কেবল খেটেছি সংসারে এতকাল। আজ এলে বড়ো বড়ো কথা শোনাতে। এই যদি ছিল তবে ভুল শোধরাওনি কেন? জ্যোতিও ছিল, তুমিও ছিলে।

দরজাটা সশব্দে ভেজিয়ে দিয়ে সুমন্ত বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। বিরক্তিতে নিজের ওপরই মনটা উঠল বিষিয়ে— এরকম যে হবে তা সে ভাবেনি; অপমানও সে করতে চায় না বাসন্তীকে— তবু কেমন করে মনের ক্ষোভটা বেরিয়ে পড়ল আজই।

জ্যোতির ঝি এসে দরজা খুলে দিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে স্বামী-স্ত্রীর চাপা গলার কথা কাটাকাটি শুনে থমকে দাঁড়াল সুমন্ত— ঘরসংসার চুলোয় গেল, বাবুলটা একটু যত্ন পাচ্ছে না, এসব দেখেশুনেও ওই আশি টাকার চাকরি তোমার না করলেই চলবে না।

জ্যোতি বলছে, তোমার তো মেজাজ! দেবে আবার কোনদিন চাকরি ছেড়ে, তখন ওই আশি টাকার চাকরি আর টিউশনি করে সংসার আমাকেই চালাতে হবে। চাকরি তুমিও করো— আমিও করি, ছাড়ব কেন?

না, তা ছাড়বে কেন? তা হলে যে চাকরির নাম করে সুমন্তর সঙ্গে এখানে-ওখানে মিট করার অসুবিধে হয়, আর ভুলের প্রায়শ্চিত্তও করা যায় না। রাস্কেল! নিজের বউটাকে রেখেছে চাকরানির অধম করে, অশিক্ষিত বলে দিনরাত কথা শোনাচ্ছে, চাকুরে মেয়েকে সঙ্গে করে সিনেমা-থিয়েটার করতে আর ভালো লাগবে না কেন?

ছিঃ ছিঃ, কী বলছ তুমি! তীক্ষ্নস্বরে জ্যোতি যেন আর্তনাদ করে উঠল, মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না আমি, বলে কান্না আটকানো গলায় দেওয়ালে ঝোলানো ব্যাগটা টেনে নিয়ে স্যান্ডেল পায়ে গলিয়ে সিঁড়ির মাথায় এসে সুমন্তর পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল জ্যোতি, শুনেছ তো সব, যা পাইনি বলে দুঃখ করছিলাম তাই এসে গেছে আমার জীবনে। কিন্তু তুমি আর একটুও দাঁড়িও না— ভালো লাগছে বুঝি খুব কথাগুলো? বলে কেঁদে ফেলল।

সুমন্ত সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে এল। চোখ মুছে জ্যোতি ঘরে ঢুকে হঠাৎ মনুদার হাত ধরে টেনে জানালার কাছে নিয়ে এল— দেখেছ, সুমন্ত, তোমার কী পরিচয় নিয়ে গেল।

তাই বুঝি! ব্যঙ্গের হাসিতে মুখ ভরিয়ে মনুদা বললেন, তা ওই সঙ্গে তুমি গেলে না যে— আমার পরিচয় তো পেতে বাকি নেই অনেকদিনই। বল তো ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করি? —জামাটা গায়ে চাপিয়ে মনুদা দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। জ্যোতি দুহাত দিয়ে আগলে দাঁড়াল দরজা— যাচ্ছ কোথায়?

ওকে ডেকে আনি— এসে ফিরে গেল? আগের সেই পুরোনো গলায় মনুদা বললেন।

না না না, যেতে পাবে না তুমি, কোথাও যেতে পাবে না, বলে অসহ্য রাগে মনুদার হাত ধরে জোর করে জ্যোতি তাঁকে বসিয়ে দিল খাটের ওপর, তিনি বসে রইলেন অসহায়ের মতো মাটির দিকে তাকিয়ে।

এর মধ্যেই কাঁচা ঘুম ভেঙে বাবলুটা হঠাৎ উঠে কাঁদতে শুরু করল, কিন্তু বাবা-মা দুজনেই বসে রইল কাঠের পুতুলের মতো, কেউ উঠে ছেলেটাকে একবার কোলে করে আদর পর্যন্ত করল না।